শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
স্বামী অদ্বৈতানন্দ

১। সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং সঙ্ঘনেতা রূপে অবতীর্ণ। বিশ্বজীবের প্রতি অপার অহৈতুকী করুণায় বিগলিত-চিত্ত ভগবান্ মানবদেহ ধারণ করে জগদাচার্য্যরূপে-ভারতকে তথা সমগ্র জগৎকে মহামুক্তির পথে পরিচালনের জন্য আবির্ভূত হয়ে বিশ্বমানবকে বলেছেন- "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।"

আমি আবার আচার্যরূপে আসিয়াছি! ওরে তৃষিত, তাপিত, আর্ত্ত মানব! আমাকে আশ্রয় কর-

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

ভীত, বিচলিত, শোকগ্রস্ত হয়ো না, - আমি তোমাকে সমগ্র মালিন্য, গ্লানি থেকে উদ্ধার করবো। "মামেকং শরণং ব্রজ।" আমার নিকট এস!

২। মানবদেহ ধারণ করে - মাতা, পিতা, পতি, পুত্র, স্বামী, সখার ন্যায় স্নেহ-মমতা-প্রেম-প্রীতি-অনুরাগ-ভালবাসা-শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সূত্রে আমাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়ে নরলীলার অনুবর্ত্তন করলেও তিনি আমাদের ন্যায় মায়ামোহে আবদ্ধ নন। তিনি সর্ব্বদাই মায়াতীত, মায়াধীশ, তিনি বলেছেন -

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্

'আমাকে যে যে-ভাবে চায় - আমি সেই ভাবে তাকে ধরা দেই; যে কোনো সম্বন্ধে হোক্ - আমাকে আশ্রয় কর; যে কোনো সম্বন্ধে হোক্ - আমার সহিত যুক্ত হও,- সম্পর্ক পাতাও। আমি তোমার মনোমত ভাবে তোমাকে আমার প্রতি আকর্ষণ করবো।'

SRIMAD BHAGABAT GITA
By Swamy Advaitananda
Price ₹ 200.00
ISBN : 978-93-84965-73-0

প্রকাশক ঃ
স্বামী সারস্বতানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ
বালিগঞ্জ, কোলকাতা-১৯
ফোন - ৯২৩১৮৭৮১১১

নবম সংস্করণ ঃ
শ্রীশ্রীবুদ্ধপূর্ণিমা — ১৪২৬
মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ২০০০

আর্থিক অঞ্জলি প্রদানে—

ধর পরিবার নুঙ্গী, সানিপাড়া, বাটানগর কোলকাতা-৭০০ ১৪০	৺সরোজ কুমার বক্‌সীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রী অপর্ণা বক্‌সী পি-২৯৩ এফ, মুদীয়ালী রোড কোলকাতা-৭০০ ০২৪
৺প্রমথনাথ বড়াল মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণবকান্তি বড়াল (পুত্র)	৺শ্রীমতি মিলন পাল-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রীমতি সুজাতা পাল ৩৪২, কেন্দুয়া মেন রোড, পি.ও. ঃ গড়িয়া কোলকাতা-৭০০ ০৮৪ ফোন ঃ ৮৬৯৭৬১৫৪৫০
মঞ্জুষা ব্যানার্জী	
শ্রীকৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু	

মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা

মুদ্রাকর ঃ
ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা-৭০০ ০০৯

ওঁ

অর্ঘ্য

হে প্রাণারাম ঠাকুর!
নবযুগের তুমিই পরম পুরুষোত্তম,
তোমার সুমহান্ ব্যক্তিত্বের মধ্যে
প্রকট হয়েছে গীতাকার শ্রীভগবানের মহাভাব
তোমার ভাব-বাণীর মধ্যে তাই পরিলক্ষিত হয়
শ্রীমদ্ভগবদগীতারই পরিপূর্ণ প্রতিধ্বনি,
তোমার ধর্ম্মসংস্থাপনার শুভ সঙ্কল্পের মধ্যে তাই
পুনঃ প্রকাশিত সেই ভাগবত প্রতিশ্রুতি ;
তোমার অলক্ষ্য প্রেরণায় রচিত এই গীতা-গ্রন্থ
তোমারই রাতুল চরণে অর্পণ ক'রে
ধন্য হ'ল তোমার দীন
সন্তান।

গ্রন্থকারের নিবেদন

সে বহুদিনের কথা। সঙ্ঘজীবনের তখন প্রথম পর্ব্ব। সন্তান তখন সঙ্ঘের অন্যতম কেন্দ্র খুলনা সেবাশ্রমে কর্ম্মনিরত। সহসা তার নিকট আচার্য্যদেবের একখানি নির্দ্দেশ পত্র আসে—"তোমাকে অগৌণে রাজসাহী বিদ্যার্থিভবনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে।" তাঁর আদেশ পেয়ে মনে হর্ষ-বিষাদের দ্বন্দ্ব। নূতন কার্য্যভার গ্রহণে হর্ষ আছে, কিন্তু যে সকল কলেজের ছাত্রদের পরিচালন করতে হবে তাদের অনেকের বয়স এই সেবকের চেয়েও বেশী। কাজটি দুরূহ বই কি!

তারপর কলিকাতা উপস্থিত হয়ে যখন শুনলাম—প্রতি রবিবার সেখানে ছাত্রদের নিয়ে গীতাক্লাশও চালাতে হবে, তখন মন আরো উদ্বিগ্ন। সন্তানের ভয় ও সঙ্কোচ লক্ষ্য ক'রে আচার্য্যদেব তার হাতে একখানা নোটবুক দিয়ে বললেন—"গীতাক্লাশ চালানো তেমন দুরূহ ব্যাপার নয়। যে শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করতে হবে, তা পূর্ব্বে একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে প্রস্তুত হলেই হবে। একাজের যোগ্যতা না থাকলে তোমাকে এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হবে কেন?"

শ্রীগুরুর সেই অভয় আশ্বাস পেয়ে মন অনেকখানি শান্ত ও আশ্বস্ত। এই উপলক্ষ্যেই সন্তানের গীতার পঠন-পাঠনের প্রথম হাতে খড়ি। চার বৎসর পর পুনরায় আদেশ "তোমাকে সঙ্ঘের বাণীর বার্ত্তাবহরূপে দিগ্‌দেশে প্রচারব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে।" শুরু হয়—নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে সেই নূতন কাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য্য করে সন্তান দেশ-বিদেশে সঙ্ঘের ভাবাদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়। এই সূত্রে বৃহত্তর পরিবেশে মধ্যে মধ্যে গীতাপ্রবচনের সুযোগ ঘটে। গীতাধর্ম্মের ভিতরে যতই প্রবেশ করি ততই উপলব্ধি ঘটে, শ্রীগীতার বাণীর ভিতরে আচার্য্যের বাণী ও ভাবাদর্শের অপরূপ সাদৃশ্য। শ্রীগীতাধর্ম্মের প্রবক্তা যেন মূর্ত্তিমন্ত হয়েছেন আচার্য্যের তপঃশুদ্ধ ভাগবত শরীরে। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুর্ব্বৃত্তগণের বিনাশ তথা

ধর্ম্মসংস্থাপনের যে বিরাট দায়িত্বভার নিয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব,আজ যুগপ্রয়োজনে তাঁর সেই ভাগবতী লীলাই যেন প্রকট হয়েছে যুগাচার্য্যের বহুমুখী কর্ম্মপ্রকল্পের ভিতরে। জ্ঞান-ভক্তি-ধ্যানমিশ্র যে অপূর্ব্ব কর্ম্মযোগের সমন্বিত আদর্শ শ্রীগীতার উপজীব্য, যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দও অধুনা সেই আদর্শই দেখাচ্ছেন। তিনি বলছেন—মহাজাগরণ, মহামিলন, মহাসমন্বয় ও মহামুক্তি—এযুগের কাম্য।

শ্রীশ্রীআচার্য্যের বাণী, আদর্শ ও শিক্ষার ভিতর যে আলোক পেয়েছি, সেই আলোকের দৃষ্টিতে আচার্য্যেরই কৃপাগুণে শ্রীগীতাগ্রন্থের আলোচ্য সংস্করণটি প্রকাশিত হলো। ভক্ত ও সুধীজনের নিকট সমাদৃত হলেই শ্রম সার্থক মনে করবো।

ইতি—
বিনীত
গ্রন্থকার

প্রকাশকের নিবেদন

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'র সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হল। পূজ্য স্বামীজী তাঁর শেষ জীবনে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতাবশতঃ অন্য লিপিকারের সাহায্য নিয়ে তাঁকে পূর্ব্বাপর কাজ করতে হয়েছে। গ্রন্থের প্রুফ দেখতে হয়েছে প্রধানতঃ তাঁকেই—দৃষ্টিকৃচ্ছ্র সত্ত্বেও। জীবদ্দশাতেই তিনি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে যান। প্রাঞ্জল ও সরল ভাষা ও ভাষ্যের জন্য গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠক সমাজে এতই লোকপ্রিয় হয় যে, অত্যল্পকালের ভিতরেই দ্বিতীয় সংস্করণও নিঃশেষিত হয়ে যায়। স্বামীজীর তিরোধানের পর নানা কারণে গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণ হয়ে উঠেনি। অবশেষে সঙ্ঘের অন্যতম কৃতী লেখক বহু গ্রন্থপ্রণেতা স্বামী নির্ম্মলানন্দজী অসুস্থতা সত্ত্বেও কাজটি হাতে নেন এবং বর্ণাশুদ্ধির সহিত তত্ত্ব ও তথ্যগত বিষয়গুলি আদ্যোপান্ত দেখে শুনে আবশ্যকীয় সংশোধনাদি ক'রে দেন এবং মুদ্রণপ্রমাদ যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনার জন্য সর্ব্বশেষ দুটি প্রুফ স্বামীজী ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক স্বয়ং দেখে দেন। তৎসত্ত্বেও যদি দু চারিটি ছাপার ভুল থেকে গিয়ে থাকে তবে সুধী পাঠকবৃন্দ তৎসম্বন্ধে প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বাধিত হব।

গীতাপ্রেমী ভক্ত ও সজ্জনগণের নিকট গ্রন্থখানি পূর্ব্বের ন্যায়ই সমাদৃত হবে—এই প্রত্যয় আছে।

ইতি—
প্রকাশক

গীতাপাঠের নিয়মাবলী

প্রারম্ভঃ

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

শ্রীশ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।। ১
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।। ২
ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্।। ৩
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মনিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমো নমঃ।। ৪
অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।। ৫

ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস-ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা দেবতা, "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" (২।১১) ইতি বীজম্, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮।৬৬) ইতি শক্তিঃ, "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" (১৮।৬৬) ইতি কীলকম্ শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি মধ্যমাভ্যাং বৌষট্। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইত্যনামিকাভ্যাং হুম্। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাসঃ।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি শিখায়ৈ বৌষট্। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি কবচায় হুম্। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

মঙ্গলাচরণম্

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্।।

যাঁকে প্রণাম করে সমস্ত বাগ্‌দেবতার পূজা সুরু করা হয় আমি কৃতার্থ হবার উদ্দেশ্যে সেই গজাননকে প্রণাম করি।

ধ্যানম্

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণ-মুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব! ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্।। ১
নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।। ২
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ।। ৩
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।। ৪
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দ্দনম্।
দেবকী-পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।। ৫
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার-নীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।

অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈঃ রণনদী কৈবর্ত্তকে কেশবে।। ৬
পারাশর্য্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথা-সম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে।। ৭
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্।। ৮
যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।। ৯
নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনম্।। ১০

১। হে জননী ভগবদ্গীতে, শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আপনাকে প্রচার করেছিলেন, মহর্ষি ব্যাস আপনাকে মহাভারত মধ্যে গ্রথিত করেছিলেন, আপনি অদ্বৈততত্ত্বামৃতবর্ষিণী, সংসার-তাপনাশিনী ভগবতী—আমি আপনার ধ্যান করি।

২। হে মহামতি ব্যাসদেব, আপনার নয়ন-ফুল্ল পদ্মপত্রের তুল্য। আপনি মহাভারতরূপ জ্ঞান-প্রদীপের শিখায় ভারতবর্ষের দিকে দিকে আলোকপাত ক'রে ভারত-ভারতীর মোহান্ধকার দূর করেছেন—আপনাকে প্রণাম করি।

৩। শরণাগতের কল্পবৃক্ষস্বরূপ হে শ্রীকৃষ্ণ, গীতামৃতের পরিবেশক জননী দেবকীর নয়নের আনন্দ আপনি। জগতের অনন্যশরণ পরমগুরু। হে জ্ঞানময় শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনাকে প্রণাম করি।

৪। উপনিষদ নিচয় গাভীসমূহ ; সেই সমস্ত গাভীর দোগ্ধা হচ্ছেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ; বৎস হচ্ছে অর্জ্জুন, আর সেই দুগ্ধ হচ্ছে শ্রীগীতা—সুধীজন ইহারই পানকর্ত্তা।

৫। কংস ও চাণূর নামক অসুরদ্বয়ের সংহারকর্ত্তা বাসুদেব—যিনি দেবকীর পরমানন্দস্বরূপ : সেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

৬-৭। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ভীষণ নদীস্বরূপ, ভীষ্ম-দ্রোণ ইহার দুই তীর, জয়দ্রথ ইহার সলিল—গান্ধাররাজ ইহার উপল। শল্য ইহার কুম্ভীর, কৃপ ইহার খরস্রোত, কর্ণ ইহার উত্তাল তরঙ্গ। অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ ইহার মকর। দুর্য্যোধন ইহার আবর্ত্ত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সমর-নদের কর্ণধার। পাণ্ডবগণ তা-ই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পরাশরতনয় ব্যাসদেব বাণীরূপ সরোবরসম্ভূত পরম সুগন্ধ পদ্মের ন্যায় এবং হরিকথায় আপনি প্রস্ফুটিত—নানা মনোহর আখ্যানরূপ কেশরসমন্বিত—যার অমৃতকথা সজ্জনের জীবনস্বরূপ—কলি-কলুষনাশক গীতারূপ তীব্র সুগন্ধমান সেই মহাভারতরূপ পদ্ম জনগণের কল্যাণবর্দ্ধক হউক।

৮। মাধব পরমানন্দ স্বরূপ—তাঁর কৃপায় মূক বাগ্মী হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘনে সমর্থ হয়। আমি তাঁকে প্রণাম করি।

৯। ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও পবনদেব দিব্যস্তুতি দ্বারা যাঁর পূজা করেন, সামগায়কগণ বেদ-উপনিষদ্ দ্বারা যাঁর মহিমাগান করেন, যোগিগণ ধ্যানে তদ্গতচিত্ত হয়ে মানসচক্ষে যাঁকে দর্শন করেন, যাঁর পরমতত্ত্ব দেবাসুরগণেরও অজ্ঞাত—সেই পরমদেবতাকে প্রণাম করি।

১০। মহান্ ধর্ম্মের সার, সকল জ্ঞানের সার শ্রীকৃষ্ণকে এবং সকল ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে সনাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করছি।

সপ্তশ্লোকী গীতা

১। কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৮।৯

২। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ৮।১৩

৩। স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎপ্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ১১।৩৬

৪। সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩।১৪

৫। ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১৫।১

৬। সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫।১৫

৭। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ১৮।৬৫

[অনুবাদ—গ্রন্থের যথা অধ্যায় সমূহে দ্রষ্টব্য]

বিষয়-সূচী

ওঁ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

ভূমিকা

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্‌।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

আজ আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার তত্ত্ববিষয়ক ব্যাখ্যান-মালার শুভ সূত্রপাত বা মঙ্গলাচরণ করব। এই আলোচনার পূর্ব্বে গীতার ঐতিহ্য, গীতাধর্ম্মের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রগুলির সহিত গীতার সম্বন্ধ, পরবর্ত্তী ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর গীতার প্রভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। অদ্যকার আলোচনায় আমরা প্রধানতঃ এই বিষয়গুলির উপর যথাশক্তি আলোকপাতের চেষ্টা করব। কেন না, উক্ত বিষয়গুলির আলোচনা ব্যতীত গীতাধর্ম্মের মর্ম্মার্থ অনুধাবন একান্ত দুরূহ ও দুঃসাধ্য।

বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের পশ্চাতে যে অসংখ্য শাস্ত্ররত্ন বিদ্যমান, গীতা হচ্ছে তাদের মধ্যবিন্দু ; গীতার উপর পূর্ব্ববর্ত্তী বেদাদি শাস্ত্রে যেমন প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তেমনই পরবর্ত্তী শাস্ত্র ও ধর্ম্মমতগুলির উপরও গীতার বিশেষ প্রভাব সুস্পষ্ট। এই দিক দিয়ে বিচার করলে গীতার বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব-গৌরব অশেষ ও অতুলনীয়। সম্ভবতঃ এই কারণে কেহ কেহ মন্তব্য করেন— "The Gita is the best and most illuminating commentary on Hinduism." অর্থাৎ, গীতা হচ্ছে হিন্দুধর্ম্মের অত্যুজ্জ্বল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীকাস্বরূপ। আর এজন্যই কথিত হয়—"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।" অর্থাৎ, অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়নের কি প্রয়োজন? একমাত্র গীতার অধ্যয়ন ও অনুশীলনই যথেষ্ট।

গীতার মহত্ত্ব-গৌরব বিষয়ে আরও বর্ণিত হয়েছে—

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষদসমূহ গাভী, তার দোগ্ধা বা দোহনকর্ত্তা স্বয়ং গোপাল-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, পার্থ বৎস, গীতা দুগ্ধ এবং সুধীজন হচ্ছেন তার ভোক্তা। অর্থাৎ, গীতা সমস্ত উপনিষদের সার। শুধু তাই নয়, গীতা নিজেই একখানি স্বতন্ত্র উপনিষদ্। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে তাই গীতাকে অভিহিত করা হয়েছে 'উপনিষদ' বলে। তবে পূর্ব্ববর্ত্তী উপনিষদগুলির তুলনায় গীতার এক অনুপম বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। অন্যান্য উপনিষদগুলিতে ব্রহ্মের যে স্বরূপলক্ষণ ও সাধনপন্থার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, গীতাতে তা পর্য্যাপ্ত ব'লে বিবেচিত হয় নি। গীতোক্ত ব্রহ্ম শুধু নিরাকার নির্গুণ বা নিরাকার সগুণ নন ; তিনি সাকার সগুণও বটে। কেবলমাত্র তা-ই নয়, গীতোক্ত ব্রহ্ম নিরাকারে নারায়ণ বা পরম পুরুষোত্তম। বস্তুতঃ গীতাতে ঈশ্বরবাদ যে রূপে ও যে ভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে, অন্যান্য উপনিষদে তার উল্লেখ বা পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাও লক্ষণীয় যে উপনিষদের জ্ঞানবাদ ও গীতার জ্ঞানযোগ একপ্রকার নয়। মুখ্যতঃ নেতিমূলক বিচারবাদকেই অন্যান্য উপনিষদগুলি তত্ত্বজ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠ সাধনমার্গ ব'লে প্রচার করেছেন। পক্ষান্তরে, গীতা তাকে স্বীকৃতি দান করে বলেছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।। ১২।৫

নিরাকার ও সাকার, নির্গুণ ও সগুণ—এই দুইটি ব্রহ্মের দুটি বিভাব এবং সেই দুই রূপেই তত্ত্বোপলব্ধি সম্ভবপর। তবে নিরাকার, নির্গুণ ও অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা অধিকতর ক্লেশসাধ্য এবং দুঃখপ্রদ। দেহধারী মনুষ্যের পক্ষে এই সাধনা অধিকতর ক্লেশসাধ্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের আলোচনা প্রসঙ্গে গীতাকার বলেছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।। ৪।৬

জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হয়েও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান ক'রে মায়া দ্বারা আবির্ভূত হই।

জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।। ৪।৯

হে অর্জ্জুন, আমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য ; এই রহস্য যিনি সম্যক্‌রূপে অবগত, তাঁকে আর পুনর্জন্ম পরিগ্রহ করতে হয় না। তিনি দেহান্তে আমাকে লাভ করেন।

গীতার এই যে জ্ঞানযোগ তাতে অবতাররূপী শ্রীভগবানই উপাস্য দেবতা এবং তাঁর সেই দিব্য অবতারলীলার রহস্য অবগত হওয়াই মুক্তিলাভের সর্বোৎকৃষ্ট ও সহজতম উপায়।

এক্ষণে আসুন, গীতাকার স্বয়ং শ্রীভগবান্ তাঁর গীতা সম্বন্ধে কীরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন, আমরা তা লক্ষ্য করি। শ্রীভগবান্ স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে বলছেন—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্।। ৪৪
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ।। ৪৫
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্।। ৪৬

(শ্রীশ্রী গীতামাহাত্ম্য)

হে পার্থ, গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার সার-সর্বস্ব, গীতাই আমার অত্যুগ্র এবং অব্যয় জ্ঞান ; গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য স্বরূপ, গীতা আমার পরম গুরু, গীতার আশ্রয়েই আমি অবস্থান করি। গীতাই আমার পরম গৃহ, গীতাজ্ঞান আশ্রয় করেই আমি ত্রিলোক পালন করি

গীতার মহত্ত্ব-গৌরব বিষয়ে এর চেয়ে অধিক বক্তব্য আর কি হতে পারে? হৃদয় হচ্ছে মনুষ্যদেহের সর্বোত্তম ভাবকেন্দ্র। শ্রীভগবানের হৃদয়রূপী গীতাও তাই তাঁর অনন্ত স্নেহ-করুণা, অপার অভয়-আশ্বাসের

অক্ষয় উৎস। গীতাকে স্পর্শ করা তাই ভক্তবৎসল ভগবানের হৃদয়কে স্পর্শ করা, গীতার অধ্যয়ন তাই শ্রীভগবানের পরম পবিত্র বাণীরই অনুশীলন। গীতাকে গৃহে স্থাপনার অর্থ শ্রীভগবানের পরমাশ্রয়ে নিত্য অধিবাস করা। শুধু তাই নয়, গীতাজ্ঞানের দ্বারাই শ্রীভগবান্ ত্রিলোক পালন করেন। সুতরাং আসুন, এই ত্রিলোকপাবন গীতাজ্ঞান আশ্রয় করে আমরা পাপ-তাপ, জ্বালা-মালা হতে পরিমুক্ত হই ও শান্তিকামী নরনারীকে পাবন বা পবিত্র করি।

গীতাধর্ম্মের চর্চা ও আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় গীতা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়। গীতা সুবিশাল মহাভারত-গ্রন্থেরই একটি বিশেষ অংশ। মহাভারতে সকল বেদের সারার্থ সংগৃহীত, এজন্য মহাভারতকে বলা হয়—পঞ্চমবেদ। প্রবাদ বাক্যেও সচরাচর বলা হয়—'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।' গীতা এই পঞ্চমবেদরূপী মহাগ্রন্থেরই পরম সার। বস্তুতঃ, গীতাকে তাই অভিহিত করা হয়—'সর্ব্বশাস্ত্রময়ী' বলে।

অপর একদল পণ্ডিতের মতে গীতা হচ্ছে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। মহাভারতের অনেক পরে ইহা রচিত হয়। গীতাগ্রন্থ-খানির বহুল প্রচার মানসে ইহার রচয়িতা ইহাকে সুকৌশলে সুবিশাল মহাভারতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দেন।

কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষীর মতে গীতা বাইবেলের পরে রচিত। কেন না, বাইবেলের কোন কোন উপদেশের সঙ্গে গীতার বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। পরন্তু, এই সমস্ত মতবাদ একান্ত ভ্রান্ত। প্রথম মত সম্বন্ধে বলা যায়, মহাভারত ও গীতার ভাষার মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তা'ছাড়া, মহাভারতের অন্যান্য পর্ব্বেও গীতার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যে 'গীতা' নিহিত হলেও শান্তি ও অশ্বমেধ পর্ব্বেও গীতার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। ইহা হতে সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হয় যে গীতা মহাভারতেরই অংশ। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়টি আজ সর্ব্বমান্য সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়েছে যে মহাভারত রচনার বহু পরে যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব ঘটে। এতদ্ব্যতীত, অবতার পুরুষগণের লোককল্যাণমূলক উপদেশের মধ্যে কোথাও কোথাও সাদৃশ্য থাকা আদৌ বিচিত্র নয়। গীতার পূর্ব্ববর্তী উপনিষদসমূহের কোন কোন শ্লোকের সহিত গীতার কতিপয় শ্লোকের অবিকল সাদৃশ্য বিদ্যমান। ইহার দ্বারা একথা

প্রমাণিত হয় না যে গীতা উপনিষদের অনুকরণে লিখিত। বরং এই সত্য স্বীকার করা যায় যে, গীতার উপর উপনিষদের প্রভাব বিদ্যমান। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে—বাইবেল-গ্রন্থখানি যখন গীতার পরে রচিত, তখন তার উপরও গীতার কিছু কিছু প্রভাব পতিত হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

পক্ষান্তরে, একশ্রেণীর ভক্তের বিশ্বাস—গীতোক্ত ভগবদ্ বাক্যগুলি শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত পরম বাণী। অর্থাৎ, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ঐরূপ ছন্দোবদ্ধ ভাষাতেই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ করেছিলেন। এই যুক্তির সমর্থনে তাঁরা বলেন, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের পক্ষে ঐরূপ ছন্দোময় ভাষায় কাব্যাকারে উপদেশ দান আদৌ অসম্ভব নয়। পরন্তু, অন্য এক দল এ যুক্তি বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, গীতাতে ভগবদ বাক্য ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, অর্জ্জুন প্রভৃতিরও উক্তি সন্নিবিষ্ট। তাঁরাও কি ঠিক অনুরূপ পদ্যময় ভাষায় প্রশ্ন ও আলোচনা করেছেন? এরূপ হলে তাঁদের পরস্পরের ভাষার মধ্যে বৈসাদৃশ্য হওয়াই স্বাভাবিক। গীতায় তা লক্ষিত হয় কি? সুতরাং, গীতার ভগবদ্ বাক্যগুলিকে শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী বলে স্বীকার ও প্রচার করার প্রচেষ্টা কষ্টকল্পনার নামান্তর। গীতার রচয়িতা যে মহামুনি বেদব্যাস—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গীতার ধ্যানেও সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় নি কি?

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণ-মুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।

অর্থাৎ, স্বয়ং ভগবান নারায়ণ পার্থকে গীতাবোধ দান করেন এবং মহামুনি ব্যাসদেব মহাভারতের মধ্যে তা লিপিবদ্ধ করেন।

অধুনা আর একদল পণ্ডিত বলছেন, গীতোক্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কোন ঐতিহাসিক ভূমিকা নাই; শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন প্রভৃতিও ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন না। মানুষের ভিতরে যে দৈবী ও আসুরী প্রবৃত্তির সংঘর্ষ নিত্য বিদ্যমান, রূপকচ্ছলে গীতায় তা-ই বর্ণিত হয়েছে। আর এই রূপক সমূহের পশ্চাতে রয়েছে এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রহস্য। মহাত্মা গান্ধীজীও ছিলেন এই মতেরই সমর্থক। পরন্তু, লোকমান্য তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি গীতার অন্যান্য সমসাময়িক ভাষ্যকারগণ এই মতকে যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকার করেন

নি। আমরাও ইহাকে পূর্ণতঃ সমর্থন করি না। আমাদের ধারণা—উপরোক্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করলে গীতার অমূল্য উপদেশ কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সীমিত হয়ে যায়, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্ষেত্রের জীবন-সংগ্রামে গীতার শিক্ষা আদৌ উপযোগী ও প্রেরণাপ্রদ হয় না। আর এরূপ হলে গীতার প্রয়োজনীয়তা এবং মর্য্যাদাও অনেকখানি ক্ষুণ্ণ ও ম্লান হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ, গীতা এমন একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ যদ্দ্বারা মানুষ শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নয়, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক স্তরের জীবনযুদ্ধেও বিজয়-লাভের উপযোগী সামগ্রিক জ্ঞান, উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করে।

মূলতঃ গীতা মোক্ষ-শাস্ত্র সন্দেহ নাই। তবে গীতা মুক্তি মোক্ষ বলতে শুধু আধ্যাত্মিক নির্বাণ-মুক্তির সূচনা করেন নি। গীতা অর্জ্জুনকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে শত্রুগণকে জয় ক'রে ঐহিক সুখৈশ্বর্য্য লাভ এবং মৃত্যুর শেষে আধিদৈবিক স্তরে অবস্থিত সেই স্বর্গলোক ভোগের আশ্বাস দিয়ে বলছেন—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।। ২।৩৭
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।। ২।৩৮

হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্বর্গলাভ করবে, আর জয়ী হলে পৃথিবী ভোগ করবে। সুতরাং, যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে তুমি উত্থিত হও। তুমি ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মযুদ্ধই তোমার স্বধর্ম্ম। তাই তুমি সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়কে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে স্বধর্ম্ম পালনের জন্য যুদ্ধ কর। এরূপ করলে তোমার কোন পাপ হবে না।

গীতা সুস্পষ্টভাবে এখানে অর্জ্জুনকে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্ষেত্রে বিজয় লাভের জন্য প্রেরণা ও প্রোৎসাহন দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে অন্যত্র গীতা বলছেন—

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।। ৩।৪৩

হে মহাবাহো! তুমি কামরূপী দুর্দ্দম শত্রুকে বধ কর।

গীতাতে এখানে অধ্যাত্ম-সংগ্রামের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, গীতা কেবল অধ্যাত্ম উপদেশের গ্রন্থ নহে। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্বস্তরে মানুষ সংগ্রামবিজয়ী হয়ে ঐহিক, পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তি ও মুক্তির অধিকারী হোক—ইহাই গীতার মুখ্য নির্দ্দেশ। এজন্য দেখা যায়, অধ্যাত্মমার্গী উচ্চতম সাধক, পুণ্যকামী ভক্ত ও ভৌতিক সুখৈশ্বর্য্যকামী গৃহী, রাজনৈতিক কর্ম্মী—এদের সকলের নিকট গীতা সমান আদরের বস্তু। বর্ত্তমান যুগে স্বাধীনতাপ্রেমী হিংসাবাদী ও অহিংসাবাদী উভয় শ্রেণীর নেতা ও কর্ম্মিগণকেও গীতা সমভাবে প্রেরণা দান করেছেন। শোনা যায়—অগ্নিযুগের বিপ্লবী যুবকগণের উৎসাহ ও প্রেরণার সর্বশ্রেষ্ঠ আধার ও উৎস ছিল—এই গীতা। গীতা হাতে নিয়ে এঁরা অম্লান বদনে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নি। পক্ষান্তরে, নবযুগে অহিংসা-মন্ত্রের উদ্গাতা মহাত্মা গান্ধীজীর স্বদেশ-সেবামূলক প্রেরণার মূল উৎসও ছিল এই গীতা। তিনি বলতেন—গীতা আমার দ্বিতীয়া জননী। যখনি আমি নিদারুণ সন্দেহ সংশয়ে দিশেহারা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি, তখনি আমি গীতা-মাতার শরণাপন্ন হই এবং তাঁর নিকট হতে লাভ করি সত্যকার আদর্শ, প্রেরণা ও দিব্য চেতনা।

বস্তুতঃ গীতোক্ত সাধনমার্গের এক অনুপম বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় গীতা কোন একটিমাত্র সাধন-পন্থার সূচনা দেন নি। গীতার ১৮টি অধ্যায়ে ১৮ প্রকার সাধনার উপদেশ দেওয়া হয়েছে—যাদের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে চারিটি—কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তি। ভারতীয় ও অভারতীয় অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থে এতগুলি সাধন-পদ্ধতিকে একসঙ্গে সাধকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছে কি? দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি হিন্দুধর্ম্মের কথাই ধরা যায়—তাহলেও দেখা যায়,—বেদের কর্ম্মকাণ্ডে কেবল যজ্ঞমূলক কর্ম্ম, জ্ঞানকাণ্ডে বিচারমূলক জ্ঞান, কাপিল সাংখ্যে পুরুষ-প্রকৃতির বিভেদ-বিচার, পাতঞ্জল যোগে ধ্যান-ধারণারূপ এক একটি পৃথক্ পৃথক্ সাধনমার্গের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্ত্তী বৌদ্ধ, শাঙ্কর, তান্ত্রিক ও ভক্তিযুগেও ঐরূপ এক একটি সাধনপন্থার বিধান পরিদৃষ্ট হয় সে যুগের শাস্ত্রসমূহে। আর্য্যেতর অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগুলি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। পরন্তু, গীতাতেই এর অন্যথা পরিদৃষ্ট হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় জ্ঞাতব্য যে, এই কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তিমূলক সাধন-পদ্ধতিগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে অনুসরণ করার উপদেশও যেমন গীতায় দেওয়া হয়েছে তেমনি এইগুলিকে একত্রে অভ্যাস করার নির্দ্দেশও সূচিত হয়েছে সেখানে। বস্তুতঃ, এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করা যায়—গীতাকার শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত ভক্ত ও শিষ্যগণের সাধনজীবন লক্ষ্য করলে। বৃন্দাবনের গোপ-গোপীগণ ছিলেন ভক্তিযোগী, উদ্ধব ছিলেন ভক্তিমিশ্র জ্ঞানযোগী এবং অর্জ্জুন ছিলেন কর্ম্মযোগী।

বলা বাহুল্য, সাধনমার্গের এই যে উদারতা, তা-ই গীতার লোকপ্রিয়তার অন্যতম বিশিষ্ট কারণ। অনুপম লোকচরিত্রাভিজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ জানতেন, মনুষ্যপ্রকৃতি নিম্নোক্ত চারিটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত—কর্ম্মপ্রধান, জ্ঞানপ্রধান, ধ্যানপ্রধান ও প্রেমপ্রধান। রুচি ও সংস্কারভেদে তাই সাধকগণের সাধনভেদ অবশ্যম্ভাবী। গীতাতে এই সাধনভেদের বৈচিত্র্যটি বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। ৪। ১১

অর্থাৎ, যে আমাকে যেভাবে চায়, আমি তাকে সেইভাবে ধরা দেই। অনেকের মতে গীতা পৃথক্‌ভাবে কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করলেও গীতা এদের সমন্বিত সাধনমার্গের উপরই অধিক মহত্ত্ব দান করেছেন। অর্থাৎ, গীতার উদ্দেশ্য—জ্ঞান-ধ্যান-ভক্তিমিশ্র কর্ম্মযোগের প্রচার-প্রতিষ্ঠা। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবন এই সমন্বিত সাধনারই মূর্ত্তপ্রতীক। তদীয় শিষ্য অর্জ্জুনকেও তিনি সেই পথেরই নির্দ্দেশ দিয়েছেন। পরবর্ত্তী যুগের আচার্য্যগণ কিন্তু এই পন্থার মহত্ত্ব-গৌরব স্বীকার করেন নি। এঁদের কেহ কেহ তাই জ্ঞান, কেহ কেহ ভক্তি এবং অন্য কেহ কেহ কর্ম্মের উপর বিশেষ মহত্ত্ব দান ক'রে নিজেদের সিদ্ধান্ত মত গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। সৌভাগ্যের বিষয়—সহস্র সহস্র বৎসর পরে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রবর্ত্তক আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী পুনরায় গীতার সেই সমন্বিত সাধনা বা জ্ঞান-ধ্যান-ভক্তিমিশ্র কর্ম্মযোগেরই প্রচার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী ও বদ্ধপরিকর হয়েছেন। সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের জীবনও উপরোক্ত মতবাদেরই জীবন্ত নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও বর্ত্তমান যুগে সেই সমন্বিত সাধন-পদ্ধতির

মাধ্যমে যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত। বস্তুতঃ, তাঁর প্রবর্ত্তিত সংঘের সাধনা ও কর্ম্মধারার মধ্যে সেই আদর্শই সুস্পষ্ট। তাঁর সমাধিপূত দিব্য কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—"এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ যুগ মহামিলন ও মহাসমন্বয়ের যুগ, এ যুগ মহামুক্তির যুগ।"

গীতার সিদ্ধান্ত, ধর্ম্মাদর্শ ও সাধনপ্রণালী যে অতি উদার, বহুমুখী, অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বজনীন—সে বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। বস্তুতঃ এই বিশ্বোদার মতবাদের জন্য গীতা জ্ঞানী ও গুণিসমাজে সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃতা। জগতে এমন লিখিত ভাষা অতি বিরল, যাতে গীতা গ্রন্থখানি অনূদিত হয় নাই। বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে যখন খৃষ্টান পাদ্রিগণ এদেশে তাদের ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য আগমন করেন, তখন তারা এদেশে গীতার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হন। এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তিকাখানির এতখানি প্রভাব ও সমাদরের কারণ কি তা জানবার জন্য তাঁরা ইংরাজী ভাষায় সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন এই গীতা গ্রন্থখানি। হয়তো পাদ্রীদের উদ্দেশ্য ছিল—গীতার মাধ্যমে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন ক'রে তার সমালোচনার উপকরণ সংগ্রহ করা। পরন্তু, ইহার ফল হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে গীতা যখন পাশ্চাত্ত্য সুধী সমাজে প্রচারিত হল, তখন গীতার ভাবাদর্শ লক্ষ্য ক'রে সে দেশের যাঁরা সত্যকার জ্ঞানী ও শান্তিপিপাসু—তাঁরা এক অভিনব আলোকের সন্ধান পেলেন। আমেরিকার প্রখ্যাত তত্ত্বজ্ঞান-জিজ্ঞাসু পণ্ডিত এমার্সন, জার্ম্মানীর খ্যাতনামা মনীষী ডয়সন প্রভৃতি গীতার গভীর ও অত্যুদার জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আদর্শের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হন যে, তা তাঁদের জীবনে এক অপূর্ব্ব রূপান্তর আনয়ন করে এবং পরবর্ত্তী জীবনে তাঁরাও নিজেদের দেশে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত এই গীতোক্ত আদর্শের প্রচার-প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। এদের প্রচারের ফলেই পাশ্চাত্ত্যের অন্যান্য ভাষাগুলিতেও গীতার অনুবাদ দ্রুত শুরু হয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের প্রগতিশীল একশ্রেণীর নরনারী যখন অতিমাত্র জিজ্ঞাসু ও যুক্তিপ্রবণ হয়ে ওঠেন, তখন বাইবেলের আকস্মিক সৃষ্টিবাদ, আত্যন্তিক অহিংসাবাদ, ঐকান্তিক নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মনীতি ও বিজ্ঞানবিরোধী মনোভাবের প্রতি তাঁরা ক্রমশঃ আস্থাহীন হয়ে

পড়েন। এই সন্ধিক্ষণে গীতার বৈজ্ঞানিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মতবাদ ও সিদ্ধান্তের মধ্যেই তাঁরা লাভ করেন প্রকৃত শান্তি ও সান্ত্বনা। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক মানস লোকে গীতার সমাদরের ইহাও একটি মুখ্য কারণ!

গীতার জন্মভূমি ভারতবর্ষে গীতাকে যুগপ্রবর্ত্তক বললেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ, শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত ধর্ম্মাচার্য্য ও ধর্ম্মমতের উপর গীতার প্রভাব সুস্পষ্ট ও অসামান্য। শ্রীবুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্মের উপর গীতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিদৃষ্ট না হলেও গীতোক্ত নীতিধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ নীতিবাদের বহুল সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাছাড়া, পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যগণ যখন হিন্দুধর্ম্মকে সম্পূর্ণ রূপে আত্মসাৎ করার জন্য ধীরে ধীরে নালন্দাদি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হিন্দুশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের পক্ষপাতী হয়ে উঠেন, তখন গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রত্যক্ষ প্রভাব পতিত হয় বৌদ্ধধর্ম্মের উপর এবং এর ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের হীনযান হতে মহাযান সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে। এই মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সম্যক্ কর্ম্মের নামে গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে স্বীকৃতি দান করেন। এই সময় হতে বৌদ্ধধর্ম্মে পঞ্চ শীলের পালনের সঙ্গে সঙ্গে জীবসেবামূলক নিষ্কাম কর্ম্মকে অধ্যাত্ম সাধনার আবশ্যিক অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়। শুধু তাই নয়, গীতার অবতারবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবও এই কালে পতিত হয় বৌদ্ধধর্ম্মের উপর। আর এরই ফলে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীবুদ্ধও বৌদ্ধধর্ম্মে অবতাররূপে গৃহীত ও বৃত হন। প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মের স্থানকবাসী সম্প্রদায় হতে ডেরাবাসী সম্প্রদায়ের উৎপত্তিরও সম্ভবতঃ ইহাই মুখ্য কারণ। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের পূর্ব্বাপর ঐতিহ্য আলোচনা করলে এই বিষয়টির সুস্পষ্টতা উপলব্ধি করা যায়।

বৌদ্ধ ও জৈন যুগের পরবর্ত্তী সমস্ত হিন্দু ধর্ম্মাচার্য্যগণের উপর লক্ষিত হয় গীতার প্রত্যক্ষ ও পূর্ণ প্রভাব। আচার্য্য শঙ্কর তাঁর প্রচার্য্য অদ্বৈত জ্ঞানবাদের সমর্থন লাভের জন্য গীতার জ্ঞানমুখী ভাষ্য প্রণয়ন করেন। আচার্য্য শঙ্কররচিত ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদাবলীর ভাষ্যের তুলনায় তাঁর গীতাভাষ্য যে হিন্দুসমাজের উপর অধিকতর প্রভাবপ্রসূ হয়—সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ভাবে আচার্য্য রামানুজ, আচার্য্য মধ্ব, আচার্য্য শ্রীধর, আচার্য্য বলদেববিদ্যাভূষণ, আচার্য্য মধুসূদন প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণও

তাঁদের স্বীয় স্বীয় মতবাদের সমর্থনের জন্য গীতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, এইরূপ প্রচেষ্টার ফলেই গীতার অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতবাদমূলক ব্যাখ্যাসমূহ প্রবর্ত্তিত হয়।

ইদানীং কালে লোকমান্য তিলক, ঋষি অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধীজী প্রমুখ গীতাপ্রেমী নেতৃবৃন্দ অনুরূপ ভাবে নিজ নিজ আদর্শ ও সিদ্ধান্তের সমর্থন লাভের জন্য তাঁদের ভাবাদর্শে গীতার পৃথক্ পৃথক্ ভাষ্য রচনা করেন। উপরোক্ত প্রচার-প্রচেষ্টা লক্ষ্য করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়—হিন্দুধর্ম্মের ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে গীতার সম্বন্ধ সম্পর্ক কত গভীর ও অবিচ্ছিন্ন। বস্তুতঃ, গীতাকে অস্বীকার ও অমান্য ক'রে অধুনা হিন্দুধর্ম্মের প্রচার ও যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তন অসম্ভব ও কল্পনাতীত। কথা ও উপদেশদান প্রসঙ্গে গীতার বহু নীতি ও দার্শনিক বিচারের অবতারণা করা হয়। পরন্তু, তথাপি নিঃসংশয়ে বলা চলে—গীতা কেবল নীতিশাস্ত্র বা বিচারমূলক দার্শনিক গ্রন্থ নয়। বস্তুতঃ, গীতার আদি-মধ্য-অন্ত সর্বত্র জীবনগঠনের উপযোগী সাধনসঙ্কেত বিদ্যমান। সামান্য জৈব স্তর হতে ধীরে ধীরে মানুষ কি ভাবে, কি কৌশলে ভাগবত স্তরে উন্নীত হয়ে চরম মুক্তি ও শান্তির অধিকারী হতে পারে—গীতা নানাভাবে সেই প্রেরণা ও নির্দ্দেশই দান করেছেন। গীতাকে এজন্য অনেক পাশ্চাত্ত্য মনীষী অভিহিত করেছেন "Way to life and light" বলে। অর্থাৎ গীতায় যেখানে যত নীতি ও দর্শনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে তার একমাত্র লক্ষ্য—মানুষকে অতি সহজে শাশ্বত জীবন ও অমৃতত্ত্বের আলোক দান করা।

মুখ্যতঃ গীতা বেদমূলক। বেদই গীতাজ্ঞানের বা গীতাধর্ম্মের ভিত্তি।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ২।৪২

ইত্যাদি শ্লোকে বেদের কর্ম্মকাণ্ডে বিশ্বাসী সকাম সাধকদের নিন্দা করেছেন বলে কারও কারও ধারণা—গীতা বেদবিরোধী। পরন্তু, এরূপ ধারণা স্থূল বুদ্ধির নিদর্শন মাত্র। আসলে গীতা বেদের কর্ম্মকাণ্ডেরও বিরোধী নন। স্বর্গাদি ফল কামনায় যারা আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং তাকেই জীবনের যথাসর্বস্ব বলে মান্য করেন, গীতা মাত্র তাঁদের বিরুদ্ধেই ইত্যাকার উক্তি করেছেন। গীতা যদি সত্যসত্যই বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী হতেন, তবে গীতা কদাপি নিম্নোক্ত অনুশাসন দিতে না।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৩।৯

যজ্ঞার্থ বা ঈশ্বরপ্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ম্ম ব্যতীত অন্য সকল কর্ম্ম বন্ধনের কারণ। অতএব হে কৌন্তেয়, তুমি অনাসক্ত হয়ে যজ্ঞার্থে কর্ম্ম কর। গীতা আরও বললেন—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ৩।১৩

যাঁরা যজ্ঞের প্রসাদ গ্রহণ করেন তাঁরা সর্ব্বপ্রকার পাপতাপ হতে মুক্ত হন এবং যারা এরূপ না ক'রে শুধু নিজেদের জন্যই অন্নপাক করে, তারা পাপ ভোজন করে।

গীতার উপরোক্ত উক্তি হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—গীতা যজ্ঞের পরিপূর্ণ সমর্থক এবং যজ্ঞকর্ম্মকেই গীতা সত্যকার কর্ম্ম বলে স্বীকার করেন। গীতার বিরোধ শুধু পরবর্ত্তী মীমাংসকগণের ভোগমূলক যাগযজ্ঞের সহিত—যা মুক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ। সত্য বলতে, গীতাতে যজ্ঞের যেরূপ উন্নত ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা অন্যত্র বিরল। দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি-দানরূপ যে অনুষ্ঠান, গীতার দৃষ্টিতে তা হচ্ছে দ্রব্যময় যজ্ঞ। এই যজ্ঞকে স্বীকৃতি দান করলেও গীতা একেই সর্ব্বস্ব মনে করেন নি। এই দ্রব্যযজ্ঞ ব্যতীত গীতা সংযমযজ্ঞ, ইন্দ্রিয়যজ্ঞ, সমাধিযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, প্রাণায়ামযজ্ঞ, জপযজ্ঞ প্রভৃতি বহুবিধ যজ্ঞের উল্লেখ করেছেন। কেবলমাত্র ইহাই নহে, গীতার দৃষ্টিতে ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্ম, এমনকি ভয়ঙ্কর যুদ্ধকর্ম্মও যজ্ঞ এবং তা-ই মুক্তিপ্রদ।

বেদের যজ্ঞকর্ম্মের ন্যায় সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিবাদ, পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ যোগমার্গও গীতায় স্থান পেয়েছে। তবে গীতা এগুলিকে নিজের প্রয়োজনে যেখানে যতটুকু ও যেভাবে গ্রহণ করার—তা-ই করেছেন। যেমন বলা যায়—শান্ত, নির্ব্বিকার, নিত্যচেতন পুরুষ ও জড় অথচ বিকাশশীলা, প্রসবধর্ম্মিণী প্রকৃতির সংস্পর্শে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হয়—সাংখ্যের এই সৃষ্টিতত্ত্বমূলক সিদ্ধান্তটি গীতা স্বীকার করেন; তবে সৃষ্টি-ব্যাপারের পশ্চাতে স্রষ্টারূপী

ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তার কথা সাংখ্য স্বীকার করেন নাই। গীতা এখানে প্রশ্ন তুলেছেন—পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে জগৎসংসারের সৃষ্টি হয় একথা সত্য; তবে এ মিলন আপনা-আপনি ঘটে নি, বা ঘটতে পারে না। এজন্য কর্ত্তারূপী ঈশ্বরের প্রেরণা প্রয়োজন। অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি স্বাধীন নহে, ঈশ্বরের অধীন। পরমাত্মাই আদি কারণ। তাঁর মধ্যে যখন সিসৃক্ষা বা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তখন তিনি পুরুষ-প্রকৃতির মাধ্যমে সংসার সৃষ্টি করেন অথবা পরমাত্মা স্বয়ং বিশ্বজগৎরূপে অভিব্যক্ত হন।

সাংখ্য মতে পুরুষ-প্রকৃতিসহ মূলতত্ত্ব হচ্ছে ২৪, পরন্তু গীতার মতে ভগবানকে নিয়ে এই তত্ত্ব ২৫।

সাংখ্যের ন্যায় গীতা পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ সাধনমার্গকে স্বীকার করেন। তবে পাতঞ্জল দর্শন যম-নিয়মাদি সাধনাঙ্গগুলির অনুশীলন দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়—এরূপ সূচনা দেন। পক্ষান্তরে, গীতা বলেন এই সাধন-পদ্ধতির সহিত ঈশ্বরকৃপা সংযুক্ত হলেই সেই সাধনা আরও সরল ও সুগম হয়। পাতঞ্জল সাংখ্যের ন্যায় সম্পূর্ণ নিরীশ্বরবাদী না হলেও পতঞ্জলের মতে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা মুখ্য নয়, গৌণ। গীতা সাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। পাতঞ্জলযোগের ধ্যেয় হচ্ছে জ্যোতির্ম্ময় আত্মা, গীতোক্ত ধ্যানযোগের আধার হচ্ছেন স্বয়ং পুরুষোত্তম ভগবান্। তিনি কেবল শান্ত, নির্ব্বিকার ও জ্যোতিঃস্বরূপ নন, তিনি হচ্ছেন পরম করুণাময় ও অভয়-আশ্বাসদাতা শ্রীভগবান্। বস্তুতঃ, এই ঈশ্বরবাদই গীতার সর্ব্বপ্রধান উপপাদ্য।

অবতারবাদ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে তার বিশেষ উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না। এই বিষয়টির সর্ব্বপ্রথম ও সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় গীতায়। গীতাকার বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র অবতার গ্রহণ করেন। পরন্তু, শ্রীরামচন্দ্র তাঁর জীবৎকালে ভগবদবতাররূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছেন বলে মনে হয় না। পরবর্ত্তী কালে গীতোক্ত ভাগবত ধর্ম্মের প্রচার প্রতিষ্ঠার ফলে অবতারবাদ যখন দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে, তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রও অবতাররূপে বিশেষ স্বীকৃতি ও পূজা লাভ করেন।

গীতায় শ্রীভগবান্ পরিষ্কার ভাবে বলেছেন—

অজ বা জন্মরহিত হয়েও আমি নিজ মায়ায় জন্মগ্রহণ করি; শুধু

একবার নয়, যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই। "সম্ভবামি যুগে যুগে"। বস্তুতঃ, ঈশ্বরের অবতারতত্ত্বের এর চেয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত গীতা ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায় কি? খৃষ্টানদের বাইবেল ও মুসলিমদের কোরানেও অবশ্য আবির্ভূত পুরুষের উল্লেখ আছে। তবে তা গীতোক্ত ভগবৎ প্রতিশ্রুতিরই দূরতম প্রতিধ্বনি মাত্র। কেন না, তাঁদের মহাত্মা যীশু ও হজরত মহম্মদ ঈশ্বরের অবতার নন, তাঁরা যথাক্রমে ভগবানের পুত্র ও দোস্ত মাত্র।

গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে কিন্তু ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ বা অভিব্যক্তি বলেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি সংসারাবদ্ধ জীবকে পরিত্রাণলাভের যে সরলতম পন্থাটির নির্দ্দেশ দিয়েছেন তাও অন্যত্র বিরল। তিনি পুরুষকারহীন, শক্তিহীন দীন দুর্ব্বল জীবকে চরম অভয়াশ্বাস দিয়ে বললেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৬৬

ধর্ম্মাধর্ম্মের সমস্ত বিচার বিবেচনা পরিহার ক'রে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর। আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার গ্লানি-ম্লানি, পাপ-তাপ থেকে উদ্ধার করব, তুমি আদৌ শঙ্কিত ও দুঃখিত হয়ো না।

দুশ্ছেদ্য মায়াজাল হতে পরিত্রাণ পাবার এত বড় অভয়াশ্বাস আর কোন ধর্ম্মে আছে? মোক্ষলাভের এমন সরল ও সহজতম পন্থা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আর কোথায়, কোন্ ধর্ম্মে?

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয়ও জানা অত্যাবশ্যক। কৃপাবাদের উপর এতখানি জোর দিলেও গীতা পুরুষকারবাদকে আদৌ অস্বীকার করেন নি। অধিকারী বিশেষকে লক্ষ্য ক'রে গীতা একথাও বলেছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ॥ ৬।৫

মনের দ্বারা মনের উর্দ্ধগতি সম্পাদন কর। মনকে কদাপি অবসন্ন হতে দিও না। এইরূপে গীতা বহুস্থলে মুমুক্ষু সাধককে স্বীয় পুরুষকারের সহায়তায় সাধনমার্গে অগ্রসর হবার জন্য পুনঃ পুনঃ উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেছেন। তবে এ বিষয়ে গীতার বক্তব্য এই যে, সাধকের যতটুকু

শক্তি-সামর্থ্য আছে তার পক্ষে ততটুকু পুরুষকার অত্যাবশ্যক। কিন্তু সাধনার ইহাই শেষ কথা নয়।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭।১৪

আমার দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া। জীবের সাধ্য নাই কেবল পুরুষকার সহায়ে সে তা জয় করে। জীবের পরমা মুক্তি আমার হাতে। আমি প্রসন্ন হয়ে কৃপা করলে সেই মায়াজাল অতিক্রম করা সহজসাধ্য হয়।

গীতা এখানে পুরুষকারবাদ ও কৃপাবাদের সমন্বিত সাধনার ইঙ্গিত করেছেন। ভক্তিযোগেও তাই গীতা ভক্তিমার্গীকে লক্ষ্য ক'রে ভক্তের উপযোগী গুণ ও অধিকার অর্জ্জনের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। গীতার এই সমন্বিত সাধনা সত্য সত্যই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

অর্জ্জুন কেন গীতার প্রথম শ্রোতা?

যে যুগে গীতাধর্ম্মের প্রচার হয়, সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির। জ্ঞানে-গুণে, দয়া-দাক্ষিণ্যে, উদারতা-মহানুভবতায়, ন্যায়-নিষ্ঠায় ও বুদ্ধি-বিচারে যুধিষ্ঠির ছিলেন সে যুগে সর্বাগ্রগণ্য এবং এ সমস্ত গুণাবলীর জন্য তিনি লোকসমাজে অভিহিত হতেন 'ধর্ম্মরাজ' বলে। এক্ষণে প্রশ্ন আসে এ হেন মহান্ গুণধর ব্যক্তিকে উপেক্ষা ক'রে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে তাঁর গীতোপদেশের প্রথম শ্রোতৃরূপে মনোনয়ন করলেন? অর্জ্জুনের এমন কি গুণ ও অধিকার ছিল যেজন্য তিনি শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্ত ও সখারূপে গৃহীত হলেন? পক্ষান্তরে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরই বা কেন অযোগ্য ও অনধিকারী বিবেচিত হলেন?

গীতাধর্ম্মের আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিষয়টির মীমাংসা একান্ত আবশ্যক। কারণ, গীতাজ্ঞান সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে হলে চাই গীতাকার শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি ও ভগবৎ-সখা অর্জ্জুনের গুণ ও অধিকারের যথাশক্তি অনুসরণ ও অনুকরণ। অর্থাৎ, গীতাজ্ঞান লাভের জন্য আমাদের প্রয়োজন —অর্জ্জুনের গুণ, চরিত্র ও যোগ্যতার অনুবর্ত্তী হওয়া। মূল গীতা গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভের পূর্ব্বে তাই আসুন, আমরা অর্জ্জুনের সেই মহত্ত্ব ও যোগ্যতার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

ভগবৎ-প্রীতি :—

অর্জ্জুনচরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর অনুপম ভগবৎ-প্রেম। এই গুণের জন্যই তিনি শ্রীভগবানকে পরম সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এ সংসারে মিত্রতা বা সখ্য হয় সমানে সমানে। অর্থাৎ, যেখানে দুই ব্যক্তির মধ্যে গুণ ও শক্তির সাদৃশ্য বা সমানতা বিদ্যমান, সেখানেই তাঁদের মধ্যে সখ্যের সূত্রপাত হয়। এই মানদণ্ডে বিচার করলে অর্জ্জুনের চরিত্র কতখানি উন্নত ও মহত্ত্বপূর্ণ ছিল তা অনেকখানি অনুমান করা যায়। কেন না, অর্জ্জুনের সখা রাম-শ্যাম-যদু-মধুর ন্যায় কোন সামান্য ব্যক্তি নয়। তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবদবতার শ্রীকৃষ্ণ।

প্রশ্ন আসে, ভগবানের সদৃশ বা সমান গুণ, জ্ঞান ও শক্তি কি কখনও মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভবপর? তিনি তো সব দিক দিয়ে অসীম ও অনন্ত। তিনি তাই অনুপম বা অতুলনীয় নন কি? উত্তরে বলবো—এক হিসাবে তা-ই সত্য। তবে, পরম কারুণিক ভগবান্ যদি কারো রূপ, গুণ, শক্তি ও মহিমা দেখে কৃপাপূর্ব্বক তাঁকে স্বয়ং সখা বলে স্বীকার করেন, তবে তাঁর সৌভাগ্য-সুকৃতির পার কোথায়? বৃন্দাবনের গোপবালক ও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ছিলেন এই দিক দিয়ে মহান্ ও অনন্যসাধারণ। বাহ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বয়স ও দৈহিক বর্ণ ছিল একই প্রকার ; বীরত্ব, পৌরুষ, স্নেহ, প্রেম, করুণা প্রভৃতি দেবোচিত বহু সদ্‌গুণেরও ছিলেন বিশেষ অধিকারী এই কৃষ্ণসখা পার্থ। তবে একথা সত্য যে, অন্য অনেকের ন্যায় অর্জ্জুনও প্রথমতঃ তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার রূপে ধারণা করতে পারেন নি। তিনি তাঁকে তাঁরই ন্যায় একজন গুণী, জ্ঞানী ও শক্তিশালী মনুষ্যরূপে মনে করেছিলেন। পরন্তু, জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারে হোক—অর্জ্জুনের প্রেম-প্রীতি ভগবচ্চরণেই নিবেদিত হয়েছিল এবং ইহাই ছিল তাঁর জন্মান্তরীণ সৌভাগ্যসুকৃতি আর ইহাও লক্ষ্য করার বিষয়, শ্রীকৃষ্ণকে সখারূপে বরণ করার পর অর্জ্জুন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর সঙ্গ বা সাহচর্য্য পরিহার করতে প্রস্তুত হন নি। উত্থানে, উপবেশনে, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে ও অন্যান্য যাবতীয় কাজ-কর্ম্মে তিনি ছিলেন তাঁর নিত্য সাথী। গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন করার পরে অর্জ্জুন এই কথাটি স্মরণ ক'রে খেদের সহিত বলেছিলেন—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ১১।৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ১১।৪২

তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও মহিমা অবগত না হয়ে তোমাকে সখাজ্ঞানে ও প্রণয় বশতঃ 'হে কেশব, কে কৃষ্ণ, হে সখা' ইত্যাদি সম্বোধনে অভিহিত করেছি। হে অচ্যুত, আহার-বিহার, শয়ন ও উপবেশনকালে একাকী ও বন্ধু সমক্ষে তোমাকে কত অসম্মান ও অমর্য্যাদা করেছি। হে অমিতপ্রভাব, এজন্য আমি তোমার নিকট এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে ক্ষমাসুন্দর, তুমি আমার সমস্ত দোষ-ত্রুটি মার্জ্জনা কর। অজ্ঞাত ভাবে হলেও অর্জ্জুনের এই ভগবন্নিষ্ঠা কতই না গভীর, মধুর ও মহত্ত্বপূর্ণ।

মাতৃভক্তি :—

অর্জ্জুন ছিলেন অনন্য মাতৃভক্ত। অপরাপর ভ্রাতাদের তুলনায় এক্ষেত্রেও তাঁর মাতৃভক্তির ছিল এক অনুপম বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে একদিনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একদা অর্জ্জুন গৃহপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ ক'রে লক্ষ্য করলেন—মাতা কুন্তী একান্তে বসে রোদন করছেন। জননীর এই শোকবিহ্বল অবস্থা লক্ষ্য করে অর্জ্জুন অতীব মর্ম্মাহত ও বিচলিত। মাতার চরণযুগল জড়িয়ে ধরে অর্জ্জুন তাঁর এই নিদারুণ মর্ম্মব্যথার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে জননী কুন্তী বললেন, "আমি বিবাহের পর যখন হতে কুরুকুলে প্রবিষ্ট হয়েছি তখন হতেই এই কুলের যিনি কুলদেবতা—সেই সদাশিবের পূজা আমি নিত্য ক'রে এসেছি। আজ প্রাতে যখন আমি পূজার অর্ঘ্য নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি তখন কৌরবজননী গান্ধারী বললেন, তুমি আর রাজমহিষী নও। সুতরাং, তোমার আর এই মন্দিরে পূজার অধিকার নাই। আমাদের বিবাদ দেখে স্বয়ং শঙ্কর আদেশ করেছেন—আগামীকল্য প্রভাতে প্রথমে যে আমাকে সহস্র কনক চাঁপায় পূজা করবে সে-ই হবে আমার পূজার অধিকারিণী, তাঁর ছেলেই হবে রাজা। বৎস, আমি একদিন ছিলাম এই কুলের রাজমহিষী এবং পরে

ছিলাম রাজজননী। আজ আমি সর্ব্বহারা ভিখারিণী। গান্ধারী তাই আমাকে এরূপ কটু বাক্য বলে তিরস্কার করতে সাহসী হয়েছে।"

অর্জ্জুন বললেন, "মা, এই তোমার দুঃখের কারণ? তুমি নিশ্চিন্ত হও। পঞ্চপাণ্ডব আজ রাজ্য বৈভবহীন, কিন্তু পৌরুষহীন, সামর্থ্যহীন নয়। আমি নিশ্চয়ই তোমার পূজার ব্যবস্থা করব।"

এই কথা বলে অর্জ্জুন গাণ্ডীব হস্তে বহির্গত হলেন এবং বায়ব্যাস্ত্রে কুবেরের ধনভাণ্ডার জয় ক'রে রাশি রাশি কনক চাঁপা এনে দিলেন। বললেন —"মা, এই নাও তোমার পূজার অর্ঘ্য।"

উপরোক্ত ঘটনাটি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় অর্জ্জুনের মাতৃভক্তি ছিল কী রূপ ও কোন্ পর্য্যায়ের। *

ভ্রাতৃভক্তি :—

অতি শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অর্জ্জুন পিতৃসেবার সুযোগ হতে বঞ্চিত হন। পরে তিনি তাঁর এই মানসিক ক্ষোভ দূর করেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে পিতৃতুল্যরূপে বরণ ক'রে। জ্ঞানলাভের পর হতে তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে শুধু যে পিতার ন্যায় সেবা-ভক্তি করতেন তা-ই নয়, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতার অঙ্গ হতে কেহ যদি বৈর বশে একবিন্দু রক্তপাত করে,তবে তিনি নির্ব্বিচারে তার শিরশ্ছেদ করবেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার অপমান-লাঞ্ছনা তিনি আদৌ সহ্য করবেন না।

কুরুসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাকালে ভীমসেন তখন তর্জ্জন-গর্জ্জন ক'রে যুধিষ্ঠিরের নিন্দাবাদ করতে থাকেন, তখন অর্জ্জুন মধ্যম পাণ্ডবকে এইকথা বলেন যে, তিনি যেন জ্যেষ্ঠভ্রাতার এইরূপ নিন্দা-সমালোচনা না করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বৃকোদরকে বুঝিয়ে বলেন, তাঁদের অগ্রজ যুধিষ্ঠির বিবেকী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। পাঞ্চালীর অপমানে তিনি যে শান্ত ও নীরব আছেন এর পশ্চাতে কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্য থাকতে পারে। অর্জ্জুনের এই উক্তি শুনে ও দৃঢ় সঙ্কল্প দেখে ভীমসেন ক্ষান্ত হন।

অন্য একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। একদা বিরাট রাজা ক্রুদ্ধ

* এই গল্পটি মূল মহাভারতে নেই, আছে কাশীদাসী মহাভারতের বিরাট পর্ব্বে।

হয়ে কঙ্কের (যুধিষ্ঠির) গণ্ডদেশে সজোরে পাশা নিক্ষেপ করলে তা হতে দর দর ধারায় রুধির নির্গত হতে থাকে। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ সৈরিন্ধ্রীকে আদেশ দেন, শীঘ্র একটি পাত্রে এই ক্ষরিত রক্তধারা ধারণ করতে। কারণ, অর্জ্জুন যদি তাঁর একবিন্দু রক্ত ভূপতিত অবস্থায় দেখতে পায় তবে রাজা বিরাটের আর রক্ষা নাই। ভ্রান্তিবশে এই গর্হিত কাজ করলেও রাজা বিরাট পাণ্ডবদের আশ্রয়দাতা ও পরম হিতৈষী। তাঁর কোনও প্রকার হানি না হয়—তা-ই তাঁদের দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত ঘটনাবলী হতে সুস্পষ্ট রূপে ধারণা করা যায় জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি অর্জ্জুনের শ্রদ্ধা ভক্তি-অনুরাগ ছিল কতখানি আন্তরিক ও সুগভীর।

গুরুভক্তি :—

ভগবদ্‌ভক্তি, মাতৃভক্তির ন্যায় অর্জ্জুনের গুরুভক্তিও ছিল অসামান্য। এই অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও অকৃত্রিম সেবা-পরিচর্য্যার গুণেই তিনি অচিরে গুরু দ্রোণের হৃদয় জয় ক'রে তাঁর প্রিয়তম শিষ্যত্বের অধিকার লাভ করেছিলেন এবং এই গুণাবলীর জন্যই তিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব অর্জ্জন ক'রে সকলের বিস্ময়দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পক্ষান্তরে, তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না ক'রে কৌরবগণ এমন কি আচার্য্যপুত্র স্বয়ং অশ্বত্থামাও তাঁর প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেন। তাঁরা অভিযোগ করতে থাকেন যে, অর্জ্জুনের এই অত্যদ্ভুত সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে আচার্য্য দ্রোণের পক্ষপাতিত্ব এবং তাঁর এই ব্যবহার নিতান্তই অক্ষম্য ও অমার্জ্জনীয়।

আচার্য্য দ্রোণ কৌরবাদি শিষ্যগণের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য মৌখিক প্রত্যুত্তর না দিয়ে কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে যখন তাঁদিগকে বুঝিয়ে দিলেন যে অর্জ্জুন স্বীয় গুণ ও যোগ্যতার বলেই এরূপ অসামান্য কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন তখন তাঁরা কিছুটা শান্ত হলেন।

শুধু অস্ত্র-শিক্ষাকালেই নয়, সমগ্র জীবন অর্জ্জুন তাঁর শিক্ষাদাতা আচার্য্যের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুরাগের ভাব রক্ষা ক'রে চলতেন তাই দেখা যায়, বার বার যুদ্ধকালে যখন গুরু দ্রোণ শত্রুপক্ষে যোগদান ক'রে তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার জন্য কৃতনিশ্চয়, তখনও অর্জ্জুন

গুরুর এই প্রতিকুল ব্যবহারের জন্য বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ না হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'বার প্রাক্‌মুহূর্ত্তে সর্ব্বাগ্রে গুরুর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করতেন দুটি শর। প্রথম শরটি চালিত হ'ত গুরু দ্রোণের কর্ণের পার্শ্বদেশ দিয়ে এবং তা তাঁকে জানিয়ে দিত—আপনার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত। অন্য শরটি নিক্ষিপ্ত হ'ত তাঁর চরণমূলে এবং তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিত আপনার অনুগত শিষ্য অর্জ্জুন প্রণিপাত নিবেদন করছে আপনার পদমূলে। গুরু দ্রোণ অর্জ্জুনের এই ঐকান্তিক শরণাগতি ও ভাবভক্তির জন্য চিরকাল তাঁর এই পুত্রোপম প্রিয় শিষ্যের কল্যাণ কামনা করতেন। বস্তুতঃ, অর্জ্জুনের এই গুরুভক্তি সত্য সত্যই অতুলনীয় ও সুদুর্লভ।

অর্জ্জুনের চিত্তসংযমের সামর্থ্যও ছিল অত্যদ্ভুত। পরমা সুন্দরী উর্ব্বশীর প্রণয়প্রার্থনাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন অবিচলিত চিত্তে এবং তার পরিবর্ত্তে উর্ব্বশীর কঠোর অভিসম্পাত বরণ করতেও তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। উভয় হস্তে শর যোজনা করার অসামান্য শক্তিধর ছিলেন বলে অর্জ্জুনের খ্যাতি ছিল সব্যসাচীরূপে। বস্তুতঃ, এরূপ বহু গুণের অধিকারী হওয়ায় তিনি হয়েছিলেন নরোত্তম-রূপে প্রখ্যাত।

যুধিষ্ঠিরের অযোগ্যতার কারণ :—

প্রশ্ন আসে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে কি উপরোক্ত গুণাবলীর একান্ত অভাব ছিল? তাঁর হৃদয়ে কি প্রভুপ্রেম, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ ও গুরুভক্তি ছিল না? এরূপ হলে তিনি সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিমান, ধীমান্ ও ধার্ম্মিক বলে প্রসিদ্ধ হলেন কেমন করে? কীরূপেই বা তিনি সে যুগে প্রখ্যাত হলেন 'ধর্ম্মরাজ' রূপে?

প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল। এ বিষয়ে একশ্রেণীর পণ্ডিতগণের অভিমত —ভগবানের ভাব ও ব্যবহার রহস্যময় এবং তা মানবীয় বুদ্ধির অগম্য। তাই সাধারণ বুদ্ধি-বিচারের সাহায্যে ভগবৎ বিধানের কারণ ও যৌক্তিকতা অনুধাবন করা দুঃসাধ্য—এমন কি অন্যায়। অপর এক শ্রেণীর অভিমত— যুধিষ্ঠির ছিলেন বয়স ও লৌকিক সম্পর্কের দিক দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের গুরুজনতুল্য, তাই শ্রীকৃষ্ণ সাধারণতঃ তাঁকে আদেশ-উপদেশ দানে সহজে প্রস্তুত হতেন না। আর এই কারণেই দেখা যায়—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে

যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একান্ত শোকবিহ্বল হয়ে পড়েন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিয়ে উপনীত হন পিতামহ ভীষ্মের নিকট এবং তাঁরই প্রবোধবাক্যেই যুধিষ্ঠির আশ্বস্ত ও প্রবুদ্ধ হন।

পক্ষান্তরে, আর একদল মনে করেন, 'ধর্ম্মরাজ' রূপে অত্যধিক খ্যাতি ও প্রশস্তি লাভ করার ফলে যুধিষ্ঠিরের মনে খানিকটা নৈতিকতার অভিমান জাগ্রত হয় এবং এই কারণেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত আদেশ নির্দ্দেশ বিনা দ্বিধায় স্বীকার ও বরণ করতে সর্ব্বদা প্রস্তুত হতেন না। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত উত্থাপিত করে তাঁরা বলেন, দ্রোণবধ দুঃসাধ্য মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ যখন যুধিষ্ঠিরকে নির্দ্দেশ দেন—"আপনি বলুন 'অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে' ; আপনার কথা শুনে আচার্য্য দ্রোণের মন যখন বিক্ষিপ্ত ও বিহ্বল হবে তখনই তাকে বধ করা সহজসাধ্য হবে, নচেৎ আপনাদের জয় অসম্ভব" ; যুধিষ্ঠির তখন শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ বিনা দ্বিধায় পালন করতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু, তাঁর জয়লাভের ইচ্ছাও ছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণের আদেশ কিঞ্চিৎ বিকৃত আকারে পালন করে উচ্চারণ করলেন—"অশ্বত্থামা হতঃ" অতঃপর অস্ফুট স্বরে বললেন—"ইতি কুঞ্জরঃ" অর্থাৎ অশ্বত্থামা নামে পরিচিত হস্তীটি নিহত হয়েছে।

উক্ত ঘটনা হতে ঐ সমালোচকগণ ধারণা করেন, যুধিষ্ঠির যদি অভ্রান্ত গুরুজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থ শ্রদ্ধা করতেন তবে নিশ্চয়ই ঐ সময়ে বিনা সঙ্কোচেই অর্জ্জুনের ন্যায় তিনি বলতে পারতেন—'করিষ্যে বচনং তব'। এই প্রসঙ্গে জানা উচিত, অর্জ্জুনের মনেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রথম প্রথম গুরুবুদ্ধি ছিল না। তবে তিনি যখন উপলব্ধি করলেন তাঁর রথোপরি উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সামান্য মানব নন, তিনি স্বয়ং পুরুষোত্তম, তখন তিনি হলেন নিঃসন্দেহ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নীতিমান্ । সত্যসন্ধ হলেও কিন্তু অর্জ্জুনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করতে পারেন নি।

সে যা হোক, একথা সত্য যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেই তাঁর প্রিয়তম ভক্ত ও সখারূপে গ্রহণ ক'রে তাঁকেই তাঁর অমূল্য অমৃতময়ী গীতার উপদেশ দান করেন।

একশ্রেণীর লোকের ধারণা, গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রোতা অর্জ্জুন উভয়েই ছিলেন গৃহী এবং এঁদের উভয়ের জন্ম হয়েছিল ক্ষত্রিয়কুলে

এবং পুরুষশরীরে। সুতরাং, যাঁরা অগৃহী, অক্ষত্রিয় এবং স্ত্রীলোক-গীতাজ্ঞান তাঁদের জন্য নয়। কেন না, গীতা হতে সত্যকার জ্ঞান ও প্রেরণালাভ করার পূর্ণ যোগ্যতা ও জন্মগত অধিকার তাঁদের নাই।

বলা বাহুল্য, ইত্যাকার ধারণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অলীক। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'সন্ন্যাস যোগ'—যাতে প্রকৃত সন্ন্যাসী কে, সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ ও দায়িত্ব কি তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া, নবম অধ্যায়ে গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাষার স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৯। ৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা। ৯। ৩৩

হে পার্থ, স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র অথবা যারা পাপযোনি-সম্ভূত অন্ত্যজ তারাও আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে নিশ্চয়ই পরমগতি লাভ করবে। সুতরাং, পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ যে পরমগতি লাভ করবেন তাতে আর সন্দেহ কি?

গীতাজ্ঞানের অধিকারী সম্বন্ধে তাই উক্ত প্রকার সংশয় নিরর্থক। তবে একথা সত্য যে গীতাধ্যায়ীর পক্ষে গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ ও গীতাশ্রোতা অর্জ্জুনের চরিত্রগত গুণাবলীর যথাশক্তি অনুসরণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ, গীতাধর্ম্মের যাঁরা অনুশীলনকারী, তাঁরা হবেন অর্জ্জুনের ন্যায় মুমুক্ষু, বীর, ধীর, অকপট, অনলস, উদ্যমী, অধ্যবসায়ী, সুখে দুঃখে সমচিত্ত, সন্তোষী, দক্ষ, দয়ালু, পরোপকারী, সমর্পিতচিত্ত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বদেশপ্রেমী। এরূপ গুণ ও যোগ্যতার যাঁরা অধিকারী, তাঁরা যে কোনো কুলে, পুরুষ বা নারী শরীরে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁরাই গীতাধর্ম্মের যোগ্য সাধক বা সাধিকা।

সুতরাং, আসুন, আমাদের হৃদয়-মনের সর্ব্বপ্রকার সংশয়-সন্দেহ, ভয়-ভীতি, কুণ্ঠা পরিহার ক'রে গীতাজ্ঞান লাভের জন্য প্রস্তুত হই।

আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ
প্রতিষ্ঠাতা — ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

প্রথম অধ্যায়ের সারশিক্ষা

বিষাদযোগের তাৎপর্য্য :

গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম বিষাদযোগ। অর্থাৎ বিষাদ বা শোক-দুঃখকে কী রূপে অধ্যাত্ম যোগসাধনায় পরিণত করা যায়—এ অধ্যায়ে মুখ্যতঃ তারই সূচনা দেওয়া হয়েছে।

দুঃখবোধই ধর্ম্মবুদ্ধির প্রথম কারণ

সাধারণতঃ, মানব যত দিন লৌকিক জীবনে সুখী ও সম্পন্ন থাকে, যত দিন তার জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাতজনিত দুঃসহ দুঃখ-বেদনার অনুভূতি প্রবল না হয়, যত দিন তার অদৃষ্টে বিপদাপদের দুনির্বার ঝঞ্ঝা-ঝটিকা পরিদৃষ্ট না হয়, তত দিন তার মধ্যে ধর্ম বা উচ্চতর জ্ঞানলাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় না, তত দিন সে থাকে জৈব জীবনের সুখ-সম্পদ আহরণেই ব্যস্ত ও ব্যগ্র। পরন্তু, জীবনের যাত্রাপথে মানুষ ক্রমশঃ উপলব্ধি করে, এই নশ্বর মরজগতে সুখ অপেক্ষা দুঃখ, সম্পদ অপেক্ষা বিপদের সম্ভাবনাই অধিক এবং এরূপ অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়-মনে প্রশ্ন আসে—এই সংসারে কি তবে অবিমিশ্র ও স্থায়ী সুখ বলে কিছু নাই? কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ এক সময়ে এরূপ মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে পতিত হয়ে বৈরাগ্যদৃপ্ত হয়েছিলেন।

> "নাই কিরে সুখ, নাই কিরে সুখ,
> এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?
> যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
> কেবলি কি নর জনম লয়?"

মানবের ধার্ম্মিক চেতনা উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করলেও জানা যায়—দুঃখের চরম নিবৃত্তি ও পরম-শান্তি প্রাপ্তির প্রবল প্রেরণায় মানুষের চিত্তও ঠিক অনুরূপ ভাবে ধর্ম্মমুখী ও প্রভুপ্রেমী হয়ে ওঠে।

'বিপদি মধুসূদনঃ'—বিপদকালেই বিপদহারী মধুসূদনের স্মৃতি জাগ্রত হয়। জগতের অধিকাংশ প্রখ্যাত মহাপুরুষগণের জীবনেতিহাসের প্রতি দৃক্‌পাত করলেও দেখা যায়—তাঁদের জীবনের প্রাথমিক স্তরে এমনি কোন বাহ্য বা অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল, যাতে বিচলিত ও বিহ্বল হয়ে তাঁদের মন ক্রমশঃ প্রকৃত সত্যের সন্ধানে আকুল-ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

দুঃখনিবৃত্তির উপায় লৌকিক সান্ত্বনা নয়

শ্রীরামচন্দ্র ভগবচ্ছক্তির পরিপূর্ণ অবতার। তথাপি, তাঁর জীবনেও দেখা যায়—বাল্যে তীর্থভ্রমণকালে বিচিত্র সুখ-দুঃখের চিত্র দর্শন করার ফলে তাঁর মনে জাগ্রত হয়েছিল যে বিবেকবিচার তাই-ই তাঁর বিষয়বৈরাগ্যের প্রাথমিক কারণ। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্যপ্রকরণে শ্রীরামচন্দ্রের এই আত্যন্তিক নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্যবিচারের চিত্রটি নিখুঁত ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। পূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে, শ্রীবুদ্ধের সংসারবৈরাগ্যের পশ্চাতেও ঠিক অনুরূপ ঘটনাই বিদ্যমান। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ঐরূপ এক বিষম পরিস্থিতির মধ্যেই অর্জ্জুনের হৃদয়-মন নিদারুণ শোক-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল এবং তাই ধীরে ধীরে কী ভাবে তাঁকে মুক্তিপথের পথিক করে তুলেছিল,—প্রথম অধ্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের সহিত এই বিষয়টিই বিশেষ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অধিকাংশ নর-নারী তো শোক-দুঃখে অভিভূত হয়ে একেবারে মুষড়ে পড়ে। এই অবস্থায় দুঃখনিবৃত্তির জন্য তারা যে উপায় বা পন্থা গ্রহণ করে, তাও একান্ত লৌকিক ও সাময়িক। এরূপ উপায় তাদের কোন দিন পরমা শান্তির সন্ধান দিতে পারে না। দুঃখ-কষ্ট, শ্রান্তি-ক্লান্তি নিবারণের জন্য তারা ক্লাবে, থিয়েটারে, সিনেমায়, বন্ধুমহলে গিয়ে অংশগ্রহণ করে। নানা প্রকার ক্রীড়াকৌতুকে, মদ্যপান, জুয়া প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত হয় এদের কেহ কেহ। দুঃখনিবৃত্তির জন্য অপর কেহ কেহ আত্মীয়-পরিজন বা অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ করে। পরন্তু, এই সকল লৌকিক উপায়গুলি নিদারুণ দুঃখ-জ্বালায় সন্তপ্ত আত্মাকে কোনদিন চরম শান্তির সন্ধান দিতে পারে না। এর দ্বারা বরং অনেক সময় বিপরীত ফলই প্রসূত হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—কোন ব্যক্তির শরীরে দুরারোগ্য ও দুর্গন্ধযুক্ত

ক্ষতের উপসর্গ পরিদৃষ্ট হলে সে তার চিকিৎসার যোগ্য ব্যবস্থা না করে যদি তার ক্ষতস্থানটি বস্ত্রাদির দ্বারা আবৃত করে রাখে এবং তাতে সুগন্ধি তৈল বা এসেন্স প্রয়োগ ক'রে তার সেই ক্ষতের বীভৎস দৃশ্য ও দুর্গন্ধ হ'তে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তবে তার সেই ক্ষতের কি যথাযথ আরোগ্য হবে? এতে তো আরোগ্যের পরিবর্ত্তে তার সেই ক্ষতের বৃদ্ধির সম্ভাবনাই হবে সমধিক। লৌকিক সাধারণ উপায়ের দ্বারা দুঃখ-নিবৃত্তির প্রচেষ্টার ফলও হয় অনুরূপ। এর দ্বারা দুঃখের মূল কদাপি উৎপাটিত হয় না। উপরন্তু, দুঃখ-ক্লেশ আরও ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠে।

ভক্তের দৃষ্টিতে দুঃখ-বিপদ ভগবানেরই দান

যাঁরা কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগী তাঁদের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ হচ্ছে—তার পূর্ব্বকৃত অসৎ কর্ম্ম বা ত্রুটি-বিচ্যুতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। পক্ষান্তরে, ভক্তিবাদী সাধক মনে করেন—তাঁর দুঃখ-ক্লেশের বিধাতা হচ্ছেন তাঁর পরম প্রেমময় প্রভু স্বয়ং। স্বর্ণকার যেমন প্রয়োজনবোধে কাঁচা সোনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তাকে পাকা সোনায় পরিণত করে, শ্রীভগবানও তেমনি তাঁর আশ্রিত ভক্তকে দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষেপ করে তাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে নেন। আর ঠিক এই কারণেই পাণ্ডবজননী কুন্তী শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন —"হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে নিরন্তর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রেখো। কেন না যতক্ষণ আমি দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকি ততক্ষণ তোমার স্মৃতি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। সুখের সংস্পর্শে এলেই আমি তোমাকে বিস্মৃত হই।" পরম সাধিকা কুন্তীর এই উক্তি হতে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়—সুখ অপেক্ষা দুঃখ, সম্পদ অপেক্ষা বিপদাপদই মানুষের প্রকৃত হিতকারী বন্ধু। দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েই মানুষ পরিত্রাণ লাভের জন্য দুঃখহারী শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করে এবং তাঁর কৃপা ও আশীর্ব্বাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়। গীতার মতে ইহাই 'বিষাদযোগ'।

এক্ষণে আমরা লক্ষ্য করব, অর্জ্জুনের জীবনে কী রূপে এবং কী রূপ অবস্থাচক্রের মধ্যে পতিত হওয়ায় এরূপ বিষাদযোগের সূত্রপাত হয়েছিল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে অর্জ্জুনের হৃদয়-মন ছিল উৎসাহ-উদ্দীপনা,

বীরত্ব ও তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ। দুঃখ-ক্লেশ, বিপদ-আপদকে সে সময়ে তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর অন্তঃকরণে স্থান দিতেন না। কুরুক্ষেত্রের এই যুদ্ধের পূর্ব্বেও তিনি বহুবার বহু ব্যাপারে বহু যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। রাজা বিরাটের গোধন-রক্ষাকালে তিনি একাকী ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও কৌরবাদি যোদ্ধৃবৃন্দকে সম্মুখসমরে পরাভূত ও পর্য্যুদস্ত করে অশেষ যশঃ ও কীর্ত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তখন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর মনে দুর্ব্বলতা, ভয় বা কাতরতা প্রশ্রয় পায় নি। এহেন বীরহৃদয় অর্জ্জুন সহজে নতমস্তক হবার পাত্র নন। নিজের মধ্যে যিনি বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা বা হতাশা-নৈরাশ্যের প্রশ্রয় দেন না, তিনি কেনই বা অন্যের নিকট শরণাগত ও উপদেশপ্রার্থী হবেন? অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু জানতেন—তাঁর পরম প্রিয় সখা অর্জ্জুনের এই অভিমান ও আত্মসন্তোষের মনোভাব মিথ্যা, সাময়িক ও অজ্ঞানতাপ্রসূত। সামান্য একটু চেষ্টা করলেই তাঁর এই মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং তাঁর মধ্যে অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার ও উৎসাহের ভাব জাগ্রত করা সম্ভবপর।

এই সংসারের প্রেমের শাসন সব চেয়ে বড় শাসন। এরূপ শাসনের সহায়তায় মানুষকে যত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত করা যায়, এমন আর কোন কিছুর দ্বারা সম্ভবপর নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই সর্ব্বপ্রথম অর্জ্জুনকে অপার ও অচ্ছেদ্য স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করে তাঁকে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে এমনি এক বিচিত্র অবস্থাচক্রের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন যাতে তাঁর গর্ব্বাভিমান নিঃশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি নিজেকে একান্ত অসহায় ও বিপন্ন বলে মনে করলেন।

কুরুক্ষেত্রে উপনীত হয়ে শস্ত্রসম্পাত বা যুদ্ধারম্ভের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অর্জ্জুন তদীয় সারথিকে নির্দ্দেশ দিয়ে বললেন—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ১।২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্। ১।২২

হে অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যে এমন স্থানে আমার রথ স্থাপন কর যাতে আমি যুদ্ধ-কামনায় যারা উপস্থিত—তাদিগকে ভালমত দেখতে পাই।

ভগবল্লীলা অপার ও অদ্ভুত

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথ্য স্বীকার করেছেন এবং অর্জ্জুন প্রভুর ন্যায় স্বীয় অভিপ্রায়মত তাঁকে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। এই দৃশ্য ও তাঁদের এতাদৃশ ব্যবহার কতই না বিচিত্র! যিনি নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, যিনি সর্ব্বভূতের বিভু, যাঁর নির্দ্দেশে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি স্বীয় স্বীয় কক্ষে ভ্রাম্যমাণ, তিনি আজ নরশরীর ধারণ করে মরলোকে সামান্য ভৃত্যের আসনে আসীন এবং স্বীয় প্রাণসখা অর্জ্জুনকে তিনি এক্ষণে প্রভুত্বের ও নির্দ্দেশ দানের অধিকার দান করছেন। শ্রীভগবানের এই মর্ত্ত্যলীলা কতই না অদ্ভুত ও সান্ত্বনাপ্রদ।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের বাহ্য রথের সারথি হয়েছেন—কুরুক্ষেত্রের ভৌতিক সংগ্রামে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। স্থূল দৃষ্টিতে পার্থ এতক্ষণ এই দৃশ্যই দর্শন করেছেন এবং সেইভাবেই তিনি তাঁকে রথ চালনার জন্য নির্দ্দেশ দান করেছেন। পরন্তু, সখা শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর জীবনরথের চিরসারথি এবং এখন হতে এই সারথির নির্দ্দেশেই যে তাঁর জীবনগতি নির্ণীত ও নির্দ্ধারিত হবে সে জ্ঞান এখনো তাঁর হয় নি। অথচ, তাঁর পক্ষে এক্ষণে এরূপ অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্যজ্ঞানেরই প্রয়োজন সর্ব্বাধিক। কেন না, শ্রীভগবান্ চান—অর্জ্জুনকে তাঁর লোকসংগ্রহরূপ মহান্ ব্রতের মাধ্যমরূপে প্রস্তুত করতে এবং এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন অর্জ্জুনের জৈব জীবনধারার পরিপূর্ণ রূপান্তর। অন্তর্য্যামী বিধাতৃরূপে এক্ষণে তিনি অর্জ্জুনের জীবনে প্রকারান্তরে সেই অবস্থারই সৃষ্টি করছেন।

স্বজনবধের আশঙ্কায় অর্জ্জুনের ভাবান্তর

অর্জ্জুন উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে স্বীয় অতি নিকট আত্মীয় স্বজনগণকে লক্ষ্য করে মুহূর্ত্তের মধ্যে চিন্তিত ও বিহ্বল হয়ে পড়লেন। এরূপ পরমাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণকে যুদ্ধার্থে সম্মুখে অবস্থিত দেখে তিনি নিতান্ত কৃপাবিষ্ট চিত্তে বলতে লাগলেন—“হায়! আমরা রাজ্যসুখলাভের জন্য স্বজনগণকে বধ করতে উদ্যত হয়ে কি মহাপাপই না করতে বসেছি! আমি অস্ত্র ত্যাগ করে প্রতিকারে বিরত হলে যদি দুর্য্যোধনাদি আমাকে হত্যাও করে, তাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।”

স্বজনপ্রীতির প্রভাব কি বিস্ময়কর! সাংসারিক দৃষ্টিতে এই প্রভাব অবশ্যই মহত্ত্বপূর্ণ ও গৌরববর্দ্ধক। পরন্তু, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ইহা ভীষণ মোহ, অধোগতি ও সর্ব্বনাশের কারণ। জাগতিক জীবনে মানুষ যখন স্বজনপালনের দায়িত্ববোধ পরিহার ক'রে আত্মসেবায় নিরত হয় তখন সে হয় ঘোর স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। পক্ষান্তরে, সেই ব্যক্তি যখন স্বজনগণের প্রতি প্রেম-প্রীতি ও সেবা-সৎকারে নিরত হয়, তখনই সেই উদারতা, মহানুভবতার জন্য সে হয় প্রশংসিত ও সমাদৃত। এই দিক দিয়ে বিচার করলে অর্জ্জুন এখানে সেই স্বজনপ্রীতির উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগের অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করছেন। তাঁর নিজের মৃত্যুতেও যদি কৌরবগণ ও অন্যান্য আত্মীয়-পরিজন সুখী হন—তাতে ক্ষতি কি? পরন্তু, যাঁর নিকট অর্জ্জুন এই আত্মত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন —তাঁর সেই পরম সখা শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তার এই আচরণে আদৌ সন্তুষ্ট নন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করব—শ্রীকৃষ্ণ এজন্য অর্জ্জুনকে তিরস্কার করে বলছেন—"তোমার এই স্বজনপ্রীতি মোহেরই নামান্তর এবং তোমার এই যুদ্ধত্যাগের সঙ্কল্প অনার্য্যোচিত ক্লৈব্য ও কাপুরুষতার পরিচায়ক মাত্র।"

বস্তুতঃ, এতেই অনুমান করা যায়—জীবনের এক পর্য্যায়ে যা ন্যায় ও করণীয় রূপে বিবেচিত হয়, জীবনের অন্য পর্য্যায়ে তাই হয় অন্যায় ও নিন্দনীয় বলে ধিকৃত। আর এ জন্যই বলা হয় "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" ধর্ম্মতত্ত্বের রহস্য অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা সব সময় ন্যায়ান্যায় বা সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায় না। বলা বাহুল্য, এখানে ধর্ম্ম বলতে কর্ত্তব্যবোধকেই বোঝানো হচ্ছে।

বস্তুতঃ গীতার দৃষ্টিতে ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যের পরিভাষা অত্যন্ত ব্যাপক। এই মতে এক ক্ষেত্রে এক ব্যাপারে যা কর্ত্তব্য বা করণীয়, অন্য ক্ষেত্রে অন্য ব্যাপারে তাই অকর্ত্তব্য ও অকরণীয়। আত্মীয়পরিজনগণের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয়ে তাদের কল্যাণবিধানের চেষ্টা করা—গৃহিগণের পরম প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে, বিশ্বহিতৈষী সর্ব্বভূতহিতে রত সন্ন্যাসীর পক্ষে এরূপ নিজ আত্মীয়-পরিজনের সেবা-পরিচর্য্যা স্বার্থসেবারই নামান্তর বলে বিবেচিত। গরুড়পুরাণ বলেছেন—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।।

কুলের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ, গ্রামের স্বার্থের নিমিত্ত কুলের স্বার্থ, জনপদের স্বার্থের জন্য গ্রামের স্বার্থ এবং আত্মার নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবীর স্বার্থ পরিত্যাজ্য।

উপরোক্ত আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সুস্পষ্ট ভাবে ধারণা করা যায়—জীবনের উন্নতির বিবিধ স্তরে কর্ত্তব্যের ব্যাখ্যা এবং ধারণাও পরিবর্ত্তিত হয়।

অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ স্বীয় সখারূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁকে এক্ষণে ধীরে ধীরে ভাগবতী চেতনায় উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত। তিনি তাই তাঁকে সাধারণ সাংসারিক কর্ত্তব্যবোধের স্তরে আবদ্ধ দেখতে প্রস্তুত নন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ফলাফল শুধু স্বীয় কৌটুম্বিক বা কুলের স্বার্থের মধ্যে সীমিত থাকবে বলে অর্জ্জুন যে ধারণা করেছেন, উচ্চতর ভাগবত-দৃষ্টিতে তা সত্য নয়। বস্তুতঃ, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল হবে অতি সুদূরপ্রসারী। এই ধর্ম্মযুদ্ধের পরিণামে সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য হবে নির্ণীত। এর ফলে প্রবর্ত্তিত হবে বিশ্বহিতমূলক পরম ধর্ম্মরাষ্ট্র এবং সেই মহান্ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই শ্রীভগবান্ নরশরীরে অবতীর্ণ এবং এ জন্যই তিনি এই যুদ্ধের সূত্রধাররূপে পাণ্ডবের পক্ষে দণ্ডায়মান। স্বজনগণের স্বার্থে বিমোহিত থাকায় অর্জ্জুন এখনও এই মহৎ উদ্দেশ্য বুঝতে অক্ষম। তিনি একথা ধারণা করতে পারছেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ কেন এই যুদ্ধব্যাপারে এতখানি উৎসাহী ও আগ্রহী। কেনই বা তিনি এত সুকৌশলে তাঁর রথের সারথ্য গ্রহণ করে এই ভীষণ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা গ্রহণ করছেন।

বস্তুতঃ, স্নেহ-মমতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। অর্জ্জুনেরও এখন সেই অবস্থা। আর এই অবস্থায় আবদ্ধ ও আচ্ছন্ন থাকা পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের আত্মিক কল্যাণ কদাপি সম্ভবপর নয়। তাই তাঁর প্রতি ভগবানের এই নিন্দা-শ্লেষ। সদ্গুরু করুণাময়। আশ্রিত শিষ্যের কল্যাণ ও উর্দ্ধগতির জন্য তাঁর কতই না উদ্যোগ-আয়োজন, আগ্রহ- উৎকণ্ঠা! এমন

পরম কৃপালু মহান্ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করলে শিষ্যের আর কোন ভয়-ভীতি থাকে কি? অর্জ্জুন [illegible] এই দিক দিয়ে ধন্য ও সৌভাগ্যবান্। আমরাও, আসুন, অর্জ্জুনের ন্যায় আমাদের জীবনের অশেষ দুঃখ-দুর্গতি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সদ্গুরুরূপী শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হই। সহস্র বৎসর পরে শ্রীভগবান্ আবার জীবোদ্ধারের জন্য আচার্য্য প্রণবানন্দ-শরীরে অবতীর্ণ। কে আছ তোমরা অন্ধ-আতুর, দুঃখী-তাপী, কে আছ তোমরা ত্রিতাপজ্বালা-জর্জ্জরিত, এস, তোমরা আচার্য্যের শরণ গ্রহণ কর। তিনি তোমাদিগকে তোমাদের এই সংসার-দাবদাহ হ'তে পরিমুক্ত করবেন। ভগবান্ শ্রীবুদ্ধের ন্যায় এযুগেও তিনি রচনা করেছেন বিপুল সঙ্ঘ। তোমরা তাঁর এই সঙ্ঘতরণীতে আরোহণ কর—তিনি তোমাদের ভবসমুদ্রের পরপারে নিয়ে যাবেন।"

আসুন, আমরা সেই মহান্ সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি তুলে বলি—

"কাণ্ডারী ডাক দিয়েছে আয়
তোরা কে কে যাবি আয়।"

গীতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে পণ্ডিতগণ অনেক প্রকার চর্চ্চালোচনা করেছেন। এই শ্লোকে অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় অমাত্য সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করছেন—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১।১

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হয়ে আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণ কি করল?

কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র কেন?

প্রথমতঃ প্রশ্ন আসে কুরুক্ষেত্রকে কেন ধর্ম্মক্ষেত্র বলা হল? যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে কুরুক্ষেত্র তো একটি ভয়ঙ্কর বিভীষিকার স্থল। যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক হতাহত হবার সম্ভাবনা—তাকে তো ভীষণ পাপভূমি বলে উল্লেখ করাই সঙ্গত। তা না করে একে কেন ধর্ম্মক্ষেত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, কুরুক্ষেত্র হচ্ছে অতি প্রাচীন তপোভূমি।

এর নাম—ব্রহ্মাবর্ত্ত বা সমন্তকভূমি। শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে—কুরুক্ষেত্রের স্থানমাহাত্ম্য এত অধিক যে এখানে তপস্যা করলে অতি সহজে ও অল্প সময়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়। কৌরবকুলের আদিপুরুষ সম্রাট কুরু এখানে দীর্ঘ কাল তপস্যা করে পরম কল্যাণ ও খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্ত্তী কালেও বহু ঋষি-মহর্ষি এখানে কঠোর তপশ্চর্য্যা ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করেন এবং ধর্ম্মপ্রাণ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী ছিল এই কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত থানেশ্বরে। হিন্দুশাস্ত্রমতে সূর্য্যগ্রহণ কালে কুরুক্ষেত্রের হ্রদে স্নান অত্যন্ত পুণ্যপ্রদ। এই সমস্ত কারণে তীর্থস্থলরূপে এর প্রখ্যাতি ও প্রশস্তি অতি প্রাচীন।

আর একদিক দিয়ে বিচার করলেও কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলে স্বীকার করতে হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ন্যায়ান্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সত্যাসত্যের বিচার হয়। অর্থাৎ, এই যুদ্ধের ফলে ঘটে পাপপক্ষের পরাজয় এবং তার ফলে হয় সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও সমৃদ্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এখানে যাঁরা যুদ্ধার্থে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের এক পক্ষে ছিলেন ধর্ম্মরাষ্ট্র-সংস্থাপক শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং—যিনি এই ধর্ম্মযুদ্ধের মাধ্যমে তাঁর পূর্ব্বপরিকল্পিত লোকসংগ্রহব্রতে উদ্যত। রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলে উল্লেখ করে ভুল করেন নি। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক ও ধার্ম্মিক দৃষ্টিতে কুরুক্ষেত্রের 'ধর্ম্মক্ষেত্র' বিশেষণটি অতি সঙ্গত।

ধৃতরাষ্ট্রের মনে সংশয় কেন?

দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ প্রশ্ন করেন—কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হয়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণ কি করলেন, এরূপ সন্দেহ ধৃতরাষ্ট্রের মনে কেন উদিত হল? যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হয়ে তারা যুদ্ধই করবে, ইহাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন কুরুক্ষেত্রের ন্যায় পুণ্যস্থলে উপনীত হবার পরে স্থান মাহাত্ম্যের প্রভাবে যোদ্ধৃবৃন্দের মনোভাবের পরিবর্ত্তনও ঘটতে পারে—এই ধারণায় ধৃতরাষ্ট্রের মনে এইরূপ সংশয় উত্থিত হয়েছিল। ব্যাপারটিও ঘটেছিল অনেকটা তদ্রূপই। যুদ্ধের প্রারম্ভে পাণ্ডবপক্ষের শ্রেষ্ঠতম রথী অর্জ্জুনের মন সহসা যেরূপ বিহ্বল ও যুদ্ধবিরোধী হয়ে উঠেছিল তাতে যুদ্ধ প্রায় বন্ধ হবারই উপক্রম হয়েছিল না কি? তা ছাড়াও, ধৃতরাষ্ট্র

ভালমতই অবগত ছিলেন যে তাঁর পুত্রগণ অন্যায় ভাবে পাণ্ডবগণকে উৎসন্ন ও সর্ব্বস্বান্ত করতে উদ্যত। সুতরাং, কুরুক্ষেত্রের ন্যায় ধর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর পুত্রগণের জয়ের আশা কম। যুদ্ধশেষে তিনি পুত্রশোকে কাতর হয়ে তাঁর বিলাপপ্রসঙ্গে সেই সন্দেহের বিষয়টি বার বার উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ, পাপী ব্যক্তির অন্তঃকরণে নিরন্তর সংশয় সন্দেহের ঝঞ্ঝা-ঝটিকা উত্থিত হওয়াই স্বাভাবিক।

ভেদবুদ্ধিই অনর্থের কারণ

পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র এই শ্লোকে তাঁর পুত্রগণকে "মামকাঃ" বলে অভিহিত করেছেন। এই সংসারে আপন ও পর এই যে ভেদবুদ্ধি তাই যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মূল। মানুষ যেদিন জগতের সব কিছুকে নিজের বলে ভাবতে পারে অথবা তার বিপরীত ভাবনার দ্বারা এই সংসারের যাবতীয় বস্তুকে অন্যের বা ভগবানের বলে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়, সেদিন সব বিরোধ-বিতণ্ডার অবসান ঘটে। ধৃতরাষ্ট্রের মনে এই ভাবের অভাব ছিল। তাই তার এই মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তি।

আসুন, আমরা আমাদের সমক্ষে পরিদৃশ্যমান্ এই বিশ্বজগতকে হয় "আমার" অথবা "ভগবানের" বলে ভাবতে চেষ্টা করি। এরূপ ভাবশুদ্ধির সাধনায় সিদ্ধ হলেই ক্রমশঃ আমরা সত্যকার দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় উন্নীত হতে পারব।

দিব্যদৃষ্টি কি?

কথিত আছে—মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সম্যক্ বিবরণ জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষুঃ দান করেন এবং সেই দিব্যদৃষ্টির বলেই হস্তিনাপুরে অবস্থিত থেকেও সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের যাবতীয় ঘটনাবলীর দর্শন ও বর্ণনা করবার শক্তি লাভ করেন।

আজকার এই বৈজ্ঞানিক যুগে অনেকের মনে প্রশ্ন আসে—এই 'দিব্যদৃষ্টি' ব্যাপারটি কি? যুদ্ধক্ষেত্র হতে বহু দূরে অবস্থান করেও তথায় সংঘটিত ঘটনাবলী সঞ্জয় কী রূপে দর্শন ও বর্ণনা করলেন?

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে সম্মোহন-বিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য শক্তি ও প্রভাবের কথা আমরা অনেকেই অবগত। এই বিদ্যায় যারা পারদর্শী তারা নিজেদের অদ্ভুত সঙ্কল্পশক্তির বলে ব্যক্তিবিশেষকে সম্পূর্ণ রূপে বশীভূত করে তার দ্বারা স্বীয় অভিপ্রায় মত বহু কাজ করিয়ে নেন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরে তাঁরা যখন আবার তাঁদের সেই সম্মোহন শক্তি উঠিয়ে নেন তখন সেই বশীভূত ব্যক্তি পুনরায় স্বীয় স্বাভাবিক চেতনা ফিরে পায় এবং তারপরে সেই ব্যক্তি তার সম্মোহিত অবস্থার কোন কথাই স্মরণ করতে পারে না। দিব্যদৃষ্টি দানের ব্যাপারটাকেও অনেকখানি তদ্রূপ ধরে নেওয়া যায়। অলৌকিক যোগশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁর অপূর্ব্ব যোগশক্তির বলেই সঞ্জয়কে ঐরূপ দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন—মনে করা যায়।

এই প্রসঙ্গে ১৯৫০ সালের হরিদ্বার কুম্ভের একটা ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। মেলার মধ্যভাগে একব্যক্তি তার অদ্ভুত যোগশক্তির বলে তার একটি বলদের মাধ্যমে সমবেত নর-নারীকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেছিল। বলদটিকে জনতার মধ্য হতে কোন ব্যক্তি যে প্রশ্ন করেছিল সে তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে 'হাঁ' বা 'না' জানিয়ে সেই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। আমাদের মধ্যে একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই জনতার মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি সম্প্রতি আফ্রিকা হতে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন? বলদটি অমনি ঘুরে ফিরে ঠিক সেই সন্ন্যাসীর নিকট এসে মুখ দিয়ে চিহ্নিত করল। পুনরায় একজন প্রশ্ন করলেন—এই জনতার মধ্যে এমন কে আছেন হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের জন্য যাঁর প্রাণ অতিমাত্র উদ্বিগ্ন। বলদটি তৎক্ষণাৎ জনৈক স্বামীজীকে চিনিয়ে দিল। ঘটনাটি দেখে মনে হয়েছিল, বলদটির মালিক তার অপূর্ব্ব সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাবে বশীভূত বলদটির দ্বারা এই সব অত্যাশ্চর্য্য কাজগুলি করিয়ে নিচ্ছিল। যে দেশে একটা পশুর মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে এরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভবপর, সে দেশে মহর্ষি বেদব্যাসের পক্ষে সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দানের ব্যাপারটি অসম্ভব বলে কেন বিবেচিত হবে?

প্রাচীন ভারতের যুদ্ধনীতি

গীতার প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের যুদ্ধপদ্ধতি বিষয়ে কতকটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে উভয়পক্ষের সৈন্যগণকে ব্যূহবদ্ধ ভাবে কীরূপে সজ্জিত করা হত, যুদ্ধে কীরূপ অস্ত্র-শস্ত্র-বাদ্যাদি ব্যবহৃত হত, যুদ্ধারম্ভের সঙ্কেত-ধ্বনির নিমিত্ত উভয় পক্ষের বীরেন্দ্রবৃন্দ কী রূপ শঙ্খধ্বনি করতেন, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত সৈনিকগণকে স্বীয় স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে কেন ও কি নিয়মে রথী মহারথী বলে অভিহিত করা হত এ সমস্ত বিষয়ের অনেক কিছু জ্ঞান বা তথ্য এ অধ্যায় হতে লাভ করা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও জানা যায়—অর্জ্জুনের রথের অশ্বগণ শ্বেতবর্ণ, তাঁর শঙ্খ 'দেবদত্ত' এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম 'অনন্তবিজয়'। এই সমস্ত সাত্ত্বিক নাম ও লক্ষণসমূহ পাণ্ডবপক্ষের ন্যায় ও বিজয়ের সূচনা করে। ইহাও লক্ষ্য করার বিষয়—উভয় পক্ষের যুধ্যমান যোদ্ধৃবৃন্দের মধ্যে সমগ্র জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন রাজ্যের রাজেন্দ্র ও বীরেন্দ্রবৃন্দ সমাবিষ্ট। ইতঃপূর্ব্বে এত বড় বিপুল সমারোহ আর কোন যুদ্ধে হয় নি। এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের উপর তাই নির্ভর করে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ। যুদ্ধের এই ব্যাপক ও ভীষণ প্রস্তুতি লক্ষ্য করলে সহজেই অনুমান করা যায়—এই যুদ্ধে কী-রূপ লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা।

উভয় পক্ষের সৈন্যসমাবেশ যখন সম্পূর্ণ, তখন অর্জ্জুনের মনে কি রূপ ভাবান্তর ঘটল আমরা পূর্ব্বে তা আলোচনা করেছি।

এক্ষণে, এই সময়ে কৌরব পক্ষের সর্ব্বাধিনায়ক দুর্য্যোধন কি করলেন —তাই আমরা লক্ষ্য করব।

দুর্য্যোধনের কূটনীতি

আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—দুর্য্যোধনই এই প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর ক্ষমতাপ্রিয়তা এবং রাজ্যলালসাই মূলতঃ এই যুদ্ধের মুখ্য কারণ। কেবলমাত্র যুদ্ধায়োজন করেই তাঁর শান্তি নাই। এই যুদ্ধে কী রূপে পাণ্ডবকুলের সম্পূর্ণ পরাজয় ও বিলুপ্তি ঘটবে এবং তার নিজ পক্ষের বিজয়-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হবে তিনি এক্ষণে সেই ষড়যন্ত্রে নিমগ্ন। সৈন্য-সমাবেশের

কার্য্য সুসম্পন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাই গুরু দ্রোণের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন—

হে আচার্য্য, আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র কর্ত্তৃক ব্যূহাকারে সজ্জিত পাণ্ডবগণের বিপুল সেনার প্রতি লক্ষ্য করুন।

কুচক্রী দুর্য্যোধন স্বীয় কূট চাতুরী প্রভাবে ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-শল্য প্রভৃতিকে তিনি স্বীয় পক্ষে আনয়ন করেছেন। পরন্তু, তিনি ভালমতই জানতেন এঁরা তাঁর ঋণ পরিশোধের দায়ে কৌরব-পক্ষে যোগদান করলেও অন্তরে অন্তরে তাঁরা পাণ্ডবগণেরই হিতৈষী। সুতরাং, তাঁদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা চলে না।

তা ছাড়া, দুর্য্যোধনের বিশেষ আশঙ্কা ছিল আচার্য্য দ্রোণের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে। কেন না, অর্জ্জুন ছিলেন দ্রোণের অন্তরঙ্গ প্রিয়তম শিষ্য। তাঁর প্রতি তিনি কদাপি নির্ম্মম হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করবেন না। পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে তাই তাঁকে উত্তেজিত করবার জন্য দুর্য্যোধন কৌশলপূর্ব্বক তাঁকে বললেন—"গুরুদেব, এই দেখুন, আপনার প্রিয় ও বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র পাণ্ডবদের জন্য কি ভীষণ দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করেছেন।" দুর্য্যোধন ইচ্ছা করেই এখানে ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম উচ্চারণ না করে তাঁকে 'দ্রুপদপুত্র' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জানতেন দ্রুপদ হচ্ছেন আচার্য্য দ্রোণের প্রাচীন শত্রু। এককালে অন্তরঙ্গ মিত্র হলেও তিনি তাঁর নিকট নিদারুণ ভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন। এক্ষণে যদি গুরু দ্রোণকে তাঁর সেই পূর্ব্ব বৈরভাবের কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, তবে তিনি নিশ্চিতই প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করবেন। কেন না, রাজা দ্রুপদ ও তাঁর পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন যোগদান করেছেন পাণ্ডবপক্ষে। পাণ্ডবগণের মহতী চমূ বা সৈন্যবাহিনীর বিশালতার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণকে বিশেষ সতর্ক হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য নির্দ্দেশ করলেন।

এই কথা বলার পরেই দুর্য্যোধন মনে ভাবলেন—পাণ্ডবপক্ষের বিপুলবাহিনীর উল্লেখ করায় যদি আচার্য্য দ্রোণ পুনরায় তাঁকে বলে বসেন —"এই জন্যই তো তোমাকে আমরা পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করেছিলাম" ; তাই পরক্ষণেই তিনি কথাটা একটু পাল্‌টিয়ে নিয়ে স্বীয়

পক্ষের বলাবলের উল্লেখ করে বললেন—পিতামহ ভীষ্মকর্তৃক সজ্জিত আমাদের সৈন্যগণ অপরিমিত বা অগণিত। পক্ষান্তরে, ভীমসেনকর্তৃক সজ্জিত ও পরিচালিত পাণ্ডব সেনা পরিমিত বা অপ্রচুর। তা ছাড়া ভীমসেন অপেক্ষা পিতামহ ভীষ্ম অধিকতর শক্তিশালী ও নিপুণতর যোদ্ধা। সুতরাং, আমাদের ভয় করবার কিছুই নাই। তবে এক্ষণে আমাদের একটি মাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে পিতামহ ভীষ্মদেবকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা ও সহায়তা করা।

'পর্য্যাপ্ত' ও 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দ দুটির অর্থ শ্রীধর স্বামী প্রমুখ আচার্য্যগণ করেছেন অন্যরূপ। তাঁদের মতে 'পর্য্যাপ্ত' শব্দের অর্থ যথেষ্ট এবং 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দের অর্থ অযথেষ্ট বা প্রয়োজনের তুলনায় কম। মহাভারত পাঠে জানা যায়, পাণ্ডবগণের সৈন্য ছিল সপ্ত অক্ষৌহিণী এবং কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী। সুতরাং, দুর্য্যোধন এখানে 'পর্য্যাপ্ত' ও 'অপর্য্যাপ্ত' বলতে পরিমিত ও অপরিমিত বলেই বর্ণনা করেছেন। যা হোক, দুর্য্যোধনের এই প্রকার উক্তি হতে জানা যায়, তার হৃদয় কী রূপ কূট ষড়যন্ত্রপ্রবণ ছিল।

প্রাচীনকালে সেনাপতিকে প্রত্যক্ষ ভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হত। শুধু নির্দ্দেশ দানের মধ্যেই তাঁর কার্য্য সীমিত বা সীমাবদ্ধ থাকত না। আর এজন্য সেকালে সেনাপতিকে রক্ষা ও সহায়তা করা অন্যান্য সেনানীগণের প্রধান কর্ত্তব্য বলে বিবেচিত হত। দুর্য্যোধন এখানে সেই নির্দ্দেশই দিচ্ছেন। আজকাল অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। অধুনা সেনাপতির দায়িত্ব হচ্ছে দূর হতে সৈন্যগণকে নির্দ্দেশ দান করা। বিগত বিশ্বযুদ্ধে হিটলার, মুসৌলিনী, চার্চ্চিল, লেনিন প্রভৃতি এইরূপ ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

অর্জ্জুনের কুলধর্ম্ম রক্ষার চিন্তা

স্বজনবধের ভয়ে কাতর হয়ে অর্জ্জুন যুদ্ধ ত্যাগের সঙ্কল্প করলেন। এতখানি প্রস্তুতি ও সাজ-সজ্জার পরে যুদ্ধত্যাগ করলে পাছে তাঁকে হাস্যাস্পদ ও সমালোচনার পাত্র হতে হয় এবং সখা শ্রীকৃষ্ণই বা এই ব্যাপারে কিছু মনে করেন, তাই অর্জ্জুন স্বীয় পক্ষ সমর্থনের জন্য নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে স্বজনবধের দুঃখ ও ভয় ছাড়াও আর একটি বিষয়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—আমি যে যুদ্ধত্যাগের সঙ্কল্প করেছি তার পশ্চাতে অনেকগুলি কারণ বিদ্যমান।

এর দ্বারা যে আত্মীয়-স্বজনের বিনাশ ঘটবে তাই নয়, এই যুদ্ধের ফলে যে ভীষণ লোকক্ষয় হবে কৌলিক, সামাজিক ও ধর্ম্মিক দিক দিয়ে তার পরিণাম হবে অতি ভয়ঙ্কর। কৌরবগণ রাজ্যলোভের বশে এই সর্ব্বনাশের দিকটা আদৌ ভেবে দেখছেন না। কিন্তু আমরা বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে এই গর্হিত কার্য্যে কী রূপে অগ্রসর হই? এই যুদ্ধে যে অপরিমিত লোকক্ষয় হবে তাতে আমাদের রমণীগণও কুলধর্ম্মচ্যুতা হয়ে পরপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং তাদের এই ব্যভিচারপরায়ণতার ফলে সমাজে বর্ণসাঙ্কর্য্যের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। এতে আমাদের সনাতন কুলধর্ম্ম ও জাতি-ধর্ম্ম বিনষ্ট তো হবেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিতৃগণ পিণ্ডোদকে বঞ্চিত হবেন। এর চেয়ে সর্ব্বনাশের ব্যাপার আর কি হতে পারে?

প্রাচীন সমাজ ছিল কুলাশ্রয়ী

অর্জ্জুনের উপরোক্ত উক্তি হতে অবগত হওয়া যায় প্রাচীন কালের বৈদিক আর্য্যসমাজ ছিল কুলবর্ণাশ্রয়ী। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও বহু কুলের সমবায়ে সে যুগের সমাজ ছিল সুগঠিত এবং তন্মধ্যে কুরুকুলের বৈশিষ্ট্য-গৌরব ছিল অত্যন্ত প্রখ্যাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। এই কুলের আদিপুরুষ সম্রাট কুরু ছিলেন মহান্ তপস্বী ও রাজর্ষি পর্য্যায়ের ব্যক্তি। সেই সুবিখ্যাত কুলের ও তৎসঙ্গে অন্যান্য বহু বংশের কৌলিক পরম্পরা এই ভীষণ ও প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধে বিনষ্ট হবে এবং তার ফলে ভারতের ক্ষত্রিয়বর্ণের যাবতীয় শৌর্য্য, বীর্য্য, উদারতা ও মহত্ত্ব-গৌরব ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে—অর্জ্জুনের ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও উদারচেতা ব্যক্তি কি করে তা সহ্য করতে পারেন? তাই তিনি তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ বলছেন—এইরূপ সর্ব্বনাশকর যুদ্ধের প্রশ্রয় কিছুতেই দেওয়া চলে না। অর্জ্জুন তাই বললেন—"হে কৃষ্ণ, এই আসন্ন যুদ্ধের পরিণাম বা ভবিষ্যৎ যখন এত গ্লানিকর ও ধ্বংসমূলক তখন কেমন করে আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া চলে? আমি তো দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছি—এ যুদ্ধে আমি আর অংশগ্রহণ করব না। এতে যদি আমার অযশঃ ও প্রতিষ্ঠাহানি হয় তাও আমি অম্লানবদনে সহ্য করব।"

অর্জ্জুনের যুক্তি কেন সমর্থনযোগ্য নয়?

এক্ষণে প্রশ্ন আসে—অর্জ্জুনের আত্মপক্ষ সমর্থনের এরূপ সুন্দর ও সুস্পষ্ট যুক্তি সত্ত্বেও শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেন ও কি জন্য তাঁকে পুনঃপুনঃ যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করলেন? যে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ সেই সনাতন কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম যখন বিপন্ন তখন তিনি পাণ্ডবগণকে এই ভীষণ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে কী জন্য উৎসাহ দান করছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যে যুগে অবতীর্ণ সেই যুগে ধর্ম্মগ্লানি পূর্ব্ব হতেই ভয়াবহরূপ ধারণ করেছিল। যে কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য অর্জ্জুন এতখানি উৎকণ্ঠিত, সেই কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম তো পূর্ব্ব হতেই বিনষ্টপ্রায় হয়ে উঠেছিল। তদানীন্তন সমাজের প্রতি লক্ষ্য করলে এই বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

পাণ্ডবগণের ঐ নিকট-আত্মীয় কৌরব-ভ্রাতৃবৃন্দ, কর্ণ, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি নীতিধর্ম্মভ্রষ্ট হয়ে নিদারুণ দুরাচারী ও ব্যভিচারী হয়ে উঠেছিল নাকি? তা ছাড়া, জরাসন্ধ ও নরকাদি রাজেন্দ্রবৃন্দও পাপের পরিপূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করে তৎকালীন সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল। কেবলমাত্র পাণ্ডবকুলেই সে কালে বিদ্যমান ছিল ক্ষাত্রোচিত বিবেকবুদ্ধি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা। এমতাবস্থায় যুদ্ধসঙ্কল্প পরিহার করে মাত্র নীতিধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার প্রচেষ্টা তখন আর সম্ভবপর ছিল না।

এরূপ পরিস্থিতিতে ঐরূপ প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধই ছিল একমাত্র উপায়—যার দ্বারা ধরিত্রীকে পাপভারমুক্তা করে পুনরায় ধর্ম্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর। অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জ্জুনের এই যুক্তিকে সমর্থন দেওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি।

বস্তুতঃ প্রত্যেক সমাজে কখন কখন এমন পরিস্থিতি ও অবস্থাচক্রের সৃষ্টি হয় যখন বিপুল ধ্বংসের আয়োজন ছাড়া লোকসংগ্রহ-ব্রত সিদ্ধ হয় না। এজন্যই কখনও কখনও পণ্ডিতগণ বলেন—"At times, war becomes a necessity"—অর্থাৎ, কোন কোন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্কালে ঠিক অনুরূপ এক বিষম অবস্থাচক্রের সৃষ্টি হয়েছিল। এই কারণে পরম অহিংসাব্রতী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত প্রকার

ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েও কৌরবগণকে যুদ্ধপ্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হন নি। শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যপ্রচেষ্টাও ঐ একই কারণে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল। সুতরাং, যুদ্ধ ব্যতীত তখন আর গত্যন্তরই ছিল না। ত্রেতাযুগে এমনিতর এক বিষম পরিস্থিতিতে মানবতা ও মানবসংস্কৃতির রক্ষার নিমিত্ত মর্য্যাদাবতার শ্রীরামচন্দ্রকে রাবণ, বালী ও অগণিত রাক্ষসকুলের ধ্বংসসাধনে উদ্যোগী হতে হয়েছিল। দ্বাপর যুগের এই ভীষণ ধ্বংসযজ্ঞের মূল কারণও ইহাই।

নব কুরুক্ষেত্রের রচনা

বর্ত্তমান যুগের অবস্থাচক্রও সেই দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করছে বলে মনে হয়। কতিপয় বর্ষের ব্যবধানে দুটি প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের পরেও মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি ও সমরপিপাসা প্রশমিত হয়েছে কি? ভয়াবহ মারণাস্ত্র নির্ম্মাণ ও নিক্ষেপের সর্ব্বধ্বংসী পরিণাম সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চর্চ্চালোচনা সত্ত্বেও জগতের প্রধান প্রধান শক্তিগোষ্ঠীসমূহের অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করলে মনে হয়—পৃথিবীর বুকে পুনরায় দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের আয়োজন অতি আসন্ন। এবার হয়তো ভারতও এই প্রলয়ঙ্কর দাবানল হতে রক্ষা পাবে না। কেন না, ভারতকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভিড়াবার জন্য আজ চতুর্দ্দিকে রচিত হচ্ছে ভীষণ ও কুট ষড়যন্ত্রজাল।

এই নিদারুণ অবস্থাচক্রের মধ্যে মানবসভ্যতার রক্ষার নিমিত্ত পুনরায় প্রয়োজন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও প্রচার প্রতিষ্ঠা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রণেতা আচার্য্য প্রণবানন্দ সেই সুমহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আজ যুগধর্ম্মের প্রচার-প্রতিষ্ঠায় সমুদ্যত। তাঁর দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যানুভূতির মধ্যে আজ তাই পুনরায় প্রকট হয়েছে গীতার সেই মার্ম্মিক বাণী।

আমরা এই যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর সেই অলৌকিক জীবনের আলোকে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার যুগোপযোগী বিশ্লেষণে উদ্যোগী।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ—বিষাদযোগঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১

অন্বয়—ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ—সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাঃ চ এব সমবেতাঃ কিম্ অকুর্ব্বত॥ ১

অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র বললেন, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী আমার তনয়গণ এবং পাণ্ডুপুত্রগণ সমবেত হয়ে কি করল॥ ১

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ, তদা পাণ্ডব-অনীকাং ব্যূঢ়ম্ দৃষ্ট্বা, তু রাজা দুর্য্যোধনঃ আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য বচনম্ অব্রবীৎ॥ ২

অনুবাদ—সঞ্জয় বললেন, পাণ্ডব সৈন্যগণকে ব্যূহবদ্ধ দেখে রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্য সমীপে গিয়ে এই কথা বললেন॥ ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩

অন্বয়—আচার্য্য তব ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূম্ পশ্য॥ ৩

অনুবাদ—হে আচার্য্য, আপনার ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র কর্তৃক ব্যূহবদ্ধ পাণ্ডবগণের এই বিশাল সেনাদল দেখুন॥ ৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৬

অন্বয়—অত্র মহেষ্বাসাঃ শূরাঃ যুধি ভীমার্জ্জুনসমাঃ মহারথঃ যুযুধানঃ বিরাটঃ চ, দ্রুপদঃ চ, ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীর্য্যবান্ কাশীরাজঃ চ, নরপুঙ্গবঃ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ, বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ, সৌভদ্রঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ, সর্ব্বে এব মহারথাঃ॥ ৪।৫।৬॥

অনুবাদ—এই সেনামধ্যে মহাধনুর্দ্ধারী বীরগণ, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনের তুল্য মহারথী, সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, বীর্য্যবান ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও কাশীরাজ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, পরাক্রান্ত রাজা উত্তমৌজাঃ, সুভদ্রানন্দন ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ সকলেই মহারথী॥ ৪।৫।৬

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭

অন্বয়—দ্বিজোত্তম, অস্মাকম্ তু যে বিশিষ্টাঃ মম সৈন্যস্য নায়কাঃ তান্ নিবোধ। তে সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি॥ ৭

অনুবাদ—হে দ্বিজোত্তম, আমাদেরও যাঁরা প্রধান—আমার সৈন্যের নেতাগণ তাঁদিগকে অবগত হোন। আপনার গোচরার্থ তাঁদের নাম বলছি॥ ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ॥ ৮

অন্বয়—সমিতিঞ্জয়ঃ ভবান্ ভীষ্মঃ চ, কর্ণঃ চ, কৃপঃ চ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণঃ চ, সৌমদত্তিঃ, জয়দ্রথঃ॥ ৮

অনুবাদ—সমরবিজয়ী আপনি, পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত-তনয় ও জয়দ্রথ॥ ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০

অন্বয়—মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ অন্যে চ বহবঃ নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ শূরাঃ। ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকম্ তং বলম্ অপর্য্যাপ্তম্ এতেষাং তু ভীমাভিরক্ষিতম্ ইদং পর্য্যাপ্তম্॥ ৯।১০

অনুবাদ—আমার নিমিত্ত জীবন ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প আরও বহু শস্ত্রাস্ত্রধারী রণকুশল বীর আছেন। ভীষ্মরক্ষিত আমাদের সেই সৈন্য অপরিমিত এবং ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডব সৈন্য পরিমিত॥ ৯।১০

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১১

অন্বয়—ভবন্তঃ সর্ব্বে এব হি সর্ব্বেষু চ অয়নেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু॥ ১১

অনুবাদ—সমস্ত ব্যূহপ্রবেশপথে নিজ নিজ বিভাগানুসারে অবস্থিত আপনারা সকলে ভীষ্মকেই রক্ষা করতে থাকুন॥ ১১

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২

অন্বয়—প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ॥ ১২

অনুবাদ—মহাপ্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) তাঁর (দুর্য্যোধনের) হর্ষোৎপাদন করে উচ্চ সিংহনাদপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করলেন॥ ১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪

অন্বয়—ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত। স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ। ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৩।১৪

অনুবাদ—তদনন্তর শঙ্খ ও ভেরী সমূহ এবং পণব, আনক, গোমুখ, ইত্যাদি ধ্বনিত হয়ে সে এক তুমুল শব্দ হল। তৎপরে শ্বেত-অশ্বযুক্ত মহারথে আরূঢ় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করলেন॥ ১৩।১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫

অন্বয়—হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ॥ ১৫

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ—পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুন—দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর (ভীমসেন)—পৌণ্ড্র (নামক) মহাশঙ্খ বাজালেন॥ ১৫

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলসহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮

অন্বয়—কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং, নকুলঃ সহদেবঃ চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ। পৃথিবীপতে, পরমেষ্বাসঃ কাশ্যঃ চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটঃ চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ, দ্রৌপদেয়াঃ চ, দ্রুপদঃ চ, মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্বশঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ॥ ১৬।১৭।১৮

অনুবাদ—কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির—অনন্ত বিজয়, নকুল—সুঘোষ ও সহদেব—মণিপুষ্পক নামক (শঙ্খধ্বনি করলেন)। হে পৃথ্বীপতি (ধৃতরাষ্ট্র) মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও মহাবাহু অভিমন্যু সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করলেন॥ ১৬।১৭।১৮

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯

অন্বয়—সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ নভঃ চ পৃথিবীং চ এব অভ্যনুনাদয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ॥ ১৯

অনুবাদ—সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করল॥ ১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১

অন্বয়—মহীপতে! অথ কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে ধনুঃ উদ্যম্য তদা হৃষীকেশম্ ইদং বাক্যম্ আহ। অর্জ্জুন উবাচ, অচ্যুত! উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়॥ ২০।২১

অনুবাদ—হে মহীপতে! তৎপরে কপিধ্বজ অর্জ্জুন কৌরবগণকে ব্যূহাকারে অবস্থিত দেখে ধনুঃ উত্তোলন করে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর॥ ২০।২১

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২

অন্বয়—যাবৎ অহম্ এতান্ অবস্থিতান্ যোদ্ধুকামান্ নিরীক্ষে অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্॥ ২২

অনুবাদ—যতক্ষণ আমি এই অবস্থিত যুদ্ধার্থিগণকে দেখি—এই যুদ্ধারম্ভে কাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে॥ ২২

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ। ২৩

অন্বয়—অত্র যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ যে এতে সমাগতাঃ যোৎস্যমানান্ অহম্ অবেক্ষে॥ ২৩

অনুবাদ—এই যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের হিতকামী যে সকল নৃপতি সমাগত (হয়েছেন), সংগ্রামেচ্ছু (তাঁদিগকে) আমি পর্য্যবেক্ষণ করি॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ, ভারত! গুড়াকেশেন এবমুক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা। ২৪

অনুবাদ—সঞ্জয় বললেন—হে ভারত, গুড়াকেশ অর্জ্জুন এইরূপ বললে, শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে উত্তম রথ স্থাপন করে (বললেন)॥ ২৪

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫

অন্বয়—ভীষ্মদ্রোণ-প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং চ পার্থ! এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য ইতি উবাচ॥ ২৫

অনুবাদ—ভীষ্মদ্রোণ-প্রমুখ সকল রাজগণেরও সম্মুখে—হে পার্থ, এইসমবেত কৌরবদল নিরীক্ষণ কর—এরূপ বললেন॥ ২৫

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি। ২৬

অন্বয়—অথ পার্থঃ তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি স্থিতান্ পিতৄন্, পিতামহান্, আচার্য্যান্ মাতুলান্, ভ্রাতৄন্, পুত্রান্, পৌত্রান্ তথা সখীন্ শ্বশুরান্, চ এব সুহৃদঃ অপশ্যৎ॥ ২৬

অনুবাদ—অনন্তর অর্জ্জুন তথায় উভয় সেনায় অবস্থিত পিতৃব্য পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর ও সুহৃদগণকে দেখলেন॥ ২৬

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ২৭

অন্বয়—স কৌন্তেয়ঃ অবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ ইদম্ অব্রবীৎ॥ ২৭

অনুবাদ—সেই কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন (যুদ্ধার্থ) অবস্থিত সেই সমস্ত বন্ধুগণকে দেখে পরম কৃপাপরবশ ও বিষণ্ণ (হয়ে) এইরূপ বললেন॥ ২৭

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥ ২৮

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ, কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি মুখং চ পরিশুষ্যতি॥ ২৮

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ, যুদ্ধাভিলাষী এই সকল স্বজনগণকে সমুপস্থিত দেখে আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন ও মুখ বিশুষ্ক হয়ে আসছে॥ ২৮

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে॥ ২৯

অন্বয়—মে শরীরে বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ চ জায়তে। হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে ত্বক চ এব পরিদহ্যতে॥ ২৯

অনুবাদ—আমার শরীরে কম্পন ও রোমাঞ্চ হচ্ছে, হস্ত হতে গাণ্ডীব খসে পড়ছে এবং সমুদয় ত্বক যেন বিদগ্ধ হচ্ছে॥ ২৯

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ৩০

অন্বয়—কেশব! অবস্থাতুং ন শক্নোমি; মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব, বিপরীতানি নিমিত্তানি পশ্যামি॥ ৩০

অনুবাদ—হে কেশব! আমি স্থির হয়ে থাকতে পারছি না; আমার মন অস্থির হচ্ছে; আমি দুর্লক্ষণসমূহ লক্ষ্য করছি॥ ৩০

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১

অন্বয়—হে কৃষ্ণ! আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ন চ অনুপশ্যামি; বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে; রাজ্যং চ সুখানি চ ন॥ ৩১

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে আত্মীয়গণকে নিহত করে আমি মঙ্গল দেখছি না। বিজয় আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্য এবং সুখও চাই না॥ ৩১

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥ ৩২

অন্বয়—গোবিন্দ! নঃ রাজ্যেন কিম্? ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্? যেষামর্থে নঃ রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতম্॥ ৩২

অনুবাদ—হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভোগ বা জীবনে কি প্রয়োজন? যাদের জন্য রাজ্য ভোগ ও সুখের কামনা করি। ৩২

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ। ৩৩

অন্বয়—তে ইমে আচার্য্যাঃ, পিতরঃ, পুত্রাঃ চ, তথা এব পিতামহাঃ প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ॥ ৩৩

অনুবাদ—সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহগণ, ধন ও জীবনের আশা পরিত্যাগ করে এই যুদ্ধে অবস্থিত॥ ৩৩

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন॥ ৩৪

অন্বয়—তথা মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ, সম্বন্ধিনঃ, মধুসূদন! ঘ্নতঃ অপি এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি॥ ৩৪

অনুবাদ—আরও মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও বৈবাহিকগণ (উপস্থিত)। হে মধুসূদন, হত হলেও আমি এদের নিধন করতে ইচ্ছা করি না॥ ৩৪

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন॥ ৩৫

অন্বয়—জনার্দ্দন! মহীকৃতে কিং নু ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি। ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ? ৩৫

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন, পৃথিবীর জন্য কি কথা? ত্রৈলোক্যরাজ্যের জন্যও (কাকেও বধ করিতে ইচ্ছা করি না)। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ করে আমাদের কি সুখ হবে॥ ৩৫

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৬

অন্বয়—আততায়িনঃ এতান্ হত্বা অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ। তস্মাৎ সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ বয়ং হন্তুং ন অর্হাঃ। মাধব! হি স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম? ৩৬

অনুবাদ—এই সকল আততায়িগণকে হত্যা করলে, আমাদের পাপই হবে। এজন্য আমাদের বন্ধুগণসহ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে আমাদের (পক্ষে) হত্যা করা উচিত নয়। হে কৃষ্ণ! স্বজনগণকে হত্যা করে কীরূপে সুখী হব? ৩৬

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭

অন্বয়—যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ এতে কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ন পশ্যন্তি॥ ৩৭

অনুবাদ—লোভাভিভূতচিত্ত হওয়ায় (দুর্য্যোধন পক্ষীয়গণ) কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহজনিত পাপরাশি দেখতে পাচ্ছে না॥ ৩৭

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন॥ ৩৮

অন্বয়—হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্? ৩৮

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়জনিত পাপ লক্ষ্য করেও কেন আমাদের তাতে নিবৃত্ত হবার জ্ঞান হবে না? ৩৮

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ ৩৯

অন্বয়—কুলক্ষয়ে সনাতনঃ কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি ; উত ধর্ম্মে নষ্টে অধর্ম্মঃ কৃৎস্নং কুলম্ অভিভবতি॥ ৩৯

অনুবাদ—কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম্মসমূহ বিনষ্ট হয় ও ধর্ম্ম নষ্ট হলে অধর্ম্ম সমস্ত কুলকে অভিভূত করে ফেলে॥ ৩৯

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০

অন্বয়—হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয় প্রদুষ্যন্তি ; বার্ষ্ণেয় স্ত্রীষু দুষ্টাসু বর্ণসঙ্করঃ জায়তে॥ ৪০

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! কুল অধর্ম্মে অভিভূত হলেই কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হয়। হে বৃষ্ণিবংশধর! কুলনারীগণ পতিতা হলেই বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়॥ ৪০

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪১

অন্বয়—সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং কুলস্য চ নরকায় এব, হি এষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পিতরঃ পতন্তি॥ ৪১

অনুবাদ—(ব্যাভিচার জনিত) বর্ণসঙ্কর কুলের এবং বংশনাশকগণের নরকের কারণ হয় ; শ্রাদ্ধতর্পণ-বর্জ্জিত হওয়ায় তাদের পিতৃপুরুষ-গণ নরকে পতিত হন॥ ৪১

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪২

অন্বয়—কুলঘ্নানাং এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ জাতি-ধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ চ উৎসাদ্যন্তে॥ ৪২

অনুবাদ—কুলনাশকারীদের (কর্ম্মফলে উৎপন্ন) এই সকল বর্ণসঙ্কর দোষ দ্বারা শাশ্বত জাতি-ধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়॥ ৪২

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম।। ৪৩

অন্বয়—জনার্দ্দন! উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম।। ৪৩

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন! যাদের কুলধর্ম্মাদি বিনষ্ট হয়েছে সেই মনুষ্যগণের চিরদিন নরকবাস হয়ে থাকে—ইহাই আমরা শুনেছি।। ৪৩

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।। ৪৪

অন্বয়—অহোবত! বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ, যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ।। ৪৪

অনুবাদ—হায়! আমরা রাজ্যসুখলোভে স্বজনগণকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়ে মহাপাপে প্রবৃত্ত হয়েছি! ৪৪

যদি মামপ্রতিকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।। ৪৫

অন্বয়—যদি অপ্রতিকারম্ অশস্ত্রং মাং শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তারাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।। ৪৫

অনুবাদ—যদি প্রতিকারোদ্যমরহিত নিঃশস্ত্র আমাকে শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ হত্যাও করে, তাতে আমার অধিকতর মঙ্গলই হবে।। ৪৫

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ।। ৪৬

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ—শোকসংবিগ্নমানসঃ অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে সশরং চাপং বিসৃজ্য রথোপস্থ উপাবিশৎ।। ৪৬

অনুবাদ—সঞ্জয় বললেন—শোকাকুলচিত্ত অর্জ্জুন এইকথা বলে ধনুর্ব্বাণ পরিহার করে রথোপরি বসে পড়লেন।। ৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ—সাংখ্যযোগঃ

প্রথম অধ্যায়ের যা সার শিক্ষা তা পূর্ব্বে আমরা আলোচনা করেছি। এক্ষণে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তত্ত্বাংশ উপস্থাপিত করার চেষ্টা করব।

সাংখ্যযোগ কি?

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সাংখ্যযোগ। তবে 'সাংখ্য' বলতে সাধারণতঃ কাপিল দর্শন বোঝায়—যাতে পুরুষ-প্রকৃতির স্বরূপ ও বিভেদতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। তার সঙ্গে এই অধ্যায়ের কোন সাদৃশ্য নেই। তবে গীতা সাংখ্য দর্শনের বিরোধী নয়। পরবর্ত্তী কতিপয় অধ্যায়ে গীতা স্বীয় বিশিষ্ট মতবাদের সমর্থনের জন্য প্রয়োজন মত সাংখ্য মতের কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জ্জন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ, পরে আমরা তার আলোচনা করব। এখানে শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন—সাংখ্য বলতে এই অধ্যায়ে যা বোঝান হয়েছে, তা হচ্ছে বিচারমূলক জ্ঞান। বস্তুতঃ, 'সাংখ্য' শব্দটির প্রকৃত অর্থও তাই। সাংখ্য দর্শনে রয়েছে পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের বিচার, আর এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে আত্ম-অনাত্ম-তত্ত্বের বিচার, পার্থক্য শুধু এই। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে সুস্পষ্ট রূপে বলা হয়েছে "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্"—অর্থাৎ সাংখ্যবাদীদের জন্য জ্ঞানযোগ। এখানে আত্ম ও অনাত্মতত্ত্বের বিচারবাদকেই অভিহিত করা হয়েছে সাংখ্যযোগ ব'লে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য

দুইটি বিশেষ কারণে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের মহত্ত্ব বিবেচিত হয়। এই অধ্যায়ের মধ্যে অনুপ্রবেশের পূর্ব্বে আমরা সেই বিষয়টির কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

প্রথমতঃ গীতাধর্ম্ম বা গীতাজ্ঞান বলতে যা বোঝায় তার প্রাথমিক অবতারণা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই প্রসঙ্গে তাই একটি কথা স্মরণযোগ্য। গীতার প্রথম অধ্যায়ে যা কিছু আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে ভগবদুক্তি কিছুই

নাই। সেখানে যা কিছু বলার তা বলেছেন ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়, দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন। প্রথম অধ্যায়ের অন্তিম ভাগে আসন্ন যুদ্ধের ফলাফল যে কী ভীষণ স্বরূপ ধারণ করবে—পারিবারিক, সামাজিক, ধার্ম্মিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উপর তার আশু ও ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া কীরূপ হবার সম্ভাবনা—অর্জ্জুন বিহ্বল চিত্তে তারই বিশদ বর্ণনা দিতে দিতে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন এবং যার নিকট তিনি স্বীয় মনোব্যথা নিবেদন করলেন, রথোপরি উপবিষ্ট তাঁর সেই প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের উত্তর শুনবার পূর্ব্বেই তিনি শোকাকুল হয়ে তীর-ধনু পরিহার করে রথের উপর বসে পড়লেন। এখানেই প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি এবং পার্থের সেই বিষাদচিত্রের বর্ণনা নিয়েই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত।

আলোচ্য অধ্যায়ের আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, এই অধ্যায়ে সর্ব্বপ্রথম শ্রীভগবান্ তাঁর গীতাধর্ম্মের অমৃতময় উপদেশ আরম্ভ করেছেন। এক শ্রেণীর পাঠক এই অধ্যায়কে তাই অভিহিত করেন "গীতার্থ-সূত্র" বলে। কেন না, সমগ্র গীতার বিবিধ অধ্যায়ে যে গভীর, বিচিত্র ও অমূল্য উপদেশের অবতারণা হয়েছে—তার সংক্ষিপ্তসার সন্নিবেশিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই সমস্ত কারণে গীতাপ্রেমী পাঠক ও শ্রোতৃবৃন্দের নিকট এই অধ্যায়টি অতীব প্রিয় ও মূল্যবান্।

এই অধ্যায়ের শেষভাগে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ও অবস্থার বর্ণনা-প্রসঙ্গে যে শ্লোকগুলি বিবৃত হয়েছে, অনেক পাঠক-পাঠিকার নিকট তা বিবেচিত হয় নিত্য পাঠ্যরূপে। গীতাপ্রেমী মহাত্মা গান্ধীজীর প্রাত্যহিক প্রার্থনা-মন্ত্রের মধ্যেও এগুলি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়—আচার্য্য শঙ্করাদি গীতার কোন কোন প্রাচীন ভাষ্যকার এই অধ্যায় হতেই তাঁদের টীকাগ্রন্থ রচনা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সঞ্জয় অর্জ্জুনের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার বর্ণনা করে বললেন—

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ—মধুসূদনঃ তথা কৃপয়াবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণা-কুলেক্ষণং বিষীদন্তং তম্ ইদং বাক্যম্ উবাচ॥ ১

অনুবাদ—ভগবান মধুসূদন স্বীয় সখা পার্থকে কাতর, কৃপাবিষ্ট ও শোকাকুল দেখে বললেন॥ ১

গীতামৃত—সঞ্জয়বর্ণিত অর্জ্জুনের এই বিষাদচিত্র কতই না করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী! চিরনির্ভীক ও পৌরুষমূর্ত্তি পার্থ আজ অবসন্নদেহ ও ভগ্নহৃদয়। শোকে, দুঃখে, দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায়, তিনি শুধু ম্রিয়মাণ নন—রোরুদ্যমান। তাঁর প্রাণাদপি প্রিয় গাণ্ডীব—যার বিন্দুমাত্র নিন্দা-সমালোচনা তাঁর নিকট অসহ্য—তা আজ অগ্রাহ্য ও পরিত্যক্ত। বাহ্য কোন আঘাত-আক্রমণে তিনি এমত বিহ্বল-বিভ্রান্ত হন নি, হবার পাত্রও নন। এ তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতেরই শোচনীয় পরিণাম। তিনি স্বীয় আত্মীয়-পরিজনবর্গের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করছেন। বাহ্যদৃষ্টিতে অর্জ্জুনের এই নিদারুণ কাতর ও বিহ্বল অবস্থা আত্যন্তিক সমবেদনা ও সহানুভূতির যোগ্য। পরন্তু, যাঁর নিকট তিনি স্বীয় মনোব্যথা নিবেদন করে আশ্বাস ও সহানুভূতিসূচক সান্ত্বনা ও উপদেশের আশা করেছিলেন তিনি কিন্তু অপ্রসন্ন ও বিরূপ ভাবে বলে উঠলেন—

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥ ২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩

অন্বয়—অর্জ্জুন! বিষমে কুতঃ ইদম্ অনার্য্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্ত্তিকরং কশ্মলং ত্বা সমুপস্থিতম্॥ ২

পার্থ! ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ, এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে, পরন্তপ ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ॥ ৩

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন, হে অর্জ্জুন! এই বিষম (সঙ্কট) সময়ে কোথা হতে এরূপ আর্য্যগণের অযোগ্য, অপুণ্যকর ও অযশস্কর মোহ তোমার মনে উপস্থিত হল॥ ২

হে পার্থ, কাতর হয়ো না, এরূপ দুর্ব্বলতা তোমাতে শোভা পায় না। তুমি তোমার তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিহার করে সত্বর উত্থিত হও॥ ৩

প্রথম ভগবদ্বাণী

উপরোক্ত দুটি শ্লোকই গীতার সর্ব্বপ্রথম ভগবদ্বাণী। এই দিক দিয়ে এর একটা বিশেষ মহত্ত্ব-গৌরব রয়েছে। কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে প্রিয় সখা অর্জ্জুনের মাধ্যমে শ্রীভগবান্ যে প্রথম বাণী উচ্চারণ করলেন তা কতই না মূল্যবান ও অশেষ প্রেরণাপ্রদ!

বলা বাহুল্য, বাহ্যতঃ অর্জ্জুন এই বাণীর উপলক্ষ্য এবং কুরুক্ষেত্র-সমর এর সাময়িক পটভূমিকা। পরন্তু উচ্চতর অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে মানব জীবনই চিরন্তন কুরুক্ষেত্র। জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষের যে ভাল-মন্দ কর্ম্মপ্রচেষ্টা-তাই তার অব্যাহত জীবন-সংগ্রাম। নবজাতকের অসহায় ক্রন্দনেই এই সংগ্রামের করুণ সূত্রপাত এবং জীবনের চরমসিদ্ধির বিজয়গৌরবেই এর পরিসমাপ্তি। অনন্ত গুণ, জ্ঞান ও মহিমা-গরিমার অধিকারী মানুষ স্বরূপতঃ ভগবদংশ বা ব্রহ্মকুমার এবং এই হিসাবে আর্য্যত্ব বা দেবত্বই হচ্ছে তার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার।

প্রতিকূল পরিস্থিতির ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের মনোবুদ্ধি যখন নানা ভাবে আহত, ব্যাহত হয়, তখনই ঘটে তার অধোগতি—স্বভাববিচ্যুতি বা অনার্য্যত্বপ্রাপ্তি। জীবনের যাত্রাপথে কোন এক অশুভ মুহূর্ত্তে যখন মানুষ অর্জ্জুনের ন্যায় অসহায়, বিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, তখন প্রকৃত শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের আশায় তার অন্তরের অন্তঃস্থল হতে উত্থিত হয় এতাদৃশ অন্তর্ভেদী কাতর আকুতি। বস্তুতঃ সদ্গুরুরূপী ভগবানের প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ লাভের ইহাই মঙ্গল মুহূর্ত্ত। জীবনের এই মহামাহেন্দ্রক্ষণে অভয়মূর্ত্তি সদ্গুরু করুণাবিমিশ্রিত ভর্ৎসনার সুরে তখন তাকে বলেন—হে অমৃত সন্তান ব্রহ্মকুমার! তুমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। শোকদুঃখ তোমার জন্য নয়। তুমি অনন্ত শক্তি, সামর্থ্য ও পৌরুষের অধিকারী। জীবনের অশুভ মুহূর্ত্তে বিষম প্রতিকূল অবস্থা-চক্রের মধ্যে যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রয়োজন তখন তোমার এই ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা কেন? এই ক্লৈব্য পরিহার করে তুমি সত্বর উত্থিত হও।

গীতোক্ত এই সতর্ক বাণী সংসারবদ্ধ জীবনের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত শাশ্বত জাগৃতিমন্ত্র। যুগ যুগ ধরে মোহগ্রস্ত জীবের কর্ণে তাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ" এবং এই অমোঘ বোধন-বাণী

তাকে নিরন্তর স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"।

দয়ার নামে মায়া

অর্জ্জুন স্বজনবধের আশঙ্কায় ভীত ও কৃপাবিষ্ট হয়েছেন। 'কৃপা' শব্দটির সাধারণ অর্থ দয়া। দয়া মানব হৃদয়ের অন্যতম সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি বা গুণরূপে সর্ব্বকালের সভ্যসমাজে চির প্রশংসিত ও সমাদৃত। জগতের সকল নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে দয়ার স্থান তাই সর্ব্বাগ্রে। বৌদ্ধধর্ম্মের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে করুণা, মুদিতা ও মৈত্রী। আদর্শ ভক্তের গুণ ও অধিকারের বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানও দ্বাদশ অধ্যায়ে বলেছেন—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।" অর্থাৎ আদর্শ ভক্ত হবেন ঈর্ষ্যা-দ্বেষবিহীন, মিত্রাচারী ও দয়ালু। ভক্ত তুলসীদাসও বলেছেন—"দয়া ধরম্ কা মূল হ্যায় পাপ মূল অভিমান।"

এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক—অর্জ্জুনের অন্তঃকরণ যদি সত্য সত্যই এই দেবোচিত দয়াভাবের দ্বারা উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে, তবে তিনি তাঁর প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের নিকট এরূপ ধিক্কার ও বিরূপ সমালোচনার পাত্র হলেন কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে কোন কোন পণ্ডিত বলেন—'দয়া' একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৎগুণ বটে, তবে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া এক কথা এবং তার প্রভাবে আবিষ্ট, আড়ষ্ট ও কাতর হওয়া অন্য কথা। অর্থাৎ, কারুর দুঃখ-ক্লেশ দেখে দয়ার্দ্রচিত্ত বা সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়াটা দোষের নয় বরং গুণের; পরন্তু, সেই দুঃখে কাতর ও মূহ্যমান হয়ে হতাশ ও বিহ্বল হওয়া নিদারুণ আত্মদৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। ইহাতে সেই দয়ালু ব্যক্তি শুধু যে নিষ্ক্রিয় ও নিরুদ্যম হন, তাই নয়, তিনি এর প্রভাবে হয়ে পড়েন একান্ত অসুস্থ ও অশান্ত। দয়ালু ব্যক্তির এই অসহায় ও করুণ অবস্থা সত্য সত্যই অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও খেদজনক। অর্জ্জুনের মনোভাব উপরোক্ত খেদজনক মনোদশারই অনুরূপ। এরূপ না হলে তিনি গাণ্ডীব পরিহার করে হতাশ হৃদয়ে রোদন করতে বসবেন কেন?

সচরাচর দেখা যায়, কোন বাড়ীতে কেহ একটু বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সেই পীড়িত ব্যক্তির

দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে ও তার করুণ আর্ত্তনাদ শুনে এত কাতর ও মুহ্যমান হয়ে পড়েন যে, তখন তাকে নিয়ে এক নতুন বিভ্রাট ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তির এই যে দয়া—তা দুর্ব্বলতা ও মায়ার নামান্তর।

বস্তুতঃ, সত্যকার দয়া মানুষকে কাতর ও দুর্ব্বল করে না। ইহা এক দিকে যেমন মানুষের হৃদয়ে সমবেদনা ও সহানুভূতির মহান্ ভাব জাগ্রত করে, অন্য দিকে তেমনি তা তার প্রাণে ব্যথিত ব্যক্তির দুঃখ-বেদনা দূর করার উপযোগী নির্ম্মল বুদ্ধি, অমোঘ প্রেরণা এবং অসীম ধৈর্য্য ও সাহসের সঞ্চার করে। জগতের উদারচেতা ও সেবাব্রতী মহাপুরুষগণের পুণ্য জীবনচরিত—এই আদর্শের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সুউচ্চ আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়—অর্জ্জুনের কৃপাবিষ্ট এই মানসিক অবস্থা কোন্ স্তরের এবং তা প্রশংসনীয়, না নিন্দনীয়।

অন্য এক শ্রেণীর পণ্ডিত 'কৃপা' শব্দটিকে ইংরাজী Pity শব্দটির সমার্থবোধক বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেন, Pity শব্দটির অর্থের মধ্যে যেরূপ প্রচ্ছন্ন রয়েছে, একটি দয়াজনক কাতরভাব, "কৃপা" শব্দটির অর্থও তদ্রূপ। তাঁরা বলেন—দয়াভাবের মধ্যে যেরূপ একটি বিশ্বোদার প্রেমের ও সেবার ভাব বিদ্যমান, অর্জ্জুনের হৃদয়গত ইত্যাকার কৃপার মধ্যে ছিল সেই মহান্ উদার ভাবের ঐকান্তিক অভাব।

প্রথম অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকগুলিতে অর্জ্জুনের মুখে যে খেদোক্তি বিবৃত হয়েছে তাতে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়, তিনি সেখানে কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও কুলস্ত্রীগণের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কীরূপ ব্যথিত ও বিহ্বল হয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তিরস্কৃত ও উপদিষ্ট হবার পরেও তিনি স্বীয় স্বীয় মতের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে যে কথাগুলি বললেন তার মধ্যেও কোন উদার মনোভাবের সঙ্গতি লক্ষিত হয় না। অর্জ্জুন বললেন—

অর্জ্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ। অরিসূদন! কথম্ অহং সংখ্যে পূজার্হৌ ভীষ্মং দ্রোণং চ ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি॥ ৪

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন—হে শত্রুমর্দ্দন! কিরূপে আমি যুদ্ধে পূজার যোগ্য ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত বাণসমূহের দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করব? ৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫

অন্বয়—মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা হি ইহলোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ। গুরূন্ হত্বা তু ইহ এব রুধিরপ্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয়॥ ৫

অনুবাদ—মহানুভব গুরুজনগণকে বধ না করে ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজনও কল্যাণকর। কিন্তু গুরুজনগণকে হত্যা করলে ইহলোকে (তাহাদের) রক্তলিপ্ত ভোগসম্পদ ভোগ করতে হবে॥ ৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬

অন্বয়—যদ্বা জয়েম যদি বা নঃ জয়েয়ুঃ কতরৎ নঃ গরীয়ঃ এতৎ চ ন বিদ্মঃ। যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ॥ ৬

অনুবাদ—যদি বা আমরা জয়ী হই অথবা যদি আমরা পরাজিত হই —উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ বুঝি না। যাহাদিগকে হত্যা করে বাঁচতে ইচ্ছা করি না—সেই ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ সম্মুখে অবস্থিত॥ ৬

অর্জ্জুনের বিচার স্বার্থজড়িত

অর্জ্জুনের পূর্ব্বাপর উক্তিগুলি হতে সহজেই প্রতীয়মান্ হয় যে, তিনি এখন পর্য্যন্ত স্বজনগণের হিতাহিত চিন্তায় নিমজ্জিত। তাঁর চিন্তা-চেষ্টা এখনও কৌলিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় নি। অর্থাৎ, তিনি এখনও বুঝতে অক্ষম

যে সংকীর্ণ প্রেমে মোহের জন্ম এবং তাঁর যাবতীয় দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-দৈন্যের মূল কারণ হচ্ছে এই স্বার্থকেন্দ্রিক মনোভাব। উপরন্তু অর্জ্জুন অদ্যাপি উপলব্ধি করেন নি—সখা ও সারথিরূপে যিনি তাঁর রথে উপবিষ্ট, তিনি স্বয়ং বিশ্বপতি পরম পুরুষোত্তম এবং গৃহী হয়েও তিনি গৃহাতীত, স্বজনহিতৈষী হয়েও তিনি পরম অনাসক্ত মহাসন্ন্যাসী। এই নিষ্কাম ত্যাগ ও সেবার আদর্শ দেখাবার জন্যই তিনি সমগ্র জীবন বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ভূমিকায় লীলা করতে করতে হস্তিনাপুরে তাঁদের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হয়েছেন। জীবনের কোন স্তরে কোন কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব তাঁকে ক্ষণকালের জন্যও আসক্ত ও আবদ্ধ করতে পারে নি। শ্রীকৃষ্ণের বড় দুঃখ—তাঁর ন্যায় এত বড় মহান্ জীবন সম্মুখে দেখেও তাঁর সখা এতখানি মোহান্ধ ও স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন! তিনি তাই শ্লেষের সুরে অর্জ্জুনকে তিরস্কার করে বললেন—"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।' হে সখে, এই সঙ্কটকালে ইত্যাকার মোহ তোমাতে কোথা হতে প্রবিষ্ট হল? সাধারণ অবস্থায় যদি তুমি এরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করতে তাহলে তা উপেক্ষা করা যেত। কিন্তু এ যে এক বিষম সঙ্কটজনক পরিস্থিতি! এ সময়ে এরূপ দুর্ব্বলতা দেখালে লোকে তোমাকে কি বলবে? এতে যে তোমার এত কালের অর্জ্জিত সুনাম সুখ্যাতি বিনষ্ট হবে। সুতরাং, কেউ না দেখবার, না জানবার পূর্ব্বেই এই দুর্ব্বলতা ত্যাগ করে তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও।

অধ্যাত্মস্তরে উচ্চাধিকারী সাধকের ত্রুটি অনুপেক্ষণীয়

আমরা বলেছি—অর্জ্জুনের ইত্যাকার দোষ-দুর্ব্বলতা ছিল সাময়িক। তা ছাড়া, সাধারণ সাংসারিক মানদণ্ডে বিচার করলে তাঁর এই দোষত্রুটি তেমন ভয়ঙ্কর ও সাংঘাতিক নয়। 'আমি আমার স্বজনগণের সঙ্গে যুদ্ধ না করে ভিক্ষা করে খাব"—একজন সাধারণ গৃহী যদি এরূপ বিচার করে, তবে সে জন্য তাকে তেমন দোষ দেওয়া যায় কি? পরন্তু, অর্জ্জুন তো এরূপ সাধারণ স্তরের লোক ছিলেন না ; শুধু জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধিই তাঁর কাম্য ছিল না ; বস্তুতঃ, অর্জ্জুন ছিলেন সত্যকার মোক্ষার্থী। গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি যে সব মহৎ প্রশ্ন উত্থাপন করে তার সমাধান চেয়েছেন—তা সাধারণ ও সামান্য প্রশ্ন নয়। বস্তুতঃ, পরিপূর্ণ মানসিক শান্তি ও সর্ব্বোত্তম জ্ঞান লাভের জন্যই তিনি ছিলেন একান্ত আকুল ব্যাকুল।

মানস-শাস্ত্রের মতে অধ্যাত্মসাধনায় যাঁরা ব্রতী হন তাঁদের চিত্তের সর্ব্বপ্রকার ভালমন্দ সংস্কারগুলি নিঃশেষে বিনষ্ট হবার পূর্ব্বে সেগুলি ধারণ করে ভীষণ, বিচিত্র ও উগ্রস্বরূপ। সাধকের সেই সময়কার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত ভয়ানক বলে মনে হয়। কত অপ্রত্যাশিত চিন্তা-ভাবনা, কত অবাঞ্ছিত দুর্ব্বার কামনা-বাসনা এইকালে তাকে আচ্ছন্ন, অভিভূত ও দিশেহারা করে তোলে। অর্জ্জুনের যাবতীয় চিত্তদৌর্ব্বল্য, মোহ ও অজ্ঞানের মূল কারণও ইহাই।

অর্জ্জুনের আশ্রয়দাতা যিনি সদ্‌গুরু সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবানের নিকট তাঁর স্বভাব-সংস্কার কিছু অজ্ঞাত ছিল না। অর্জ্জুনের সহিত তাঁর সম্বন্ধ-সম্পর্কও এক জন্মের নয়। তাই তিনি তাঁর সাময়িক দুর্ব্বলতাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে না দেখে তাঁকে তা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত করার জন্যই এতখানি আগ্রহশীল।

ভগবদুক্তির পুনরাবর্ত্তন

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার মহত্তম অভয় ও আশ্বাসবাণী হচ্ছে—"সম্ভবামি যুগে যুগে"। বস্তুতঃ, এই আশ্বাসবাণীকে আশ্রয় করে হিন্দুধর্ম্ম চির অমর ও প্রগতিশীল। বর্ত্তমান যুগে এই ধর্ম্মগ্লানির দুর্দ্দিনেও সেই ভগবৎপ্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হয় নি। তাই এ-যুগে তিনি আচার্য্য প্রণবানন্দ-শরীরে আবির্ভূত হয়ে গীতার সেই সনাতন শিক্ষাকে পুনরায় জ্বলন্ত স্বরূপ দান করেছেন। অর্জ্জুনের ন্যায় মোহগ্রস্ত মর্ত্ত্যজীবকে লক্ষ্য করে তাই তিনি পুনরায় বলছেন—"মানুষের সবল মন দুর্ব্বল হয় স্নেহ-মায়া-মমতার প্রভাবে। এই স্নেহ-মমতার ছিদ্রপথে সাধকের যাবতীয় শৌর্য্য-বীর্য্য, সাহস-পরাক্রম মুহূর্ত্তে বিলীন হয়ে যায়।"

দুর্ব্বলতাই সমস্ত পাপের মূল—গীতার এই মহতী শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করে তিনি বললেন "দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতাই মহাপাপ এবং বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্বই মহাপুণ্য।" মোহ ও ক্লৈব্যরূপী মহাপাপ হতে আত্মরক্ষার উপায় কি? এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ দিয়ে আচার্য্যপ্রবর যা বললেন, তাও গীতার সেই সুদিব্য অনুশাসনেরই অনুরূপ। তিনি বললেন—"সংগ্রামই জীবন, সংগ্রামই সাধকের পরম সহায়। সংগ্রামই সাধকের ভিতরে আনয়ন করে জাগ্রত জীবন্ত ভাব। এই সংগ্রামের অভাব হইলে সাধক নির্জ্জীব নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। সাধক যতক্ষণ সংগ্রামের ভিতর থাকে ততক্ষণ তার মধ্যে থাকে অমিত তেজঃ, বীর্য্য, বিক্রম ও পরাক্রম।"

সঙ্কল্পচ্যুতিও অর্জ্জুনের অন্যতম অপরাধ

আত্মীয়-পরিজনের প্রতি আত্যন্তিক মমত্ববুদ্ধির ন্যায় অর্জ্জুনের মানসিক অধোগতি আর একটি কারণ হচ্ছে তাঁর সঙ্কল্পভঙ্গ। ভালমত বিচার-বিবেচনা করেই তো পাণ্ডবগণ যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বা অন্য কারুর কোনো প্ররোচনা এর পশ্চাতে ছিল না। এমতাবস্থায় সমরসজ্জা ও সৈন্য-সমাবেশের যাবতীয় প্রস্তুতির পরে যুদ্ধারম্ভের প্রাঙ্ মুহূর্ত্তে 'যুদ্ধ করব না' বলে রণে ভঙ্গ দেওয়া ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে মহা অপরাধ নয় কি? অর্জ্জুন এই অমার্জ্জনীয় অপরাধেও আজ ঘোর অপরাধী এবং এই ত্রুটির জন্যই তাঁকে হতে হয়েছে তাঁর প্রিয় সখার বিরূপ সমালোচনার পাত্র।

এ বিষয়েও যুগাচার্য্য সঙ্ঘনেতা নির্দ্দেশ দিয়েছেন "সঙ্কল্পই সাধকের জীবন, সঙ্কল্পই সাধকের যথাসর্বস্ব। সঙ্কল্পে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত। বীর সাধক আকাশে বাতাসে সব সময় শুনিতে পায়—কখনও নিজ সঙ্কল্প ছাড়িব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব না। সঙ্কল্প ত্যাগের পূর্ব্বে আমার দেহের যেন পতন ঘটে।"

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।। ৭

অন্বয়—কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ত্বাং পৃচ্ছামি। মে যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ নিশ্চিতং ব্রূহি। অহং তে শিষ্যঃ। ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি।। ৭

অনুবাদ—হৃদয়দৌর্ব্বল্যাক্রান্ত, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানহারা, বিমূঢ়চিত্ত (আমি) তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। আমার পক্ষে যাহা কল্যাণকর তাহা তুমি নিশ্চয় করে বল। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দাও।। ৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্।। ৮

অন্বয়—ভূমৌ অসপত্নম্ ঋদ্ধং রাজ্যং সুরাণাম্ অপি আধিপত্যং চ অবাপ্য যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণং শোকম্ অপনুদ্যাৎ ন হি প্রপশ্যামি।। ৮

অনুবাদ—পৃথিবীতে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সমৃদ্ধ রাজ্য, দেবতাদের উপর আধিপত্য লাভ করেও ইন্দ্রিয়গণের সন্তাপদায়ক শোক কিরূপে নিবারিত হবে—তা দেখতে পাচ্ছি না।। ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।। ৯

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ—পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃষীকেশং গোবিন্দম্ এবম্ উক্ত্বা ন যোৎস্যে ইতি উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।। ৯

অনুবাদ—সঞ্জয় বললেন-শত্রুসন্তাপকারী, জিতনিদ্র অর্জ্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে "আমি যুদ্ধ করব না" এই বলে চুপ করলেন।। ৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ।। ১০

অন্বয়—ভারত! হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তম্ ইদং বচঃ উবাচ।। ১০

অনুবাদ—হে ভারত, তখন হৃষীকেশ হাসতে হাসতে উভয় সৈন্য দল-মধ্যবর্ত্তী বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে এই কথা বললেন।। ১০

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অর্জ্জুন এতক্ষণ যে যুক্তিজাল প্রদর্শন করলেন, তা খণ্ডন করে শ্রীভগবান বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।। ১১

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ চ প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে, পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ অগতাসূন্ চ ন অনুশোচন্তি।। ১১

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন, (হে অর্জ্জুন) যাদের জন্য শোক করবার প্রয়োজন নেই তাদের জন্য তুমি শোক করছ, আবার পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলছ। পণ্ডিতগণ জীবিত বা মৃত কাহারো জন্য শোক করেন না॥ ১১

জাত ও মৃতের জন্য শোকবিলাপ নিরর্থক

জন্ম ও মৃত্যু নিত্যকার স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রত্যহ কত লোক এ সংসারে জন্মগ্রহণ করছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত এই সব দৃশ্য লক্ষ্য করেও মানুষ মৃত্যুভয়ে চির আতঙ্কিত এবং স্বজনবিয়োগের চিন্তায় ব্যথিত ও চিন্তিত! শাস্ত্রমতে এই দুশ্চিন্তা ও ভয়-ভীতির মূল কারণ মোহ বা অজ্ঞান। যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী ও বিবেকী তাঁরা তাঁদের জ্ঞানদৃষ্টিতে জন্মমৃত্যুর রহস্য পরিজ্ঞাত। তাই তাঁরা শোকরহিত, নিত্যানন্দময়। অর্জ্জুন লৌকিক দৃষ্টিতে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ হলেও অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে অদ্যাপি অজ্ঞান ও মোহের স্তরে আবদ্ধ। তাই তিনি স্বজনবিয়োগের চিন্তায় এতখানি উদ্বিগ্ন ও শোকাকুল। শুধু তাই নয়, অর্জ্জুন মোহান্ধ হয়েও মুখে বড় বড় নীতিকথা উদ্ধৃত করে স্বীয় যুক্তির সমর্থনের জন্য উদ্‌গ্রীব। তিনি বলছেন—গুরুজনকে বধ করে স্বর্গরাজ্য ভোগ করাও আমার কাম্য নয়। আমি রাজ্য চাই না, বিজয় চাই না, এই রুধিরলিপ্ত ভোগসুখ অপেক্ষা বরং ভিক্ষা করে দিনাতিপাত করা শ্রেয়ঃ।

মোহগ্রস্ত ব্যক্তির অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে—আত্মবিস্মৃতি বা বুদ্ধিবৈকল্য। এই অধ্যায়ের শেষের দিকে গীতা এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলছেন—

"সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো।"

মোহ হতে সর্ব্বপ্রথম হয় আত্মবিস্মৃতি এবং তা হতে ঘটে বুদ্ধিনাশ। অর্জ্জুনের এক্ষণে সেই অবস্থা। শুধু অর্জ্জুন কেন, আমরাও তো সব সময় ভুলের পর ভুল করতে করতে ভুলের পাহাড় জমিয়ে তুলি এবং নানা যুক্তিতর্ক উত্থাপিত করে সেই ভ্রান্তিরাশির সমর্থন করতে প্রস্তুত হই। তবে এরূপ অবস্থায় যদি আমরা কোনদিন ভাগ্যবলে অর্জ্জুনের ন্যায় প্রকৃত সদ্‌গুরুর চরণসান্নিধ্যে উপনীত হই, তাহলে আমাদের সেই মোহ দূরীভূত হবার মহামাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়। শ্রীগুরুগীতায় এজন্য বলা হয়েছে—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যে কৃপালু সদ্‌গুরু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা অজ্ঞানান্ধ জীবের জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত করেন—তাঁকে প্রণাম।

সদ্‌গুরুরূপী শ্রীভগবান্ প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে বলছেন—হে সখে, তোমার জ্ঞানাভিমান মিথ্যা। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কদাচ জীবিত বা মৃতের জন্য শোক করেন না। কারণ যাঁরা বিবেকী তাঁরা জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখতে পান—মানুষ দেহ নয়, দেহী। পাঞ্চভৌতিক এই শরীর নশ্বর। পরন্তু, এই দেহে দেহী বা আত্মারূপে যিনি বিরাজমান তিনি নিত্য, সনাতন ও অবিনাশী। দেহের নাশে তাঁর কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয় না। এই চরম সত্য অবগত হওয়ায় তাঁরা মৃতের জন্য আদৌ ভীত ও ব্যথিত হন না। পক্ষান্তরে জীবিতের জন্যও তাঁরা চিন্তিত হন না। কারণ, তাঁরা জানেন—প্রারব্ধের বশেই জীবকে দেহ ধারণ করতে হয় এবং যতদিন তার মনে বাসনার বীজ বিদ্যমান থাকবে—ততদিন তাকে জন্মগ্রহণ করতেই হবে। আর জন্ম হলেই একদিন না একদিন তার মৃত্যু ঘটবেই। আর যা অবশ্যম্ভাবী—যা হবেই হবে, তার জন্য আবার শোক দুঃখ কি? আত্মদর্শী কবি তাই নিঃশঙ্ক চিত্তে গেয়েছেন—

"ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়।
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।"

এছাড়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি আরও জানেন—এই সংসারনাট্যে যিনি স্বয়ং শিব তিনিই জীবরূপে লীলারত। অর্থাৎ, তিনি স্বেচ্ছায় সংসারবন্ধন স্বীকার করে জন্মমৃত্যুজনিত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। লীলা শেষে পুনরায় তিনি স্ব-স্বরূপে প্রত্যাবৃত্ত হন। বস্তুতঃ, জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই সংসাররহস্যের আদ্যন্ত সমস্ত কিছু অবগত। তাই তাঁদের "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন"। জ্ঞানীরা তাই অভীঃ-মন্ত্রসিদ্ধ, নিত্যানন্দময়। অর্জ্জুনকে এই দিব্যদৃষ্টি দানের জন্য শ্রীভগবান্ একান্ত ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত। তাই তিনি এক্ষণে তার নিকট আত্মার স্বরূপ-লক্ষণের বর্ণনায় উদ্যত হয়ে যা বলছেন তা পরবর্ত্তী কতিপয় শ্লোকে নিবদ্ধ।

**ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২**

অন্বয়—অহং জাতু ন আসং ত্বং ন, ইমে জনাধিপাঃ ন তু এব। অতঃপরং চ সর্ব্বে বয়ং ন ভবিষ্যামঃ ন এব॥ ১২

অনুবাদ—আমি এর পূর্ব্বে কখনও যে ছিলাম না, তুমিও যে ছিলে না—তাহাও নয়; এই নৃপতিগণও যে ছিলেন না, তাহাও নয়—এবং এর পরেও যে আমরা থাকব না, তাহাও নয়॥ ১২

**দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩**

অন্বয়—যথা দেহিনঃ অস্মিন্ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ, তত্র ধীরঃ ন মুহ্যতি॥ ১৩

অনুবাদ—যেমন দেহীর এই দেহেই কৌমার, যৌবন ও জরা (এই ত্রিবিধ অবস্থা) প্রাপ্ত হয়ে থাকে, দেহান্তর প্রাপ্তিও তদ্রূপ (একটি অবস্থা বিশেষ মাত্র)। ধীর পুরুষগণ তাতে মোহগ্রস্ত হন না॥ ১৩

**মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ১৪**

অন্বয়—কৌন্তেয় মাত্রাস্পর্শাঃ তু শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ, আগম-অপায়িনঃ অনিত্যাঃ, ভারত, তান্ তিতিক্ষস্ব॥ ১৪

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! ভোগ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ শীতোষ্ণাদি সুখ বা দুঃখদায়ী, অস্থায়ী অনিত্য; (অতএব) হে ভারত! তত্তাবৎ সহ্য কর॥ ১৪

গীতামৃত—দুরূহ আত্মতত্ত্বকে সরল ও সহজবোধ্য করার জন্য শ্রীভগবান্ সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে বললেন—হে পার্থ, আমি ও তুমি যে পূর্ব্বে ছিলাম না এবং এই রাজন্যবর্গও পূর্ব্বে ছিলেন না—এমন নয়। আর আমরা সকলে যে পরে থাকব না, তাও নয়। পূর্ব্ব জন্মে আমরা সকলে অন্যত্র অন্য স্বরূপে ছিলাম। এক্ষণে এই জন্মে আমরা এখানে এই অবস্থায় আছি। আবার পরজন্মে অন্যত্র অন্য স্বরূপে থাকব। অর্থাৎ, আমাদের

দেহের নাশ হলেও দেহী বা আত্মারূপে আমরা চিরকাল ছিলাম, আছি ও থাকব। বিষয়টি তোমাকে আরও পরিষ্কার করে বলছি—মন দিয়ে শোন। মানুষের দেহে শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের অবস্থা একের পর এক আসে। তার জন্য কি কেউ শোকাতুর হয়? এজন্য কি কেউ দুঃখ করে বলে —হায় হায়! আমার এত সাধের সেই শৈশব ও যৌবন কোথায় গেল-রে? হায়! কবে-কেমন করে আমি আবার হারানো অবস্থাগুলি ফিরে পাব? নিশ্চয়ই তা বলে না। কেন না, সে জানে স্বভাবের বশে—কালের গতিতে দেহে এরূপ পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর হতে বাধ্য। এজন্য শোক করা বা অনুযোগ অভিযোগ করা বৃথা।

হে সখে, তা ছাড়া, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ভালমত জানেন, দৈহিক মৃত্যুতে আত্মার কিছু আসে যায় না। সংসার-যাত্রাপথে দেহ হতে দেহান্তরপ্রাপ্তি অতি স্বাভাবিক ব্যাপার, আত্মার ক্রমবিকাশের ধারায় এর প্রয়োজনও অনিবার্য্য। এ যেন জরাজীর্ণ শরীরটা ত্যাগ করে অন্য একটি নূতন শরীর গ্রহণ করা। আরও শোন, দেহেন্দ্রিয়ের সহিত রূপরসাদি বিষয়ের সংস্পর্শ হলেই তদ্বারা ভালমন্দ, শীতোষ্ণ বা সুখ-দুঃখের অনুভূতি হওয়া স্বাভাবিক। পরন্তু, সেই সংস্পর্শজনিত ভাল-মন্দ বা সুখ-দুঃখের অনুভূতি অতি সাময়িক, ইহা আদৌ চিরস্থায়ী নয়। মনে ভাব—তুমি শীতকালে কোন পানাপুকুরে অবগাহন স্নানের জন্য নেমেছ এবং এজন্য নিদারুণ ঠাণ্ডায় তুমি অধীর অস্থির হয়ে উঠেছ। আচ্ছা, এই অবস্থায় কি তুমি চিরকাল ঐ পুকুরে ডুবে থাক? নিশ্চয়ই না। সুতরাং, শৈত্যের অনুভূতিজনিত সেই দুঃখ তোমার দেহে চিরকাল থাকে না। উপরে উঠে কিছুক্ষণ রৌদ্রে থাকলেই মুহূর্ত্তেই সেই ক্লেশ মিটে যায়।

ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেও দেহে শীতোষ্ণের অনুভব হয়। বিবেকী ব্যক্তিরা তাই এতে অধীর অসহিষ্ণু না হয়ে একে একটা সাময়িক অবস্থায় মনে করে তা ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করেন। হে সখে, স্বজনগণের মৃত্যু হলে তাদের সেই আকস্মিক বিয়োগ বা বিচ্ছেদের জন্য দুঃখ বেদনা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করলে সেই শোক-দুঃখ ক্রমশঃ প্রশমিত হয়ে যায়। সুতরাং, এমতাবস্থায় তিতিক্ষা ও ধৈর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। এই ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের মহত্ত্ব-গৌরব সম্বন্ধে সব শাস্ত্রই একমত। এ

বিষয়ে সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দ বলতেন—"ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য—সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি। তোমাদিগকে ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য—সহিষ্ণুতার জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইতে হইবে।" সাধারণ কথাতেও বলা হয়—"যে সয় সে রয়।"

তিতিক্ষার মহত্ত্বের বর্ণনা করে শ্রীভগবান্ অতঃপর বললেন—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।। ১৫

অন্বয়—পুরুষর্ষভ! এতে হি সমদুঃখসুখং যং ধীরং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি সঃ অমৃতত্বায় কল্পতে।। ১৫

অনুবাদ—হে পুরুষর্ষভ, এই সুখ দুঃখ যে ধীর ব্যক্তিকে ব্যথিত করে না, সেই ব্যক্তিই অমৃতত্ব (পরমা শান্তি) লাভ করে।। ১৫

অমৃতত্ব লাভের উপায়

'অমৃতত্ব'—শব্দের সাধারণ অর্থ—অমরত্ব বা মৃত্যুঞ্জয়ীর অবস্থা। বিশেষ অর্থে অমৃতত্ব বলতে বোঝায়—পরম শান্তিময় অবস্থা। ইচ্ছামাত্রই এই সুদুর্লভ স্থিতি লাভ করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন—অনন্ত ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও তিতিক্ষার সাধনা।

এক শ্রেণীর মানুষ আছেন—যাঁরা চান সস্তায় কিস্তি মাৎ করতে। সব ব্যাপারেই তাঁরা short cut বা সরল সহজ পথ খোঁজেন। সদ্‌গুরুর নিকট হতে মন্ত্রদীক্ষা নেবার পরেও তাঁরা ধৈর্য্য সহকারে সাধন-ভজন করতে প্রস্তুত নন। এঁরা ভুলে যান যে, জন্ম-জন্মান্তরের কামনা-বাসনার বেগ ও ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হবার নয়, এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘকালীন সাধনা।

আর এক শ্রেণীর সাধক আছেন যাঁরা ভাবেন, বিষয়ের সংস্পর্শে এলেই যখন মন চঞ্চল হয় এবং মনে নানা প্রকার অসুখ-অশান্তির সৃষ্টি হয় তখন বিষয়বস্তু থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ। এঁরা মনে করেন—সংসারের কর্ম্মকোলাহল হতে দূরে গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলে সহজেই মানসিক শান্তি বা মুক্তি লাভ করা সম্ভবপর। এঁরাও ভুলে যান—সংসার কেবল বাইরে নয়, প্রকৃত সংসার রয়েছে ভিতরে। বস্তুতঃ, মনই সংসার। মনে যতদিন

বিষয়ভোগেচ্ছা বিদ্যমান, ততদিন বিজন প্রান্তর, গহন জঙ্গল, গিরিগুহা যেখানেই অবস্থান কর না কেন কোথাও শান্তি সোয়াস্তির সম্ভাবনা নাই। তা ছাড়া, যতদিন দেহ আছে ও দেহরক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, ততদিন আহার, নিদ্রা, গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্তও কিছু না কিছু বিষয়সেবার আবশ্যকতা থাকবেই। সুতরাং, দেহযাত্রা থাকা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নির্ব্বিষয় হওয়ার কল্পনা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক। এ বিষয়ে আচার্য্য প্রণবানন্দের অভ্রান্ত উপদেশ—"সমাহিত মনই নির্জ্জন গিরিগুহা।" সুতরাং, নির্জ্জন বাসের জন্য অন্যত্র ছুটাছুটি বৃথা।

নির্জ্জন বাসের উপযোগিতা

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গীতাতেও প্রয়োজন ও অবস্থাবিশেষে সাধককে বিবিক্ত দেশসেবিত্বের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—ইহাই গীতার মুখ্য নির্দ্দেশ নয়। গীতাপাঠক মাত্রই অবগত আছেন—গীতার উপদেশ হয়েছিল ভীষণ ও উন্মুক্ত রণাঙ্গনে। নির্জ্জন তপোবন বা গিরিগুহায় নয় এবং গীতার উপদেষ্টা ও শ্রোতা উভয়েই ছিলেন—বীর যোদ্ধা ও সংসারাশ্রমী। মিথ্যা বৈরাগ্যাশ্রয়ী সংসার-ধর্ম্মত্যাগেচ্ছু অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম ও স্বকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যেই গীতার প্রচার-প্রতিষ্ঠা এবং এই প্রচার-প্রতিষ্ঠায় গীতা বিষয়সংস্পর্শ ত্যাগের অপেক্ষা বিষয়াসক্তি ত্যাগের উপরই অধিকতর জোর দিয়েছেন। তবে এই কথার এরূপ অর্থ নয় যে গীতা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বিষয়ের সংস্পর্শে এসে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

গীতার মতে সংসার হচ্ছে কর্ম্মক্ষেত্র। স্বধর্ম্ম পালনের পথে যে যে কর্ম্ম অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং যদ্দ্বারা নিজের ও সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হবার সম্ভাবনা—সেই সেই কর্ম্ম পরম ধৈর্য্য সহকারে ও অনাসক্ত ভাবে আচরণ করাই ধর্ম্ম এবং তার পরিহারই অন্যায়—অধর্ম্ম। তবে গীতোপদিষ্ট এই স্বধর্ম্মাচরণের পথ একান্ত সরল ও সহজ নয়। এ পথেও বিষয়-সংস্পর্শজনিত বিবিধ সুখ-দুঃখের অনুভূতি ও উত্থান-পতন এবং জয়-পরাজয়জনিত মানসিক উদ্বেগ অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। এক্ষেত্রে গীতার উপদেশ—"তান্ তিতিক্ষস্ব ভারত"—তা ধৈর্য্য সহকারে সহ্য কর বা এই

অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে মনের সাম্য বা সমত্বের ভাব রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা কর। কর্ম্মযোগী সাধকের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা এবং এই সাধনার চরম সিদ্ধিতে অমৃতত্ব বা পরমা শান্তি। এই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় উন্নীত হতে পারলে, আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হতে হয় না। কেন না, সাধকের মন তখন হয় বাসনাবর্জ্জিত, শান্তি ও অচঞ্চল। এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে সংসারের শত প্রকার কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যেও চিত্তের স্থিরতা ও প্রশান্তি আর বিনষ্ট হয় না। মানব জীবনের ইহাই চরম কাম্য। গীতাধর্ম্মের মতে ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি, মোক্ষ, মুক্তি—ইহাই অমৃতত্ব।

অর্জ্জুনের জ্ঞানাভিমান ও ভ্রান্তি নিরসনের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ তাঁকে নানা ভাবে উপদেশ দিচ্ছেন। এক্ষণে তিনি বলছেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬

অন্বয়—অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে; সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে, তত্ত্বদর্শিভিঃ, তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ॥ ১৬

অনুবাদ—যে বস্তু অনিত্য, তার অস্তিত্ব থাকে না, যে বস্তু নিত্য তার নাশ হয় না, তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপে উভয়ের পরিণাম দর্শন করেছেন॥ ১৬

সৎ ও অসতের প্রকৃতি

এই সংসারে দুপ্রকার বস্তু আছে—সৎ ও অসৎ। সৎ বস্তু নিত্য, অবিনাশী ও সনাতন—কোনও কালে কোনও অবস্থায় তার পরিবর্ত্তন বা নাশ সম্ভব নয়। আর যা অসৎ বস্তু—তা নশ্বর এবং পরিবর্ত্তন ও বিনাশশীল। শত ভাবে শত চেষ্টা করলেও তাকে রক্ষা করা অসম্ভব। যার স্বভাবই এরূপ নশ্বর ও অনিত্য তা বিনষ্ট হবেই। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই বিষয়টি ভাল মত জানেন; তাই তাঁরা অসৎ বস্তুর নাশে আদৌ ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হন না।

হে সখে, জীবদেহ যখন পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন, তখন তা কালের গতিতে একদিন পুনরায় সেই পঞ্চভূতে মিশে যাবেই। তুমি যদি তোমার আত্মীয়-পরিজনের দেহে আঘাত নাও কর তাহলেও প্রাকৃতিক

নিয়মে একদিন তাদের মৃত্যু ঘটবেই। নিয়তির এই বিধান অলঙ্ঘ্য। তবে তাদের দেহে দেহীরূপে যে আত্মা বিরাজমান—তা কোনদিন বিনষ্ট হবার নয়। সুতরাং, এই নশ্বর ও বিনাশশীল বস্তুর জন্য তুমি কেন এত চিন্তিত ও শোকাকুল হচ্ছ?

অদ্বৈত বেদান্ত মতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বা সত্য বস্তু এবং জাগতিক অন্য সব কিছু স্বপ্নবৎ অলীক ও মিথ্যা। অর্থাৎ, এদের ব্যবহারিক সত্যতা থাকলেও পারমার্থিক সত্যতা নাই। গীতাকারও বলেন—"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্"—এই অনিত্য ও অসুখকর সংসারে এসে তুমি আমার ভজনা কর। কেন না, পুরুষোত্তমরূপী আমিই একমাত্র সত্য বস্তু। শুধু হিন্দুশাস্ত্র নয়; জগতের কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা বিজ্ঞান জাগতিক বস্তুকে সত্য ও চিরন্তন বলে স্বীকার করে নি। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে Spirit and matter —এই দুটি অন্তিম তত্ত্ব; এদের প্রথমটি অবিনশ্বর ও শাশ্বত এবং পরবর্ত্তীটি নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল। এমন কি যারা জড়বাদী নাস্তিক সেই চার্ব্বাক-পন্থীরাও তাদের ভোগবাদের সমর্থনের জন্য বলেছেন—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" সুতরাং, যে দিক দিয়েই বিচার করা হোক—দেহকে শাশ্বত মনে করে তার প্রতি আসক্ত হওয়া বা তার নাশের ভয়ে ক্ষুণ্ণ ও বিচলিত হওয়া একান্ত অযৌক্তিক।

এক্ষণে, সৎ ও অসতের স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ আবার বললেন—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭

অন্বয়—যেন ইদং সর্ব্বং ততং তৎ তু এব অবিনাশি বিদ্ধি, কশ্চিৎ অস্য অব্যয়স্য বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি॥ ১৭

অনুবাদ—যিনি এই সমস্ত (জগৎকে) পরিব্যাপ্ত করে আছেন, তিনি অবিনাশী; কেউ এই অব্যয় (সত্তার) বিনাশ সাধনে সমর্থ নয়॥ ১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮

অন্বয়—নিত্যস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ উক্তাঃ, তস্মাৎ ভারত! যুধ্যস্ব॥ ১৮

অনুবাদ—নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয় শরীরীর এই সমস্ত দেহ বিনাশশীল—তত্ত্বদর্শিগণ ইহাই বলেছেন। অতএব হে ভারত, তুমি যুদ্ধ কর॥ ১৮

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

অন্বয়—যঃ এনং হন্তারং বেত্তি, যঃ চ এনং হতং মন্যতে, তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ ; অয়ং ন হন্তি, ন হন্যতে॥ ১৯

অনুবাদ—যিনি ইহাকে (অবিনাশী সত্তাকে) হন্তা মনে করেন, আর যিনি ইহাকে হত মনে করেন, তাঁহারা উভয়ে জানেন না যে ইনি হত্যাও করেন না, হতও হন না॥ ১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০

অন্বয়—অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে, ন বা ম্রিয়তে, ভূত্বা বা ভূয়ঃ অভবিতা ইতি ন, অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ পুরাণঃ অয়ং (আত্মা) শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে॥ ২০

অনুবাদ—ইনি (আত্মা) কখনও জন্মগ্রহণ করেন না, মরেনও না ; জন্মেছেন অথবা ভবিষ্যতে আর জন্মাবেন না—এমন নয় ; তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ ; শরীর বিনষ্ট হলেও ইঁহার বিনাশ নাই॥ ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

অন্বয়—পার্থ! যঃ পুরুষঃ এনম্ অবিনাশিনং নিত্যম্ অজম্ অব্যয়ং বেদ, সঃ কথং কং ঘাতয়তি বা কং হন্তি॥ ২১

অনুবাদ—হে পার্থ! যিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত, অব্যয় বলে জানেন, সে পুরুষ কাকে কীরূপে বধ করান বা করেন॥ ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২

অন্বয়—যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি গৃহ্নাতি, তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি সংযাতি॥ ২২

অনুবাদ—যেমন মানুষ জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী (আত্মা) জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ ক'রে নূতন দেহ ধারণ করে থাকেন॥ ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩

অন্বয়—শস্ত্রাণি এনং ন ছিন্দন্তি, পাবকঃ এনং ন দহতি। আপঃ এনং ন ক্লেদয়ন্তি, মারুতঃ ন শোষয়তি॥ ২৩

অনুবাদ—শস্ত্রসমূহ ইঁহাকে (আত্মাকে) ছেদন করতে পারে না, অগ্নি ইঁহাকে দগ্ধ করতে পারে না, জল ইঁহাকে আর্দ্র করতে পারে না এবং বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করতে পারে না॥ ২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪

অন্বয়—অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্যঃ অক্লেদ্যঃ, অশোষ্যঃ এব চ। অয়ং নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ অচলঃ সনাতনঃ॥ ২৪

অনুবাদ—এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্ব্বত্রব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি॥ ২৪

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫

অন্বয়—অয়ম্ অব্যক্তঃ অয়ম্ অচিন্ত্যঃ অয়ম্ অবিকার্য্যঃ উচ্যতে, তস্মাৎ এনম্ এবং বিদিত্বা অনুশোচিতুং ন অর্হসি॥ ২৫

অনুবাদ—ইনি (আত্মা) অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী বলে কথিত, অতএব তুমি ইহার এই স্বরূপ জেনে আর শোক করতে পার না॥ ২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬

অন্বয়—অথ চ এনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মৃতং মন্যসে তথাপি মহাবাহো ত্বম্ এনং শোচিতুং ন অর্হসি॥ ২৬

অনুবাদ—আর যদি (আত্মা) নিত্য জন্মেন ও নিত্য মরেন—মনে কর; তথাপি হে মহাবাহো! তোমার শোক করা উচিত নয়॥ ২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭

অন্বয়—হি জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ, মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্, তস্মাৎ অপরিহার্য্যে অর্থে ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি॥ ২৭

অনুবাদ—যেহেতু জাত ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম নিশ্চিত, সুতরাং, সেই অপরিহার্য্য বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়॥ ২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮

অন্বয়—ভারত! ভূতানি অব্যক্তাদীনি, ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্ত-নিধনানি এব, তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮

অনুবাদ—হে ভারত, ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত, মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত আবার বিনাশেও অব্যক্ত; অতএব তজ্জন্য কিসের শোক?॥ ২৮

গীতামৃত—হে সখে, আমাদের সমক্ষে এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ তা দু'দিনের ভোজবাজি—এই আছে, এই নাই। যে আত্মীয়-পরিজনের ভবিষ্যৎ

চিন্তায় তুমি এতখানি দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হচ্ছ, তাদের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ-সম্পর্ক ক'দিনের? তুমি কি বলতে পার—তাদের এই জন্মের পূর্ব্বে তারা কোথায় ছিল এবং মৃত্যুর পরেও বা তারা কোথায় থাকবে? নিশ্চয়ই তোমার সে জ্ঞান নাই। জীবের জন্মের পূর্ব্বের এবং মৃত্যুর পরের গতি—একান্তই অব্যক্ত ও অদৃশ্য! কোন্ অদৃশ্য ও অপরিচিত লোক হতে তারা এই জগতে আবির্ভূত হয় এবং কর্ম্মশেষে মৃত্যুর পরে আবার তারা কোন্ অজানা স্থানে চলে যায়! তাই মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ-সম্পর্ক মাত্র নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। আমাদের পারস্পরিক কল্যাণের জন্য এই সাময়িক অবস্থার সদ্ব্যবহার করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। পরন্তু, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যে, আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে আমাদের এই সম্পর্ক আদৌ চিরস্থায়ী নয়। এখানে এই স্বল্পকালের পারস্পরিক ব্যবহার ও সেবা-পরিচর্য্যার দ্বারা আমরা পরস্পরের কল্যাণ সাধনে মনোযোগী হব। কিন্তু, আমাদের প্রতিনিয়ত স্মরণ রাখতে হবে, কাল পূর্ণ হলে যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদিগকে এই সংসারবন্ধন ছিন্ন করে বিদায় নিয়ে পরলোকের যাত্রী হতে হবে। ব্যাপারটি কটু, কঠোর ও দুঃখপ্রদ সন্দেহ নাই। পরন্তু, এই কঠোর অথচ বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হওয়ার সাহস, ধৈর্য্য ও মনোবল আমাদের অবশ্যই সঞ্চয় করতে হবে। জনকাদি ব্যক্তিরা এই জ্ঞান নিয়ে সংসার করেছিলেন। এই তো সেদিনও নবদ্বীপধামে শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীবাস মৃত পুত্রকে গৃহমধ্যে বস্ত্রাবৃত করে রেখে বহিরঙ্গনে সতীর্থগণের সঙ্গে প্রেমানন্দে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে বিভোর হলেন। পল্লীঅঞ্চলে বাল্যে আমরাও একদা লক্ষ্য করেছি—জনৈক সাধক গৃহীর দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রের মৃত্যু হলে পরিবারের অন্য সকলে যখন বিলাপরত, তখন তিনি শান্তভাবে নির্দ্দেশ দিলেন—যাঁর দান তিনি গ্রহণ করেছেন। এজন্য আর বৃথা শোক বিলাপ করা কেন? তোমরা সকলে তার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা কর ও সত্বর তার সৎকারের ব্যবস্থা কর।

এই গৃহী ব্যক্তিটি খুব উচ্চ শিক্ষিত বা শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না। গুরুর নির্দ্দেশিত পথে নিয়মিত সাধন-ভজনের দ্বারা তিনি ঐ দিব্যজ্ঞান ও মনোবল লাভ করেছিলেন।

আসুন, আমরাও এই ভগবদ্বাণী স্মরণ করে এই অসার সংসারে সেই পরম তত্ত্বের আহরণে ব্রতী হয়ে চরম জ্ঞান ও শান্তির অধিকারী হই। ঐ

শুনুন, আত্মবিস্মৃতির এই দুর্দ্দিনেও আবার নবযুগের আচার্য্য তাঁর মোহগ্রস্ত সন্তান-সন্ততিগণকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবার জন্য কম্বুকণ্ঠে আত্মস্মৃতির মহামন্ত্র উদ্‌ঘোষণ করে বলছেন—

"যে বিভ্রম-বিস্মৃতি এতকাল পর্য্যন্ত অসত্যে সত্যবোধ আনিয়া, অবস্তুতে বস্তুবোধ দিয়া, অনিত্যে নিত্যবোধ জাগাইয়া আমার অনন্ত শক্তিসামর্থ্য ও বিপুল বিক্রম পরাক্রমকে দমন করিয়া আমাকে পাপ, তাপ ও মায়া-মোহের পথে প্রবর্ত্তিত করিত; এই মহাব্রত দ্বারা হৃদয়ে আত্মস্মৃতি জাগাইয়া, চির জনমের মত এই বিভ্রম-বিস্মৃতিকে নষ্ট করিয়া সেই পরম পুরুষের সহিত আপনাকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিবার জন্য এই মহামুক্তি ও শাশ্বত কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত হইলাম।"

আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গহন ও দুর্ব্বোধ্য

আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এতক্ষণ অনেক কথাই আলোচিত হল। পরন্তু, এই তত্ত্ব এত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য যে শ্রীভগবান্ এতখানি বিস্তৃত আলোচনার পরেও এই বিষয়ের দুর্জ্ঞেয়তার সম্বন্ধে পুনরায় বলছেন—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯

অন্বয়—কশ্চিৎ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, তথৈব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি, অন্য চ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি, কশ্চিৎ শ্রুত্বা চ অপি এব এনং ন বেদ॥ ২৯

অনুবাদ—কেহ ইহাঁকে (আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎ দেখেন; আবার অন্য কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বর্ণনা করেন, অন্য কেহ ইহাঁকে আশ্চর্য্য ভাবে শ্রবণ করেন, আর কেহ শ্রবণ করেও আত্মাকে জ্ঞাত হতে পারেন না॥ ২৯

গীতামৃত—আজকাল এই অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার যুগে অনেকেই তো আত্মা-পরমাত্মা সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে চান না। পরন্তু, প্রাচীন কালে এই আত্মতত্ত্বই ছিল আর্য্য সন্তান-সন্ততির নিত্যকার আলাপ-

আলোচনার ও চর্চ্চানুশীলনের বস্তু। উপনিষদে ঋষি বলেছেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥

সেখানে সূর্য্য-চন্দ্র-তারকা প্রকাশিত হয় না। বিদ্যুতের প্রকাশও সেখানে নাই, অগ্নির প্রকাশের তো কথাই উঠে না।

অন্যত্র উপনিষদ বলছেন—"ন সৎ ন চাসৎ স শিবঃ।" তিনি সৎও নন, অসৎও নন, তিনি কেবল শিবস্বরূপ। অন্যত্র বলা হয়েছে—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"। আত্মা অণু হতেও অণু, মহৎ হতেও মহৎ।

উপরোক্ত উক্তিসমূহ হতে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়—আত্মতত্ত্ব কত দুর্ব্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় ও জটিল। এজন্য শ্রুতিতে আরো বলা হয়েছে—"যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। যেখান হতে বাক্য ব্যর্থকাম হয়ে মনের সঙ্গে ফিরে আসে। অর্থাৎ, তা অবাঙ্‌মনসগোচর।

তবে কি আত্মা কদাপি উপলব্ধিগম্য নন? তবে কি তিনি চিরকাল রহস্যাবৃত ছিলেন, আছেন ও থাকবেন? অবশ্যই নয়। দুর্ব্বোধ্য হলেও আত্মাকে জানা যায় এবং তাঁকে জানাই হচ্ছে মনুষ্যজীবনের চরম ও একমাত্র লক্ষ্য। উপনিষদ্ এজন্যই বিশেষ নির্দ্দেশ দিয়ে বলেছেন—"আত্মানাং বিদ্ধি—যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"—আত্মাকে জান; যাঁকে জানলে সব কিছু জানা যায়।

বস্তুতঃ, এই আত্মজ্ঞান দানের জন্যই গীতায় এতক্ষণ এই আত্মার স্বরূপতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে এরূপ চর্চ্চার দ্বারা অর্জ্জুন আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যা জানলেন—তা পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র। এ বিষয়ের অপরোক্ষ জ্ঞান এভাবে লাভ করা যায় না। উপনিষদ্ তাও পরিষ্কাররূপে বলেছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" আত্মাকে আলাপ-আলোচনা, মেধা-প্রতিভা বা বিস্তর শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না। তবে কি আত্মতত্ত্ব বিষয়ের চর্চ্চা, অধ্যয়ন ও শ্রবণের প্রয়োজন নাই?—অবশ্যই আছে।

এ বিষয়ে শ্রুতি বলেছেন, "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ"। আত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রথম প্রয়োজন—শ্রবণ, তারপর প্রয়োজন—শ্রুত বিষয়ের উপর পুনঃ পুনঃ মনন ও নিদিধ্যাসন।

আত্মিক বিষয়ে চর্চ্চা ও শ্রবণের দ্বারা আমরা এতক্ষণ যে আভাস বা পরোক্ষজ্ঞান লাভ করলাম—আসুন, এক্ষণে আমরা তার উপর গভীর ভাবে মনন ও ধ্যান করি।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০

অন্বয়—ভারত! সর্ব্বস্য দেহে অয়ং দেহী নিত্যম্ অবধ্যঃ, তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি শোচিতুং ন অর্হসি॥ ৩০

অনুবাদ—হে ভারত! সকল দেহেই এই দেহী (আত্মা) নিত্য অবধ্য; অতএব কোন প্রাণীর জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়॥ ৩০

গীতামৃত—আত্মতত্ত্বে প্রত্যক্ষ বা সম্যক্ অনুভব-জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন—আত্মকৃপা ও গুরুকৃপার সমন্বিত সাধনা। অর্জ্জুনের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত এই দুইটি বস্তুরই ঐকান্তিক অভাব। আত্মকৃপারূপী যে পুরুষকারের প্রবৃত্তি, তা তিনি ইতঃপূর্ব্বে হারিয়ে ফেলেছেন। পক্ষান্তরে, প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণকে বাহ্যতঃ গুরুরূপে স্বীকার করলেও এখনও তাঁর প্রতি তাঁর হৃদয়ে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাসের উদ্রেক হয় নি। এমতাবস্থায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রথমে আত্মার স্বরূপবিষয়ক সামান্য আভাস দানের পরে পুনরায় লৌকিক স্তরে অবতরণ করে তাঁকে স্বধর্ম্মপালনের গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১

অন্বয়—স্বধর্ম্মম্ অপি চ অবেক্ষ্য বিকম্পিতুং ন অর্হসি, হি ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে॥ ৩১

অনুবাদ—স্বধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেও তোমার কম্পিত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। কেন না, ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের অধিক শ্রেয়োজনক আর কিছুই নাই॥ ৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২

অন্বয়—পার্থ! যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম্ অপাবৃতং স্বর্গদ্বারম্ ঈদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে॥ ৩২

অনুবাদ—হে পার্থ, অযাচিত ভাবে উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই প্রাপ্ত হন॥ ৩২

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩

অন্বয়—অথ চেৎ ত্বম্ ইমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি, ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপম্ অবাপ্স্যসি॥ ৩৩

অনুবাদ—কিন্তু যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিহারের জন্য তুমি পাপভাগী হবে॥ ৩৩

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪

অন্বয়—অপি চ ভূতানি তে অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিং কথয়িষ্যন্তি; সম্ভাবিতস্য অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ চ অতিরিচ্যতে॥ ৩৪

অনুবাদ—সকলেই চিরকাল তোমার অকীর্ত্তি ঘোষণা করবে। গুণবান্ পুরুষের পক্ষে অকীর্ত্তি মরণাপেক্ষাও অধিকতর গ্লানিকর॥ ৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫

অন্বয়—মহারথাঃ চ ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং মংস্যন্তে; ত্বং যেষাং বহুমতঃ ভূত্বা লাঘবং যাস্যসি॥ ৩৫

অনুবাদ—মহারথগণ তোমাকে ভয়ে যুদ্ধ হতে পরাঙ্মুখ মনে করবেন। যাদের কাছে তুমি সম্মানিত—তারা তোমাকে লঘুজ্ঞান করবে॥ ৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬

অন্বয়—তব অহিতাঃ চ তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তি; ততঃ দুঃখতরং কিং নু?॥ ৩৬

অনুবাদ—তোমার শত্রুরাও তোমার শক্তির নিন্দা ক'রে অনেক অকথ্য কথা বলবে ; তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখকর আর কি আছে?॥ ৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭

অন্বয়—কৌন্তেয়! হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি, জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে, তস্মাৎ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ উত্তিষ্ঠ॥ ৩৭

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়। যদি (এই যুদ্ধে) হত হও, স্বর্গে যাবে, যদি বিজয়ী হও, তবে পৃথিবী ভোগ করবে ; অতএব যুদ্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে উত্থিত হও॥ ৩৭

স্বধর্ম্ম-পালনের অনিবার্য্যতা

প্রাচীন কাল হতে ভারতীয় ক্ষত্রিয়-সমাজের বিশেষ দায়িত্ব ছিল ধর্ম্ম, দেশ, জাতিকে ভিতরের ও বাইরের আঘাত আক্রমণ হতে রক্ষা করা। 'ক্ষত্রিয়' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাই—ক্ষত বা আঘাত হতে যিনি রক্ষা বা ত্রাণ করেন তিনি ক্ষত্রিয়।

অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব। ধর্ম্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করাই তাঁর কৌলিক বৃত্তি এবং এই স্বধর্ম্ম-পালনের উপরেই তার আত্মিক, সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণ নির্ভরশীল। এই দিক দিয়ে ধর্ম্মযুদ্ধই তাঁর জীবনব্রত এবং তার লঙ্ঘনই তাঁর পক্ষে অমার্জ্জনীয় প্রত্যবায় বা অপরাধ। আত্মবিস্মৃতির মোহে সাময়িক ভাবে অর্জ্জুন তাঁর সেই সুমহান্ দায়িত্ব বিস্মৃত। তাঁর সদ্গুরু তাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—হে সখে, ভুললে চলবে কেন—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগের ন্যায় মহত্তর বস্তু আর কিছুই নাই। তোমার জন্মান্তরীণ সুকৃতি বশে সেই ধর্ম্ম-সংগ্রামের সুযোগ আপনা হতেই তোমার সমক্ষে উপস্থিত। তোমার জানা উচিত—বিধাতৃবিহিত এরূপ ধর্ম্মযুদ্ধের পরিণাম—জয়ই হোক আর পরাজয়ই হোক—উভয়ই সমান-ফলপ্রদ। এই যুদ্ধে জয়ী হলে অতুল রাজ্য সম্পদ হবে তোমার করায়ত্ত এবং এতে পরাজিত হয়ে যদি তোমার মৃত্যুও ঘটে, তাতেও কোন ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কেন না, সে অবস্থায় তোমার

পারলৌকিক সুখ ও কল্যাণ সুনিশ্চিত। সুতরাং, যে দিক দিয়েই বিচার কর না কেন, এতে তোমার ভীত বা কম্পিত হবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। পরন্তু, মোহ ও জিদের বশে তুমি যদি এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হও, তবে স্বধর্ম্মচ্যুতির নিমিত্ত তুমি যে শুধু পাপভাগী হবে—তাই নয়, এর ফলে তোমার এত কালের অর্জ্জিত অতুল যশঃমান-প্রতিষ্ঠা সবই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কর্ণাদি যে সব মহারথিবৃন্দ এতদিন তোমাকে তোমার অসামান্য বীরত্ব ও সমরনৈপুণ্যের জন্য ঈর্ষ্যা, ভয় ও সমীহার দৃষ্টিতে দেখত, তারাও তখন সুযোগ বুঝে তোমাকে উপহাস ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে সাহসী হবে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ উপহাস-বিদ্রূপ, অখ্যাতি-অকীর্ত্তি মৃত্যুর চেয়েও গ্লানিকর নয় কি? তুমি যদি শক্তি-সামর্থ্যহীন ভীরু দুর্ব্বল হতে, তবে ভিন্ন কথা হত। কিন্তু, তুমি যে বিশ্ববিশ্রুত বীর, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিহত ধুরন্ধর যোদ্ধা বলে প্রখ্যাত। তুমি এরূপ অপমান ও গ্লানি কেন সহ্য করবে? আর তুমি এভাবে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হলে শুধু যে তোমার ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতি ও অমর্য্যাদা ঘটবে তাই নয়। এর ফলে সমগ্র সমাজ, রাষ্ট্র ও সনাতন ধর্ম্মের যে কি ভীষণ পরিণাম বা ক্ষয় ক্ষতি হবে—তাও তুমি চিন্তা করে দেখ।

সুতরাং, কালবিলম্ব না করে যুদ্ধের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে তুমি উত্থিত হও।

মানসিক সাম্যরক্ষার উপায়

অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম-পালনের গুরুদায়িত্ব বোঝান হল। পরন্তু, অর্জ্জুন পাছে মনে ভাবেন—স্বধর্ম্ম পালন তো আমার নিকট নতুন কথা নয়। এই ব্রত তো আমি এতকাল পালন করেই এসেছি। তবু তো তাতে আমার মন আশ্বস্ত ও প্রবুদ্ধ হয় নি? এত চেষ্টা করেও তো আমি আমার মানসিক প্রশান্তি রক্ষা করতে অক্ষম। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

সখার মনের এই প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের সমাধানের জন্যই শ্রীভগবান্ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে তখন বললেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮

অন্বয়—সুখ-দুঃখে সমে লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ চ (সমৌ) কৃত্বা ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব, এবং পাপং ন অবাপ্স্যসি॥ ৩৮

অনুবাদ—সুখ-দুঃখ, লাভালাভ ও জয়-পরাজয় সমান মনে করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহলে তুমি পাপভাগী হবে না॥ ৩৮

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ৩৯

অন্বয়—পার্থ! সাংখ্যে এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা। যোগে তু ইমাং শৃণু, যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥ ৩৯

অনুবাদ—হে পার্থ! এতক্ষণ তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় তোমাকে বলা হল; (এখন) বুদ্ধিযোগের রহস্য অবগত হও, যে জ্ঞান তোমার কর্ম্মবন্ধন ছেদন করতে পারবে॥ ৩৯

গীতামৃত—হে পার্থ, তুমি এতকাল যেরূপ মনোভাব নিয়ে তোমার ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করেছ তার পশ্চাতে ছিল সত্যকার জ্ঞান ও বিবেকের অভাব। স্বধর্ম্ম-পালনের যে শাস্ত্রীয় নীতি ও কৌশল—তা ছিল এত দিন তোমার অবিদিত। তাই তুমি সারা জীবন নিজের মতলব মত স্বধর্ম্ম পালন করে শান্তিলাভ করতে পার নি। তোমার এক্ষণে জানা আবশ্যক—শুধু মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা করলেই কাজ হয় না; কাজ করার নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিটিও জানা চাই। তা না হলে শুধু যে পণ্ডশ্রম হয়—তাই নয়, তার দ্বারা বর্দ্ধিত হয় মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তি। এত কাল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়েও তুমি যে উদ্বেগ, অশান্তি ও নৈরাশ্যমুক্ত হতে পার নি—তার কারণও ইহাই। সুতরাং, এখন মনোযোগ দিয়ে শোন—এতক্ষণ আমি তোমাকে সাংখ্যযোগের আলোচনা প্রসঙ্গে আত্মতত্ত্বের উপদেশ করেছি। এখন তোমাকে বুদ্ধিযোগের রহস্য বিষয়ে যা বলছি তা ভাল ভাবে বুঝতে চেষ্টা কর। এই রহস্য অবগত হলে সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় তোমার নিকট সমান বলে মনে হবে এবং সেই সমত্ব-দৃষ্টি নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে তোমাকে কোন প্রকার পাপ-তাপ স্পর্শ করবে না।

সাধারণ স্তরের অজ্ঞান মানুষ যখন কর্ম্ম করে তখন তার মধ্যে থাকে কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ও ফলাসক্তি। প্রত্যেকটি কাজ করার সময়ে সে মনে করে—

আমি এই কাজটি করছি এবং তার দ্বারা আমার এরূপ ফল লাভ হবে। এইরূপ অহংবুদ্ধি ও ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করার পরে কৃত কাজটির ফল যদি আশানুরূপ হয়, তবে তার হর্ষের সীমা থাকে না। পক্ষান্তরে, কাজটির পরিণাম যদি প্রতিকূল হয় এবং তার দ্বারা আশাভঙ্গ হয় তবে অশেষ দুঃখ ও নৈরাশ্যের উৎপত্তি হয়। অর্জ্জুনের মনে এখনও এরূপ অহংবুদ্ধি ও ফলাসক্তি বিদ্যমান। তাই তিনি পূর্ব্ব হতেই যুদ্ধের ফলাফল চিন্তা করে এতখানি উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কগ্রস্ত। তাঁর এই মানসিক অশান্তি উদ্বেগের প্রতিকারের জন্য সদ্‌গুরুরূপী শ্রীভগবান্ তাঁকে তাই বলছেন—"পার্থ, যে কোন কর্ম্মের ফল—হয় ভাল হবে, না হয় মন্দ এবং কর্ম্মীর মন যদি শান্ত, সংযত ও নিষ্কাম না হয়, তবে তার কর্ম্মের ফল আশানুরূপ ভাল ও প্রীতিকর হলে সাফল্যজনিত অত্যানন্দে তার মন হবে উল্লসিত ও বিচলিত; আর ফলটি বিপরীত হলে তো কথাই নাই। এরূপ অবস্থায় সে হবে একান্ত মুহ্যমান ও হতাশ। এই হর্ষ ও অমর্ষ—দুটি অবস্থাই চিত্তচাঞ্চল্যকর ও উদ্বেগজনক। তাই তোমাকে বলছি, তুমি যদি সত্যকার শান্তি চাও তবে তুমি কর্ম্মফলে অনাসক্ত হয়ে স্বধর্ম্ম পালন করতে শিখ। এই ভাবে কর্ম্ম করতে অভ্যস্ত হলে কর্ম্মফল ভাল হোক বা মন্দ হোক, অনুকূল হোক বা প্রতিকূল হোক, তা তোমাকে আদৌ বিচলিত করতে পারবে না।

কর্ম্মযোগের সূচনা

জ্ঞান-ভক্তিমিশ্র যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, এক্ষণে তারই বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্বের সূচনা দিয়ে শ্রীভগবান্ বললেন,—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০

অন্বয়—ইহ অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে; অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পম্ অপি মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে॥ ৪০

অনুবাদ—এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ কখনও ব্যর্থ হয় না এবং এতে কোন প্রত্যবায় বা অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। বরং এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগরূপ ধর্ম্মের স্বল্প আচরণও সাধককে মহাভয় হতে পরিত্রাণ করে॥ ৪০

গীতামৃত—হে সখে! কর্ম্মযোগের মহত্ত্ব-গৌরব অপরিসীম। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি ত্যাগ করে যখন কোন কর্ম্ম করা হয়, তখন তা কখনও নিষ্ফল হবার নয়। এরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতে যদি সামান্য ভুল-ত্রুটি হয় তবে তাতে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কেন না, গীতোক্ত কর্ম্মযোগের যদি স্বল্পমাত্রও অনুষ্ঠান করা যায় তবে তা জন্মমৃত্যুজনিত নিদারুণ সংসার-ভয় হতে পরিত্রাণ করে। অর্থাৎ, এই ধর্ম্মের যতটুকু অনুষ্ঠান করা যায় ততটুকুই অশেষ ফলপ্রদ। কারণ, কর্ম্মযোগের মূলে রয়েছে স্বার্থত্যাগ, ফলাসক্তির পরিহার ও ভগবৎপ্রীতির সঙ্কল্প। এই কর্ম্মযোগের দ্বারা তাই একদিকে যেমন সাধকের হৃদয়-মন দ্রুত শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়, অন্যদিকে সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগমূলক সেবার দ্বারা সমাজের অশেষ হিত সাধিত হয়। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ফল তাই কোন দিক দিয়েই ব্যর্থ বা নিষ্ফল হবার নয়।

সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মীর বিচারভেদ

অতঃপর সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মীর বিচারভেদের বর্ণনা করে শ্রীভগবান্ বললেন—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ৪১

অন্বয়—কুরুনন্দন! ইহ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ একা। অব্যবসায়িনাং বুদ্ধয়ঃ বহুশাখাঃ অনন্তাঃ চ॥ ৪১

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন! এই (কর্ম্মযোগের) নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একই; পরন্তু ফলকামী অস্থিরচিত্তদের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনন্ত॥ ৪১

গীতামৃত—'ব্যবসায়' শব্দটি এখানে দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত। এই অর্থে 'ব্যবসায়' মানে কার্য্যাকার্য্য-নির্ণয় এবং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অর্থ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। অর্থাৎ, সেই বুদ্ধি দ্বারা সত্যাসত্য বা ন্যায়ান্যায়ের নির্ণয় করা হয়। বুদ্ধির কার্য্যও সাধারণতঃ এইরূপ।

প্রসঙ্গতঃ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্য্যের পার্থক্য কি—সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, এই পাঁচটি হচ্ছে

ইন্দ্রিভোগ্য বিষয়। এদের প্রতি চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পারস্পরিক আকর্ষণ অতি স্বাভাবিক। কারণ, এদের পরস্পরের মধ্যে রচনাত্মক মৌলিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃততর আলোচনা করা যাবে। এখানে মাত্র এইটুকু জানা প্রয়োজন —উক্ত রূপরসাদি ভোগ্যবিষয়গুলি স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয়গণের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র ইন্দ্রিয়গণ তাদিগকে ভোগ করার জন্য অতিমাত্র চঞ্চল হয়ে ওঠে; যেমন সুন্দর রূপ দেখলেই চক্ষুঃ তৎপ্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। পরন্তু, ইন্দ্রিয়গণের রাজা হচ্ছে মন। রাজার সম্মতি ও সহযোগিতা ব্যতীত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের এই ভোগপ্রবৃত্তি কদাপি সার্থক হতে পারে না। চক্ষুঃ তাই রূপটি দেখেই মনের নিকট তার সংবাদ পৌঁছে দেয়। মনের আবার ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা নাই। রাজারা সাধারণতঃ মন্ত্রীর পরামর্শ মত কাজ করেন। মন তাই বিষয়বস্তুটি মুহূর্ত্ত মধ্যে তার মন্ত্রী বুদ্ধির নিকট পৌঁছে দেয়। বুদ্ধির তখন কাজ হয় বস্তুটি গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য তা বিচার করে মনকে নির্দ্দেশ বা সূচনা দেওয়া। বুদ্ধির নিকট হতে সূচনা পেয়েই মন তখন চক্ষুরূপী ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় বস্তুটি ভোগে উন্মত্ত হয়। এই কাজগুলি এত তড়িৎ গতিতে সম্পন্ন হয় যে আত্যন্তিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছাড়া এদের কার্য্যের পার্থক্যবোধটি ধরা যায় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও জানা আবশ্যক, বুদ্ধি সব সময় যে সদুপদেশ বা নির্ভুল সূচনা দেয়, তা নয়। কারণ, মানুষের বুদ্ধি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। এখানে বুদ্ধিকে স্থির ও একনিষ্ঠ এবং অস্থির ও বহুমুখী এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

শ্রীভগবান্ বলছেন—যারা নিষ্কাম কর্ম্মী তাদের ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি স্থির ও একনিষ্ঠ, আর যারা সকাম কর্ম্মী তাদের বুদ্ধি অব্যবসায়াত্মিকা বা বহুমুখী। স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিরা বিবেক-জ্ঞানসম্পন্ন। তাঁরা তাঁদের মোহমুক্তি নির্ম্মলবুদ্ধি দ্বারা সম্যক্রূপে উপলব্ধি করেন—ঈশ্বরই একমাত্র সৎ ও অদ্বিতীয় এবং এই রসস্বরূপ ও অনন্ত আনন্দ ও শান্তির উৎস ও আধার। তাই তাঁরা নশ্বর বিষয়বাসনা পরিহার করে রসস্বরূপ ভগবানে অনুরক্ত হয়ে তাঁতেই স্থির ও সমাহিত হন। পক্ষান্তরে, যারা ভোগী ও বিষয়াসক্ত তাদের মন নিরন্তর চঞ্চল ও নানা দিকে ধাবিত। কারণ, তাদের কাম্য ও ভোগ্য বিষয়গুলি এক নহে—বহু। এদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করে কবি বলেছেন—

"লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে ;
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
অকূল গরল-পাথারে।"

এরূপ বিচিত্র ও বহুমুখী বাসনা-কামনার পশ্চাতে যাদের মনোবুদ্ধি ধাবিত, তাদের দুর্গতি ও অশান্তির পার কোথায়?

নবযুগের আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীও এই কামনা-বাসনার বিষম পরিণাম সম্বন্ধে সাধক সন্তানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন—"মানুষের সব রকম বীর্য্য-বিক্রম-পরাক্রমের বিলোপ সাধন করে—একমাত্র বাসনা। সব রকম বাসনার নাশ যেখানে, প্রকৃত মুক্তি সেখানে। স্নেহ, মায়া, মমতা হতেই বাসনা কামনার অঙ্কুর উদ্গত হয় এবং তাহারই ফলে তিরোহিত হইয়া যায় সাধকের যাবতীয় বিবেক-বৈরাগ্য ও বীর্য্যবত্তা এবং তখন শত সহস্র রকমের কামনা বাসনা আসিয়া তার ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিয়া ফেলে।"

অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিসম্পন্ন সকাম যজ্ঞবাদীদের কঠোর সমালোচনা করে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে এক্ষণে বলছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।। ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি।। ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াঽপহৃতচেতসাম্।।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।। ৪৪

অন্বয়—হে পার্থ! ন অন্যৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি তয়া ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাম্ অপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।। ৪২।৪৩।৪৪

অনুবাদ—হে পার্থ, অবিবেকী ব্যক্তিগণ বেদের সকাম কর্ম্মের প্রশংসায় অনুরক্ত। তাদের ধারণা—বেদোক্ত স্বর্গাদিফলপ্রদ কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই করণীয় নাই। এরা ঘোর বিষয়ী ও স্বর্গকামী। জন্মকর্ম্মফল-প্রদ বিবিধ ভোগৈশ্বর্য্য লাভের উপায়স্বরূপ নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপের প্রশংসায় তারা শতমুখ। তাদের চিত্ত বেদবাদীদের আপাত মনোহর বাক্যে মুগ্ধ ও ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত। এরূপ সকামবাদীদের বুদ্ধি কদাপি স্থির ও একনিষ্ঠ হয় না। ৪২।৪৩।৪৪

গীতার শ্রীকৃষ্ণ কি বেদবিরোধী?

শ্রীভগবানের এই উক্তিগুলি আপাতদৃষ্টিতে বেদবিরোধী বলে মনে হয়। পরন্তু, এরূপ ধারণা অমূলক। কেন না, শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বেদমূর্ত্তি। বৈদিক সনাতন ধর্ম্মকে গ্লানিমুক্ত ও যুগোপযোগী বিশুদ্ধ স্বরূপদানের জন্যই তাঁর আবির্ভাব। এই গীতারই পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে তিনি বলেছেন—তিনি সকল বেদের বেদ্য। বিভূতিযোগে স্বীয় মহিমা বর্ণনার কালেও তিনি উক্তি করেছেন—"বেদানাং সামবেদোঽস্মি"—বেদসকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে সামবেদ তা আমি।" এমন কি এখানে যে যজ্ঞকর্ম্মের নিন্দা করা হয়েছে, পরবর্ত্তী তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে সেই যজ্ঞের সমর্থন করে বলছেন —যজ্ঞ ব্রহ্ম হতে উদ্ভূত, যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই কর্ম্ম করা বিধেয়। অন্যথা কর্ম্ম বন্ধনের সৃষ্টি করে। আরও বলা হয়েছে—যজ্ঞের প্রসাদভোজীরা সকল প্রকার পাপ হতে মুক্ত হয়ে অমৃতত্ব লাভ করে। এক কথায় গীতার দৃষ্টিতে সত্যকার অধ্যাত্ম সাধকের সমগ্র জীবনই যজ্ঞময়। তাঁর তপস্যা, দান, স্বাধ্যায়, প্রাণায়াম প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞের নামান্তর। গীতা ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রগ্রন্থে যজ্ঞের এরূপ ব্যাপক ও গভীর ব্যাখ্যা বিরল। এমতাবস্থায় গীতাকার শ্রীকৃষ্ণকে বেদবিরোধী মনে করা যায় কীরূপে? বস্তুতঃ, গীতাধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী যুগের শ্রীবুদ্ধ, মহাবীর স্বামীর ন্যায় বেদনিন্দক ও যজ্ঞবিরোধী ছিলেন না।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রাথমিক যুগে যজ্ঞধর্ম্ম ছিল বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গ। পরন্তু, তারপরে এক শ্রেণীর ভোগবাদী মীমাংসক পণ্ডিত ও পুরোহিতের আবির্ভাব হয়—যাদের মধ্যে যজ্ঞের সেই মহত্তম অর্থবোধের

অভাব ঘটে এবং তারা যজ্ঞের মাধ্যমে ঐহিক ও পারত্রিক ভোগবাদের প্রচার প্রতিষ্ঠায় কটিবদ্ধ হয়। ফলে, এদের দ্বারাই যজ্ঞধর্ম্ম কলুষিত ও অধোগত হয়। এরা অজ্ঞ জনসাধারণকে নানা প্রকার লোভনীয় মধুর বাক্যে বিমুগ্ধ ও প্রোৎসাহিত করে এরূপ ভোগমূলক যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করে। এদের দৃষ্টিতে যজ্ঞই ছিল পরম পুরুষার্থ এবং ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগসুখই ছিল জীবনের চরম কাম্য। গীতায় উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে সেই ভোগবাদী যাজ্ঞিকগণের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে অর্জ্জুনকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—যেন তিনি বেদের কদর্থকারী এই সকল মীমাংসকগণের বাক্য ও মতবাদে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত না হন। অর্থাৎ, তিনি যেন তাদের উপদিষ্ট সেই সকাম সাধনার স্তরে আবদ্ধ হয়ে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মহত্ত্ব-গৌরব বিস্মৃত না হন।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫

অন্বয়—অর্জ্জুন! বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ভব, নির্দ্বন্দ্বঃ, নিত্যসত্ত্বস্থঃ, নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান্ (ভব)॥ ৪৫

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, বেদসকল ত্রৈগুণ্যবিষয়ক, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য, দ্বন্দ্বাতীত, নিত্যসত্ত্বস্থ, যোগক্ষেমরহিত ও আত্মনিষ্ঠ হও॥ ৪৫

গীতামৃত—ইতঃপূর্ব্বে গীতাকার শ্রীভগবান্ সকাম বেদবাদীদের কীরূপ বিরূপ সমালোচনা করেছেন—তা আমরা লক্ষ্য করেছি। এক্ষণে শুধু বেদবাদী নয়, স্বয়ং বেদই তাঁর সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত। বলা হচ্ছে—বেদসমূহ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অধীন এবং ত্রিগুণাত্মক বিষয়বস্তু নিয়েই তাদের চর্চ্চালোচনা। আর ত্রিগুণ যখন বন্ধনের কারণ, তখন বেদাধ্যয়ন বা বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা কীরূপে মোক্ষলাভ সম্ভবপর? শ্রীভগবান্ স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে তাই এই শ্লোকে সাবধান করে বলেছেন হে সখে! তুমি যদি সত্য সত্যই মোক্ষার্থী হও, তবে ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বেদের অনুশীলন পরিহার করে গুণাতীত হও। কেন না, এরূপ গুণাতীত অবস্থা লাভ করলেই তুমি দ্বন্দ্বাতীত হয়ে সত্ত্বগুণে চির প্রতিষ্ঠিত, যোগক্ষেমরহিত ও আত্মনিষ্ঠ হতে সক্ষম হবে। মানব-জীবনের চিরবাঞ্ছিত অবস্থা ইহাই।

লক্ষ্য করার বিষয়—শ্রীভগবান্ এখানে 'নিস্ত্রৈগুণ্য' ও 'নিত্যসত্ত্বস্থ' একই সঙ্গে এই যে দুটি শব্দের প্রয়োগ করেছেন তা মূলতঃ পরস্পরবিরোধী। কেন না, মানুষের পক্ষে একই সঙ্গে ত্রি-গুণাতীত ও নিত্যসত্ত্বস্থ হয়ে অবস্থান করা কীরূপে সম্ভবপর? সত্ত্বগুণটিও তো ত্রিগুণের অন্তর্গত। তাছাড়া, সাংখ্যমতে কোন গুণই অবিমিশ্রিত নয়। সত্ত্বাদি প্রত্যেকটি গুণের মধ্যে অন্য দুটি গুণও সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান। সুতরাং, সম্পূর্ণরূপে অন্য গুণনিরপেক্ষ হয়ে 'নিত্যসত্ত্বস্থ' বা সত্ত্বগুণে নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় কীরূপে?

বিষয়টি একটু জটিল বটে, তবে এর সমাধান নিশ্চয় আছে ; তা না হলে শ্রীভগবানের মুখ হতে এইরূপ বাক্য নিঃসৃত হবে কেন? এক্ষণে আসুন, বিষয়টির স্পষ্টীকরণের জন্য আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। প্রথমতঃ মোক্ষলাভের জন্য সাধককে ক্রমিক সাধনার দ্বারা ত্রিগুণের পাশ অতিক্রম করে গুণাতীত স্থিতি লাভ করতে হবে এবং এই অবস্থা কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় স্তরেই লাভ করা সম্ভবপর। পরন্তু, এই গুণাতীত অবস্থা লাভের পরে সাধক যখন জীবন্মুক্তির অবস্থায় উন্নীত হন, তখন তাঁকে পুনরায় ব্যবহারিক স্তরে অবতীর্ণ হয়ে দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কীভাবে অবস্থান করতে হবে—ইহাই জিজ্ঞাস্য। শ্রীভগবানের নির্দ্দেশ হচ্ছে—এই কালে সেই সিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষ নিত্য সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" জীবোদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করবেন। গীতার মতে ত্রিগুণাতীত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের লৌকিক জীবনধারার ইহাই পরম ভাগবত বিধান।

এরূপ নিত্যসত্ত্বস্থ ব্যক্তিই নিরন্তর আত্মনিষ্ঠ বা আত্মচিন্তায় বিভোর। জগতের সুখাসুখ, লাভালাভ, জয়-পরাজয়, ভাল-মন্দরূপী দ্বন্দ্ব-সংঘাতে তিনি আর বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। শুধু ইহাই নয়—এইরূপ উচ্চতম আধ্যাত্মিক স্থিতিতে সাধকের অপ্রাপ্য বা চেষ্টাপূর্ব্বক রক্ষণীয় আর কিছু থাকে না। ভক্তবৎসল ভগবানই তখন তাঁর যাবতীয় জীবনভার গ্রহণ করেন। অনন্য ভক্তকে লক্ষ্য করে তাই তিনি অন্যত্র প্রত্যক্ষভাবে অভয় ও আশ্বাস দিয়ে বলেছেন—"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"—এইরূপ ভক্তগণের 'যোগক্ষেম' আমিই বহন করি। ভগবদ্ভক্তগণের জীবনেতিহাস অনুধ্যান করলে উপরোক্ত ভাগবত প্রতিশ্রুতির ভূরি ভূরি জ্বলন্ত প্রমাণ লাভ করা যায়।

বেদ ত্রিগুণাত্মক কেন?

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের মীমাংসা প্রয়োজন। গীতাকার শ্রীকৃষ্ণই এখানে বেদকে 'ত্রৈগুণ্যবিষয়ক' বলে উল্লেখ করলেন কেন? যে বেদ পরমাত্মার নিঃশ্বাসস্বরূপ ও নিখিল জ্ঞান ও প্রেরণার আধার ও উৎস, যে বেদের অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা মানুষ পরম জ্ঞান, চরম অভয় ও অক্ষয় শান্তির অধিকারী হয়—সেই বেদকে ভগবান্ এখানে 'ত্রিগুণাত্মক' অথবা বন্ধনের কারণ বলে অভিহিত করলেন কেন? ইহা কি বেদনিন্দা নয়? উত্তরে বলা যায় নিশ্চয় নয়।

বেদে আর্ষ সত্য নিহিত—সন্দেহ নাই। পরন্তু জানা আবশ্যক বেদে সকাম ও নিষ্কাম, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার জ্ঞানেরই সমাবেশ। বেদবর্ণিত এই সকাম ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যে ত্রৈগুণ্যবিষয়ক—সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তা ছাড়া, শুধু বেদাধ্যয়ন বা বৈদিক জ্ঞানের বাহ্য অনুশীলন দ্বারা যে মানুষ কদাপি মোক্ষ বা পরমা শান্তির অধিকারী হয় না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—প্রাচীন কালের বেদব্যাখ্যাতা মীমাংসক পণ্ডিতগণ—যাঁরা বেদ-শাস্ত্রের চর্চা ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেও ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসুখের প্রাপ্তিকেই চরম কাম্য বলে মনে করতেন। মধ্যযুগীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও তো অনুশাসন দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বেদপাঠ ও 'প্রণব' উচ্চারণে অধিকার নেই। তাঁদের গোঁড়ামি ও সংকীর্ণ মতবাদের প্রচারের ফলেই তো সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলে প্রচারিত হওয়ায় ভারতের বৈদেশিক প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। এঁদের প্রচারিত ভ্রান্তনীতির জন্যই তো অধুনা কোটি কোটি হিন্দু ধর্ম্মান্তরিত হয়ে পরধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে আজ ভারতরাষ্ট্রের সর্ব্বনাশা বিপদ সৃষ্টি করেছে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ বেদাদি শাস্ত্রের বহুল অনুশীলন করা সত্ত্বেও সবচেয়ে অধিক অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়তা ও গোঁড়ামির পরিপোষক। শিবাবতার স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য ঐ দেশে জন্মগ্রহণ করায় কৌলিক সংস্কারের বশে কাশীধামে চণ্ডালদর্শনে নিজেকে অপবিত্র মনে করে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত বংশে জন্মগ্রহণ করেও নবযুগের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মৎস্যজীবীবংশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে পূজারী নিযুক্ত হয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ মায়ের প্রসাদ গ্রহণে আপত্তি জানিয়েছিলেন। উপরোক্ত দৃষ্টান্তবলী হতে স্বতঃই প্রমাণিত

হয়—শুধু বেদাধ্যয়ন বা বেদের দোহাই দিলেই বা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করলেই মানুষ পরম জ্ঞানের অধিকারী হয় না। এ বিষয়ে স্বয়ং বেদই অনুশাসন দিয়েছেন "ন প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" অর্থাৎ, মেধা, প্রতিভা, বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় দক্ষতার দ্বারা সত্যকার আত্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভ করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় স্মরণযোগ্য। উচ্চতম অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দুশ্চর তপস্যালব্ধ অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর সমস্ত জ্ঞানই ত্রিগুণাত্মক। এই হিসাবে বিচার করলে অধ্যয়নলব্ধ বৈদিক জ্ঞানকেও ত্রিগুণের অধীন বলা চলে না কি? গীতাকার শ্রীভগবান্ স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে তাই পরে এই বিষয়টির ইঙ্গিত দিয়ে বললেন—"আমার ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়া দূরতিক্রমণীয়া। একান্ত ভাবে যারা আমার শরণ গ্রহণ করে, আমার অনুগ্রহে মাত্র তারাই এই দুশ্ছেদ্য মায়াজাল হতে মুক্ত হতে পারে।" এই ভগবৎ বাক্য হতে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়, শুধু বেদাধ্যয়ন বা শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা কেহ কোন দিন ত্রিগুণের প্রভাব হতে পরিত্রাণ পেতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন —ভগবচ্চরণে ঐকান্তিক শরণাগতি ও গুরুকৃপা বা ভগবৎকৃপা (মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা)।

অর্জ্জুন শাস্ত্রজ্ঞানহীন অজ্ঞ ও মূর্খ ছিলেন না। তিনি তৎকালপ্রচলিত বিদ্যা বা জ্ঞানের অনুশীলন অবশ্যই করেছিলেন। পরন্তু, তাঁর সেই অনুশীলনলব্ধ জ্ঞান তাঁকে মোহ ও বিভ্রান্তি হতে মুক্ত করতে পেরেছিল কি? এজন্য তাঁকে স্বীয় সখা শ্রীকৃষ্ণকে গুরুপদে বরণ করে তাঁর কৃপাপ্রার্থী হতে হয়েছিল। বস্তুতঃ, ত্রিগুণাত্মক বিষয়াসক্তি ও মায়ামোহ হতে উদ্ধার পাবার ইহাই একমাত্র উপায়। বেদাদি শাস্ত্রের চর্চ্চা ইহার আনুষঙ্গিক সহায় মাত্র। ইহার আবশ্যকতা আছে বটে, তবে তা মুখ্য নয়, গৌণ। তা ছাড়া, জগতের সকল দেশে এমন এক শ্রেণীর সাধক-সাধিকা পরিদৃষ্ট হন যাঁরা শাস্ত্রচর্চ্চা না করেও কেবলমাত্র সদ্‌গুরুনির্দিষ্ট পথে সাধনা করে এবং তাঁদের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করে মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েছেন। মধ্যযুগের নানক, কবীর, দাদু, মীরাবাঈ, বর্ত্তমান যুগের শ্রীরামকৃষ্ণ ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ। জগদ্‌গুরু আচার্য্য প্রণবানন্দও এ বিষয়ে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—"ধর্ম্ম নাই মালায় ঝোলায়, ধর্ম্ম নাই তিলক ফোঁটায় ; ধর্ম্ম নাই অশনে-বসনে ; ধর্ম্ম

নাই বেদে, বাইবেলে, পুরাণে, কোরানে; ধর্ম্ম নাই মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায়; ধর্ম্ম আছে অনুষ্ঠানে, আচরণে ও অনুভূতিতে। ধর্ম্ম আছে, ত্যাগ, সংযম, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যে।”

পরবর্ত্তী শ্লোকটিতেও শ্রীভগবান্ এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বললেন—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬

অন্বয়—সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবান্ অর্থঃ বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবান্॥ ৪৬

অনুবাদ—সকল স্থান জলে প্লাবিত হলে কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের যে প্রয়োজন, তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের সমস্ত বেদেও সেই প্রয়োজন॥ ৪৬

শঙ্করাচার্য্যাদি প্রাচীন টীকাকারগণের মতে উক্ত শ্লোকটির অন্বয় ও অর্থ অন্যরূপ—উদপানে যাবান্ অর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সর্ব্বেষু বেদেষু তাবান্।

বাপি, কূপ, তড়াগাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক বিস্তীর্ণ মহাজলাশয়ে তৎসমস্তই সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ, বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মসমূহে যে ফল লাভ হয়, ব্রহ্মবেত্তা, ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের সেই সমস্তই লাভ হয়।

আধুনিক ও প্রাচীন টীকাকারগণের এই মতপার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয়

প্রাচীন টীকাকারগণ এই শ্লোকটির মধ্যে বেদনিন্দার আভাস লক্ষ্য করেন। তাই তাঁরা এই শ্লোকটির উপরোক্ত ব্যাখ্যা করে বুঝাতে চান—বেদের সকাম যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম—উভয় কল্যাণ ও শান্তিপ্রদ। অর্থাৎ, সকাম যজ্ঞ কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধক যে ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসুখ লাভ করেন তাও একেবারে তুচ্ছ ও নগণ্য নয়। নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনাজনিত অতুল ব্রহ্মানন্দের তুলনায় তা স্বল্প হলেও তাও আদৌ ত্যাজ্য বা অগ্রাহ্য নয়। কেন না, বিষয়ভোগজনিত আনন্দ ব্রহ্মানন্দেরই ছায়া মাত্র। সুতরাং, বেদবর্ণিত সকাম ও নিষ্কাম উভয়বিধ কর্ম্ম যখন হিত ও শান্তিপ্রদ, তখন তাদের কোনটি বর্জ্জনীয় নয়।

এই সমস্ত প্রাচীন টীকাকারগণ বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের নিত্য অনুশীলন ও বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডসূচিত সাধনপন্থার অনুষ্ঠানে এতখানি পক্ষপাতী যে তাঁরা কোন অবস্থাতেই এমন কি চরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরেও তাঁদের বিন্দুমাত্র উপেক্ষা ও অনাদরের অপক্ষপাতী। তাঁরা তাই বলতে চান—বেদের নিষ্কাম জ্ঞানের সাধনার দ্বারা সাধক অতুল ভূমানন্দের অধিকারী হন সত্য; পরন্তু, সকাম যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারাও তো ঐহিক ও পারত্রিক সুখশান্তি লাভ হতে পারে; পরিমাণে তা কম হলেও তার উপেক্ষা অনুচিত।

উক্ত শ্লোকের আধুনিক ব্যাখ্যাতাগণ প্রাচীন পন্থীদের ইত্যাকার ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত বলে মনে করেন। তাঁরা বলতে চান প্রবর্ত্তক অবস্থায় সাধকের পক্ষে বেদাদি শাস্ত্রের অনুশীলন এবং প্রয়োজনবিশেষে বেদোক্ত সকাম যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান আবশ্যক হতে পারে। কিন্তু সাধক যখন উচ্চতম তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়ে সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিলাভে ধন্য হন, তখন তাঁর পক্ষে আর বেদাদির অনুশীলন ও কাম্যকর্ম্মের প্রয়োজন কি? তখন সেগুলি তাই তাঁর পক্ষে ত্যাজ্য ও উপেক্ষণীয়।

এ বিষয়ে আমাদের অভিমত কি—তাই এক্ষণে আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করব। আমাদের মতে সমাজ-রক্ষার পক্ষে রক্ষণশীলতা ও উদারতা—এই উভয়বিধ মনোভাবের স্থান আছে। রক্ষণশীলতার নামে প্রাচীন ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি আত্যন্তিক মোহ বা আসক্তি যেমন ক্ষতিকর, তেমনি প্রগতি বা উদারতার নামে সেই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি ঐকান্তিক উপেক্ষা ও অনাদর-প্রদর্শনও কম হানিকর নয়। বর্ত্তমান যুগে আমরা তাই লক্ষ্য করি, একশ্রেণীর ধর্ম্মগুরু বা শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতগণ ক্রিয়াকাণ্ডের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলিকে অত্যন্ত মহত্ত্ব দান করেন। পক্ষান্তরে, এ যুগে আর একদল অত্যুদার পন্থী নেতা ও নায়কের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অনাদরের ভাব পোষণ করে থাকেন। তাঁরা তাই পূজা আরতি, যাগযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। আমাদের মনে হয়—এই উভয় মতবাদিগণের ধারণা ও সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ হবার পরেও লোকশিক্ষার জন্য বা নিম্নস্তরের সাধকগণের নিকট দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করার জন্য তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণ যদি পূজারতি ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, তবে তার দ্বারা সমাজহিতই সাধিত হয়। তাই দেখা যায়

—এযুগে মহান্ লোকশিক্ষক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস চরম জ্ঞান লাভের পরেও দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে দণ্ডায়মান হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। আচার্য্য প্রণবানন্দ তদীয় মঠ ও আশ্রমগুলিতে সনাতন ধর্ম্মানুমোদিত সর্ব্ববিধ উৎসব পার্ব্বণ ও যাগযজ্ঞের আয়োজনে উৎসাহ প্রদান করতেন। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ রাখা প্রয়োজন—এ যুগে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ ছিলেন ঔপনিষদিক জ্ঞানবাদের একান্ত পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে, আর্য্যসমাজীরা ছিলেন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিশেষ অনুরাগী। কিন্তু, এদের কোন দলের মতবাদ সনাতনী হিন্দুসমাজের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আচার্য্য প্রণবানন্দ-সূচিত মতাদর্শের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় উক্ত উভয় মতের সমন্বয় এবং তাঁর সেই সমন্বিত আদর্শই অধুনা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ৪৭

অন্বয়—কর্ম্মণি এব তে অধিকারঃ, কদাচন ফলেষু মা, কর্ম্মফলহেতুঃ মা ভূঃ, অকর্ম্মণি তে সঙ্গঃ মা অস্তু॥ ৪৭

অনুবাদ—কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলে কখনও নয়। কর্ম্মফল যেন তোমার কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়। আর কর্ম্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না জন্মে॥ ৪৭

কর্ম্মযোগের প্রাথমিক সূচনা

বলা বাহুল্য, সমগ্র কর্ম্মযোগের মূল রহস্য সংক্ষেপে এই শ্লোকটির মধ্যে নিহিত। কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়—ফলাকাঙ্ক্ষা যেন তোমার কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ না হয়—কর্ম্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না জাগে। বস্তুতঃ ইহাই কর্ম্মযোগের মূলসূত্র।

এক দৃষ্টিতে ইহা পরম সত্য যে, ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকলেই মানুষ স্বীয় অভিপ্রায় মত যে কোন ভালমন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হতে পারে। পরন্তু, তার অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্মের ফল কীরূপ হবে—না হবে, পূর্ব্ব হতে তার পক্ষে তা নির্ণয় করা শক্ত। কেন না, কর্ম্মফল তার অধিকারে থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাণপণ চেষ্টায় কর্ম্ম করেও মানুষ তার আশানুরূপ

ফললাভে বঞ্চিত হয়। গীতাকার শ্রীভগবান্ তাই এ বিষয়ে স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন—কর্ম্মফলের প্রত্যাশা নিয়ে যেন কোন কর্ম্মে তুমি প্রবৃত্ত না হও।

এক্ষণে প্রশ্ন আসে, ফললাভের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে কর্ম্ম করার প্রেরণা ও উৎসাহ আসবে কোথা হতে? এরূপ উদ্দেশ্যহীন হলে মানুষের কর্ম্মপ্রবৃত্তিই তো বন্ধ হয়ে যাবে। 'প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে' —প্রয়োজন ব্যতীত অজ্ঞান ব্যক্তিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না।

গীতোক্ত কর্ম্ম—উদ্দেশ্যহীন নহে

গীতার মতে এরূপ প্রশ্ন বা সংশয় মিথ্যা ও নিরর্থক। সাধারণ স্তরের কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রেরণার উৎস অবশ্যই কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি। আমি এই কাজটা করছি এবং এরূপ ফললাভের আশায় তা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি —এরূপ যে স্বার্থবুদ্ধি, তাই সাধারণ কর্ম্মীকে কর্ম্মে প্রোৎসাহিত করে। পরন্তু, গীতার কর্ম্মী এরূপ স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন নন। অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে গীতার কর্ম্ম হচ্ছে যজ্ঞ বা ত্যাগমূলক অনুষ্ঠান এবং এই মতে কর্ম্মী হচ্ছেন ভগবচ্চালিত যন্ত্র বা সেবক। ভগবৎ নির্দ্দেশিত লোকসংগ্রহই এই কর্ম্মপ্রেরণার মূল হেতু ও উৎস। সুতরাং, এই কর্ম্মও উদ্দেশ্যহীন নয়। তবে সেই উদ্দেশ্য উচ্চতর লোককল্যাণ—যা আনে সাধকের চিত্তশুদ্ধি ও মানসিক প্রশান্তি। লৌকিক জগতে সুযোগ্য সদ্‌গুরুর সন্ধান যাদের অদৃষ্টে মিলেছে এবং তাঁর নির্দ্দেশে কর্ম্ম করার সৌভাগ্য যাদের ঘটেছে—তাদের পক্ষে এই রহস্য উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল। গুরু ও ভগবানে বিশ্বাসহীন আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের নিকট বিষয়টি অবশ্যই দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য। পাশ্চাত্যের রাজসিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে তাই গীতার এই কর্ম্মযোগের রহস্য ধারণাতীত।

উপরোক্ত ভাগবত কর্ম্ম ছাড়াও নিঃস্বার্থ জনসেবামূলক কর্ম্মপ্রবৃত্তিও কর্ম্মীর প্রাণে কম উৎসাহের সঞ্চার করে না। ভীষণ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় যাঁরা কর্ম্ম-তৎপর তাঁরাও পদে পদে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও তাঁদের সেই পবিত্র সেবাব্রত উদ্‌যাপন করেন না কি? এরূপ ক্ষেত্রে কর্ম্মের পশ্চাতে কর্ম্মীর প্রাণে স্বার্থসিদ্ধির কোন ইচ্ছা বা সঙ্কল্প থাকে

না, উদ্দেশ্য থাকে—কেবল নিষ্কাম পরসেবা ও পরদুঃখ-নিবারণ। তথাপি, এরূপ অবস্থাতেও কতখানি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাসহকারে এই পরিচর্য্যামূলক কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে! সুতরাং, যাঁরা মনে করেন—ফলাসক্তি ব্যতীত কর্ম্মীর অন্তঃকরণে কর্ম্মপ্রেরণা জাগ্রত হয় না, তাঁরা একান্ত ভ্রান্ত ও মূঢ়। পাশ্চাত্যের স্বার্থদুষ্ট জড়বাদীদের সংস্পর্শে আসার ফলে অধুনা আমাদের দেশেও এক শ্রেণীর নরনারীর মনে এরূপ বিকৃত ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে যার সংস্কার এবং সংশোধন একান্ত ও আশু প্রয়োজন।

কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি ত্যাগ করা সত্ত্বেও যে উৎসাহ সহকারে কর্ম্ম করা যায়, সে কথাটি আলোচিত হ'ল। এক্ষণে প্রশ্ন আসে, ঐ ভাবে কাজ করলেও অনুষ্ঠিত কর্ম্মের তো একটা ভালমন্দ ফল হবেই, সেই কর্ম্মফলের প্রতি কর্ম্মীর মনোভাব কীরূপ হওয়া প্রয়োজন? এই বিষয়টির সমাধানের জন্য শ্রীভগবান্ পরমুহূর্ত্তে বললেন—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮

অন্বয়—ধনঞ্জয়! যোগস্থঃ [সন্] সঙ্গং ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ ভূত্বা কর্ম্মাণি কুরু; সমত্বং যোগঃ উচ্যতে॥ ৪৮

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! যোগযুক্ত হয়ে ফলাসক্তি ত্যাগ করে ও সিদ্ধি অসিদ্ধিকে সমজ্ঞান করে তুমি কর্ম্ম কর। এরূপ যে সমত্ববুদ্ধি তাই হচ্ছে প্রকৃত যোগ॥ ৪৮

সমত্ব-যোগ

কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধিহীন ও ফলাসক্তিবর্জ্জিত হয়ে কাজ করার পরে কর্ম্মফল যে প্রকার হোক না কেন তাতে মানসিক সাম্য বা প্রশান্তি বিন্দুমাত্র বিনষ্ট না হয় তৎপ্রতি নিরন্তর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ এইরূপ নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল ভগবানে অর্পিত হওয়াই স্বাভাবিক। কেন না, যিনি যন্ত্রী বা কর্ত্তারূপে কর্ম্মীকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও পরিচালিত করেছেন, কর্ম্মফল বস্তুতঃ তাঁরই প্রাপ্য। গীতোক্ত কর্ম্মযোগী এই কারণেই ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করার জন্য উপদিষ্ট।

গীতার মতে লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, সিদ্ধি-অসিদ্ধি—এরূপ সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বময় অবস্থায় মানসিক প্রশান্তি বা সমত্ব রক্ষার সাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ। শুধু কর্ম্মী নয়—জ্ঞানী, ধ্যানী, ভক্ত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অধ্যাত্ম সাধককে লক্ষ্য করে গীতা এই সমত্ব-সাধনার প্রতি বিশেষ নির্দ্দেশ দান করেছেন। গীতার মতে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও শিথিলতা থাকলে কোন সাধনাই সাফল্যমণ্ডিত বা জয়যুক্ত হতে পারে না। গীতা তাই প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে সাধকদের গুণ ও অধিকারের বর্ণনা-প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ এই বিষয়টির প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। সুতরাং, গীতার যারা পাঠক ও শ্রোতা—তাদিগকে সর্ব্বদা এই সমত্ব-সাধনার বিষয়টি স্মৃতিপথে রেখে তাদের সাধন পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

অতঃপর শ্রীভগবান্ স্বীয় সখাকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করে বললেন—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯

অন্বয়—ধনঞ্জয়! কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ দূরেণ হি অবরং; বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ, ফলহেতবঃ কৃপণাঃ॥ ৪৯

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধিযোগের তুলনায় কর্ম্ম অতি নিকৃষ্ট। সুতরাং, তুমি বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। কেন না, যারা ফলের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করে তারা অতি দীন ও কৃপার পাত্র॥ ৪৯

বুদ্ধিযোগের মহত্ত্ব

অর্জ্জুনের মন পূর্ব্ব হতেই নিদারুণ কর্ম্মবিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধরূপ ভয়ঙ্কর কর্ম্ম পরিহার ক'রে নিবৃত্তিমূলক সন্ন্যাস বা জ্ঞানের পথ অনুসরণ করার জন্যই তাঁর মন একান্ত অধীর, উদ্‌গ্রীব ও উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। এরূপ অবস্থায় যখন তিনি শুনলেন—বুদ্ধিযোগ হতে কর্ম্ম নিকৃষ্ট, ফলের প্রত্যাশা নিয়ে যারা কর্ম্ম করে তারা হীন ও কৃপার পাত্র এবং সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ পেলেন—তুমি বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণকর, তখন তিনি হয়তো ভাবলেন—সখা শ্রীকৃষ্ণ যখন কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধিযোগকে শ্রেষ্ঠ বলছেন এবং

নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করাও যখন দুরূহ ব্যাপার, তখন তিনি এতক্ষণে হয়তো তাকে জ্ঞানের পথ আশ্রয় করার জন্য নির্দ্দেশ দিচ্ছেন।

পরন্তু, অর্জ্জুনের এইরূপ ধারণা একান্ত অমূলক। কারণ, এই শ্লোকে বর্ণিত 'বুদ্ধিযোগ' ও পূর্ব্বপ্রচলিত নিবৃত্তিমূলক জ্ঞানযোগ এক বস্তু নয়। বুদ্ধিযোগ বলতে এখানে শ্রীভগবান্ যা বোঝাতে চাচ্ছেন তা হচ্ছে সমত্ব-বুদ্ধির সাধনা। এরূপ সমত্ববুদ্ধি নিয়ে কর্ম্ম করতে না পারলে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। অর্থাৎ, যে কর্ম্মের পশ্চাতে জ্ঞান বা উচ্চতর বিবেকবিচার নাই তা কখনও শুভপ্রদ হতে পারে না। তাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেছেন —'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'—তুমি সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। এরূপ হলে তোমার কর্ম্ম আর বন্ধনের কারণ হবে না।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥ ৫০

অন্বয়—বুদ্ধিযুক্তঃ ইহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে জহাতি, তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব, কর্ম্মসু কৌশলং যোগঃ॥ ৫০

অনুবাদ—বুদ্ধিযুক্ত (ব্যক্তি) ইহ লোকেই সুকৃত ও দুষ্কৃত—এই উভয়ই পরিত্যাগ করেন। অতএব যোগে যুক্ত হও ; কর্ম্মের কৌশলই যোগ॥ ৫০

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১

অন্বয়—বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি হি॥ ৫১

অনুবাদ—সমত্ব-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্মফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে বিমুক্ত হয়ে দুঃখশূন্য পদ লাভ করেন॥ ৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২

অন্বয়—যদা তে বুদ্ধিঃ মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ নির্ব্বেদং গন্তাসি॥ ৫২

অনুবাদ—যখন তোমার বুদ্ধি মোহময় গহন দুর্গ পরিত্যাগ করবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ের (প্রতি) বৈরাগ্য প্রাপ্ত হবে॥ ৫২

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩

অন্বয়—যদা শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ সমাধৌ নিশ্চলা অচলা স্থাস্যতি, তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি॥ ৫৩

অনুবাদ—বেদ-বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি সমাধিতে যখন নিশ্চল অচল হয়ে থাকবে তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হবে॥ ৫৩

প্রজ্ঞাপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বুদ্ধি স্থির হয় না

প্রকৃত জ্ঞান লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষ মোহবশতঃ ধর্ম্মবিষয়ে লোকে যে যা বলে অথবা পণ্ডিতেরা যেরূপ বিধিবিধান দেন তাতেই কর্ণপাত করতে থাকে এবং এই কারণে তখন পর্য্যন্ত তার কোন মানসিক স্থিরতা থাকে না। জগতের বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন অল্পজ্ঞ নরনারী এইরূপ 'নানা মুনির নানা মতে' নিরন্তর বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। এই অবস্থায় সত্যকার জ্ঞান বা ধর্ম্ম কি—তা তারা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে পারে না।

অর্জ্জুনের মানসিক অবস্থা এতখানি অধঃপতিত না হলেও অনেকটা সেই ধরণের। তাই শ্রীভগবান্ তাঁকে বললেন—তোমার বুদ্ধি এখনও মোহরূপ গহন-কাননে—পরিভ্রমণশীল। ধর্ম্মবিষয়ে তুমি এতকাল যা যা শুনেছ ও জেনেছ তা তোমার বুদ্ধিকে শান্তি দিতে পারেনি। এবং এরূপ ভাবে লৌকিক ও বৈদিক উপদেশ-নির্দ্দেশে কর্ণপাত করতে থাকলে তোমার বুদ্ধি কোন দিন ধীর, স্থির শান্ত ও সমাহিত হবে না। তুমি এখনও এমন জ্ঞানীর সন্ধান পাও নি—যাঁর উপদেশ-নির্দ্দেশ লাভ করলে তোমার এই জ্ঞানাভিমান ও বুদ্ধিভ্রম বিদূরিত হবে। তুমি যদি সত্য সত্যই শান্তিকামী হও তবে কর্ম্মত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ ক'রে, কর্ম্মযোগের কৌশল-জ্ঞান অর্জ্জনে প্রযত্নশীল হও। বস্তুতঃ, বুদ্ধিযোগের রহস্য তুমি যখন সম্যক্ অবগত হবে তখনই তোমার মন সর্ব্বপ্রকার সংশয়যুক্ত হয়ে স্থির ও দৃঢ়নিশ্চয় হবে।

আচার্য্য প্রণবানন্দ স্বীয় পার্ষদবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলতেন—"স্থিরপ্রজ্ঞ অবস্থা লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধক অনেক সময় অনেক চঞ্চলতার পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প যাহারা, আরব্ধ ও সঙ্কল্পিত কর্ম্মসাধনে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত যাহারা, তাহারা নিজেদের ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতাকে পরিহার করিয়া যখন তখন যা তা করিতে প্রস্তুত হয় না।"

শ্রীভগবানের নিকট এরূপ মৃদু ভর্ৎসনাসূচক নির্দ্দেশ লাভের পরে অর্জ্জুনের মনে সত্যকার জ্ঞানীর লক্ষণ ও অবস্থা অবগত হবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা হল।

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ—কেশব! সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা? স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত? কিম্ আসীত? কিং ব্রজেত? ৫৪

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন, হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েছেন তাঁর লক্ষণ কি? স্থিতধী ব্যক্তি কীরূপ কথা বলেন? কিরূপে অবস্থান করেন ও কীরূপে চলেন? ৫৪

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ

উপরোক্ত শ্লোকটিতে ব্যবহৃত স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধী—দুটি সমার্থবোধক শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে—নিশ্চল বা পরিপক্ব বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি। সাধারণতঃ মল ও বিক্ষেপ—এই দুটি কারণের জন্য বুদ্ধির স্থৈর্য্য ও বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। আর একথা অনস্বীকার্য্য যে, ধীর ও শুভবুদ্ধি ব্যতীত নির্ম্মল জ্ঞান বা প্রজ্ঞার উদয় অসম্ভব। এজন্য জগতের সকল ধর্ম্মমতগুলি চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ নির্দ্দেশ দান করেন। বলা বাহুল্য, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ও আচরণ বলতে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে এখানে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক সেই উচ্চতর নীতি ও সংযমমূলক বিধি-বিধানের বিষয়গুলি বিবৃত হয়েছে—যা প্রজ্ঞালাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

এ প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন—মানুষের মনোবুদ্ধি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,—এই ত্রিগুণের উপাদানে গঠিত হওয়ায় গুণভেদে নিরন্তর তাদের ভালমন্দ অবস্থান্তর ঘটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ, রজঃ ও তমোগুণের আধিক্য ও প্রাবল্য থাকা পর্য্যন্ত মনোবুদ্ধি কদাপি শান্ত ও সংযত হতে পারে না এবং ততক্ষণ তাদের মধ্যে মল বিক্ষেপজনিত চাঞ্চল্য ও অশুদ্ধি থাকতে বাধ্য। সুতরাং, সাধকের নিত্যসত্ত্বস্থ হতে থাকার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আবশ্যক। অথচ, এই সত্ত্বসাধনা স্বল্পায়াসে সিদ্ধ হবার নয়। এজন্য প্রয়োজন নিরন্তর ও নিরবচ্ছিন্ন অন্তঃসংগ্রাম। নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্লোকে শ্রীভগবান্ সেই সাধনপথেরই নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

ঋষি বিশ্বামিত্রপরিদৃষ্ট বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে গায়ত্রী-মন্ত্র তার উদ্দেশ্যও এই বুদ্ধির শোধন। গায়ত্রীর প্রার্থনা-মন্ত্রে বলা হয়েছে—যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করেন, সেই দ্যোতমান্ সর্ব্বব্যাপী জগৎপ্রসবিতার বরণীয় তেজঃ আমরা ধ্যান করি।

গীতাধর্ম্মের যাঁরা সাধক তাঁদের জানা কর্ত্তব্য—শুধু সাময়িক ভাবে নয়—প্রজ্ঞায় বা নির্ম্মলবুদ্ধিতে চির প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত মানসিক সাম্য ও শান্তির আশা সুদূর-পরাহত। অর্জ্জুনের অস্থির ও অশান্ত মন এক্ষণে শাশ্বত শান্তিলাভের জন্য একান্ত আকুল ব্যাকুল। তাই ভগবচ্চরণে তাঁর এই আন্তরিক আকুতি ও জিজ্ঞাসা। তাঁর সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ৫৫

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—পার্থ! আত্মনি আত্মনা তুষ্টঃ যদা সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি, তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে॥ ৫৫

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন, হে পার্থ, আপনাতে আপনি তুষ্ট (ব্যক্তি) যখন মনের সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন, তখনই তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ নামে উক্ত হন॥ ৫৫

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬

অন্বয়—দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগভয়-ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে॥ ৫৬

অনুবাদ—দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন, সুখে নিঃস্পৃহ, কাম-ক্রোধ-ভয় হতে মুক্তসাধক স্থিতপ্রজ্ঞ (বলে) কথিত হন॥ ৫৬

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭

অন্বয়—যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ তৎ তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বভূতে মমতাশূন্য, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুতে যিনি আনন্দ বা দ্বেষ করেন না, তাঁরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত॥ ৫৭

গীতামৃত—যিনি মনোগত যাবতীয় বাসনা কামনা পরিহার করে স্বীয় আত্মাতে সন্তুষ্ট, বহির্ব্যাপারে যিনি আর সুখের প্রত্যাশা করেন না; সাধক রামপ্রসাদের ভাষায়—"আপনাতে আপনি থেকো মন, যেয়ো না কো কারো ঘরে"—এইরূপ যাঁর মানসিক অবস্থা—তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। এরূপ অবস্থায় সাধকের আর পরতন্ত্রতার বালাই কোথায়? তিনি তখন সত্য সত্যই আত্মারাম ও আত্মতৃপ্ত হয়ে যান। বস্তুতঃ এইরূপ অবস্থায় অধিরূঢ় হলে সাধকের আর বাহ্য সুখ-দুঃখের পরোয়া থাকে না। তিনি তখন সম্যক্‌রূপে রাগ-দ্বেষমুক্ত হয়ে যান। দেহাদি বিষয়েও তিনি তখন হন মমত্বশূন্য এবং সমস্ত শুভাশুভ ভালমন্দ ব্যাপারেও হন সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন।

আর্য্যেতর ধর্ম্ম জীবন্মুক্তি স্বীকার করে না

সত্য সত্যই, স্থিতপ্রজ্ঞের এই অবস্থা অতি মহান্ ও উন্নত। এই অবস্থায় চিরপ্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের আর দুঃখ-ক্লেশ, উদ্বেগ-অশান্তির কারণ থাকে না। বস্তুতঃ এই দেহে অবস্থিত থেকেই সাধক তখন হন দেবত্বের আসনে আসীন। গীতার মতে ইহাই জীবন্মুক্তির অবস্থা। আর্য্যেতর জাতিগুলির মুক্তি-মোক্ষের কল্পনা কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক্। তাঁরা মনে করেন—মানুষ কখনও এই

দেহে অবস্থান কালে চিরশুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ অবস্থা লাভ করতে পারে না। কেন না, মানুষ হচ্ছে জন্মপাপী এবং যে যতই তপস্যা ও পূজারাধনা করুক না কেন জন্মমৃত্যুর সীমিত কালের মধ্যে সে কখনও যাবতীয় কলুষ-কালিমার সংস্কারমুক্ত হয়ে পরামুক্তির অধিকার লাভ করতে পারবে না। এজন্য তাকে সন্দিগ্ধ মনে 'অন্তিম বিচারের দিন' পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

তাদের মুক্তির কল্পনাও গীতার এই মুক্তিকল্পনা হতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্যান্য ধর্ম্মে মানুষকে তার মনোগত সমস্ত ভোগবাসনাকে পরিহার করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয় না।

মৃত্যুর পরে পরলোকে অনন্তকাল যাবৎ স্বর্গ-সুখ ভোগের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা—তাও তাকে ত্যাগ করতে বলা হয় না। আর্য্যহিন্দু কিন্তু বলেন—'মুক্তি-মোক্ষ' ব'লে যদি কোন কিছু জিনিস থাকে তবে তা এই জন্মেই—এই দেহে অবস্থানকালেই লাভ করতে হবে। বস্তুতঃ, দেহে থেকেও দেহাতীত হওয়া, বিষয়বস্তুর মধ্যে থেকেও পরিপূর্ণরূপে রাগ-দ্বেষ হতে পরিমুক্ত হওয়ার শিক্ষা-দীক্ষা কেবলমাত্র গীতাদি আর্য্যশাস্ত্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি—তা উপরের শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কী ভাবে অবস্থান করেন,—তাঁর আচরণ কী রূপ, শ্রীভগবান্ তারই বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলছেন—

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮

অন্বয়—যদা চ অয়ং কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্বশঃ ইন্দ্রিয়াণি সংহরতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮

অনুবাদ—কচ্ছপ যেমন মুখ-পদাদি অঙ্গসকল সঙ্কুচিত করে রাখে, তেমনি যিনি রূপ-রসাদি বিষয়বস্তু হতে ইন্দ্রিয়সকলকে সংহরণ করতে অভ্যস্ত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ॥ ৫৮

স্থিতধী কী ভাবে অবস্থান করেন

বিপদের সম্মুখীন হলে কচ্ছপ যেমন স্বীয় মুখ ও পদাদি ইন্দ্রিয়গুলি দেহমধ্যে গুটিয়ে নিয়ে শান্ত ও নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থান করে, স্থিতধী ব্যক্তিও

তেমনি রূপরসাদি ভোগ্য বিষয় সমূহ হতে তাঁর ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন আসে—কূর্ম্ম তো আত্মরক্ষা কালে তার বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে নিজের দেহমধ্যে একেবারে গুটিয়ে নেয়, জ্ঞানী তো তা করেন না বা করতে পারেন না? ইন্দ্রিয়সংযমের সময়ে তাঁদের মুখ ও কর-চরণাদি বহিরিন্দ্রিয়গুলি যেমন বাহিরে ছিল তেমনি থেকে যায়। সুতরাং, ইন্দ্রিয়-সংযমের ব্যাপারে কূর্ম্মের সহিত এরূপ একটি বিসদৃশ উপমা উত্থাপন করার অর্থ কি? উত্তরে বলা যায়—জীবকুলের মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এই কারণে মনুষ্যের পক্ষে মন ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযমই সব চেয়ে বড় কথা। মানুষের বিচারে হস্তপদাদি বাহ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি তার ভিতরের ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিগুলির সহায়ক যন্ত্রমাত্র। তাই কেবলমাত্র এদের সংযম বা সংহরণের দ্বারা তার ভোগপ্রবৃত্তি শান্ত হবার নয়। পক্ষান্তরে, মন ও তৎসহ ভিতরের ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিকে সংযত করতে পারলে তার ইন্দ্রিয়-সংযমের সাধনা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হতে পারে। সুতরাং, কূর্ম্মের ন্যায় বাহ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে ভিতরে গুটিয়ে নেবার প্রয়োজন তার নাই। তবে কূর্ম্মের নিকট হতে ইহাই শিক্ষণীয় যে, রূপরসাদি ক্ষতিকর কোন ভোগ্য বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তৎ তৎ বিষয়বস্তু হতে মন ও ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিগুলিকে গুটিয়ে নিয়ে একান্ত স্থির ও প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করা প্রয়োজন। নিরন্তর প্রচেষ্টার দ্বারা এই অভ্যাস এরূপ হওয়া আবশ্যক যে ইন্দ্রিয়সংযমের প্রযত্ন যেন তার পক্ষে কূর্ম্মের ন্যায় একান্ত সহজ, স্বাভাবিক ও অনায়াসসিদ্ধ ব্যাপারে পরিণত হয়ে যায়।

শিবমন্দিরের সমক্ষে পরিদৃষ্ট হয় একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বলদ ও একটি কচ্ছপ। দুর্ভাগ্যের বিষয়—অধিকাংশ হিন্দু ভক্ত নরনারীর নিকট অধুনা এই প্রতীক দুটির অন্তর্নিহিত অর্থ বিলুপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। মন্দিরের গর্ভপ্রকোষ্ঠে বিগ্রহমূর্ত্তির সেবাপূজার সঙ্গে এই দুটি মূর্ত্তির উপরেও দু-চারটি ফুল ছিটিয়ে দিয়ে ভক্তগণ অধুনা তাঁদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন। পরন্তু, তাঁরা অনেকেই তলিয়ে বুঝতে চান না—মন্দিরের পুরোভাগে এই দুইটি প্রতীক-মূর্ত্তির প্রয়োজনীয়তা কি?

বলদ হচ্ছে শিবের বাহন—যিনি নন্দী নামে প্রখ্যাত। উদরপূর্ত্তির জন্য সামান্য আহারে পরিতুষ্ট হয়ে নন্দী কী রূপ নিষ্কামভাবে সমগ্র জীবন প্রভুসেবা

করে চলেছেন, বলদের দর্শনে উপাসক ভক্ত সেই শিক্ষাটি গ্রহণ করবেন। আর গীতোক্ত এই কূর্ম্মের উপমাটি বিগ্রহ-প্রতীকরূপে তাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেবে—অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে ইষ্টদর্শনের পূর্ব্বে কূর্ম্মের ন্যায় ইন্দ্রিয়সংযমে অভ্যস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯

অন্বয়—নিরাহারস্য দেহিনঃ বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে, রসবর্জ্জং পরং দৃষ্ট্বা অস্য রসঃ অপি নিবর্ত্ততে॥ ৫৯

অনুবাদ—ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগে যিনি অপ্রবৃত্ত তাঁর বিষয়ভোগ (সাময়িক ভাবে) নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তদ্বারা তাঁর ভোগতৃষ্ণা (চিরতরে) বিলুপ্ত হয় না। সেই পরমপুরুষের দর্শনের শেষেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়বাসনা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়॥ ৫৯

গীতামৃত—শ্লোকটির যা সহজ অর্থ তার তাৎপর্য্য হচ্ছে—কোনও ব্যক্তি যদি কিছুক্ষণ উপবাস করে অথবা কোনও কারণবশতঃ সে আহার্য্যগ্রহণের সুযোগলাভে বঞ্চিত হয়, তবে সেই কালে তার আহার্য্যক্রিয়ারূপী বিষয়-ভোগ বন্ধ থাকে বটে, পরন্তু, এইরূপ অনাহার বা উপবাসের ফলে তার ভোজন-প্রবৃত্তি কদাচ বন্ধ হয় না ; বরং তা আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। পক্ষান্তরে, সেই ব্যক্তি যদি অমৃতভক্ষণের দ্বারা তার ক্ষুধা-প্রবৃত্তিকে চিরতরে জয় করতে সমর্থ হয় তবে আর অন্ন-পানরূপী সাধারণ ভোজনে তার রুচি থাকে না। ঠিক তদ্রূপ যদি কোন ব্যক্তি জরা-ব্যাধি বা কোনও অঙ্গবৈকল্য প্রভৃতি শারীরিক অপটুতার কারণে ইন্দ্রিয়ভোগে বঞ্চিত বা অসমর্থ হয় তাহলে সেই অবস্থায় তার বিষয়ভোগেচ্ছা আদৌ বিনষ্ট বা নিবৃত্ত হয় না। কেবলমাত্র বিষয়রস অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্মানন্দ-রস—তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করলেই তার মন স্বভাবতঃই বিষয়বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে ; ভোগ্যবস্তুর প্রতি তখন তার প্রাণে কাকবিষ্ঠা-তুল্য ঘৃণারই উদ্রেক ঘটে। এই কারণে এখানে নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্ছে—সেই রসস্বরূপ পরম-পুরুষের দর্শন ব্যতীত স[illegible] জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করা অসম্ভব। চিনির আস্বাদ পেলে যেমন [illegible] চিটাগুড়ের প্রতি কারুর আকর্ষণ থাকে না, ইহাও তদ্রূপ। যিনি [illegible]

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তিনি অতুল ব্রহ্মানন্দের আস্বাদলাভ করে ধন্য হয়েছেন। তিনি তাই চিরশান্ত, সৌম্য ও নিত্যানন্দময়। জগতের কোনও ভোগৈশ্বর্য্য বা বিষয়প্রবৃত্তি আর তাঁকে বিমোহিত, বিচলিত বা বিভ্রান্তি করতে পারে না। তবে এ অবস্থা আদৌ সহজলভ্য নয়। এ জগতে কোটির মধ্যে গোটিই মাত্র সেই পরম স্থিতি লাভ করে ধন্য হন। পরবর্ত্তী শ্লোকটিতে ভগবান্ এই ইন্দ্রিয়-জয়ের প্রচেষ্টা যে কতখানি দুঃসাধ্য ব্যাপার তা স্বীয় সখাকে লক্ষ্য করে বললেন—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

অন্বয়—কৌন্তেয়! প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি হি যততঃ বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য অপি মনঃ প্রসভং হরন্তি॥ ৬০

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়, প্রমাথী বা বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ প্রযত্নশীল বিবেকী সাধকের মনকেও বলপূর্ব্বক হরণ করে॥ ৬০

গীতামৃত—ইন্দ্রিয়সংযম অতি দুষ্কর ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবেক-বিচার, অশেষ পাণ্ডিত্য প্রভৃতি কোন কিছুই মনোজয় বা ইন্দ্রিয়সংযমের পক্ষে একান্ত নির্ভরযোগ্য সাধন বলে স্বীকার করা যায় না। কেন না, প্রবল ভোগবাসনা উন্নত বিচারশীল জ্ঞানী ব্যক্তির মন-বুদ্ধিকেও সময়ে সময়ে একান্ত বিভ্রান্ত ও বিচলিত করে তোলে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থগুলি অনুধ্যান করলে অবগত হওয়া যায়, বিশ্বামিত্রাদি কত কঠোরতপাঃ জ্ঞানী গুণী ঋষি মুনির মনও মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতি রূপসী মোহিনীগণের মোহলালসায় বিমুগ্ধ হয়ে সাময়িক ভাবে সাধনভ্রষ্ট হয়েছিল।

ফ্রয়েডবাদ ও ইন্দ্রিয়সংযম

পাশ্চাত্য জগতে বর্ত্তমান যুগে এক শ্রেণীর মনস্তত্ত্ববিদের আবির্ভাব ঘটেছে—যাঁদের নায়ক হচ্ছেন ফ্রয়েড। মানসশাস্ত্রে এঁদের যে নবীন অবদান তা অধুনা Psycho-analysis বা 'মনোবিকলনবাদ' নামে পরিচিত। ফ্রয়েডবাদীদের মতে নর-নারীর যাবতীয় সংস্কারপ্রবৃত্তির মূলে যে শক্তি ও প্রেরণা ক্রিয়াশীল, তা হচ্ছে Sex-instinct বা যৌনপ্রবৃত্তি। এই মতবাদীরা

মনে করেন এই জগতে মানুষের যাবতীয় কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে এই ঐন্দ্রিক সুখ-ভোগাকাঙ্ক্ষা। নবজাত ক্ষুদ্র শিশুটি তার বৃদ্ধাঙ্গুলিটি মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়ে যে আনন্দ উপভোগ করে, তাঁদের মতে, তার মধ্যেও রয়েছে শিশুর প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়সম্ভোগের প্রবৃত্তি। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কেহ কেহ এতখানি গোঁড়া মনোভাবসম্পন্ন যে পিতার কন্যাপ্রীতি ও মাতার পুত্রপ্রীতির মধ্যেও তাঁরা ঐ মিথুনপ্রবৃত্তির প্রচ্ছন্ন প্রকাশ লক্ষ্য করেন। এঁদের ইত্যাকার একপক্ষীয় দৃষ্টিকোণ ও গোঁড়া মনোভাব লক্ষ্য করে শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করেছেন—ফ্রয়েডবাদীরা পায়খানার দ্বার দিয়ে জগৎ দর্শন করেছেন। ফ্রয়েডবাদীদের সমগ্র মতবাদটি যে ভ্রান্ত তা বলা চলে না ; তবে তা যে পূর্ণ সত্য নয়—তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষতঃ, তাঁরা যখন প্রচার করেন, ইন্দ্রিয়সংযমের প্রচেষ্টামাত্রই অন্যায়, অযৌক্তিক ও হানিকর, তখন তাঁদের সে মতবাদের বৈধতা বিষয়ে প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক। এই জন্য গীতোক্ত ইন্দ্রিয়সংযমের বিধি-বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েডবাদীদের এই মতবাদটি একটু বিচারসাপেক্ষ।

হিন্দুশাস্ত্রের মতে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—এই চারিটি প্রবৃত্তি —পশু ও মানুষের হৃদয়ে সমভাবে বিদ্যমান। তবে মানুষ শুধু পশু নয় ; তার মধ্যে নিহিত রয়েছে এক মহিমময় দৈবী চেতনা—যার প্রকাশ-বিকাশের মধ্য দিয়ে সে ক্রমশঃ তার অন্তর্নিহিত সেই পশুভাবকে জয় করে দেবোপম মহত্ত্ব অর্জ্জন করতে সমর্থ। ফ্রয়েডবাদীরা নাস্তিক। তাই তাঁরা মানুষকে জৈবস্তরে অবনত করে তার গুণাগুণ বিচারে প্রমত্ত। বাধ্যতামূলক ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা যে মানুষের হৃদয়মনে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টির সম্ভাবনা, ফ্রয়েডবাদীদের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের আচার্য্যগণও তা স্বীকার করেন। তবে তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে, ইন্দ্রিয়সংযম সর্ব্বাবস্থায় অযৌক্তিক ও হানিকর। ব্রত-নিয়ম-উপবাস-জপ-ধ্যান-পূজাপাঠ প্রভৃতি দ্বারা মানুষের এই স্বাভাবিক ভোগমুখী ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিকে ধীরে ধীরে উন্নত, পবিত্র ও ঊর্ধ্বমুখী করে তুলতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, কেহ কেহ বলেন, মানুষের সম্ভোগ-প্রবৃত্তিকে এই ভাবে দমিত ও সাময়িক ভাবে প্রশমিত করা সম্ভবপর হলেও তার ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া হয় ভীষণ ও নিদারুণ সর্ব্বনাশকর। তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন—নর-নারীর দেহমনে সত আধি-ব্যাধির প্রকাশ ঘটে তার

অধিকাংশের মূলে রয়েছে তাদের বাধ্যতামূলক ইন্দ্রিয়সংযমের প্রতিক্রিয়াজনিত কুফল। এ বিষয়ে তাঁরা আরো পরিষ্কার করে বলেন, মানুষ যখনই তার কোনও প্রবল ভোগবৃত্তিকে জোরপূর্ব্বক সংযত করে তখন তা বাহ্যতঃ বিলুপ্তপ্রায় হয় বটে, তবে তা মূলতঃ মানুষের অবচেতন মনে প্রবিষ্ট হয়ে তথায় সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে এবং সময় সুযোগমত তা শতগুণ শক্তি নিয়ে যখন আবির্ভূত হয় তখন তা মানুষের দেহ-মনকে একেবারে অসাড়, অবশ ও নানাভাবে জর্জ্জরিত করে তোলে।

মনোবিজ্ঞানীদের উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা বলা চলে না। পরন্তু, তাঁরা যখন বলেন, মানুষের ভোগ-প্রবৃত্তিকে কোন কালেই সন্তোষজনক এবং নিরুপদ্রব ভাবে স্তব্ধ ও সংযত করা অসম্ভব, তখনই তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। কেন না, তাঁদের এই সিদ্ধান্ত ও যুক্তিকে স্বীকার করে নিলে মানুষকে চিরকাল পশুর ন্যায় অসংযত ও ভোগপ্রবণ জীবরূপেই মেনে নিতে হয়। জগতের কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র তা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। বাইবেল বলেছেন—"God made man in His own image". অর্থাৎ, মানুষ ভগবানের প্রতিবিম্বরূপেই সৃষ্ট হয়েছে (এবং এই কারণে তার আসল প্রকৃতি হচ্ছে ভাগবত)। এই বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র বলেছেন—"জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" অর্থাৎ, জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।

ফ্রয়েডবাদীদের উর্দ্ধীকরণ পদ্ধতি

তবে ফ্রয়েডবাদীরা যে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল ভোগবাদের পক্ষপাতী—তাও নয়। উচ্ছৃঙ্খল ভোগবৃত্তির অবাধ প্রশ্রয়ের ফলে যে মানুষের দেহ-মনে অশেষ ক্ষয় ক্ষতি সাধিত হতে পারে তাও তাঁরা স্বীকার করেন এবং তার প্রতিকার সম্বন্ধেও যে তাঁরা কোনও নিদানের আবিষ্কার করেন নি, তাও নয়। এ বিষয়ে তাঁরা যে বিধি-বিধানের সমর্থন দিয়েছেন তাঁদের ভাষায় তাকে বলা হয়—Socialisation। অর্থাৎ, তাঁরা বলেন—মানুষ তার ভোগবৃত্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে সংযত না করে, নিঃসঙ্গ নিরালা জীবন পরিহার করে, সামাজিক মেলামেশার দ্বারা বা নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের সহায়তায় তার মনকে যদি ব্যাপৃত রাখতে পারে, তবে তার উচ্ছৃঙ্খল ভোগপ্রবৃত্তিগুলি স্বাভাবিকভাবেই অনেকখানি শান্ত ও সংযত হয়ে যায়। ফ্রয়েডবাদীদের এই

মতবাদ অধুনা এক শ্রেণীর শিক্ষিত ভারতীয় নর-নারীর হৃদয়-মনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে যে আজ তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তি হতে অব্যাহতি লাভের জন্য বহুবিধ বাহ্য আমোদ-প্রমোদের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। বিচিত্র ধরণের নৃত্য-নাটক-সিনেমা ও আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও এজন্য তাঁরা নানাপ্রকার যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করে থাকেন। Relaxation বা চিত্তবিনোদনের জন্য আজকাল এই কারণে সহরের অলিগলিতে, প্রেক্ষাগৃহ ও ক্লাবভবনের প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক ও অনিবার্য্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।

আর এক শ্রেণীর নর-নারী মনকে শুচি, শুদ্ধ ও উর্দ্ধমুখী করার জন্য উচ্চাঙ্গের চিত্রকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতির চর্চ্চানুশীলনের নির্দ্দেশ দান করেন। তাঁদের অভিপ্রায় এই যে, মানুষের মন যদি ইত্যাকার উচ্চাঙ্গের বিষয়ে নিবদ্ধ থাকে তবে তাদের মনে অচিন্তা, কুচিন্তা, অনাচার ও ব্যভিচারপ্রবণতা প্রশ্রয় পেতে পারে না। পরন্তু, আমাদের বিবেচনায় মনকে পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধ, শান্ত ও সমাহিত করার পক্ষে এই বিধি-বিধানগুলিও একান্ত পর্য্যাপ্ত বলে মনে হয় না। কেন না, প্রাচীন, অর্ব্বাচীন ও এমন বহু প্রখ্যাত শিল্পী, চিত্রকর, কবি, সাহিত্যিক এবং সঙ্গীতাচার্য্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের জীবন ও চরিত্র আশানুরূপ উন্নত ও পবিত্র ছিল না। এই কারণে মনে হয়—ইত্যাকার শিল্পসাধনার পশ্চাতে যে রসবোধ বা রসানুভূতির প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান, তার অনুশীলনের সূত্রে তাঁদের চিন্তা ও মানসিকতায় প্রবিষ্ট হয় একপ্রকার মোহাসক্তি—যা, ক্রমশঃ. তাঁদের চরিত্রকে অধোগত ও নিরয়গামী করে তোলে। সুতরাং, আমাদের বিবেচনায় পরিপূর্ণ চিত্তশুদ্ধি ও মনঃসংযমের পক্ষে ইহাও যথেষ্ট নয়। উপরোক্ত শ্লোকে শ্রীভগবান্ সেই বিষয়টির প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বললেন—"বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ মহাগুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির মনকেও বিভ্রান্ত ও বিচলিত করতে সমর্থ।" এ অবস্থায় মনঃসংযমের প্রকৃষ্ট উপায় কি, কী উপায়ে মনকে চিরতরে শান্ত শুদ্ধ সমাহিত করা সম্ভবপর? নিম্নোক্ত শ্লোকে এক্ষণে তারই সূচনা দেওয়া হচ্ছে—

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১

অন্বয়—মৎপরঃ তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১

অনুবাদ—যিনি আমার অনন্য ভক্ত, যিনি তাঁর সকল ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে আমাতে চিত্ত সমাহিত করে অবস্থান করেন, তাদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ চিরতরে বশীভূত হয় এবং তিনিই প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ॥ ৬১

গীতামৃত—মনকে সংযত ও ঊর্ধ্বমুখী করার জন্য গীতায় কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ প্রভৃতি বহু সাধনপদ্ধতির উপদেশ ও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভের পক্ষে সেই সমস্ত নীতি-পদ্ধতিগুলি যে বিশেষ অনুকূল ও উপযোগী সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পরন্তু, এই সমস্ত যোগমার্গের মধ্যে গীতা একটি বিশেষ বিষয়ের উপর সর্ব্বদা গুরুত্ব অর্পণ করছেন এবং তা হচ্ছে শ্রীভগবানের সহিত যোগযুক্ত হয়ে এই সমস্ত সাধন-পদ্ধতির অনুসরণ করা। সমগ্র গীতা-গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করলে অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় গীতার একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় এবং তা হচ্ছে ভাবনিষ্ঠার প্রতি তার নিরন্তর সতর্ক দৃষ্টি। গীতাকার শ্রীভগবান্ সাধক অর্জ্জুনকে নানা প্রসঙ্গে নানা যুক্তির মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন—হে সখে, আমিই ভগবান্ পুরুষোত্তম। জীবোদ্ধারের জন্য অনন্ত করুণার পসরা নিয়ে নরদেহে আমি ধরাধামে অবতীর্ণ। তুমি যদি সত্যকার মুমুক্ষু হও, তবে জেনে রেখ—আমার কৃপা ব্যতীত কোনও যোগ-যাগ-তপস্যা তোমাকে সহজে সেই পরম পদ দিতে সমর্থ হবে না।

নবযুগের আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীও স্বীয় আশ্রিত পার্ষদগণকে লক্ষ্য করে ঠিক অনুরূপ নির্দ্দেশ দিয়ে বলেছেন—"**কঠোর যোগ-যাগ-তপস্যা-ব্রত-নিয়ম উপবাস-তীর্থভ্রমণ—কোন কিছুই মানবকে তার ঈপ্সিত পরমপদ দিতে পারে না, যতক্ষণ সে সর্ব্বতোভাবে আমার শরণাগত ও শরণাপন্ন হয়ে আমার কৃপার উপর একান্ত নির্ভরশীল না হয়।**"

উপনিষদও এই ভাগবত প্রতিশ্রুতির সূচনা দিয়ে পূর্ব্বেই বলেছেন—"ন প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"—যুক্তি, তর্ক, শাস্ত্রচর্চা, শাস্ত্রশ্রবণ, মেধা, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য—কোন কিছুর দ্বারা সেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায় না। কৃপা করে তিনি যাঁকে বরণ করেন তিনিই তাঁকে লাভ করেন।

দুর্ব্বার মন ও ইন্দ্রিয়গণকে কী ভাবে সম্পূর্ণরূপে বশে আনা যায় তা এতক্ষণ আলোচিত হয়েছে। এক্ষণে কীরূপে অবিবেকী মনুষ্য বিষয়-বাসনা দ্বারা অভিভূত হয়ে ধীরে ধীরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, শ্রীভগবান্ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে সেই সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে বললেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২

অন্বয়—বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে, সঙ্গাৎ কামঃ সংজায়তে, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে।। ৬২

অনুবাদ—বিষয়ের ধ্যান করতে করতে তাতে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি হতে জন্মে কাম বা উপভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং সেই ভোগলালসা চরিতার্থ করার পথে যখন কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় তখন তা হতে উৎপন্ন হয় ক্রোধের॥ ৬২

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩

অন্বয়—ক্রোধাৎ সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ ভবতি বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩

অনুবাদ—ক্রোধ হতে মোহ, মোহ হতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশের ফলে ঘটে বিনাশ বা মৃত্যু॥ ৬৩

বিষয়সেবার পরিণাম

বিষয়সেবার অন্তিম পরিণাম যে বিনাশ বা ধ্বংস তা বোঝা গেল। পরন্তু প্রশ্ন আসে—এই পঞ্চভূতাত্মক সংসারে রূপরসাদি বিষয়পঞ্চক নিয়েই তো মানুষের নিত্যকার ব্যবহার ও কর্ম্মপ্রবাহ। উঠতে-বসতে,চলতে-ফিরতে, খেতে-শুতে, দেখতে-শুনতে সদা সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপারেই তো বিষয়ের সহিত তার দৈনন্দিন কাজ কারবার। এমতাবস্থায় বিষয়ের সংস্পর্শে আসা ব্যতীত তার উপায়ান্তর কি? তাছাড়া, রূপ-রসাদি বিষয়গুলিও তো পরম কৃপালু ভগবানেরই সৃষ্টি। চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ের প্রতি যে স্বাভাবিক

আকর্ষণ, তার পশ্চাতেও তো নিহিত রয়েছে সেই ভগবৎপ্রেরণা। তাই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক—মানুষ নিরন্তর বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ক্রমশঃ মোহগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুপথের পথিক হোক্—ইহাই কি ভাগবত বিধান?

অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত কিছুই ব্রহ্মস্বরূপ। শ্রুতি স্বয়ং এই মতের সমর্থন দিয়ে বলেছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" বিবেকানন্দ বলেছেন—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।" অর্থাৎ, এই জগতে সকল কিছুর মধ্যেই সেই একই ব্রহ্মসত্তা বিদ্যমান। আর এই জন্যই বিশ্বচরাচরের বিবিধ বস্তুর পরস্পরের প্রতি এতখানি আকর্ষণ। সকলেরই মধ্যে নিজের আত্মসত্তা অনুভব করি বলেই তাদের প্রতি আমরা এতখানি আকৃষ্ট হই। পরন্তু, এখানে প্রশ্ন আসে ইহাই যদি সত্য হয়, তবে বিষয়সেবার দ্বারা জীবের উন্নতির পরিবর্ত্তে অধোগতি হয় কেন? শ্রীভগবানই বা উপরোক্ত শ্লোকে কেন স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে সতর্ক করে বললেন—বিষয়ের ধ্যান করতে করতে তাতে আসক্তি এবং সেই আসক্তি হতে ক্রমে ক্রমে ঘটে চরম অধঃপতন ও বিনাশের সম্ভাবনা।

বুদ্ধিভেদের জন্য বিষয়ভোগের ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম

উপরোক্ত প্রশ্নটির যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য্য। তবে তার উত্তরে বলা হয় —বিষয়ে নিরন্তর ভগবদ্বুদ্ধি জাগ্রত থাকলে ঐরূপ ঘটে না। বিষয়বস্তুতে জড় ভোগবুদ্ধি জন্মে বলেই ভোগী ব্যক্তির মনে এইরূপ বিকারবুদ্ধির সঞ্চার হয় এবং তার ফলেই কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে সে প্রিয় এবং অন্য কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে অপ্রিয় মনে ক'রে তাদের প্রতি আসক্তি বা দ্বেষভাব পোষণ করে। শ্রীভগবান্ এখানে অর্জ্জুনকে এই বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন।

বস্তুতঃ, দোষ বিষয়ের নয়, বিষয়-ভোগকারী ব্যক্তির বিকৃত বুদ্ধিই এই ব্যাপারে দায়ী। দুই ব্যক্তি একই নারীর রূপগুণে মোহিত। এদের একজনের দৃষ্টি কলুষিত ও ভোগলোলুপ, অপরের দৃষ্টি পরম পবিত্র ও সাত্ত্বিক। সেই একই নারীর চিন্তায় তাই একজনের হল অধোগতি ও বিনাশ। কিন্তু অপরের কোন হানি হল না। কামিনীর ন্যায় কাঞ্চন সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। মোহদৃষ্টিতে অর্থবিত্তের অর্জ্জন ও ভোগ করলে তাতে ঘটে অনর্থ ও সর্ব্বনাশ। আর সেই অর্থকে লক্ষ্মী জ্ঞানে নিঃস্বার্থ সমাজসেবার উদ্দেশ্যে অর্জ্জন ও ব্যবহার

করলে তার দ্বারা লাভ হয় পরমার্থ ও পরমপদ। সুতরাং, বোঝা গেল—বিষয়বস্তুর সংস্পর্শে আসা বা প্রয়োজনমত তা ভোগ করা অন্যায় বা হানিকর নয়। দোষ হচ্ছে—অশুদ্ধ ভাব ও দৃষ্টি নিয়ে বিষয়ের চিন্তা ও সেবা করা।

বিষয়ভোগীর অধোগতির ক্রম

এক্ষণে বিষয়ভোগের দ্বারা ক্রমশঃ মানুষের কী ভাবে পতন ও অধোগতি ও অন্তিমে বিনাশ পর্য্যন্ত ঘটে একটি দৃষ্টান্ত সহায়ে তা বোঝার চেষ্টা করা যাক। বিনয় বাবু নামে এক ব্যক্তি গ্রাম্য জমিদার শ্রীযুক্ত শশীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের অধীনে গোমস্তার কাজ করেন। ভদ্রলোক বেশ শান্ত, ধীর, স্থির, নীতিমান ; যথাশক্তি ন্যায় ও নিষ্ঠার সহিত তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব উদ্‌যাপন ক'রে কয়েক বছরের মধ্যেই মনিবের বিশেষ বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলেন। পরন্তু, কর্ম্মব্যপদেশে নিরন্তর বিষয়সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা (ধ্যান) করতে করতে অলক্ষ্যে তাঁর মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটতে লাগল। তিনি কর্ত্তব্যপালনের নামে বিষয়চিন্তায় এতখানি বিভোর হয়ে পড়লেন যে তিনি তাঁর দৈনন্দিন সেবাপূজা, সন্ধ্যাবন্দনা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেলেন। এই ভাবে তাঁর মনে বিষয়সেবার প্রতি জাগল প্রগাঢ় আকর্ষণ (আসক্তি), আর এই আসক্তি হতে তাঁর মনে ধীরে ধীরে জেগে উঠল নিদারুণ লোভপ্রবৃত্তি (কাম)। মনিবের বিশ্বাসপরায়ণতার সুযোগ নিয়ে এক্ষণে তিনি তাঁর জমিদারীর কিয়দংশ গ্রাস করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অর্থের দ্বারা একজন উকিলকে বশীভূত ক'রে তার সহায়তায় তিনি ক্রমশঃ নিজের নামে কিছু দলিলপত্র প্রস্তুত করে নিলেন। এমন সময় অন্য একজন কর্ম্মচারী বিনয় বাবুর ছল-চাতুরীর ব্যাপারটি অবগত হয়ে তাঁকে একদিন তিরস্কার করে বললেন—"আপনার এতখানি অধঃপতন ঘটবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। আপনি সাবধান হোন, নচেৎ আমি আপনার কীর্ত্তিকলাপ জমিদার বাবুর দৃষ্টিগোচর করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করব না।"

বিনয় বাবু স্বীয় মতলব সিদ্ধির পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর হৃদয়-মনে এখন সম্পত্তি-লালসা ভীষণ প্রবল। বন্ধুবরের পরামর্শে সচেতন হওয়া দূরের কথা, তাঁকেই এক্ষণে তিনি তাঁর পথের কণ্টক ব'লে মনে করলেন এবং এই কারণে তাঁর প্রতি তাঁর মনে সঞ্চারিত হল ভীষণ রোষের

(ক্রোধ) ভাব। ধরাপৃষ্ঠ হতে তাঁকে উচ্ছেদ করার জন্য এক ডাক্তার-বন্ধুর সহায়তায় তিনি তাঁকে করলেন বিষ প্রয়োগ। বিনয় বাবুর কি ঘোর আত্মবিস্মৃতি! তিনি এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন—তিনি কি ছিলেন আর আজ কি করতে উদ্যত হয়েছেন (স্মৃতিভ্রংশ)।

বিষ প্রয়োগের ফলে ভদ্রলোক হাসপাতালে নীত হলেন। বিনয় বাবু সেবাশুশ্রূষার ছলে একদিন তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। চিকিৎসার ফলে ক্ষণেকের তরে রোগীর চৈতন্যোদয় হল এবং সম্মুখে বিনয় বাবুকে লক্ষ্য করে তিনি চীৎকার করে উঠলেন—"তুমিই তো আমার মৃত্যুর কারণ।" বন্ধুটির সংজ্ঞাপ্রাপ্তির লক্ষণ লক্ষ্য করে বিনয় বাবুর মনে ভয়ের সঞ্চার হল। তিনি তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য (বুদ্ধিনাশ) হয়ে তাঁর কণ্ঠরোধ ক'রে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। এই সময় সহসা বিনয় বাবুর এই কুকীর্ত্তি হাসপাতাল-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হল। সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাশ পাওয়ার ফলে বিনয় বাবুর বিরুদ্ধে কোর্টে ভীষণ মামলার সৃষ্টি হল। এই মামলায় তিনি ক্রমশঃ সর্ব্বস্বান্ত হলেন। এইরূপ সর্ব্বহারা অবস্থায় একদিন বিনয় বাবু তাঁর মানসিক যাতনার হাত হতে চিরনিষ্কৃতি পাওয়ার আশায় বিষভক্ষণ করে আত্মহত্যা করলেন (বিনাশ)।

বস্তুতঃ ভোগবুদ্ধি দিয়ে বিষয়সেবা করলে তার ক্রমিক পরিণতি কীরূপ হয়—উক্ত দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে তা বোঝা গেল। এক্ষণে কী ভাবে, কীরূপে বিষয়ের সেবা করলে আত্যন্তিক চিত্তপ্রসাদ লাভ করা যায়, নিম্নোক্ত শ্লোক দুটিতে তারই নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্ছে—

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪

অন্বয়—রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ তু বিষয়ান্ বিধেয়াত্মা চরন্ প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি॥ ৬৪

অনুবাদ—যিনি বিধেয়াত্মা (জিতেন্দ্রিয়) ও রাগ-দ্বেষ হতে মুক্ত, তিনি বশীভূত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়ভোগ করে শান্তিলাভ করেন॥ ৬৪

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫

অন্বয়—প্রসাদে অস্য সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে ; প্রসন্নচেতসঃ হি বুদ্ধিঃ আশু পর্য্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫

অনুবাদ—এইরূপ চিত্তপ্রসাদ লাভ হলে মানুষের সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে, কেন না প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি চিরপ্রতিষ্ঠিত॥ ৬৫

বিষয়সেবায় চিত্তপ্রসাদ লাভের উপায়

বিষয়সেবার ব্যাপারে গীতার প্রথম নির্দ্দেশ হচ্ছে—বিষয়ভোগ করার পূর্ব্বে ভোগ্য বিষয়ের প্রতি হৃদয়-মনের যে আত্যন্তিক আসক্তি ও দ্বেষবুদ্ধি বা ঘৃণার ভাব বিদ্যমান—তা সর্ব্বপ্রথমে পরিহার করা। কাজটি অবশ্য সহজ নয়। তবে এটা একান্তই প্রয়োজন। এ বিষয়ে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ প্রমুখ সকল মহাপুরুষই প্রযত্নশীল সাধকগণকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন—**এ সংসারে অসম্ভব বলে কোনও কাজ নাই। একের জীবনে যাহা সম্ভবপর হয়েছে, অন্যের জীবনে কেন তা সম্ভবপর হবে না?** হতাশা ও নিরাশার ভাব পরিহার করে সুনির্দ্দিষ্ট পথে আন্তরিকতা সহকারে নিরন্তর ও নিয়মিত চেষ্টা করলে কঠোরতম কাজও ধীরে ধীরে ক্রমশঃ সরল ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। আর এরূপ চেষ্টা-যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণকে একবার বশীভূত করতে পারলে, বিষয়সেবা ক'রেও অনাসক্তির ফলে ও আত্মনিষ্ঠার দ্বারা মানুষ আত্যন্তিক চিত্ত-প্রসাদ লাভ করতে পারে। এই ভাবে সাধকের জীবনে যখন সত্যকার প্রশান্তি লাভ হয়, তখন তার সকল দুঃখের অবসান ঘটে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ আর একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন,—যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। স্বীয় সখাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন—এরূপ গ্লানিমুক্ত, প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নিরন্তর আমাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ, যারা নির্ম্মল ও প্রসন্নচিত্ত তারাই সত্যকার ভগবদ্ভক্ত।

লৌকিক জগতে স্নেহশীল পিতা-মাতা যেমন আজ্ঞাধীন সন্তান-সন্ততির প্রতি স্নেহানুরক্ত হয়ে তাদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় যাবতীয় ভোগসুখের ব্যবস্থা করেন এবং আশা করেন, তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণ নিজেদের খেয়াল-খুশী বা উচ্ছৃঙ্খল ভোগলালসা পরিহার করে তাঁদের আদেশ-নির্দ্দেশমত শুদ্ধ ও সংযত চিত্তে তাঁদের প্রদত্ত বিষয়বস্তু ভোগ করে নিজেরা শান্তিলাভ করুক, পারমার্থিক জগতেও ঠিক তেমনি পরম কৃপালু পরমপিতা চান—তাঁর সৃষ্ট

জীবকুল তাঁর প্রদত্ত বিধিবিধান মান্য করে তাঁর বিহিত দ্রব্য-সামগ্রী ভোগ করে নিজেরা শান্তিলাভ করুক। বিষয়ভোগের এই শাশ্বত নীতি-নিয়ম বিস্মৃত হয়ে ভোগপ্রমত্ত হলেই মানুষের জীবনে আসে অশেষ দুঃখ, ক্লেশ ও দুর্গতি।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬

অন্বয়—অযুক্তস্য বুদ্ধিঃ নাস্তি ; অযুক্তস্য ভাবনা চ ন ; অভাবয়তঃ চ শান্তিঃ ন, অশান্তস্য সুখং কুতঃ॥ ৬৬

অনুবাদ—অযোগীর বুদ্ধি নাই, অযোগীর ধ্যানও নাই, ধ্যানহীনের শান্তি নাই, অশান্তব্যক্তির সুখ কোথায়॥ ৬৬

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধিয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ ৬৭

অন্বয়—চরতাং হি ইন্দ্রিয়াণাং যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে, তৎ বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব অস্য প্রজ্ঞাং হরতি॥ ৬৭

অনুবাদ—বিষয়ে বিচরণকারী ইন্দ্রিয়গণের যে কোনটিকে মন অনুসরণ করে, সেইটিই বায়ু যেমন জলের উপর নৌকাকে (চালিত করে)। তেমনি ভাবে ইহার (সাধকের) বিবেকবুদ্ধি হরণ করে॥ ৬৭

গীতামৃত—এরূপ অযুক্ত ব্যক্তির দুঃখের অন্ত নাই। বায়ু যেমন জলমধ্যস্থ ভাসমান তরণীকে নিরন্তর বিচলিত করে, তেমনি অযুক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়কুল বিষয়বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হয়ে তার প্রজ্ঞাকে হরণ করে ; অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তিহীন নাস্তিক, ভোগী ব্যক্তির অদৃষ্ট একান্ত দুঃখ ও গ্লানিময়। তাদের অধোগতি ও সর্ব্বনাশের পক্ষে একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য ও দৌরাত্ম্যই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে, সদগুরু বা শ্রীভগবানের ছত্রছায়াতলে যাঁরা অবস্থান করেন, তাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয়ের দ্বার প্রয়োজনমত বিষয় সেবা করলেও তাঁদের চিত্তের প্রশান্তি বিন্দুমাত্রও বিনষ্ট হয় না।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮

অন্বয়—মহাবাহো! তস্মাৎ যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্বশঃ নিগৃহীতানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮

অনুবাদ—হে মহাবাহো! ভালভাবে জেনে রেখো—যাদের মন ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, তারাই প্রকৃত জ্ঞানী ও স্থিতধী॥ ৬৮

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯

অন্বয়—সর্ব্বভূতানাং যা নিশা তস্যাং সংযমী জাগর্ত্তি ; যস্যাং ভূতানি জাগ্রতি পশ্যতঃ মুনে সা নিশা॥ ৬৯

অনুবাদ—সাধারণ জীবকুলের পক্ষে যা রাত্রি, সংযমী ব্যক্তি তাতে জাগ্রত থাকেন এবং যাতে অজ্ঞ প্রাণিগণ জাগ্রত থাকে, আত্মদর্শী মুনিগণের পক্ষে তাই রাত্রি স্বরূপ॥ ৬৯

সংযমী ও অসংযমী ব্যক্তির দৃষ্টিভেদ

এই ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য হচ্ছে—যারা অজ্ঞ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, যাদের মনোবুদ্ধি ভৌতিক স্তরে বিচরণশীল—আত্মতত্ত্ব বা ভগবৎ বিষয়ের চিন্তায় তাদের আদৌ প্রবৃত্তি বা রুচি হয় না। ভগবৎ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই তারা একান্ত চঞ্চল ও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে বা ঝিমিয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, যারাধর্ম্মপথের পথিক, আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি যাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ, তারা জাগতিক চিন্তা বা বিষয়ভোগের আবহাওয়াকে আদৌ পছন্দ করেন না। এরূপ ধর্ম্মহীন পরিবেশের মধ্যে তাঁদের মন অধীর অস্থির হয়ে ওঠে।

ইংরাজী প্রবাদবাক্যে বলা হয়—"God and Satan can not live together" ; এই প্রবাদবাক্যটি সর্ব্বদেশে সর্ব্বক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে জগাই ও মাধাই নামক দুটি ভ্রাতা বিষয়সেবায় প্রমত্ত হয়ে অধোগতির চরম সীমায় উপনীত। শ্রীচৈতন্যপার্ষদ হরিদাস ও নিত্যানন্দ জীবোদ্ধারের ব্রতভার নিয়ে যখন তাঁদের গৃহদ্বার দিয়ে কীর্ত্তন করতে করতে চলেছেন, তখন বিনা কারণে তারা উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের আক্রমণ করল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের আবেশে সুদর্শনচক্রকে আহ্বান করলেন দুর্বৃত্তের শাসনে। এইরূপ দেবাসুরের সংঘর্ষের বর্ণনা নিয়েই জগতের সকল দেশের পুরাণগুলি বিরচিত।

এক্ষণে সমুদ্রের সহিত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির তুলনা করে শ্রীভগবান্‌ বললেন—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে।
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০

অন্বয়—যদ্বৎ আপঃ আপূর্য্যমাণম্‌ অচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রং প্রবিশন্তি, তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ যং প্রবিশন্তি, স শান্তিম্‌ আপ্নোতি, কামকামী ন॥ ৭০

অনুবাদ—যেমন চতুর্দ্দিক হতে নদনদীর জলরাশি প্রশান্ত সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়ে বিলীন হয়ে যায়, ঠিক তেমনি যে মহাপুরুষ বিষয়সকলে প্রবিষ্ট হয়েও তাঁর মনে কোনরূপ বিক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারে না, তিনিই প্রকৃত শান্তিলাভ করেন ; ভোগকামী ব্যক্তিগণ নয়॥ ৭০

প্রকৃত সংযমী ব্যক্তি সমুদ্রবৎ প্রশান্ত

সমুদ্র কদাপি স্বীয় সীমা লঙ্ঘন করে না। তার বক্ষোপরি যত বীচিবিক্ষোভ হউক না কেন, বহিরাগত অগণিত নদনদীর উচ্ছ্বসিত জলপ্রবাহ যত বেগবান হোক না কেন—সে তাতে কখনও বিন্দুমাত্র বিচলিত বা বিক্ষুব্ধ হয় না। সর্ব্বাবস্থায় সমুদ্র নিরন্তর নিজের গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্য রক্ষা করে চলে। জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের মানসিক অবস্থাও ঠিক তদনুরূপ। এই পাঞ্চভৌতিক জগতে প্রতিনিয়ত রূপরসাদি ভোগ্যবস্তুর আবেদন তাঁর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে প্রবেশ করছে, কিন্তু ইহাতে তাঁর মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় নির্ব্বিকার ও প্রশান্ত। কিন্তু যারা ভোগী—বিষয়ের প্রতি যাদের নিরন্তর লোলুপদৃষ্টি, তারা প্রতিনিয়ত আকাঙ্ক্ষিত ও অভিপ্রেত বিষয়সমূহের পশ্চাতে ধাবিত হয়ে তাদের প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি ও ক্ষতির চিন্তায় নিরন্তর উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকে। ভোগের নেশায় তাদের চিত্ত সর্ব্বক্ষণ অশান্ত ও উদ্বেলিত। এরূপ ভোগকামীদের দুঃখ-অশান্তির শেষ নাই। গীতার মতে ভোগলালসাহীন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন। জাগতিক মায়ামোহ তাঁদিগকে স্পর্শ করতে পারে না।

বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ব্বান্‌ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৭১

অন্বয়—যঃ পুমান্‌ সর্ব্বান্‌ কামান্‌ বিহায় নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ নিস্পৃহঃ স শান্তিম্‌ অধিগচ্ছতি॥ ৭১

অনুবাদ—যিনি সর্ব্ববিধ কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমতাশূন্য হয়ে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তিনি শান্তিলাভ করেন॥ ৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ৭২

অন্বয়—পার্থ! এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ, এনাং প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি অন্তকালে অপি অস্যাং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণম্‌ ঋচ্ছতি॥ ৭২

অনুবাদ—হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এই প্রকার ; ইহা প্রাপ্ত হলে আর বিমুগ্ধ হয় না। মৃত্যুকালেও এই অবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক সাধক ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন॥ ৭২

স্থিতপ্রজ্ঞের এই চরম শান্তির অবস্থার বর্ণনা করে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হ'ল। গীতার মতে ইহাই মনুষ্য জীবনের চরম গতি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ—কর্ম্মযোগঃ

অর্জ্জুনের হৃদয়-মন নিদারুণ দ্বিধা-সংশয়ে আচ্ছন্ন। জ্ঞানের পথ শ্রেয়ঃ, না কর্ম্মের পথ শ্রেয়ঃ—ইহাই তাঁর সন্দেহ-সংশয়ের কেন্দ্রবিন্দু। বস্তুতঃ এই সন্দেহ নিয়েই গীতাধর্ম্মের অবতরণিকা এবং এই সংশয়ের নিরসনের প্রসঙ্গ নিয়েই গীতার উপদেশপ্রবাহ। আর এই সংশয়ের চরম সমাধানেই গীতাজ্ঞানের পরিসমাপ্তি।

শুধু গীতা নয়, গীতার ন্যায় বহু উপনিষদ ও অন্য অনেক আর্যশাস্ত্র এইরূপ প্রশ্নোত্তরের ধারায় রচিত। এতেই প্রমাণ হয়—লৌকিক জ্ঞানের ন্যায় অধ্যাত্ম-জ্ঞান লাভের নিমিত্তও ইত্যাকার সংশয়-সন্দেহের প্রাথমিক আবশ্যকতা অনস্বীকার্য্য। তবে, এস্থলে জানা প্রয়োজন—জিজ্ঞাসা বা সংশয়ের স্থান থাকলেও গীতা বিচারহীন সন্দেহ-সংশয়ের চরম পরিণাম স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—সংশয়ী ব্যক্তির অন্তিম পরিণাম হচ্ছে বিনাশ বা মৃত্যু। বলা বাহুল্য, অর্জ্জুন এই স্তরের বিবেকহীন সংশয়ী নন। তিনি হচ্ছেন সদ্‌গুরুরূপী শ্রীভগবানের আদর্শ জিজ্ঞাসু শিষ্য বা ভক্ত। এই প্রসঙ্গে আমরা যারা গীতাপ্রেমী, তাদের জানা প্রয়োজন—আমরা যদি সত্য সত্যই গীতাজ্ঞানের অধিকারী হতে চাই, তবে আমাদের অর্জ্জুনের ন্যায় শ্রদ্ধালু জিজ্ঞাসু হওয়া একান্ত আবশ্যক। অর্জ্জুনের ন্যায় আমাদের কর্ত্তব্য—সদ্‌গুরুর চরণে প্রাণ খুলে অন্তরের প্রশ্নগুলি একের পর এক নিবেদন বা উপস্থাপিত করা।

পূর্ব্বে বলেছি—অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা এখানে মানব-জীবনের চরম সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের উপযোগিতার বিষয় নিয়ে। প্রথম হতেই ভীষণ কর্ম্মবিতৃষ্ণার মনোভাব নিয়েই তাঁর এই জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। বলা বাহুল্য, বিষাদযোগের প্রাথমিক লক্ষণরূপে অর্জ্জুনের মনে জ্ঞাতিবধের আশঙ্কাসূত্রে যে বিষয় বৈরাগ্য বা নির্ব্বেদের ভাব সৃষ্ট হয়, মূলতঃ তাই তাঁর এই কর্ম্মকুণ্ঠার মৌলিক কারণ। জীবনযুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রত্যেক মানুষের প্রাণে একদিন না একদিন এইরূপ অবস্থার আবির্ভাব

একান্তই স্বাভাবিক। অধ্যাত্ম বিকাশের পথে—জীবনপ্রবাহের এক স্তরে এইরূপ সন্দেহ ও জিজ্ঞাসার মনোভব একান্ত প্রয়োজনও বটে। ইহা ব্যতীত উচ্চতর জ্ঞানলাভের আশা আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত হয় না।

আমরা ইহাও লক্ষ্য করেছি—দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠার আলোচনা প্রসঙ্গে 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' এবং 'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়'—এই দুটি বাক্যে কর্ম্মযোগের যা মূলসূত্র বা সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে তার সূচনা দেওয়া হয়েছে। পরন্তু, পরক্ষণেই তার পরবর্ত্তী শ্লোকে যখন বলা হয়েছে—'দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়'—বুদ্ধিযোগ হতে কর্ম্ম নিকৃষ্ট, তখনই অর্জ্জুনের মনে পুনরায় সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে—বুদ্ধিযোগের চেয়ে যখন কর্ম্ম নিকৃষ্ট, তখন কর্ম্মের ঝুঁকি বা দায়িত্বভার নিয়ে লাভ কি? তা ছাড়া, কর্ম্ম করতে গেলেই তো কর্ত্তৃত্বাভিমান, ফলাসক্তি প্রভৃতি দোষগুলি এসেই যায় এবং সেগুলি এড়িয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ভাবে কর্ম্ম করা অত্যন্ত কঠিন। পক্ষান্তরে, জ্ঞানের পথে অগ্রসর হলে এই সব জটিলতার সম্ভাবনা নাই। তাই অর্জ্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে জ্ঞানীর লক্ষণ ও আচরণ কীরূপ তা জানার জন্য এতখানি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

এক্ষণে, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই সন্দিগ্ধ মনে অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করলেন—

অর্জ্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ১

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ। জনার্দ্দন! চেৎ কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী তে মতা তৎ কেশব! কিং ঘোরে কর্ম্মণি মাং নিয়োজয়সি॥ ১

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন, হে জনার্দ্দন, যদি তোমার মতে কর্ম্ম হতে বুদ্ধি বা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে, হে কেশব, তুমি আমাকে হিংসাত্মক কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করছ?॥ ১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্॥ ২

অন্বয়—ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব ; যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াং তৎ একং নিশ্চিত্য বদ॥ ২

অনুবাদ—বিমিশ্র বাক্যের দ্বারা তুমি আমার মনকে কেন এই ভাবে বিভ্রান্ত করছ? যার দ্বারা আমি শ্রেয়ঃ লাভ করতে পারি, সেই পথটি আমাকে নিশ্চিত করে বল॥ ২

সংশয়প্রবণতা মনের অন্যতম লক্ষণ

মানস শাস্ত্রমতে সংশয়প্রবণতা মনুষ্যমনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সাধনা প্রভাবে মানুষ যতদিন না চরম একত্বের স্থিতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন তার মন চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত থাকবেই এবং এই অবস্থায় তার মনে নানাপ্রকার দ্বিধা-সংশয়ের তরঙ্গ-প্রবাহও উত্থিত হবে। সাধারণতঃ দেখা যায় কাহারও সমক্ষে যখন অনুসরণ করার মত একটি মাত্র আদর্শ বা পথ বিদ্যমান থাকে, তখন তার অন্তঃকরণে ভাল-মন্দের তেমন কোনও প্রশ্নই জাগ্রত হয় না। সে তখন নিশ্চিন্ত মনে সেই আদর্শ বা পন্থাটি অনুসরণ করে এগিয়ে যায়। কিন্তু যখন তার সমক্ষে একাধিক আদর্শের প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়, তখন তার মনে স্বভাবতঃই এই চিন্তা জাগ্রত হয়—এদের মধ্যে কোন্‌টি তার পক্ষে অধিকতর হিতকর বা উপযোগী।

অর্জ্জুনের সমক্ষে এক্ষণে এইরূপ একটি জটিল সমস্যা আবির্ভূত। তাঁর পুরোভাগে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটি পথ উপস্থাপিত। কর্ম্মের পথটিতে আবার হিংসাত্মক স্বজনবধের আশঙ্কা। তিনি তাই এক্ষণে বিষম সঙ্কটের সম্মুখীন। অর্জ্জুন এই কারণে স্বীয় সখা শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—"তুমি কখনও জ্ঞানের প্রশংসা, আবার কখনও কর্ম্মের প্রশংসা করে আমাকে এরূপ বিভ্রান্ত করছ কেন? তোমার এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমি সত্য সত্যই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। তুমি যদি আমার সত্যকার হিতৈষী হও তবে এই দুইটির মধ্যে আমার পক্ষে যেটি অপেক্ষাকৃত সরল ও উপযোগী, সেইটিই নির্দ্দিষ্ট করে বল—যাতে আমি নিশ্চিন্ত মনে সেই পথে অগ্রসর হয়ে পরম শান্তি ও মুক্তির অধিকারী হতে পারি।

অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বললেন—

শ্রীভগবান্ উবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—অনঘ, অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তা ; জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন, হে অনঘ! ইহলোকে দু'প্রকার নিষ্ঠা বিদ্যমান, ইহা আমি পূর্ব্বেই বলেছি ; জ্ঞানযোগে জ্ঞানীদের, কর্ম্মযোগে কর্ম্মীদের॥ ৩

দ্বিবিধা নিষ্ঠা

এই জগতে প্রাচীন কাল হতে দুই শ্রেণীর সাধক পরিদৃষ্ট হন সাংখ্যবাদী ও কর্ম্মবাদী। প্রকৃতিভেদের জন্য এঁদের রুচি ও নিষ্ঠা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাংখ্যবাদীদের নিষ্ঠা জ্ঞানে এবং কর্ম্মবাদীদের নিষ্ঠা কর্ম্মে। সুতরাং, এঁদের দুই-এর মধ্যে উত্তম অধমের প্রশ্নই অবান্তর। তবে হে সখে, এই প্রসঙ্গে তোমার একটি বিষয় জানবার আছে, আর তা হচ্ছে—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪

অন্বয়—পুরুষঃ কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং ন অশ্নুতে ; সংন্যসনাৎ এব চ সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি॥ ৪

অনুবাদ—কর্ম্ম না করে কেহই নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা লাভ করতে পারে না ; আর কর্ম্ম ত্যাগ করলেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না॥ ৪

গীতামৃত—কর্ম্মবিতৃষ্ণ অর্জ্জুনের মনোবুদ্ধি নৈষ্কর্ম্ম্যমূলক জ্ঞানবাদের পক্ষপাতী। তাঁর এই ধারণা যে ভ্রান্ত ও অমূলক তা তাঁকে বোঝাবার জন্য শ্রীভগবান্ বললেন—"হে পার্থ, কর্ম্ম না করে জ্ঞানের পথ অনুসরণ করলেই মানুষ সহজে সিদ্ধিলাভ করতে পারে, তোমার এই যে ধারণা তা একান্তই ভ্রান্ত। কর্ম্ম করা ছাড়া মানুষের দেহ-মনের তমোভাব বিনষ্ট হয় না। মানব সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদংশ তমোগুণাচ্ছন্ন। স্বভাবতঃ জাড্যভাবাপন্ন বলেই

তারা কর্ম্মকুণ্ঠ ও আয়াসপ্রিয়। কর্ম্মপ্রচেষ্টা অপেক্ষা কর্ম্মত্যাগেই তাই এদের অধিকতর রুচি। তাছাড়া, সব দেশেই আর একশ্রেণীর লোক আছে—যারা বাহ্যতঃ সাত্ত্বিকতার ভান করে, পরন্তু তারা অন্তরে অন্তরে তামসিক। এরাও কর্ম্মবিতৃষ্ণ, তবে এরা তাদের এই কর্ম্মকুণ্ঠাকে নানাপ্রকার যুক্তির দোহাই দিয়ে তার সমর্থন করতে উদ্যত হয়।

ভারতের সহস্র সহস্র দায়িত্বজ্ঞানহীন উদাসীন ও কর্ম্মকুণ্ঠ তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসীরাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এরা অনাসক্তি বা বৈরাগ্যের দোহাই দিয়ে তাদের প্রকৃতিগত আলস্য-ঔদাস্যকে সমর্থন করার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, মহাবীর অর্জ্জুনের বর্ত্তমান মানসিকতাও অনেকখানি এই ধরণের। ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব হওয়ায় অর্জ্জুনের স্বভাবধর্ম্ম রাজসিক এবং এই কারণে কর্ম্মেই তাঁর রুচি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে তিনি জ্ঞাতিবধমূলক হিংসাত্মক যুদ্ধভয়ে ভীত ও কাতর হয়ে এক্ষণে কর্ম্মকুণ্ঠার প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং তাকে তিনি নানা প্রকার দার্শনিকতার যুক্তিজাল দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত।

তথাকথিত সাত্ত্বিকতাবাদী দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্ম্মকুণ্ঠ সন্ন্যাসী-সমাজের সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দ স্বীয় ত্যাগী পার্ষদগণকে বলেছেন—"**সন্ন্যাসীর জীবনের নূতন আদর্শ দেশকে দেখাইতে হইলে তোমাদের ন্যায় এরূপ কতক সন্ন্যাসীকে জীবজগতের মহাকল্যাণ ও মহামুক্তি বিধানার্থে শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া দেহের বিন্দু বিন্দু পবিত্র শোণিত দেশের এই মহামলিনতা বিমোচনার্থে ব্যয় করিতে- হইবে। ঘোর তমসাচ্ছন্ন সন্ন্যাসী-সমাজের কলঙ্ক-কালিমা দূর করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট কর্ম্মশক্তি জাগাইয়া দিতে হইবে।**"

প্রশ্ন আসে—সাত্ত্বিক প্রকৃতির একশ্রেণীর লোকেরা কর্ম্মত্যাগের জন্য উৎকণ্ঠিত হন কেন? উত্তরে বলা যায়—এই সমস্ত ধর্ম্মভীরু লোকেরা মনে করেন—জীবনের চরম লক্ষ্য যখন শান্তি এবং সেই শান্তি যখন সমাধিগম্য, আর সেই চরম সমাধির অবস্থা যখন মনের পরম নিবৃত্তিমূলক সাম্যাবস্থা ব্যতীত লাভ করা যায় না, তখন সাধনার পথে নিরর্থক কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিয়ে মনকে অশান্ত ও চঞ্চল করে তোলা কেন? এইরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিলে তো কোন কালে মানসিক স্থৈর্য্য লাভ করা সম্ভবপর হবে না। তখন তো মন কর্ম্ম হতে কর্ম্মান্তরেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করতে থাকবে।

বস্তুতঃ, এইরূপ ধারণার বশে এঁরা কর্ম্মমাত্রকেই সদোষ বা দোষযুক্ত বলে মনে করেন। পরন্তু এঁরা বিস্মৃত হন যে দেহমনের তামসিক জড় অবস্থাকে জয় করার নিমিত্ত সাধনার প্রাথমিক স্তর কিছুকাল রজোগুণের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য্য। জ্ঞানবাদী আচার্য্যগণ এজন্য প্রবর্ত্তক শিষ্যদের জন্য ধ্যান, জপ ছাড়াও আচার্য্যের সেবা-শুশ্রূষামূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার অনুশাসন দিয়েছেন। তাঁদের নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত—ইত্যাকার গুরু সেবামূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টা ব্যতীত আশ্রিত সাধক-শিষ্যের দেহমনের তমোভাব নিঃশেষে বিদূরিত হবার নয়। নবযুগের উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দও বর্ত্তমান ভারত-ভারতীর এই জঘন্য তামসিকতাকে লক্ষ্য করে কটাক্ষের সুরে হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন—"**দেওয়াল চুরি করে না, মিথ্যা কথা বলে না, অনাচার করে না, ব্যভিচার করে না, তাই বলে কি দেওয়াল সাধু? মানুষ অন্যায় করে, অনাচার করে, চুরি-ডাকাতি করে, আবার সেই মানুষ সৎচিন্তা ও সৎকর্ম্ম করে পরম সাধুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।**"

বলা বাহুল্য, স্বামীজীর এই উক্তি শ্রুতিকটু হলেও ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় এটি একটি মহতী সতর্কবাণী।

এই বাস্তবজগতে কর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত জীবের যে গত্যন্তর নাই—সেই বিষয়টি পরিস্ফুট করার জন্য শ্রীভগবান্ পরবর্ত্তী শ্লোকে সুস্পষ্টভাষায় বললেন—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৫

অন্বয়—জাতু কশ্চিৎ ক্ষণম্ অপি অকর্ম্মকৃৎ ন হি তিষ্ঠতি ; হি প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ অবশঃ সর্ব্বঃ কর্ম্ম কার্য্যতে॥ ৫

অনুবাদ—কেহ কখনও ক্ষণকালের জন্যও কর্ম্ম না করে থাকতে পারে না ; কেন না, প্রকৃতির প্রভাবে অবশ হয়ে সকলে কর্ম্ম করতে বাধ্য হয়॥ ৫

ত্রিগুণাত্মক সংসারে কর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক

জীবজগৎ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সৃষ্টি। অর্থাৎ, এই জগতের পশ্চাতে কারণরূপে ত্রিগুণের খেলাই বিদ্যমান। এখানে তাই এমন কিছু নাই—যা

ত্রিগুণের প্রভাব হতে পরিমুক্ত। আর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ যেখানে বিদ্যমান, সেখানে সেই গুণের প্রভাবে জীবহৃদয়ে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন প্রকার কর্ম্মপ্রেরণা যে জাগ্রত থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। মানুষ তাই এ জগতে কখনও কর্ম্মহীন থাকতে পারে না। বস্তুতঃ, একেবারে 'নিষ্ক্রিয়' বলে কোনও অবস্থা এ জগতে নাই। কেবলমাত্র নির্ব্বিকল্প সমাধির সেই চরম স্থিতিতে সম্পূর্ণ বৃত্তিশূন্য অবস্থাতে যখন মনের সম্পূর্ণ নাশ হয়, তখনি মাত্র মানুষ কর্ম্মহীন অবস্থা লাভ করে। সেই অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে ও পরে মানুষের দেহ-মনে কিছু-না-কিছু কর্ম্ম-প্রচেষ্টা থাকবেই। মানুষ ইচ্ছা করেও এই অবস্থা অতিক্রম করতে পারে না। কেন না, সমাধিলাভের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অবস্থায় মানুষ প্রকৃতিরই অধীন। দেহধর্ম্মের প্রভাবে তখন তাকে প্রকৃতির বশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনও-না-কোন প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত হতে হয়।

যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি মিথ্যা জ্ঞান-বৈরাগ্যের নামে কর্ম্মত্যাগে উদ্যত হয়, তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে শ্রীভগবান্ পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্লেষের সুরে বললেন—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬

অন্বয়—যঃ বিমূঢ়াত্মা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে, সঃ মিথ্যাচারঃ উচ্যতে॥ ৬

অনুবাদ—যে ভ্রান্তমতি ব্যক্তি হস্তপদাদি বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সংযত করে শান্তভাবে অবস্থান করে, অথচ মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের স্মরণ মনন করে সে মিথ্যাচারী॥ ৬

গীতামৃত—পূর্ব্বে বলা হয়েছে—দেহধারী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। তথাপি এই সত্য-সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করে এক শ্রেণীর লোক বাহ্য কর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিহার করে স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করে। তাদের ইত্যাকার প্রচেষ্টা কপট ভণ্ডামি মাত্র। কারণ, বাহ্যদৃষ্টিতে তারা কর্ম্মবিরত হলেও তাদের মন কদাপি মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ম্মহীন থাকে না। তাদের ভোগপ্রবণ মানসিক প্রবৃত্তিগুলি এই অবস্থাতেও প্রবলতররূপে সক্রিয়

থাকে। এই সময়ে মনে মনে তারা নিরন্তর এমন সব ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা করে যা তাদের দেহমনের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকর। আর তার পরিণামে একদিকে যেমন তাদের মানসিক সারল্য ও সততা বিনষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি ইত্যাকার জল্পনা-কল্পনা দ্বারা তাদের ভোগলালসা ক্রমশঃ আরও জটিলতাপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে। প্রচ্ছন্ন তুষানল যেমন লোকলোচনের অন্তরালে নির্ব্বাপণের সুযোগের অভাবে অলক্ষ্যে ক্রমবর্দ্ধিত হয়ে ভবিষ্যতে বিপুল ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে, অতৃপ্ত ভোগ-লালসার প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ ভীষণ কুফলপ্রসূ হয়। এরূপ কপট বিষয়সেবিগণ গুপ্তঘাতকের ন্যায় অত্যন্ত মারাত্মক। যে সমাজে এরা নির্ব্বিবাদে প্রশ্রয় পায় সে সমাজের ভবিষ্যৎ যে ভয়াবহ হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। লক্ষ লক্ষ তথাকথিত ধার্ম্মিক ও আস্তিক্যবাদীদের দ্বারা পরিসেবিত বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের দুর্গতির অন্যতম মুখ্য কারণও ইহাই। এই সব কপট, ভণ্ড ও প্রচ্ছন্ন ভোগবাদীদের তুলনায় সরল, উদ্দাম ভোগবাদীদের কর্ম্মোদ্যম মন্দের ভাল। কেন না, এইরূপ উন্মুক্ত ভোগবাদীদের ভোগাসক্তি তাদের প্রবল রাজসিক কর্ম্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা অতি সত্বর কটুতিক্ত অভিজ্ঞতা লাভের পরে সংযত হবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, প্রচ্ছন্ন ভোগবাদীরা সে সুযোগে বঞ্চিত হওয়ায় সুদীর্ঘকাল যাবৎ হৃদয়ে মনে নিদারুণ কুম্ভীপাক নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।

বস্তুতঃ দীর্ঘকাল পরতন্ত্রতার ফলে ভারতবাসীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ঐ প্রকার তামসিক ভোগপ্রবণতা নানাভাবে প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। তাই এদেশে কপট ধর্ম্মধ্বজীদের এরূপ সংখ্যাধিক্য। স্বাধীনতা লাভের পরেও তাই আজ নানা সূত্রে তাদের সেই অনাচার ও দুর্নীতিপ্রবণতা সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকে এতখানি কলুষিত ও বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য চাই—ভারতের জাতীয় জীবনে প্রবল উদ্যম উৎসাহের লাভাপ্রবাহের সঞ্চার। এজন্য তাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক—ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জ্বলন্ত জীবন্ত নৈতিক আদর্শের প্রচার, প্রসার। আর ইত্যাকার প্রচারব্রতের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী আধার হচ্ছে গীতোক্ত কর্ম্মযোগের এই সমুজ্জ্বল আদর্শ। বস্তুতঃ, এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে ভারতের তথা সমগ্র জগতের নূতন জীবনবেদ।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭

অন্বয়—অর্জ্জুন, তু যঃ ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্‌ আরভতে স বিশিষ্যতে॥ ৭

অনুবাদ—যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সংযত করে অনাসক্ত হয়ে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগের আরম্ভ করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ॥ ৭

গীতোক্ত কর্ম্মকৌশল

কর্ম্মেন্দ্রিয়কে শান্ত, সংযত রেখে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহায়তায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের স্মরণ মনন করলে কীরূপ বিকৃত পরিণাম ঘটে—তা পূর্ব্বশ্লোকে ভালভাবে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে, তদ্বিপরীত আচরণ করলে অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে স্থির ও সংযত রেখে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের সেবা করলে কীরূপ সুফল লাভ করা যায়—এই শ্লোকে তাই বোঝান হচ্ছে।

এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম করার জন্যই এখানে জীবের সৃষ্টি এবং এই কারণে জীবহৃদয়ে কর্ম্মপ্রবৃত্তি বিদ্যমান। তবে কর্ম্ম করার যে ভাগবত বিধান তা অবগত না হলে কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন ও দুর্গতিরই সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে, এই বিধানটি অবগত হয়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হলে, তার দ্বারা সাধিত হয় ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি, অভ্যুদয় ও কল্যাণ।

এই প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক—ইন্দ্রিয়গণের রাজা মন পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিরন্তর সদসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত। এই সংসারে অধিকাংশ নরনারী অজ্ঞানতাবশতঃ কর্ম্ম করে বলে লক্ষ লক্ষ জন্ম সংসারবন্ধনে ক্লিষ্ট ও পীড়িত হয়। অন্যদিকে, যাঁরা কর্ম্মযোগের কৌশল অবগত, তাঁরা মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রেখে অনাসক্ত হয়ে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় কর্ম্ম করেন এবং তার ফলে তাঁরা প্রকৃত শক্তি ও শান্তি লাভ করে ধন্য হন।

বস্তুতঃ কর্ম্মীর মন যেখানে শান্ত, সংযত ও বন্ধুর ন্যায় সাহায্যকারী, সেখানে নিরন্তর কর্ম্ম করেও তিনি শুদ্ধ ও অনাসক্ত থাকতে সমর্থ। আর যেখানে তার অভাব সেখানে বাহ্যকর্ম্ম পরিহার করেও কর্ম্মী মানসিক গ্লানি ও মোহাসক্তিতে নিয়ত অভিভূত ও ক্লিষ্ট।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৮

অন্বয়—ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু, হি অকর্ম্মণঃ কর্ম্ম জ্যায়ঃ। অকর্ম্মণঃ তে শরীর যাত্রা অপি চ ন প্রসিধ্যেৎ॥ ৮

অনুবাদ—তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর ; কর্ম্মশূন্যতা অপেক্ষা কর্ম্ম করা উৎকৃষ্ট। কর্ম্ম না করলে শরীরযাত্রাও নির্বাহিত হয় না॥ ৮

গীতামৃত—অর্জ্জুনের কর্ম্মবিতৃষ্ণ মনকে কর্ম্মে উদ্দীপ্ত করাই যেন এক্ষণে গীতাকারের মুখ্য প্রচেষ্টা। সর্ব্বনিম্নস্তরের সাধারণ জীব অলস, অবশ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। এই স্তরে যারা নিমজ্জিত, তাদের মনোবুদ্ধি একান্ত আচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন। এই অবস্থা হতে উত্তীর্ণ হতে না পারলে জীবের উর্দ্ধ্বগতি সম্ভব নয়। এই জড় তামসিক স্তরকে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন—বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনাযুক্ত কর্ম্মপ্রবৃত্তি। আর এ জন্যই গীতার নির্দ্দেশ—“কর্ম্ম জ্যায়ো হি অকর্ম্মণঃ” ; কর্ম্ম না করে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে কর্ম্ম করা হাজার গুণ ভাল। “It is better to wear out than to rust out”. শুয়ে বসে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে তিল তিল করে মরার চেয়ে বীরের ন্যায় কাজ করতে করতে মরণ বরণ করা শ্রেয়।

মানুষের প্রাণে যখন দুর্ব্বার কর্ম্মপ্রেরণা জাগ্রত হয়, তখন তার দেহ-মন-হৃদয়ের প্রসুপ্ত শক্তি একদিকে যেমন ভীমবেগে জেগে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি তার জীবনের গতিপথে যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি লক্ষিত হয় তাও ক্রমশঃ দূরীভূত হয়ে যায়। প্রবল খরস্রোতা নদীর গর্ভে রাশি রাশি আবর্জ্জনা নিক্ষিপ্ত হলেও তা যেমন মুহূর্ত্তে প্রবাহমুখে কোথায় বিলীন হয়ে যায়, প্রচণ্ড কর্ম্মময় জীবনেও তদ্রূপ ঘটাই স্বাভাবিক।

এই শ্লোকে ভগবান্‌ আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করে বললেন—কর্ম্ম না করলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। ‘ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ’—এতবড় শক্তিমান যে পশুরাজ সিংহ তার মুখগহ্বরেও তার আহার্য্যরূপে মৃগ আপনা-আপনি প্রবিষ্ট হয় না। তাকেও শিকার সংগ্রহের জন্য প্রয়োগ করতে হয় প্রবল পুরুষার্থ। এতেই স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় —ভৌতিক স্তরের অভাব, দারিদ্র্য, দুঃখ, দৈন্য বিনা প্রচেষ্টায় দূর হবার নয়।

নিয়ত কর্ম্ম কি?

এই শ্লোকে যে 'নিয়ত কর্ম্মের' কথা বলা হয়েছে, সেই নিয়ত কর্ম যে কি—তাই নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। বাংলাভাষায় 'নিয়ত' শব্দটির সাধারণ অর্থ নিরন্তর বা নিরবচ্ছিন্ন। তাই তাদের কেহ কেহ 'নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং'—এই অংশটির অর্থ করেন, 'তুমি নিরন্তর কর্ম্ম কর'। 'নিয়ত' শব্দটির ধাতুগত অর্থ কিন্তু নিয়ন্ত্রিত বা বিহিত। তবে এই অর্থেও প্রাচীন টীকাকারগণের অনেকেই 'নিয়ত কর্ম্ম' বলতে মাত্র সন্ধ্যোপাসনা ও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের উপদেশ দেন নি। তা ছাড়া, এখানে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যও কর্ম্ম করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, এ স্থলে নিয়ত কর্ম্মের ব্যাখ্যা অতি ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করা সমীচীন। বস্তুতঃ, 'নিয়ত কর্ম্ম' বলতে এখানে শাস্ত্রবিহিত যাবতীয় কর্ম্মপরম্পরাকে লক্ষ্য করা হয়েছে। প্রাতঃকাল হতে স্বায়ংকাল এবং সায়ংকাল হতে পুনরায় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মানুষ যে সমস্ত কর্ম্ম করে, তৎসমুদয় শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানানুযায়ী করাই 'নিয়ত কর্ম্ম'। পরবর্ত্তী শ্লোকটিতে এই অর্থ ব্যক্ত করে শ্রীভগবান্ বললেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯

অন্বয়—যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ, কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ তদর্থং কর্ম্ম সমাচার॥ ৯

অনুবাদ—যজ্ঞের জন্যই কর্ম্ম করা উচিত। এরূপ না করলে কর্ম্মবন্ধন সৃষ্ট হয়। সুতরাং হে কৌন্তেয়, তুমি অনাসক্ত হয়ে যজ্ঞের নিমিত্ত সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর॥ ৯

যজ্ঞের তাৎপর্য্য

এই প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক—'যজ্ঞ' শব্দটির অর্থ নিয়েও টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। বেদে 'যজ্ঞ' শব্দের যে অর্থ পরিদৃষ্ট হয় তা দু-প্রকার। 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ'—যজ্ঞ মানে বিষ্ণু। যজ্ঞের দ্বিতীয় অর্থ বিষ্ণু বা ভগবানের প্রীতির জন্য অগ্নিহোত্রাদি হোম-যাগের অনুষ্ঠান। আবার 'বিষ্ণু'

শব্দের অন্য অর্থ হচ্ছে 'ব্যাপ্তি বা 'বিশ্বচরাচর'। এই অর্থে বিশ্বজীবের হিতার্থে যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই যজ্ঞ। 'যজ্ঞ' শব্দের অপর অর্থ হচ্ছে ত্যাগ (Sacrifice)। আর এই অর্থে যাবতীয় নিঃস্বার্থ ত্যাগমূলক কর্ম্মই যজ্ঞ। গীতা মুখ্যতঃ 'যজ্ঞ' শব্দের শেষোক্ত ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করেছেন।

যজ্ঞের বিকৃত ধারণা

বর্ত্তমান যুগেও গীতাধর্ম্মের ব্যাপক প্রচার ও চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় দান ও সেবামূলক কর্ম্মকে 'যজ্ঞ' শব্দে অভিহিত করার একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষিত হচ্ছে। যেমন বলা হয়—শ্রমযজ্ঞ, সূত্রযজ্ঞ, ভূদানযজ্ঞ, নেত্রযজ্ঞ ইত্যাদি। তবে, এ প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে ত্যাগ ও সেবার নামে অধুনা যে একপ্রকার সঙ্কীর্ণতার মনোভাব লক্ষিত হচ্ছে তাকে 'যজ্ঞ' বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবামূলক কর্ম্মও এক দৃষ্টিতে যজ্ঞ। তবে সেই স্বদেশ ও স্বধর্ম্মসেবার আদর্শ যদি সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক হয়—তাহলে তা কদাপি যজ্ঞরূপে বিবেচিত হতে পারে না। অর্থাৎ, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদার, উদাত্ত ও নিঃস্বার্থ—তাই ভাগবত কর্ম্ম—তাই 'যজ্ঞ'।

বস্তুতঃ, জীবন্ত জাগ্রত সদ্গুরুর নির্দ্দেশ ব্যতীত যজ্ঞতত্ত্বের মীমাংসা করা অসম্ভব। গীতা এই জন্য গুরুমুখী। সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দও এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ স্বীয় আশ্রিত সন্তানগণকে লক্ষ্য করে নির্দ্দেশ দিয়েছেন—"সঙ্ঘনেতার অভিপ্রেত ও ঈপ্সিত যে কর্ম্ম নয়—তাহা করিলে ধর্ম্মজীবনের মূলে নিদারুণ কুঠারাঘাত করা হইবে। তোমাদিগকে যে স্থানে রাখিয়া, যেরূপ কর্ম্মের ভিতর দিয়া পরিচালনা করিলে তোমাদের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে ও আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইবে, তোমাদিগকে ঠিক সেই স্থানে রাখিয়া, সেইরূপ কর্ম্মের ভিতর দিয়া পরিচালনা করা হইতেছে ও হইয়া থাকে।"

অন্যত্র তিনি বলেছেন—"প্রতিনিয়ত গুরুর নির্দ্দেশিত কর্ম্মের ভিতরে আপনাকে ডুবাইয়া রাখ—তবেই তোমাদের উন্নতি হইবে। যে যেরূপ কার্য্যে যেখানে নিযুক্ত হইয়াছ, ধৈর্য্যসহকারে তাহাই করিয়া যাও—তবেই তোমাদের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে।"

বলা বাহুল্য, 'নিয়ত কর্ম্ম' বলতে গীতা এস্থলে এরূপ সদগুরুনির্দ্দিষ্ট ও শাস্ত্রবিহিত ব্যক্তিগত ও সামূহিক কল্যাণের উপযোগী যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের সূচনা দিয়েছেন। এরূপ কর্ম্মই যথার্থ ত্যাগমূলক ও ভগবৎপ্রীতিপ্রদ। এরূপ কর্ম্মই তাই 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ১১

অন্বয়—পুরা প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ—অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্; এষঃ বঃ ইষ্টকামধুক্ অস্তু। অনেন দেবান্ ভাবয়ত ; তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু; পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ॥ ১০।১১

অনুবাদ—সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি ক'রে বলেছিলেন—তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হও। এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হোক। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণকে সেবা কর এবং দেবগণও তোমাদের কল্যাণ করুন। এইরূপে পরস্পরের সেবা সৎকারের দ্বারা তোমরা শ্রীবৃদ্ধি লাভ কর॥ ১০।১১

যজ্ঞের উৎপত্তি ও উপযোগিতা

গীতামৃত—উপরোক্ত ভগবদ্ বাক্য হতে স্পষ্ট অনুভূত হয়—বিশ্ব চরাচরের কল্যাণ ও অভ্যুদয়ের জন্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই প্রবর্ত্তিত হয়েছে যজ্ঞনীতি। বস্তুতঃ এই যজ্ঞনীতিই হচ্ছে পরস্পর নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ও সেবার চিরন্তন সুমহান্ নীতি। এই নীতির সম্যক্ প্রতিপালনের উপর নির্ভর করে—মনুষ্যসমাজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, সুখ ও শান্তি এবং শৃঙ্খলা ও সাম্য। শুধু মানবসমাজে নয়, বিশ্বসৃষ্টির সর্ব্বত্র, সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্বস্তরে এই নীতি সমভাবে সক্রিয়।

নদী, তড়াগ, সমুদ্রগর্ভ হতে সূর্যকিরণ বাষ্পরাশি গ্রহণ ক'রে উর্দ্ধাকাশে মেঘের সৃষ্টি করে; পর্জ্জন্যদেব আবার প্রতিদানে বারিধারা বর্ষণ ক'রে

বিশ্বপ্রকৃতিকে সিক্ত, স্নিগ্ধ ও ধৌতবিধৌত করেন। বৃক্ষলতা মৃত্তিকা হতে রস ও সূর্য্যরশ্মি, বায়ু প্রভৃতি হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে এবং তার বিনিময়ে তারা দান করে কত সুন্দর ফুল ফল। গাভী মহিষাদি জীবগণ তৃণগুল্মশস্যাদি ভক্ষণ করে এবং তার বিনিময়ে তারা দান করে দুগ্ধরূপী পরম অমৃত। সৃষ্টির অধস্তন স্তরে আদান-প্রদানরূপী এই যে সনাতন যজ্ঞনীতি, উর্দ্ধতন স্তরেও মনুষ্য ও দেবসমাজে সেই নীতি অধিকতর শৃঙ্খলা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত অনুসৃত ও প্রতিপালিত হোক্—ইহাই ভাগবত বিধান। এই বিধান অনুসরণ ক'রে সমাজ-জীবনে যতদিন পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয়, ততদিন তথায় বিরাজ করে অনুপম শান্তি, সমবায় ও সাম্যের মহাভাব। আর যখনই এই নীতির অবজ্ঞা ও অবমাননা হয়, তখনই তথায় সৃষ্টি হয় নানাপ্রকার অনাচার, অত্যাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ও উন্মার্গগামিতা। অর্থাৎ, মানুষ যখন বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের প্রতি ও সমাজের অন্য সকলের প্রতি স্বীয় সেবা ও আনুগত্য প্রদর্শনের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে কেবল গ্রহণ ও দাবীর মনোভাব পোষণ করে, তখনই সেই স্বার্থাধিকার নিয়ে সমাজজীবনে সৃষ্ট হয় নিদারুণ হানাহানি, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, ধ্বংস ও সর্ব্বনাশ। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান যুগের যাবতীয় অসুখ-অশান্তি, ক্লেশ-ক্লান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল কারণ এখানে।

যজ্ঞনীতির অমর্য্যাদার পরিণাম

জগতের সর্ব্বদেশে সর্ব্বক্ষেত্রে আজ একটি মাত্র ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে—"দাও—দাও"। স্ত্রী স্বামীর নিকট, স্বামী স্ত্রীর নিকট, পুত্র-কন্যা পিতামাতার নিকট, পিতামাতা পুত্র-কন্যার নিকট, মজুর-ভৃত্য মনিব-মালিকের নিকট, মনিব-মালিক মজুর-ভৃত্যের নিকট, প্রজা সরকারের নিকট, সরকার প্রজার নিকট আজ কেবল গ্রহণের দাবী নিয়ে চীৎকার করে বলছে —"This is my birth-right—এটা হচ্ছে আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার—আমার এ দাবী মানতেই হবে।" পরন্তু, আজ এদের কারো কণ্ঠে শোনা যায় না —"This is my birth duty—এটা আমার জন্মগত কর্ত্তব্য—এটা আমার করণীয়।" এই প্রকার একদেশদর্শী নীতি অনুসরণের দ্বারা সমাজজীবনে কদাপি শান্তি ও শৃঙ্খলার সম্ভাবনা হয় কি? অধিকারের দাবী-দাওয়া যেখানে

এত প্রবল এবং কর্ত্তব্য পালন, দায়িত্ববোধ ও নিষ্ঠার যেখানে এত অভাব, সেখানে শান্তির আশা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক নয় কি?

গীতোক্ত যজ্ঞনীতি ও বর্ত্তমান সমবায় নীতির পার্থক্য

আধুনিক সমাজে আর এক নূতন নীতির আমদানী হয়েছে—যাকে বলা হয় 'সমবায় নীতি'—(Co-operative system)। এই নীতির উপর বর্ত্তমান সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাবতীয় কাজ-কারবার চালু করার একটা আত্যন্তিক প্রচেষ্টা লক্ষিত হচ্ছে। আমাদের বর্ত্তমান ভারত-সরকারও এই বিধি-বিধানটি প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ উদ্যোগী। তাঁদের প্রবর্ত্তিত বহুকথিত কল্যাণরাষ্ট্রের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের জন্য তাঁরা দেশের সর্ব্বত্র ও সর্ব্ববিভাগে এই সমবায়নীতির ভিত্তিতে সব কিছু গড়ে তুলবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। কিন্তু, তাঁদের এ প্রয়াস অদ্যাবধি কেবলমাত্র রাজনৈতিক, আর্থিক ও ভৌতিক স্তরেই সীমাবদ্ধ; আধ্যাত্মিক স্তরের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আদৌ প্রসারিত হয় নি। ফলে, এই সমস্ত কর্ম্মপ্রণালীর দ্বারা দেশের বাহ্যিক ও ভৌতিক বিকাশের কিছুটা সহায়তা হলেও উদার ধার্ম্মিক ভাবের অভাবে তার দ্বারা দেশের কোন স্থায়ী কল্যাণের সূচনা হচ্ছে না। অধ্যাত্মবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সনাতন যজ্ঞনীতির সহিত আধুনিক যুগের এই সমবায়নীতির পার্থক্য এখানে। বস্তুতঃ, আধুনিক সমবায়নীতির মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে—পারস্পরিক স্বার্থ; পক্ষান্তরে, সনাতন যজ্ঞনীতির পশ্চাতে রয়েছে পারস্পরিক অভ্যুদয়, ত্যাগ ও সেবার আদর্শ—যা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে মহীয়ান ও গরীয়ান্ করে।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ

এই যজ্ঞনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি কথা স্মরণ করা উচিত। আর্য্য হিন্দুর যে সমাজজীবন তা শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ-মহাযজ্ঞের অনুশাসনে অনুশাসিত। এই বিধানমতে প্রত্যেক হিন্দুগৃহীর প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যের মধ্যে এই পঞ্চযজ্ঞের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট এবং এই পঞ্চযজ্ঞের সম্যক্ অনুষ্ঠানের মধ্যেই তার গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সত্যকার সাফল্য ও শান্তি নিহিত।

বস্তুতঃ হিন্দুশাস্ত্রমতে মানুষ জন্ম হতেই পাঁচ প্রকার ঋণে আবদ্ধ এবং এই ঋণ হতে মুক্তি লাভ করার জন্যই তার আজীবন যাবতীয় প্রয়াস ও পুরুষার্থ।

মানুষের প্রথম ঋণ ভগবানের নিকট—যাঁর অপার কৃপায় এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম এবং তার নির্ব্বাহের উপযোগী অশেষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিচিত্র ভোগ্য সামগ্রীর প্রাপ্তি। এই দেবঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজন—ভাগবত জীবন যাপন এবং শাস্ত্র-বিধিমত সন্ধ্যাবন্দনা ও দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-পরম্পরার প্রতিপালনের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা সম্পাদন করা। হিন্দুশাস্ত্র মতে—ইহাই দেবযজ্ঞ।

আর্য্য-হিন্দুর দ্বিতীয় ঋণ—ঋষিঋণ। প্রাচীনকাল হতে সত্যদ্রষ্টা ঋষি-মুনিগণ তাঁদের তপোলব্ধ সত্যসিদ্ধান্তগুলি শাস্ত্রাকারে নিবদ্ধ করে গেছেন—পরবর্ত্তী যুগের জ্ঞান ও শান্তিকামী নরনারীদের কল্যাণের জন্য। তাঁদের নিকট তাই আমরা মহাঋণের দায়ে আবদ্ধ। তাঁদের রচিত সেই শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও তাঁদের প্রবর্ত্তিত সেই শাস্ত্রনির্দ্দেশগুলি অনুসরণ করে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করলেই আমরা সেই ঋণ হতে মুক্ত হতে পারি। এই বিধানের নাম—ঋষিযজ্ঞ বা স্বাধ্যায়যজ্ঞ।

মানুষের তৃতীয় ঋণ হচ্ছে—পিতৃঋণ। যে পিতা মাতা ও পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্র শোণিত ও কৌলিক ধারা নিয়ে মানুষের জন্ম ও জীবন, যাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার ফলে লাভ হয় অতুল জ্ঞানগৌরব, তাঁদের প্রতি সে কতই না ঋণী ও কৃতজ্ঞ। হিন্দুশাস্ত্রের নির্দ্দেশ—এই পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য চাই জীবিতাবস্থায় পিতামাতার সেবা-পরিচর্য্যা, তাঁদের আদেশ, নির্দ্দেশ ও আদর্শমত জীবন যাপন করা এবং তাঁদের মৃত্যুর পর মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির অনুষ্ঠান করা। হিন্দুশাস্ত্রমতে—ইহাই পিতৃযজ্ঞ।

চতুর্থ ঋণ হচ্ছে নৃ-ঋণ। অর্থাৎ, মানুষের এই ঋণ সমগ্র মনুষ্য সমাজের প্রতি। জীবননির্ব্বাহের দায়ে মানুষ পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। অন্যের সেবা সহায়তা ব্যতীত কেহ জগতে ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণে অসমর্থ। এই ঋণ পরিশোধের জন্য তাই শাস্ত্রীয় বিধান হচ্ছে—

নরমাত্রকে নারায়ণ এবং নারীমাত্রকে নারায়ণী জ্ঞান করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতির ভাব পোষণ করা এবং তাদের সেবা-পরিচর্য্যা করা। নৃ-যজ্ঞের দ্বারা সাধিত হয় এই নৃ-ঋণের পরিশোধ।

মানুষের পঞ্চম ঋণ—ভূতঋণ। এই ঋণ হচ্ছে মনুষ্যেতর প্রাণিকুল, উদ্ভিদ ও জড়জগতের প্রতি। হিন্দুশাস্ত্রমতে শুধু জীবই যে শিব—তাই নয়। সমস্ত ভূতচরাচরই শ্রীভগবানের প্রতিরূপ। বস্তুতঃ, উচ্চতম অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে —"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—জগতের সব কিছুই ব্রহ্মময়। এই দৃষ্টিতে এই জগতের সর্ব্ব বস্তুতে ব্রহ্মসত্তা নিহিত এবং এই কারণে কোন কিছুই উপেক্ষা ও অনাদরের বস্তু নয়। ভূতঋণ পরিশোধের জন্য তাই সূর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহ-নক্ষত্র, গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু প্রভৃতি নদ-নদী, অশ্বত্থ-বিল্ব-তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষবিটপী, অগ্নি-জল-মৃত্তিকাদি ভৌতিক পদার্থেও আর্য্যহিন্দু চৈতন্যের অধিষ্ঠান অনুভব করেন। আর্য্যহিন্দুর এই উদার দৃষ্টি শ্রদ্ধাপূত ধারণা ও চেতনা কতই না উদার, উদাত্ত ও বিস্ময়প্রদ! বস্তুতঃ উপরোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা আর্য্যহিন্দু আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুকে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গ্রহণ ও বরণ করে পরম শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেন। এই ভাবটি লক্ষ্য করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে সে সবার পায়।"

বৈদিক যজ্ঞ ও আধুনিক পূজার মূল লক্ষ্য এক

বৈদিক যাগযজ্ঞে সূর্য্য, সোম, ইন্দ্র, অগ্নি, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে আহুতি দানের বিধান সূচিত। ঐ সমস্ত দেবগণের মধ্যে প্রাচীন আর্য্যগণ ভগবৎ শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ অনুভব করতেন এবং শ্রদ্ধাভক্তিপূত সেই যাগযজ্ঞের মাধ্যমে তাঁদের প্রসন্নতা বিধান করতেন। পরবর্ত্তী যুগে ঐ সমস্ত বৈদিক দেবগণের স্থলে গৃহীত হন লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি, কার্ত্তিকেয়, কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি দেবদেবীসমূহ এবং তাঁদের উদ্দেশ্যেই আজ হিন্দুর মন্দিরমণ্ডপে পূজার্চ্চনার বিধি-বিধান প্রচলিত। যজ্ঞ ও পূজার এই রীতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও ইহাদের লক্ষ্য বা হেতু অদ্যাপি পূর্ব্ববৎ অপরিবর্ত্তিতই আছে এবং তা হচ্ছে ভগবানের প্রদত্ত ভোগ্য সামগ্রী উপাস্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে

অর্পণ ক'রে তাঁদের প্রসন্নতা বিধান করা এবং তাঁদের সেই প্রসাদেই আত্মতৃপ্তি অনুভব করা।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।। ১২

অন্বয়—যজ্ঞভাবিতাঃ হি দেবাঃ ইষ্টান্ ভোগান্ বঃ দাস্যন্তে ; তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ অপ্রদায় যঃ ভুঙ্‌ক্তে সঃ স্তেন এব।। ১২

অনুবাদ—যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট দেবতাগণ বাঞ্ছিত ভোগ তোমাদিগকে দান করবেন। তাঁদের প্রদত্ত (ভোগ) তাঁদের প্রদান না করে যে তা স্বয়ং ভোগ করে, সে চোর।। ১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।। ১৩

অন্বয়—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে ; যে তু পাপাঃ আত্মকারণাৎ পচন্তি তে অঘং ভুঞ্জতে।। ১৩

অনুবাদ—যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশেষ ভোজন করেন তাঁরা সর্ব্বপ্রকার পাপতাপ হতে মুক্ত হন। যে পাপাত্মারা কেবল নিজেদের উদর পূরণের জন্য অন্ন প্রস্তুত করে তারা পাপ ভক্ষণ করে।। ১৩

যজ্ঞের প্রসাদমাহাত্ম্য

হিন্দু শাস্ত্রমতে যজ্ঞ বা পূজার প্রসাদ হচ্ছে—অমৃত এবং এরূপ অমৃত জ্ঞানে প্রসাদ ভোজনেই পরম শান্তি ও হিত সাধিত হয়। পক্ষান্তরে, যারা নিজেদের রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত ক'রে তা ভোগ করে, সেই স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা ঘোর পাতকী এবং তাদের সেই ভোগও পাপভক্ষণের সমতুল্য। ভক্ত রামপ্রসাদ তাঁর এক ভজন-সঙ্গীতে গেয়েছেন—"ও মন, আহার কর, মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মাকে।" অর্থাৎ রামপ্রসাদের দৃষ্টিতে তাঁর আহার ছিল শ্যামা মায়ের আহুতি বা যজ্ঞ। বস্তুতঃ, এইরূপ উন্নত ভাবাদর্শ নিয়ে যাঁরা ভোগসুখ করেন, তাঁদের সেই ভোগসুখ অমৃতে রূপায়িত হয়।

রক্ষণশীল ভক্তসমাজে অদ্যাপি প্রসাদভোজনের এই মহত্ত্বগৌরব বিদ্যমান। তাঁরা এখনও দীন-দুঃখীকে দু'পয়সা দান ক'রে, অতিথি-অভ্যাগতের সৎকার ক'রে এবং পূজাশেষে কণিকামাত্র প্রসাদ গ্রহণ ক'রে নিজেদের ধন্য ও কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। পক্ষান্তরে, তথাকথিত উচ্চশিক্ষায় আজ যারা আলোকপ্রাপ্ত—তারা ক্রমশঃ এই প্রাচীন ধারাকে অগ্রাহ্য ও অমান্য ক'রে দীনদুঃখী, অতিথি-অভ্যাগত ও দেবসেবার পরিবর্ত্তে ক্লাব-হোটেলে ধনী বন্ধুগণের সেবা-পরিচর্য্যা এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণকে পার্টিভোজে আপ্যায়িত ক'রে তাদের কৃপারূপী প্রসাদলাভের জন্য অধিকতর আগ্রহান্বিত। সুতরাং, দেবযজ্ঞের স্থলে আজ তাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হতে চলেছে ধনিক-যজ্ঞের প্রথা!

যজ্ঞের উৎপত্তি ও মহত্ত্ব বিষয়ে পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে বিশদ বর্ণনা দিয়ে শ্রীভগবান্ বললেন—

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫

অন্বয়—অন্নাৎ ভূতানি ভবন্তি; পর্জ্জন্যাৎ অন্নসম্ভবঃ; যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ ভবতি; যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবং; তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৪।১৫

অনুবাদ—অন্ন হতে শুক্রশোণিত উৎপন্ন হয় এবং তা হতে প্রাণিকুল সৃষ্ট হয়। মেঘ হতে বৃষ্টি ও বৃষ্টি হতে অন্ন বা খাদ্যশস্য জন্মে। যজ্ঞধূম হতে জন্মে মেঘ। কর্ম্ম হতে হয় যজ্ঞের উৎপত্তি, কর্ম্মের উৎপত্তি হয় আবার বেদ বা বৈদিক অনুশাসন হতে এবং বেদ উদ্ভূত হয় ব্রহ্ম হতে। সুতরাং, এই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত॥ ১৪।১৫

সংসারচক্র

পূর্ব্বেও বর্ণিত হয়েছে—প্রজাপতি ব্রহ্মাই যজ্ঞের স্রষ্টা। উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে পুনরায় তারই সমর্থন করে বলা হল—ব্রহ্ম হতে যজ্ঞের

উৎপত্তি এবং তিনি যজ্ঞে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, সংসারচক্রের যাবতীয় কর্ম্মপ্রবাহের পশ্চাতে রয়েছে এক অদৃশ্য ভাগবত বিধান। জীবের পরম কর্ত্তব্য, সেই ভাগবত বিধানের অনুবর্ত্তন ক'রে আত্মকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকল্যাণের প্রচেষ্টায় নিরন্তর প্রযত্নশীল হওয়া। জগতে সাম্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। বস্তুতঃ, প্রাচীন কাল হতে ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি এই ধারা অনুসরণ করে এসেছে। অজ্ঞানতা, ভ্রান্তি ও প্রমাদবশে আজ ভারত-ভারতী সেই সনাতন বিধানকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করে নিজেদের খেয়াল খুশীমত নীতি-নিয়মের প্রবর্ত্তনে অগ্রসর। বর্ত্তমান যুগের যারা নেতা ও নায়ক তারা অধিকাংশই ভদবদ্‌বিমুখ। গীতোক্ত সংসারচক্রের বিধি-বিধানের মর্ম্মার্থ অনুধাবনে তারা অক্ষম। অথচ, এই সমস্ত স্বয়ম্ভূ নেতাদের প্রবর্ত্তিত নীতি ও নিয়মেই আজিকার সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত। বলা বাহুল্য, জগতের অসুখ, অশান্তি, অসাম্য ও বিশৃঙ্খলার মূল কারণ এখানে।

ভারত-ভারতীর এই বিভ্রান্তিকর মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করে সঙ্ঘনেতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রে বলেছেন—"জড়বাদকে যে দেশ চরমবাদ বলিয়া মনে করে এ দেশ সে দেশ নয়। এ দেশ চায় নীতি, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা।" "ধর্ম্মাদর্শকে আশ্রয় করিয়াই এ দেশ চিরকাল চলিতেছে ও চিরদিন চলিতে থাকিবে।"

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬

অন্বয়—পার্থ! যঃ এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রম্ ইহ ন অনুবর্ত্তয়তি, সঃ অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং জীবতি॥ ১৬

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি এই প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন না করে সেই পাপযুক্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ বৃথা জীবন ধারণ করে॥ ১৬

যজ্ঞচক্রের অনুবর্ত্তনের উপযোগিতা

জগচ্চক্রের প্রকৃত স্বরূপ কি? তার বর্ণনা-প্রসঙ্গে এখানে বলা হচ্ছে যে, প্রজাপতি ব্রহ্মার সিসৃক্ষামূলক সঙ্কল্প হতে যজ্ঞ-কর্ম্মের মাধ্যমে

বিশ্বচরাচরের সহিত সৃষ্ট হয়েছে জীবপ্রবাহ। সুতরাং, মনুষ্যের পরম কর্ত্তব্য—বিশ্বস্রষ্টা শ্রীভগবানকে সর্ব্বময় প্রভু জেনে ভক্তিবিনম্র চিত্তে তাঁর নির্দ্দেশিত পথে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন ক'রে পুনরায় সংসারচক্রের মূল উৎস সেই ভগবৎ স্বরূপে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া। জীবের মর্ত্ত্যলীলার এই যে গতিচক্র তা কর্ম্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং, এই লীলার আরম্ভের পর হতে সিদ্ধিলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবের আত্মকল্যাণ তথা আত্মবিকাশের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত অপরিহার্য্য। এক্ষণে প্রশ্ন আসে—মানুষ যখন স্বীয় অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে জীবন্মুক্তির চরম সোপানে উন্নীত হয়, তখন তার পক্ষে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে কি? উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা বা সমাধানের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ বললেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭

অন্বয়—যঃ তু মানবঃ আত্মরতিঃ এব আত্মতৃপ্তঃ চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ, তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭

অনুবাদ—কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তার কোন কর্ত্তব্য থাকে না॥ ১৭

নৈব্য তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮

অন্বয়—ইহ কৃতেন, তস্য কশ্চিৎ অর্থঃ ন এব অকৃতেন চ কঃ চ ন অস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ন চ॥ ১৮

অনুবাদ—এ জগতে কর্ম্মানুষ্ঠানে তার কোনো প্রয়োজন নাই, কর্ম্ম না করারও কোন কারণ নাই, সর্ব্বভূতের মধ্যে কারুর আশ্রয়ে তার প্রয়োজন নাই॥ ১৮

আত্মারাম ব্যক্তির কী করণীয়

যিনি নিরন্তর আত্মবিচার ও আত্মচিন্তনের দ্বারা আত্মারাম অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং এই অবস্থায় উন্নীত হওয়ার পরে যিনি প্রতিনিয়ত

আত্মানন্দে বিভোর হয়ে থাকেন, তাঁর নিজের জন্য আর করণীয় কিছু থাকে না। কেন না, এই অবস্থায় যখন তাঁর নিজস্ব কোন কামনা বাসনা ব'লে কিছুই থাকে না, তখন তিনি নিজের জন্য আর কি কাজ করবেন? কিন্তু, এই কালে তিনি যদি বিশ্বকল্যাণের দায়িত্ববুদ্ধি সম্মুখে রেখে লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কর্ম্মে ব্রতী হন, তবে তাতে তাঁর কোন হানির সম্ভাবনা থাকে না; বরং তখন তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত সেই নিষ্কাম সেবাব্রত সমাজস্থিতির পক্ষে হয় বিশেষ সহায়ক।

গীতার মতে জীবন্মুক্ত পুরুষের সমক্ষে দুটি জীবনধারা উন্মুক্ত—কর্ম্মত্যাগ করে অবধূত-স্থিতি বরণ করা বা লোকসংগ্রহমূলক কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া।

প্রাচীনকাল হতে এক শ্রেণীর মহাপুরুষ পরিদৃষ্ট হন—যাঁরা সিদ্ধিলাভের পরে জড়, উন্মাদ বা পিশাচবৎ জীবন-যাপন করেন। ভারতীয় সাধুসমাজে এঁরা বিরক্ত বা অবধূত নামে আখ্যাত। এই অবধূত শ্রেণীর মহাপুরুষগণ আবার দুই দলে বিভক্ত। এঁদের একদল একান্ত কর্ম্মবিতৃষ্ণ; লোকসঙ্গ এড়িয়ে চলবার জন্য এঁরা নানা ভাবে আত্মগোপন করে থাকেন। দেহধারণের উপযোগী ন্যূনতম প্রচেষ্টা ব্যতীত এঁরা অন্য কোন কর্ম্ম করতে একান্ত অনিচ্ছুক। পক্ষান্তরে, অন্য এক শ্রেণীর অবধূত আছেন যাঁরা লোকসংগ্রহের ব্রতভার নিয়ে সঙ্কল্পপূর্ব্বক কোন প্রকার পুরুষার্থ করতে নারাজ; তবে তাঁরা একান্ত বিরক্ত প্রকৃতির নন। আহার্য্যসংগ্রহ ও লোককল্যাণের ব্যাপারে এঁরা 'অজগর বৃত্তি'র পক্ষপাতী। অর্থাৎ, দেহধারণ বা লোককল্যাণের অভীপ্সা নিয়ে যত্র তত্র পরিভ্রমণ না করে এঁরা একই স্থানে নিরন্তর অবস্থান করেন এবং ভগবদিচ্ছায় যা কিছু প্রাপ্তি ঘটে তার দ্বারা এঁরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন এবং বিশেষ উপদেশপ্রার্থী হয়ে যদি কখনও কোন জিজ্ঞাসু ভক্ত তাঁদের নিকট আগমন করেন, তবে পরম নিরাসক্তির ভাব নিয়ে এঁরা তাদের যৎসামান্য আদেশ নির্দ্দেশ দান করেন।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এমন এক শ্রেণীর ভক্ত নরনারী আছেন, যাঁদের দৃষ্টিতে ইত্যাকার বিরক্ত শ্রেণীর তপস্বিগণই প্রকৃত সাধু। পক্ষান্তরে, আধুনিক যুগে যাঁরা নর-নারায়ণ সেবার ব্রত গ্রহণ ক'রে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সাধনায় নিযুক্ত অথবা যুগধর্ম্মের প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা অধুনা যুগোপযোগী

নানাবিধ সেবাপ্রতিষ্ঠান গঠনপূর্ব্বক কর্ম্মনিরত, তাঁদের মতে তাঁরা নিম্নপর্য্যায়ের সাধু। কেন না, তাঁরা মনে করেন, এই শ্রেণীর কর্ম্মপরায়ণ সাধুগণ স্পৃহাশূন্য নন।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ১৯

অন্বয়—তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর; পুরুষঃ হি অসক্তঃ কর্ম্ম আচরন্ পরম্ আপ্নোতি॥ ১৯

অনুবাদ—অতএব তুমি আসক্তিশূন্য হয়ে অবিরত কর্ম্ম কর। কারণ, এরূপ ভাবে কর্ম্ম করলে মানুষ পরমপদ প্রাপ্ত হয়॥ ১৯

শ্রেষ্ঠ মহাত্মা সম্পর্কে গীতার সূচনা

এখানে 'সতত' শব্দের দ্বারা এই বিষয়টি পরিস্ফুট করা হয়েছে যে, জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে এবং পরে সাধক নিরন্তর অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্মনিরত থাকবেন। এরূপ ভাবে কর্ম্ম করলে একদিকে যেমন মুক্তিকামী সাধক ক্রমশঃ শুদ্ধচিত্ত হয়ে মোক্ষপদের অধিকারী হবেন, অন্যদিকে মুক্তিলাভের পরেও তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত সেই নিষ্কাম কর্ম্মের মাধ্যমে সাধিত হবে অশেষ বিশ্বকল্যাণ।

এক শ্রেণীর টীকাকারের মতে সমগ্র গীতার মধ্যে উপরোক্ত শ্লোকটি সর্ব্বাধিক মহত্ত্বপূর্ণ। কেন না, এই শ্লোকটির মধ্যে গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি সূচিত হয়েছে সুস্পষ্টরূপে। গীতায় জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি প্রভৃতি বহুবিধ সাধনমার্গের উল্লেখ থাকলেও গীতাধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য যে জ্ঞান-ধ্যান ভক্তিবিমিশ্র কর্ম্মযোগের প্রতিপাদন, তা এই শ্লোকটিতে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। অর্থাৎ, সাধক জ্ঞানযোগী হউন, ধ্যানযোগী হউন আর ভক্তিযোগীই হউন, সাধনাবস্থায় তাঁর পক্ষে যে অল্পবিস্তর কর্ম্মানুষ্ঠান প্রয়োজন তা তিনি অনাসক্ত চিত্তে সম্পন্ন করবেন এবং সিদ্ধিলাভের পরেও তিনি লোকশিক্ষার জন্য পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ নিয়ে আমৃত্যু কর্ম্মতৎপর থাকবেন। এই ভাগবত বিধান অনুসৃত হলে সমাজে কদাপি বৈষম্য বা বিশৃঙ্খলার অবকাশ থাকবে না। উপরন্তু, ঐরূপ আদর্শনিষ্ঠ সমাজে বিরাজ করবে অবিচ্ছিন্ন সাম্য, শান্তি, আনন্দ ও কল্যাণ।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ২১

অন্বয়—জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা এব সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ, লোকসংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুম্ অর্হসি। শ্রেষ্ঠঃ জনঃ যৎ যৎ আচরতি ইতরঃ তৎ তৎ এব। সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে॥ ২০।২১

অনুবাদ—জনকাদি মহাত্মাগণ কর্ম্মযোগের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছেন। লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রেখেও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। কেন না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করেন, অন্য লোকেরা তারই অনুকরণ করে। তাঁরা যা প্রমাণ করেন (যে আদর্শ উপস্থাপিত করেন) জনসাধারণ তারই অনুকরণ করে থাকে॥ ২০।২১

আদর্শ কর্ম্মযোগী কে?

শ্রীভগবান্ এখানে রাজা জনককে কর্ম্মযোগের সুমহান্ আদর্শরূপে উপস্থাপিত করছেন। জনক ছিলেন রাজর্ষি। আদর্শ রাজা ও আদর্শ ঋষির সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে।

গীতাধর্ম্মের উপলক্ষ্য অর্জ্জুনও ছিলেন ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব এবং রাজধর্ম্ম ছিল তাঁর স্বধর্ম্ম। মোহবশে তিনি যখন সেই স্বধর্ম্ম ত্যাগে সমুদ্যত হলেন, তখন শ্রীভগবান্ তাঁর পুরোভাগে রাজা জনকের আদর্শ উপস্থাপিত করে তাঁকে শিক্ষাদানের জন্য বললেন—হে পার্থ, রাজকার্য্যের গুরুদায়িত্বের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও রাজা জনক স্বীয় স্বধর্ম্ম পালন করে কি তাঁর অভীষ্ট মোক্ষপদের অধিকারী হয়ে ঋষিত্ব অর্জ্জন করেন নি? তুমিও রাজকুমার, তোমার স্বধর্ম্মও তো তাই। তবে তুমি কেন রাজধর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ এই যুদ্ধকর্ম্মকে তোমার মোক্ষপথের কণ্টক মনে করে এতখানি আতঙ্কিত হচ্ছ? তোমার এই ভয়-ভীতি একান্ত অমূলক। তুমি একটু ধীর স্থির হয়ে বিচার করলে নিশ্চিতই বুঝতে পারবে—এটা তোমার বুদ্ধিভ্রম মাত্র।

এখানে প্রশ্ন আসে—গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়বংশজ, গীতোপদেশের গ্রহীতা অর্জ্জুনও তাই এবং তাঁকে প্রবুদ্ধ করার জন্য যাঁর দৃষ্টান্ত তাঁর সমক্ষে উপস্থাপিত করা হল তিনিও একজন ক্ষত্রিয়। গীতার উপদেশ কি তাহলে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়ের জন্য? তা যদি না হবে, তবে রাজা জনকের আদর্শ হতে সাধারণ গৃহী ও সন্ন্যাসীরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবেন? উত্তরে বলা যায় —মিথিলাধিপতি জনক শুধু আদর্শ ক্ষত্রিয় বা রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন আদর্শ গৃহী ও আদর্শ ঋষি। সুতরাং, রাজা, প্রজা, গৃহী ও সন্ন্যাসী নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁর মহৎ জীবন হতে নিষ্কাম কর্ম্ম ও প্রোজ্জ্বল ব্রহ্মজ্ঞানের অনুপম প্রেরণা লাভ করে ধন্য হতে পারেন। বস্তুতঃ, রাজর্ষি জনক ছিলেন তদানীন্তন ভারতের সর্ব্বোত্তম আদর্শ পুরুষ। তাঁর সভাগৃহ ছিল—অগণিত জ্ঞানী, গুণী, ঋষি ও যতিগণের মিলন ও অধ্যাত্মচর্চ্চার অপূর্ব্ব কেন্দ্রস্থল। এজন্য দেখা যায়, মহামুনি ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব বালব্রহ্মচারী হয়েও স্বীয় পিতাকৃর্তক আদিষ্ট হয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য রাজর্ষি জনককেই গুরুপদে বরণ করেন। এতেই প্রমাণ হয় জনক শুধু গৃহীদের নয় সন্ন্যাসীদেরও গুরু ছিলেন।

কর্ম্মযোগের উপযোগিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য এক্ষণে শ্রীভগবান্ স্বীয় অক্লান্ত কর্ম্মময় জীবনের সূচনা দিয়ে বললেন—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪

অন্বয়—পার্থ! ত্রিষু লোকেষু মে কিঞ্চন কর্ত্তব্যং ন অস্তি; অনবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং ন; কর্ম্মণি বর্ত্তে এব চ। পার্থ। যদি অহং জাতু অতন্দ্রিতঃ কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ম্; মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম সর্ব্বশঃ হি অনুবর্ত্তন্তে। চেৎ অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্, ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ; সঙ্করস্য কর্ত্তা স্যাম্; ইমাঃ প্রজাঃ চ উপহন্যাম্॥ ২২।২৩।২৪

অনুবাদ—হে পার্থ, এই ত্রিলোকে আমার করণীয় কিছুই নাই। আমার অপ্রাপ্ত ও অপ্রাপ্য বলেও কিছুই নাই; তথাপি আমি নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছি। যদি আমি অনলসভাবে কর্ম্ম না করি, তবে মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকার আমার অনুকরণ করবে। আমি যদি কর্ম্ম না করি তবে এ লোকসকল উৎসন্ন যাবে। আর এরূপ হলে আমিই বর্ণসাঙ্কর্য্যের হেতু এবং ধর্ম্মলোপের ফলে প্রজাকুলের বিনাশের কারণ হব।। ২২।২৩।২৪

কর্ম্মযোগের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ছিলেন গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং

জগতে যুগে যুগে ভগবান্ নরশরীরে অবতীর্ণ হন—নিজ জীবনে যথাযথ কর্ম্মের আচরণ করেন আদর্শ স্থাপনের জন্য। এই ভাবে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত না হলে যুগ সমস্যার সমাধান হয় না এবং তার ফলে ধর্ম্মগ্লানি ব্যাপকরূপ পরিগ্রহ করায় মানব সমাজে নিদারুণ অসুখ, অশান্তি, দুর্গতি ও দুর্দ্দশা সৃষ্ট হয় এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণম হয়—ধ্বংস বা বিনাশ।

উপরোক্ত উক্তি হতে স্বতঃই প্রমাণিত হয়—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ যদি লোকসংগ্রহের দায়িত্বভার গ্রহণপূর্ব্বক সমাজকল্যাণে ব্রতী না হন, তবে তাতে তাঁদের নিজেদের কোন প্রত্যবায় ঘটে না বটে, তবে গীতার মতে তাঁদের সেই কর্ম্ম-বিতৃষ্ণার আদর্শ ধর্ম্ম ও সমাজজীবনে নিদারুণ বিশৃঙ্খলার সূচনা করে। কেন না, এটি এক স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে প্রত্যেক সমাজের যারা কনিষ্ঠ বা অজ্ঞ জনসাধারণ, তারা সমাজের উচ্চস্তরের গুণী, জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আচার, বিচার ও আদর্শের অনুকরণ করে। সুতরাং, বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কেবলমাত্র নিজেদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না রেখে জনসাধারণের কল্যাণচিন্তা ক'রে তাঁদের নিজেদের আচার-ব্যবহার নির্দ্ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, গীতাকার শ্রীভগবানের এই সুস্পষ্ট প্রমাণ ও উক্তি সত্ত্বেও ভারতীয় সাধুসমাজের এক বৃহদংশ বেদান্তের মায়াবাদের ভ্রান্ত যুক্তি প্রদর্শন ক'রে বিশ্বকল্যাণের উদ্দেশ্যে সেবাব্রত বরণে নিদারুণ অনিচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন। ভারতবাসীর ঐকান্তিক কর্ম্মকুণ্ঠা, জাড্য-জড়তা ও অলসতার মনোভাবের মূল কারণ যে অনেকখানি এখানে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

গীতোক্ত আদর্শের পুনরুদ্ধার

সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দের লীলা-সহচররূপে—তাঁর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে থাকার সৌভাগ্য লাভের ফলে আমরা স্বচক্ষে লক্ষ্য করেছি—অবতার পুরুষেরা জীবজগতের উদ্ধারের নিমিত্ত কীরূপ ও কতখানি দায়িত্ব অনুভব করেন। এই পুরুষসিংহের অতন্দ্র কর্ম্মজীবন অহর্নিশ অনুধ্যান করে প্রতিনিয়ত মনে হত—তিনি যেন অক্লান্ত উৎসাহ ও উদ্যমের অক্ষয় প্রস্রবণ। জীবোদ্ধারের স্থায়ী ব্যবস্থারূপে তিনি যে বিপুল সঙ্ঘচক্র রচনা করেন, তার বিচিত্র আন্দোলন-প্রবাহের মধ্যে নিমজ্জিত থাকাকালে তিনি মধ্যে মধ্যে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলতেন—"**চব্বিশ ঘন্টা দিনরাত্রির মধ্যে আর কতটুকু কি করা যাবে? চব্বিশ ঘন্টার বদলে যদি আটচল্লিশ ঘন্টার দিন রাত্রি হত, তাহলে কিছু কাজ করা যেত।**" স্বীয় পার্ষদগণকে সঙ্ঘপ্রবর্ত্তিত কর্ম্মব্রতে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ সূচনা দিয়ে বলতেন—"**খুব ভাবিও, খুব চিন্তা করিও—আজ তোমরা কতবড় গুরুতর দায়িত্বভার গ্রহণ পূর্ব্বক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়াছ। আত্মবিশ্বাস বলে বলীয়ান হইয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া শত শত, সহস্র সহস্র সন্তপ্ত প্রাণকে সুশীতল করিবার জন্য তোমাদের সঙ্ঘকে উপযুক্ত করিয়া তোল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে সমবেত ও সম্মিলিত করিয়া বিরাট সঙ্ঘশক্তিকে সংগঠন কর। তবেই তোমরা মহাসংগ্রাম ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া বিপুল পরাক্রম সহকারে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে।**"

এক্ষণে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কর্ম্মের পার্থক্য কোথায়, তার সূচনা দিয়ে শ্রীভগবান্ বললেন—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্যুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫

অন্বয়—ভারত! অবিদ্বাংসঃ কর্ম্মণি সক্তাঃ যথা কুর্ব্বন্তি ; বিদ্বান্ অসক্তঃ লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ তথা কুর্য্যাৎ॥ ২৫

অনুবাদ—হে ভারত, অজ্ঞ ব্যক্তিরা আসক্তি বশে যেরূপ কর্ম্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা লোকসংগ্রহের জন্য অনাসক্ত চিত্তে তদ্রূপ কর্ম্ম করেন। ২৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬

অন্বয়—কর্ম্মসঙ্গিনাম্ অজ্ঞানাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ ; বিদ্বান্ যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ যোজয়েৎ॥ ২৬

অনুবাদ—জ্ঞানীরা কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিদের বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না। নিজেরা অবহিত চিত্তে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখবেন॥ ২৬

জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পার্থক্য হচ্ছে ভাবে, কর্ম্মে নয়।

বাহ্য দৃষ্টিতে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অজ্ঞানীর ন্যায় জ্ঞানীদেরও এমন কতকগুলি কর্ম্ম করতে হয়—যা প্রায় সমপর্য্যায়ের। তা ছাড়া, লৌকিক জীবনে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীকে একই প্রকার আরও বহু কর্ম্মে নিযুক্ত হতে হয়। গীতোক্ত যুদ্ধের ব্যাপারটি যদি ধরা যায় তাহলেও দেখা যাবে ক্ষেত্রবিশেষে অজ্ঞানীর ন্যায় জ্ঞানীকেও আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার দায়ে যুদ্ধনিরত হতে হয়। তবে বাহ্যদৃষ্টিতে উভয়ের এই যুদ্ধকর্ম্ম যতই এক প্রকারের হোক না কেন, অন্তর্দৃষ্টিতে উভয়ের মনোভাবের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান—তা কে অস্বীকার করবে? অর্থাৎ, অজ্ঞানী যুদ্ধ করে তার স্বার্থসিদ্ধি ও জিঘাংসাবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য, আর জ্ঞানী যুদ্ধ করেন ভাগবত প্রেরণায় ন্যায় ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কর্ম্মের পশ্চাতে এই যে ভাগবত বৈষম্য—তাই উভয়ের কর্ম্মফলের সত্যকার নিয়ন্তা। তাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—একই কর্ম্মের সম্পাদনের দ্বারা জ্ঞানীর লাভ হয় পরম কল্যাণ ও মুক্তি এবং অজ্ঞানীর প্রাপ্তি ঘটে আসক্তিজনিত নিদারুণ দুর্গতি ও বন্ধন। এমন কি যজ্ঞ ও পূজার ন্যায় পরম পবিত্র কার্য্যও যদি হীন বাসনাসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করা হয়, তবে তাও যাজ্ঞিক পুরোহিতকে নিরয়গামী করে। শুনা যায়, দক্ষিণেশ্বরের যে ভবতারিণীর মন্দিরে পূজা-প্রার্থনা করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করেন, পরবর্ত্তী কালে সেই মন্দিরে পূজারীরূপে

নিযুক্ত হয়ে অন্য একজন পুরোহিত মায়ের অঙ্গাভরণ অপহরণ করে ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হন। এতেই প্রমাণ হয়, ভাবই ভালমন্দ কর্ম্মফলের সত্যকার নিয়ামক—কর্ম্ম নয়।

বুদ্ধিভেদের কারণ

অতঃপর শ্রীভগবান্ জ্ঞানী ব্যক্তিকে স্বীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বললেন—

জ্ঞানীদের দায়িত্ব অপার। তাই তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন শেষ হলেও জনহিতের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজেরা কর্ম্মত্যাগ করতে বা অপরকে কর্ম্মত্যাগের উপদেশ দিতে পারেন না। এরূপ করলে কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তিদের বুদ্ধিভেদ জন্মিবার সম্ভাবনা এবং তা সাম্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে একান্ত প্রতিকূল।

এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন পূর্ব্বের কথা। বোম্বাই সহরে প্রচার কালে একদা জনৈক শেঠ ক্ষুণ্ণ মনে আমাদের নিকট স্বীয় মনোব্যথা নিবেদন করে বললেন—কিছুদিন যাবৎ আমি একটি বিশেষ মানসিক সংঘর্ষের মধ্যে কালাতিপাত করছি। আমি একজন ব্যবসায়ী, বিরাট পরিবারের দায়িত্ব আমার স্কন্ধে। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন মহাপুরুষের নিকট সাধনোপদেশ নেবার পর হতে আমার মনে উপস্থিত হয়েছে একটা ভীষণ বিচার-বিভ্রাট। আমি যখনই ব্যবসায়ের জন্য গদিতে বসি, তখনই আমার মনে হয়—আমি ধন-জনরূপ নশ্বর বিষয়-বস্তুর সেবা করে অনর্থক নিরয়গামী হচ্ছি। জগতের সব কিছুই নশ্বর। ব্রহ্মবস্তুই একমাত্র সত্য—এরূপ চিন্তা আসাতে আমি এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসায়ে মন দিতে পারি না। ফলে, আমার ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। আপনি আমাকে এই ঘোর সঙ্কট-মুহূর্ত্তে আত্মরক্ষার উপায় কি—দয়া করে তা উপদেশ দিন। ভদ্রলোকের কথা শুনে বুঝতে পারলাম—তাঁর এই মানসিক ব্যাধির মূল কারণ কোথায়? তাঁকে তখন জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, আপনার দীক্ষাদাতা গুরু কে? উত্তরে তিনি বললেন যে, তিনি একজন হিমালয়নিবাসী বিরক্ত অবধূত—তখন তাঁকে বললাম—এইরূপ বিরক্ত শ্রেণীর উদাসী বাবার নিকট থেকে উপদেশ নেওয়ার ফলেই আপনার এই বুদ্ধিভেদ জন্মেছে। আপনার

গুরু-সাধু হিসাবে মহান্ হতে পারেন, কিন্তু অধিকার বুঝে তিনি উপদেশ দিতে অক্ষম। 'ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা'—এই বৈদান্তিক মহাবাক্যটি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদেরই ধ্যান ও মননের ব্যাপার। গৃহীর পক্ষে এটি উপযোগী নয়। বেদের আর একটি মহামন্ত্র হচ্ছে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—জগতের সব কিছুই ব্রহ্মময়। সুতরাং ভগবৎ বুদ্ধিতে সকলের সেবা করলেই তার দ্বারা পরম মোক্ষ ও শান্তির অধিকারী হওয়া যায়। প্রবৃত্তিমার্গী গৃহী সাধকদের পক্ষে বেদের এই প্রসিদ্ধ উপদেশটিই বিশেষ অনুকূল ও উপযোগী। আপনাদের ন্যায় গৃহীর পক্ষে পরম নিবৃত্তির উপদেশ একান্ত অনুপযোগী ও হানিকর। ভদ্রলোক এতক্ষণে আশ্বস্ত হয়ে অনাসক্ত ভাবে সংসার-ধর্ম্মে মন দিলেন।

এক্ষণে কর্ম্ম কীরূপে অনুষ্ঠিত হয় এবং কর্ম্মের প্রকৃত কর্ত্তা কে—তারই উল্লেখ করে শ্রীভগবান্ বললেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭

অন্বয়—প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে॥ ২৭

অনুবাদ—প্রকৃতির গুণ সমূহের দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি অহঙ্কারে বিমূঢ়, সে মনে করে আমিই কর্ত্তা॥ ২৭

সাংখ্য-মতে কর্ম্ম করেন প্রকৃতি

জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ব্যক্তি উভয়েই কর্ম্ম করেন। তবে জ্ঞানী জানেন —কর্ম্মের কর্ত্তা হচ্ছে প্রকৃতি ; তিনি নিজে নন। পক্ষান্তরে, অজ্ঞানী মনে করে, কর্ম্মের কর্ত্তা সে নিজেই এবং তার নিজের পুরুষার্থের দ্বারাই তার কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুতরাং, যাবতীয় কর্ম্মের কর্তৃত্বের জন্য সে নিজেই দায়ী এবং এজন্য সেই সব কর্ম্মের ফলের উপরও তারই পূর্ণ অধিকার। এই বিষয়টি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হবে।

বস্তুতঃ কর্ম্মের প্রকৃত কর্ত্রী হচ্ছেন প্রকৃতি, পুরুষ নন। জ্ঞানী ব্যক্তি এই পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বের রহস্য সম্পূর্ণ অবগত। তাই তিনি সর্ব্বদা মনে করেন, তাঁর আত্মা কিছু করেন না, প্রকৃতির দ্বারাই সব কিছু অনুষ্ঠিত হয়—

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

অন্বয়—মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ তু গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

অনুবাদ—হে মহাবাহো! গুণ ও কর্ম্মের বিভাগের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ (ব্যক্তি) কিন্তু উহা গুণসমূহে বর্ত্তমান—এই মনে করে আসক্ত হন না॥ ২৮

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ২৯

অন্বয়—প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে; কৃৎস্নবিৎ তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ ন বিচালয়েৎ॥ ২৯

অনুবাদ—প্রকৃতির গুণে মোহগ্রস্ত (ব্যক্তিরা) গুণকর্ম্মে আসক্ত হয়, সম্যকজ্ঞানী সেই সব অজ্ঞ অসমদর্শী মন্দমতিগণকে বিচলিত করবেন না॥ ২৯

গীতামৃত—উপরোক্ত দুইটি শ্লোকে তত্ত্ববিদ্ ও অজ্ঞান ব্যক্তির বিচারবৈষম্যের ফলাফলের বিষয় উল্লেখ করে শ্রীভগবান্ বললেন—হে মহাবাহু অর্জ্জুন, যিনি ইন্দ্রিয়াদির সহিত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের সংযোগে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়—এই বিষয়টি ভালমত জানেন, তিনি কর্ম্মতত্ত্বের বিষয় সম্পূর্ণ অবগত। তিনি জানেন—আত্মা নিষ্ক্রিয়; সুতরাং, তিনি কোন কর্ম্মের দ্বারা আসক্ত হন না। পরন্তু, যারা প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণসমূহের দ্বারা মোহিত বা আচ্ছন্ন, তারা দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে আসক্ত হয়। জ্ঞানিগণের পরম কর্ত্তব্য—তদ্রূপ কর্ম্মাসক্ত, অল্পমতি অজ্ঞান ব্যক্তিদের মতিভ্রম উৎপন্ন না করা। এরূপ করলে অজ্ঞান ব্যক্তিরা আদর্শভ্রষ্ট ও বিপথগামী হতে বাধ্য। কেন না, এরূপ অবস্থায় কোন উচ্চতর তত্ত্বকথা তাদের বোধগম্য হয় না এবং তার ফলে তাদের মতিভ্রম ঘটাই স্বাভাবিক।

সাংখ্যমতে প্রকৃতির দ্বারা কীভাবে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলিতে তা বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে গীতাদি বেদান্ত শাস্ত্রের মতে কর্ম্ম কীরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তার সূচনা দিয়ে শ্রীভগবান্ বললেন—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০

অন্বয়—সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য অধ্যাত্মচেতসা নিরাশীঃ নির্ম্মমঃ ভূত্বা বিগতজ্বরঃ যুধ্যস্ব॥ ৩০

অনুবাদ—যাবতীয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করে বাসনা ও মমতাশূন্য হয়ে শোক ত্যাগপূর্ব্বক তুমি যুদ্ধ কর॥ ৩০

বেদান্ত মতে কর্ম্মের কর্ত্তা—ঈশ্বর

সাংখ্যমতে কর্ম্মকরে প্রকৃতি এবং গীতাদি বেদান্তের মতে সর্ব্ববিধ কর্ম্মের কর্ত্তা হচ্ছেন ঈশ্বর স্বয়ং। এই শেষোক্ত মতে ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরয়িতা ও বিধাতা। তাঁর ইচ্ছাশক্তিতেই বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এবং জীবজগতের কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন হচ্ছে। এই রহস্যটি অবগত হয়ে তাতে সর্ব্বকর্ম্মের দায়িত্ব অর্পণ করে ফলাকাঙ্ক্ষা ও ফলাসক্তি ত্যাগ করে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। এই ভাবে কর্ম্ম করলে কর্ম্মীর কোন প্রকার দুঃখ-শোকের ভয় থাকে না।

পূর্ব্বে আমরা জেনেছি, কর্ম্মযোগের লক্ষণ তিনটি—কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধিত্যাগ, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জন ও সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ। উপরোক্ত শ্লোকটিতে কর্ম্মযোগের এই তিনটি লক্ষণই সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হয়েছে। "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য"—বাক্যাংশের দ্বারা ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণের ভাব, 'নিরাশী' শব্দের দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগ এবং 'নির্ম্মমঃ' শব্দটিরদ্বারা মমত্ববুদ্ধি বা কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, কর্ম্মযোগের প্রকৃত স্বরূপ কি—তা সম্যক্ অবগত হতে হলে এই শ্লোকটির ভাবার্থের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥ ৩১

অন্বয়—যে মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ মে ইদং মতং নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি, তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে॥ ৩১

অনুবাদ—যারা শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াবর্জ্জিত হয়ে আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে তারাও কর্ম্মজাল হতে মুক্তিলাভ করে থাকে।। ৩১

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।। ৩২

অন্বয়—তু যে অভ্যসূয়ন্তঃ মে এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি, তান্ অচেতসঃ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি।। ৩২

অনুবাদ—কিন্তু যারা অসূয়াপরবশ হয়ে আমার এই মতের অনুসরণ করে না—তাদিগকে দুর্বুদ্ধি, সর্ব্বজ্ঞানবর্জ্জিত, বিনাশপ্রাপ্ত জানবে।। ৩২

গীতামৃত—সাংখ্য ও বেদান্ত মতে কর্ম্ম করার যে কৌশল তা উপরোক্ত দুটি শ্লোকে বর্ণিত হল। এক্ষণে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কর্ম্ম সম্পাদনের সময়ে নিরন্তর লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য—কর্ম্মকালে আমাদের অন্তর্নিহিত মনোভাবটি কীরূপ? আমরা উপরোক্ত ভাগবত নির্দ্দেশ মত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে আমাদের কর্ত্তব্যগুলি সম্পন্ন করছি কি না? কেন না, সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে কর্ম্মানুষ্ঠানকালে আমাদের মনে কর্ত্তৃত্বাভিমান, কর্ম্মে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষার ভাব জাগ্রত হবার সম্ভাবনা। এজন্য প্রয়োজন—নিরন্তর অভ্যাস ও পদে পদে সাবধান সতর্ক থাকা।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।। ৩৩

অন্বয়—জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশং চেষ্টতে, ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।। ৩৩

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।। ৩৪

অন্বয়—ইন্দ্রিয়স্য অর্থে ইন্দ্রিয়স্য রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ; তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ, হি তৌ অস্য পরিপন্থিনৌ।। ৩৪

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।। ৩৫

অন্বয়—স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্ম্ম শ্রেয়ান্, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ।। ৩৫

অনুবাদ—জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করে থাকেন ; জীবকুল প্রকৃতিরই অনুসরণ করে, সুতরাং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে কি করবে? সকল ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে রাগ-দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। তুমি ঐ রাগদ্বেষের বশীভূত হয়ো না। উহারাই জীবের প্রধানতম শত্রু। স্বধর্ম্ম কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত হলেও তা ভালভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে থেকে মৃত্যুও কল্যাণকর, কিন্তু পরধর্ম্মের আশ্রয় বিপজ্জনক।। ৩৩।৩৪।৩৫

স্বধর্ম্ম পালনের পথে রাগ-দ্বেষ জয়ের উপায়

জীবের জন্মান্তরীণ স্বভাব-সংস্কার এত প্রবল যে সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক, জ্ঞানী ব্যক্তিরাও স্বীয় স্বীয় স্বভাব-সংস্কারের বশীভূত হয়ে কর্ম্ম করে থাকেন। এমতাবস্থায় প্রাক্তন সংস্কারের দুর্ব্বার গতির বিরোধিতা করা একান্ত দুঃসাধ্য। এরূপ চেষ্টায় অনেক সময় হিতে বিপরীত ঘটার সম্ভাবনাই সমধিক। জীবগণ তাই স্বীয় স্বীয় প্রকৃতির অনুকূল যে আচরণ তারই অনুসরণ করতে চিরাভ্যস্ত। এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক—মানুষ কি তবে চিরকাল তার প্রকৃতির দাসত্ব করতে থাকবে? তার কি কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তির প্রভাব নাই? যদি তাই হয়, তবে তার ভাবী উন্নতি-অভ্যুদয় বা আত্মকল্যাণের উপায় কি?

এই প্রশ্নের উত্তরদান-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বললেন যে, মানুষ স্বীয় স্বভাব বা স্বধর্ম্মের অনুরূপ কর্ম্ম করবে বটে, তবে সেই কর্ত্তব্যের সম্পাদনকালে তার মনে যে রাগ ও দ্বেষের ভাব উৎপন্ন হতে পারে—সে কদাপি তার প্রশ্রয় না দিয়ে তাকে বশে রাখবার চেষ্টা করবে। কারণ, পতন বা ভয়ের কারণ কর্ম্ম নয়—কর্ম্মজনিত আসক্তি বা দ্বেষের ভাব। সেই রাগ ও দ্বেষের ভাবকে যদি সাংখ্য-নির্দ্দেশিত বিবেক বিচার দ্বারা বা ভক্তিমার্গসূচিত ভগবৎ শরণাগতির দ্বারা জয় করা যায়—তবে আর দুশ্চিন্তার সম্ভাবনা থাকে না। সাধকের জানা কর্ত্তব্য—তার কর্ম্মময় জীবনপথের প্রধানতম শত্রু হচ্ছে—রাগ ও দ্বেষ। একথাও তার জানা আবশ্যক যে সেই শত্রুকে জয় করার উপযোগী শক্তিও নিহিত রয়েছে তার মধ্যে। সুতরাং, সে প্রকৃতির হস্তে

ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র নয়। স্বভাবের অনুকূল পথে চলেও সাধক প্রকৃতির গতিকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—কোন মানুষ যখন তার জন্মান্তরীণ ক্ষত্রোচিত সংস্কার বশে ধর্ম্মযুদ্ধে ব্রতী হয়, তখন সেই স্বধর্ম্মের অনুসরণকালে যুদ্ধের ফলাফলজনিত আশা-নৈরাশ্য বা সুখ-দুঃখের প্রতিক্রিয়া তার মনে জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরন্তু, এইকালে সে যদি মনে করতে পারে—তার এই যুদ্ধপ্রবৃত্তির মূলে রয়েছে তার প্রকৃতির প্রেরণা, তার আসল স্বরূপ যে আত্মা তা নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার অথবা সে যদি বেদান্তের মত স্মরণ করে মনে প্রাণে অনুভব করতে পারে যে ভগবদিচ্ছার যন্ত্রস্বরূপ হয়েই সে এই যুদ্ধে ব্রতী হয়েছে, —এই ব্যাপারে ভগবানই তার সত্যকার প্রেরক বা প্রেরয়িতা, এতে তার নিজস্ব কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই, তাই সে সেই কর্ম্মের ভালমন্দ ফলাফলের দ্বারা বিন্দুমাত্র বিচলিত বা প্রভাবিত হয় না।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠার গুরুত্ব

৩৫ তম শ্লোকটিতে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠার গুরুত্ব বিষয়ে বিশেষ সূচনা দিয়ে বললেন—হে সখে, তুমি হয়তো তোমার ক্ষত্রিয়োচিত স্বধর্ম্মকে হিংসাত্মক ও কুলক্ষয়কারক মনে করে তা পরিহারপূর্ব্বক শান্তিমূলক যতিধর্ম্মের আশ্রয় করাকে অধিকতর হিতপ্রদ মনে করছ। কিন্তু, তোমার জানা উচিত—যতিধর্ম্ম যতই সুন্দর হোক না কেন, তা তোমার নিকট পরধর্ম্ম। তোমার ক্ষাত্রধর্ম্মরূপী স্বধর্ম্ম যদি কিঞ্চিৎ দোষযুক্তও হয়, তথাপি নিশ্চিত জেনো, পরধর্ম্মরূপী যতিধর্ম্ম অপেক্ষা তোমার পক্ষে তোমার স্বধর্ম্মই বহুগুণে শ্রেয়ঃ। কেন না, যতিধর্ম্ম তোমার স্বভাব-সংস্কারের আদৌ অনুকূল নয়। জোরপূর্ব্বক তা অনুসরণ করলেও তা তোমার পক্ষে কোন দিন সম্পূর্ণরূপে অধিগত হবার নয়। এতে শুধু পণ্ডশ্রমই নয়, তোমার আত্মিক কল্যাণও ব্যাহত হতে বাধ্য। এ বিষয়ে তোমাকে আরও সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই—স্বধর্ম্মে অবস্থিত থেকে বা স্বধর্ম্ম পালনের চেষ্টা করতে করতে মৃত্যুবরণও বরং শ্রেয়ঃ, তথাপি পরধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত বিপদসঙ্কুল। কারণ, ধর্ম্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয় বীরগণের মৃত্যুবরণ মহা পুণ্যপ্রদ।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—শ্রীভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যখন বনবাসকালে ভরদ্বাজাদি ঋষি মুনিগণের আশ্রমে পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন বহুস্থানে উক্ত তপোবনসমূহের আচার্য্যগণ তাঁকে নানাস্থানে পর্যটনের ক্লেশ স্বীকার না করে তাঁদের আশ্রমে অবস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই প্রার্থনার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"আমি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব, অরণ্যে বাস করলেও আমি ক্ষাত্রধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে আপনাদের আশ্রমবাসী হতে পারি না। আপনাদের শান্তরসাম্পদ তপোবনে মৃগ-ময়ূরাদি প্রাণিকুল নির্ভয়ে বিচরণ করছে। এখানে অবস্থান করলে আমি যদি ভ্রমবশতঃ তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করে বসি, তবে তার দ্বারা আশ্রমের শান্তিভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা।" গভীর অরণ্যানীর মধ্যে হিংস্র শ্বাপদ ও রাক্ষসগণের অত্যাচারের ভয়ে ভীতা হয়ে জনকনন্দিনী সীতা যখন স্বীয় পতিদেবের নিকট প্রস্তাব করেন—"এ গহন অরণ্যে আমরা মাত্র আড়াইটি প্রাণী পর্য্যটনরত। তুমি এর মধ্যে মুনি-ঋষিগণকে পুনঃ পুনঃ অভয় আশ্বাস দিয়ে বলছ—মাভৈঃ! আমি আপনাদের রক্ষাবিধানের জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হব। রাজা ভরত অযোধ্যায় ঐশ্বর্য্যসম্পদ ও সৈন্যবল নিয়ে রাজধানীতে অবস্থান করছে। এত দূরদেশে তার নিকট হতে সাহায্য সহায়তা পাবার আশাও বৃথা। এমতাবস্থায় তুমি কেন এরূপ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত হচ্ছ? এস, আমরা বাকী কয়েকটি বৎসর একটি নিরাপদ স্থানে কুটির নির্ম্মাণ করে তপস্যা ও শাস্ত্রচর্চ্চায় কালাতিপাত করি।" পত্নীর এই শান্তিপ্রস্তাবে ক্ষুণ্ণ ও কুপিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র তখন তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন—"সীতে, এজন্য আমি পূর্ব্বেই তোমাকে সূচনা দিয়ে বলেছিলাম—এরূপ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে তোমার অনুগমনের প্রয়োজন নাই। নারীজাতির স্বভাব-সংস্কার হচ্ছে ভীতিবিহ্বলতা, অরণ্যবাস তাদের জন্য নয়। তোমার জানা উচিত—আমি ক্ষত্রিয় ; সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় শরণার্থিগণকে রক্ষা করাই আমার স্বধর্ম্ম। আমি যেরূপে হোক সে ধর্ম্ম পালন করবই।"

শ্রীভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের উপরোক্ত উক্তি প্রমাণ করে—স্বধর্ম্মনিষ্ঠার মহত্ত্ব-গৌরব কত অধিক। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সখা অর্জ্জুনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে পুনরায় সেই স্বধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন আরও পরিষ্কার রূপে। নবযুগে স্বীয় আশ্রিত সন্তানগণকে তাদের গৃহীত ব্রত

ও দায়িত্ব সম্পাদনে সঙ্কল্পনিষ্ঠ করার জন্য সঙ্ঘাচার্য্য প্রণবানন্দও ঠিক অনুরূপ সূচনা দিয়ে বলেছেন—"মানুষের মুক্তিই সেখানে, মানুষের মনুষ্যত্ব, বীরের বীরত্বই সেখানে, যেখানে মানুষ অনন্ত উদ্যম অধ্যবসায় লইয়া যাবতীয় দুঃখদৈন্য দুর্ব্বিপাককে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্‌যাপনে অবিচলিত ও অচঞ্চলভাবে অচল, অটল, অটুট ভাবে অবস্থান করে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্য্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া।" অন্য প্রসঙ্গে অনুরূপ উক্তি করে তিনি বলেন—"নিশ্চেষ্ট ভাবে নিশ্চিন্ত মনে কাপুরুষের মত শুধু ভাবিয়া ভাবিয়া কাল কাটাইলে চলিবে না।" "সঙ্কল্পিত কার্য্যসিদ্ধির জন্য আরব্ধ ব্রত ও স্বধর্ম্ম উদ্‌যাপনের জন্য জীবনপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।"

স্বধর্ম্মনিষ্ঠার অন্য একটি দিক

'স্বধর্ম্ম' শব্দটির অর্থ আজ আর এক ভাবে বিচার করার প্রয়োজন হয়েছে। গীতার যুগে মানব-সমাজ আর্য্য ও অনার্য্য বা সভ্য ও অসভ্য —এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অর্জ্জুন স্বীয় আর্য্যকুলোচিত শৌর্য্য-বীর্য্য ও অন্যান্য সদ্‌গুণ পরিহার করে অনার্য্যোচিত ভীরুতা, কাপুরুষতা ও দীনতার আশ্রয় গ্রহণ করায় ভগবান্ তাকে তিরস্কার করে সেই পরধর্ম্ম পরিহারের জন্য যে উপদেশ করেছিলেন তা আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করেছি। সেই কালে খ্রীষ্টান, ইহুদি, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির আবির্ভাব ঘটেনি। সুতরাং, সেই সময় অর্জ্জুনকে সে বিষয়ে কোন উপদেশ দেবার প্রয়োজন হয়নি। পরন্তু, বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মান্তরের নামে আর একটি নূতন উপসর্গের সৃষ্টি হয়েছে। কতিপয় ধর্ম্মসম্প্রদায় আজ ছলে, বলে, কৌশলে নিজেদের ধর্ম্মমতের প্রচার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়ে ভয়ঙ্কর অশান্তি উপদ্রবের সৃষ্টি করছে। এর পরিণামে গত কয়েক শত বৎসর যাবৎ জগতে কত রক্তপাত, দাঙ্গা, লুণ্ঠন ও যুদ্ধবিগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। এজন্য অধুনা গীতার এই শ্লোকটির অন্য একটি ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয়েছে। যে যে-ধর্ম্মের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেছে সেই ধর্ম্মের আশ্রয়েই তার আত্মোন্নতি ও সমাজকল্যাণের অধিকতর সম্ভাবনা। অজ্ঞানতার জন্য, প্রলোভনে পড়ে অথবা অত্যাচারের ভয়ে ভীত হয়ে স্বধর্ম্ম পরিহার করে যদি কোনও ব্যক্তি অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাতে তার প্রভূত ক্ষতিই হয়। এজন্য প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে সাবধান

ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এখানে বলা বাহুল্য যে, অত্যুদার হিন্দুজাতি আজ এ বিষয়ে সব চেয়ে অধিক অসাবধান ও অমনোযোগী এবং তারই ভয়াবহ পরিণামে আজ হিন্দুসমাজ দিন দিন ক্ষয়িষ্ণু হতে চলেছে এবং তার স্বদেশ হিন্দুস্থানের সীমাও আজ সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। সুতরাং, আর্য্য হিন্দুকে আজ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

অর্জ্জুন যখন শুনলেন—জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রকৃতির অধীন এবং ইন্দ্রিয়জয় দুষ্কর ও দুঃসাধ্য, তখন তাঁর মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগল—মানুষের মনকে দুর্ব্বল করে কে? যে লোকটি সৎ এবং সাধুভাবে চলতে চায় তার মনকেও কে বিপথে চালিত করে? তিনি তাই এবিষয়ে স্বীয় সখাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

অর্জ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ—বার্ষ্ণেয়! অথ কেন প্রযুক্তঃ অয়ং পুরুষঃ অনিচ্ছন্ অপি, বলাৎ ইব নিয়োজিতঃ পাপং চরতি॥ ৩৬

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন, হে বার্ষ্ণেয়! আচ্ছা, লোকে কার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হয়েই পাপাচরণ করে? ৩৬

পাপ করায় কে?

অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন সচেতন ও সংশয়প্রবণ মানবমনের একটি চিরন্তন নিগূঢ় জিজ্ঞাসা। ভালমন্দ ও হিতাহিত জ্ঞানলাভের পর হতে মানুষ পদে পদে অনুভব করে যে, তার ঐকান্তিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও কে যেন তাকে জোরপূর্ব্বক পাপচিন্তা ও পাপকর্ম্মে প্রযুক্ত করে এবং নিতান্ত অসহায় ভাবেই তাকে যেন সেই পাপের পথে ধাবিত হতে হয়। শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে যেন এই পাপপ্রবৃত্তি হতে আত্মসম্বরণ করতে পারে না। তখন সে বিস্মিত ও ব্যথিত চিত্তে বিচার করে—তার এই অন্তর্নিহিত পাপপ্রবৃত্তির মূল কোথায়? শৈশব ও কৈশোর কালে যে জাতীয় কুচিন্তা ও কুভাবনার স্বপ্ন-কল্পনাও তার

মনে মুহূর্ত্তের তরেও উদিত হয় নি, যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কোথা হতে সেই জাতীয় বিসদৃশ ভাব ও অনভীপ্সিত চিন্তা ও প্রবৃত্তি তার মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নিচয়কে যেন আচ্ছন্ন ও অভিভূত করে ফেলেছে।

অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এব ক্রোধ এব রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা এষঃ কামঃ, এষঃ ক্রোধঃ, ইহ এনং বৈরিণং বিদ্ধি॥ ৩৭

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—এ হচ্ছে রজোগুণজাত দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম ও ক্রোধ; এই সংসারে এদের শত্রু বলে জানবে॥ ৩৭

কাম-ক্রোধই পাপপ্রবৃত্তির মূল

মানুষের অন্তর্নিহিত যে ভোগবাসনা তাহাই মুখ্যতঃ তার পাপপ্রবৃত্তির মূল প্রেরক। এই বাসনা উৎপন্ন হয় রজোগুণ হতে। উপভোগের দ্বারা এই ভোগবাসনা কদাপি প্রশমিত বা পরিতৃপ্ত হবার নয়। এরূপ প্রচেষ্টা করলে ইহা ঘৃতসংযুক্ত অগ্নিশিখার ন্যায় আরও প্রজ্জ্বলিত ও প্রবর্দ্ধিত হয়ে ওঠে। কামনা-বাসনার গতিবেগ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিরতিশয় প্রবল ও অত্যন্ত উগ্র। মানুষের আত্মকল্যাণ ও আত্মোন্নতির পক্ষে এর ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আর নাই। সুতরাং একে মহাশত্রু বলে গণ্য করা উচিত।

জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যকে অধ্যাত্মজীবনের উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দুধর্ম্মে এই দুষ্প্রবৃত্তিগুলি ষড়রিপু নামে আখ্যাত। এই ষড়রিপুর মধ্যে কামই আদি বা অন্যান্য কুপ্রবৃত্তিগুলির মূল উৎস। কেন না,কাম হতেই অন্য প্রবৃত্তিগুলি একে পর এক আবির্ভূত হয়ে সাধককে বিব্রত ও বিভ্রষ্ট করে।

সাধারণতঃ 'কাম' বলতে যৌনলিপ্সা বুঝায়। পরন্তু, ব্যাপক অর্থে কাম শব্দের দ্বারা সূচিত হয় যাবতীয় কামনা-বাসনা। এক্ষণে আমরা লক্ষ্য করব,

কি ভাবে কাম হতে অন্যান্য রিপুগুলি ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুরিত হয়। মনে করুন, কোন মানুষের মনে একটি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক বস্তুর প্রাপ্তির জন্য প্রবল ইচ্ছা (কাম) জাগ্রত হল। এক্ষণে সেই লোকটি যখন তার অভিলষিত বস্তুটি করায়ত্ত করার জন্য অগ্রসর হল তখন সে দেখল যে, আর এক ব্যক্তি তার সেই কামনাপূর্ত্তির পথে পদে পদে নিদারুণ বাধা সৃষ্টি করতে উদ্যত। তখন স্বভাবতঃই তার বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির মনে ভয়ঙ্কর রোষের (ক্রোধ) ভাব উৎপন্ন হল।

এই কাম ও ক্রোধই মানব মনের প্রবলতম শত্রু। সাধারণ মানুষ বাহ্য জগতে যারা তাকে প্রলুব্ধ করে বা তার প্রতি বৈরী ভাব পোষণ করে, তাদের শত্রু বলে মনে করে। পরন্তু, তারা বোঝে না তাদের চেয়ে প্রবলতর শত্রু বিদ্যমান রয়েছে তার হৃদয়-মনে এবং তারা হচ্ছে কাম ও ক্রোধ।

অধ্যাত্ম সাধনার পথে কাম যে কতবড় শত্রু তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে গীতাকার পরবর্ত্তী শ্লোক দুটিতে বললেন—

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥ ৩৮

অন্বয়—যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে; যথা আদর্শঃ মলেন; যথা চ উল্বেন গর্ভঃ আবৃতঃ, তথা তেন ইদম্ আবৃতম্॥ ৩৮

অনুবাদ—যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নি ও মলের দ্বারা দর্পণ আচ্ছাদিত থাকে এবং জরায়ু-চর্ম্মদ্বারা গর্ভ আচ্ছাদিত থাকে, সেইরূপ জ্ঞান কাম দ্বারা আবৃত থাকে॥ ৩৮

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯

অন্বয়—কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন চ জ্ঞানম্ আবৃতম্॥ ৩৯

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামরূপ দুষ্পূরণীয় অগ্নি দ্বারা জ্ঞান আবৃত॥ ৩৯

কামের আবরণশক্তি

কাম সম্বন্ধে ইংরাজীতে বলা হয়—"Love is blind" অর্থাৎ, লালসাকলুষিত যে প্রেম, তা অন্ধ। যে এরূপ ভোগবাসনাযুক্ত কামনাদ্বারা অভিভূত হয়, তার জ্ঞানচক্ষুঃ মলিন বা একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন সে এতখানি মোহান্ধ হয়ে পড়ে যে, বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে সে তার ঈপ্সিত বস্তু বা ব্যক্তির পশ্চাতে উন্মত্তের ন্যায় প্রধাবিত হয়। ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব যুবক 'বিল্বমঙ্গল' 'চিন্তা' নাম্নী এক পরমা সুন্দরী বারবণিতার রূপমোহে এতখানি আসক্ত হয়েছিলেন যে, সে অনিবার্য্য গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও গভীর রাত্রে 'চিন্তা'র চিন্তা মনে উদিত হওয়া মাত্র দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে সে গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে খরস্রোতা নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে রাত্রি ছিল ঘনঘোর দুর্য্যোগময়। মুষলধারায় বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে তখন হচ্ছিল মুহুর্মুহুঃ অশনিসম্পাত। বিল্বমঙ্গলের মনোবুদ্ধি তখন কামলালসায় এতখানি অভিভূত যে, সে সেই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে যখন সন্তরণযোগে নদী পার হচ্ছিল তখন সম্মুখে ভাসমান একটি পূতিগন্ধময় শবকে ভেলা মনে করে তার সাহায্যে পরপারে গিয়ে 'চিন্তা'র গৃহদ্বারে উপস্থিত হল। 'চিন্তা' তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। পুনঃ পুনঃ আহ্বানের উত্তর না পেয়ে বিল্বমঙ্গল তখন গৃহের প্রাচীর গাত্রে লম্বমান একটি রজ্জু লক্ষ্য করে তার সহায়তায় অতিকষ্টে উপরে উঠে গৃহমধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই শব্দে জাগরিত হয়ে 'চিন্তা' বিস্মিতভাবে লক্ষ্য করল—তার গৃহে আগন্তুক ব্যক্তি আর কেহ নয়, সে তার প্রণয়াবদ্ধ হতভাগ্য বিল্বমঙ্গল।

কী ভাবে এই দুর্য্যোগময় অমানিশার মধ্যে দুকুলপ্লাবিনী নদী অতিক্রম করে সে এপারে এসে তার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হল—সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেই বিল্বমঙ্গল যখন তাকে বলল—"কেন তুমিই তো আমার পারাপারের জন্য নদীগর্ভে ভেলার ব্যবস্থা করে রেখেছ; গৃহ প্রবেশের জন্য তুমি প্রাচীর-গাত্রেও একগাছি দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছ।"

যখন ঘটনাদৃষ্টে জানা গেল—নদীতটের উৎক্ষিপ্ত ভেলাটি একটি গলিত শব এবং প্রাচীর গাত্রে লম্বিত রজ্জুটি একটি ভীষণ বিষধর সর্প ছাড়া আর কিছুই নয়। 'চিন্তা' তখন বিল্বমঙ্গলকে তিরস্কার করে বলল—"তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করে আমার ন্যায় একটি ঘৃণিতা পতিতার প্রেমে

এতখানি মোহান্ধ হয়ে পড়েছ যে, তুমি বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে আর অধম পশুর স্তরে অবনীত। তোমার অন্তরের এই প্রগাঢ় প্রেম ও অনুরাগ যদি ভগবানে প্রযুক্ত হত, তবে তুমি দেবত্বে উন্নীত হতে। 'চিন্তা'র এই ভর্ৎসনা-বাক্যে বিল্বমঙ্গলের জীবনগতি হল সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত।

কামনা-বাসনা মানুষকে কতখানি মোহগ্রস্ত ও বুদ্ধিভ্রষ্ট করে, বিল্বমঙ্গলের জীবনের প্রতি দৃকপাত্ করলে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না কি?

কামিনীই কি কাম-বাসনার আধার?

স্থূল দৃষ্টিতে কামিনীকেই কামের আধার বলে মনে করা হয়। জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেও এজন্য যোষিৎসঙ্গ বা নারীসঙ্গকে পতনের প্রধানতম কারণ বলে নির্ণয় করা হয়েছে। নারীজাতির সহিত কী রূপ ব্যবহার করা উচিত?—এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বুদ্ধ তদীয় শিষ্যগণকে বলেছিলেন—"বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত নারীজাতির সংস্পর্শ পরিহার করবে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নারীর মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করবে না। যদি একান্ত দরকার হয় তবে নিম্নমুখী হয়ে তাদের সহিত মাত্র আবশ্যক প্রশ্নের উত্তর দিবে।' নারীজাতির সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন—"নারী নরকস্য দ্বারম্"—নারী হচ্ছে নরকের দ্বার। স্মৃতিকার মনু এ বিষয়ে যা বলেছেন তার মর্ম্মার্থ—কন্যা, ভগিনী এমন কি মাতার সহিতও একান্তে বহুক্ষণ বাস করবে না। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর নারীজাতিকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করতেন না। তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর অন্যতম শিষ্য ছোট হরিদাস মাধবীদাসীর সহিত সামান্য মাত্র সম্বন্ধ রাখার অপরাধে চিরতরে বহিষ্কৃত হন। মহাত্মা তুলসীদাস নারীজাতির স্বভাব-সংস্কার সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করে বলেছেন—

"দিনকী মোহিনী, রাতকী বাঘিনী
পলক্ পলক্ লহু চুষে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নিজে বিবাহিত হয়েও নিরন্তর বলতেন—'কামিনী-কাঞ্চনই অধ্যাত্ম-সাধন পথের পরম শত্রু।' বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত

আছে, আদিম পুরুষ আদম, আদিম স্ত্রী ইভের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে আদর্শভ্রষ্ট হন। উপরোক্ত মন্তব্যগুলি অনুধ্যান করলে মনে হয়, কামিনীই কামবাসনার মূল উৎস। পরন্তু, এই প্রসঙ্গে জানা উচিত যে উপরোক্ত মন্তব্যগুলি এসেছে পুরুষ সাধকগণের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে নারী-সাধিকাগণের পক্ষেও পুরুষ-সঙ্গ অনুরূপ ভাবে নিষিদ্ধ—ইহাই শাস্ত্রবাক্যগুলির মর্ম্মবাণী। শোনা যায়, মীরাবাঈ বৃন্দাবনে গিয়ে যখন বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোস্বামীর তপঃপ্রভাবের কথা শুনে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করতে যান, তখন তাঁর আগমনের কথা অবগত হয়েই গোস্বামী মহোদয় তদীয় শিষ্যের মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেন —"আমি প্রকৃতির মুখ দর্শন করি না।" তদুত্তরে মীরাবাঈ তাঁকে শুনিয়ে বলেন—"এ পর্য্যন্ত তো এই সংসারে আমার পরম প্রিয় গিরিধারীলাল শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন পুরুষ আছে বলে আমার জানা ছিল না। এখন দেখছি, বৃন্দাবনে আর একজন পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে।" সাধন-কুটিরের অভ্যন্তর হতে পরম সাধিকা মীরাবাঈ-এর এই উক্তি শুনে শ্রীজীব গোস্বামীর চৈতন্যোদয় হল। তিনি সেই মুহূর্ত্তে কুটিরের বাহিরে এসে সসম্ভ্রমে মীরাবাঈকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—"মাতঃ, আপনাকে প্রকৃতিজ্ঞানে অবমাননা করায় আমার যে ভুল হয়েছে তজ্জন্য আমি দুঃখিত।" শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গিনী সারদামণি দেবী তাঁর পুরুষভক্তগণকে বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীজাতির সহিত সংস্রব রাখার ব্যাপারে যেমন সাবধান করে দিতেন, তেমনি তিনি পুরুষদের সান্নিধ্য সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতেন তাঁর স্ত্রীভক্তগণকে। এতেই মনে হয়, প্রবর্ত্তক অবস্থায় নারী যেমন পুরুষের, পুরুষও তেমনি নারীজাতির অধ্যাত্ম সাধন-মার্গের পরিপন্থী। পরন্তু, সাধনার উচ্চতম স্তরে আরূঢ় হলে নারী পুরুষের এই ভেদাভেদ তিরোহিত হয়ে তৎস্থলে তখন প্রতিষ্ঠিত হয় সুপবিত্র আত্মিক বোধ। এই ভাবের উল্লেখ করে বেদ আত্মতত্ত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে একস্থানে বলেছেন—"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী।" "তুমিই নারী, তুমিই নর, তুমিই কুমার ও কুমারী।"

গীতার মতে কামের আধার নারী নয়—মন

গীতাকার শ্রীভগবানও এখানে নারীকে কামের অধিষ্ঠানরূপে বর্ণনা না করে মানুষের নিজ নিজ মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়কেই কামের আধার বলে বর্ণনা

করেছেন। শুধু গীতা নয়, বৈদিক সাহিত্যেও নারীনিন্দার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ, সে যুগে সমাজের নৈতিক মান এত উন্নত ছিল যে নারী ও পুরুষ একত্রে শিক্ষা-দীক্ষা, শাস্ত্রচর্চ্চা ও অধ্যাত্ম সাধনায় অনেকখানি সমান অধিকার ভোগ করতেন। কামের অধিষ্ঠান কোথায়—সে সম্বন্ধে গীতা বলছেন—

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌॥ ৪০

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্‌ উচ্যতে ; এষঃ এতৈঃ জ্ঞানম্‌ আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি॥ ৪০

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌॥ ৪১

অন্বয়—ভরতর্ষভ! তস্মাৎ ত্বম্‌ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনং পাপ্মানম্‌ এনং প্রজহি হি॥ ৪১

অনুবাদ—মানুষের মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়গণই কামের অধিষ্ঠানক্ষেত্র। এদের আশ্রয় অবলম্বন করেই কাম জ্ঞানকে আবৃত ক'রে মানুষকে মুগ্ধ করে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সে-জন্য তুমি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করে জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশক পাপরূপ কামকে বিনষ্ট কর। ৪০।৪১

গীতামৃত—গীতার মতে 'মন'ই সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্মের মূল এবং কামের একমাত্র আধার। সুতরাং, কাম জয় করতে হলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—মনকে বশীভূত করা। শাস্ত্রে মনকে বলা হয় অন্তরিন্দ্রিয়। এই অন্তরিন্দ্রিয়কে বশীভূত না করে কেবলমাত্র বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে জয় করার চেষ্টা করলে সে প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। নিদ্রিতাবস্থায় যখন চক্ষুঃকর্ণাদি-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি শান্ত ও নিষ্ক্রিয় থাকে তখনও মন থাকে অশান্ত ও সক্রিয়। এই অবস্থায় মন স্বীয় কল্পনা-শক্তির দ্বারা স্বপ্নজাল সৃষ্টি ক'রে জাগ্রতাবস্থার ন্যায়ই তার ঈপ্সিত বিষয়-বস্তুর ভোগ করে থাকে। এতেই প্রমাণ হয়, মন কত বড় শক্তিধর। বস্তুতঃ, মনই সংসার ; মানবের মনেই ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, সম্পত্তি—সব কিছু। মনে ভোগাসক্তি থাকে বলেই পুরুষের

নিকট রমণী এতখানি রমণীয়া বলে মনে হয়। পুনরায় সেই মনই যখন ভোগাসক্তির পরিবর্ত্তে পরম পবিত্র ভক্তিভাবে উদ্দীপ্ত হয় তখন সেই রমণী তার নিকট প্রণম্যা জননী বা দেবীরূপে প্রতিভাত হন। ঠিক অনুরূপ ভাবে মনের আসক্তির ফলেই কাঞ্চন ভোগের উপাদান-রূপে অনুমিত হয় এবং সেই আসক্তি যখন শ্রদ্ধার ভাবে রূপায়িত হয়, তখন সেই কাঞ্চনই জননী লক্ষ্মীরূপে পূজিতা হন।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি হতে বোঝা যায়, মানুষের মনই যাবতীয় ভালমন্দ, সদসৎ ভাবের স্রষ্টা। এই অসীম শক্তিশালী মন যতদিন শত্রুরূপে কার্য্য করে ততদিন মানুষের অশান্তির সীমা থাকে না। আবার সেই মন যখন মিত্ররূপে মানুষের সহায়ক হয় তখন তাই তাকে দান করে পরম শান্তি ও কল্যাণ। এজন্যই বলা হয়—"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" অর্থাৎ, "মনই মানুষের সুখ, দুঃখ, বন্ধন এব. মোক্ষেরও একমাত্র কারণ।"

শ্রীভগবান্‌ও তাই স্বীয় প্রিয় সখাকে নির্দ্দেশ দিয়ে বললেন,—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, তুমি যদি দুর্দ্দম কাম-রিপুকে বশে আনতে চাও তবে সর্ব্বাগ্রে মনকে বশীভূত কর।

মনোজয়ের উপায় কি তারই সুস্পষ্ট সূচনা দিয়ে এক্ষণে শ্রীভগবান্ বললেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ, ইন্দ্রয়েভ্যঃ মনঃ পরং, মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা ; যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ॥ ৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৪৩

অন্বয়—মহাবাহো! এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা আত্মনা আত্মানং সংস্তভ্য কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি॥ ৪৩

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ বলে কথিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন

শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আবার বুদ্ধি হতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি আত্মা। হে মহাবাহো, এরূপে বুদ্ধি হতে শ্রেষ্ঠ যে আত্মা তাঁকে অবগত হয়ে আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংযত ক'রে কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে নাশ কর॥ ৪২।৪৩

কামজয়ের উপায়

দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। কেন না, ইন্দ্রিয়গণই দেহযন্ত্রের পরিচালক ; ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য ব্যতীত দেহ একেবারেই অচল ও অক্ষম অবস্থায় পতিত থাকে। এই কারণে নিদ্রাকালে যখন ইন্দ্রিয়গণ নিশ্চেষ্ট থাকে তখন শরীরও নিশ্চল হয়ে পড়ে। আবার সেই শক্তিমান ইন্দ্রিয়গণ হতে মন শ্রেষ্ঠ। কেন না, ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হয়ে অথবা ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ সহায়তা ব্যতীতও মন স্বীয় সঙ্কল্পশক্তির বলে কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সক্রিয় রাখতে সমর্থ। পরন্তু, এত শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্বকীয় শক্তিবলে মনের কোন কিছু নির্দ্ধারণ করবার সামর্থ্য নাই। কোন বিষয়ে ভাল-মন্দ কিছু স্থির করতে হলে বুদ্ধির সহায়তা গ্রহণ করা ছাড়া তার উপায়ান্তর থাকে না। তাই মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। আবার দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি সমস্তই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে যদি তাদের উপরে তাদের পরিচালক আত্মা সাক্ষীরূপে বিরাজিত না থাকেন। এই জন্য বলা হয়েছে সকলের উপরে আত্মার স্থান। বাহ্যতঃ নিষ্ক্রিয় থাকলেও আত্মার অস্তিত্ব বা সান্নিধ্য ব্যতীত দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি সমস্তই অচল ও শক্তিহীন। এরূপে আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ক'রে শ্রীভগবান্ কাম রিপুকে পরিপূর্ণরূপে জয় করবার জন্য আত্মস্থ হবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

বস্তুতঃ মানুষ যখন আত্মনিষ্ঠ হয়, তখন তার বুদ্ধি নির্ম্মল-স্বরূপ ধারণ করে এবং সেই নির্ম্মল বুদ্ধি তার মনকে সর্ব্বদা শুভ সঙ্কল্প ও শুভ কার্য্যে প্রেরণা দান করে। তার ফলেই ক্রমশঃ মনের জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত মলিন ভোগবাসনা ও অশুভ সংস্কারগুলি ধীরে ধীরে ক্ষীণ ও সঙ্কুচিত হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বস্তুতঃ এই অবস্থায়—সাধকের মন সর্ব্বদা উর্দ্ধ্বমুখী হওয়ার ফলে তার পক্ষে কামবাসনা জয় করা হয় সহজসাধ্য।

গীতা এজন্য বলছেন, আত্মার দ্বারা আত্মাকে স্থির ও নিশ্চল ক'রে মনোবুদ্ধিকে শুদ্ধ ও নির্ম্মল কর। এখানে আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংযত করার

অর্থ 'পাকা আমি' (Higher ego) দ্বারা 'কাঁচা আমি' (Lower ego)কে সংযত করা। অর্থাৎ, শুভ সংস্কারসম্পন্ন আমিত্ব-বুদ্ধির দ্বারা মলিন বাসনাযুক্ত আভাস-আত্মাকে সংযত বা বশীভূত করা। বস্তুতঃ, কাঁচা-আমিকে আশ্রয় করেই মানুষের মনে ভোগবাসনা উৎপন্ন হয় এবং পাকা-আমিকে অবলম্বন করে মানুষের মন হয়ে ওঠে নীতিময়, সদাচারী ও ভগবন্মুখী। এই পন্থা অবলম্বন না করে যারা কৃচ্ছ্র সংযম সাধনার দ্বারা বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-দমনে অগ্রসর হয়, তাদের সে চেষ্টা যে শুধু ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয় তাই নয়—এইরূপ জোর-জবরদস্তির ফলে অনেক সময় দৈহিক ও মানসিক বিকার উৎপন্ন হওয়ারই সম্ভাবনা। বর্ত্তমান যুগের ফ্রয়েড্‌বাদী মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ এই পন্থাকে এই কারণে বিশেষ ভাবে নিন্দা করেছেন। গীতা বহু পূর্ব্বে এই পন্থার ভয়াবহতা ও অনুপযোগিতার সূচনা দিয়ে নির্দ্দেশ দিয়েছেন—বাসনা-কামনাকে জয় করতে হলে আত্মনিষ্ঠ বা আত্মচিন্তায় সমাহিত হওয়া প্রয়োজন। জ্ঞানমার্গের মতে কামজয়ের এই পন্থাই সুগম ও প্রশস্ত।

সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দও স্বীয় পার্ষদগণকে এই বিষয়ে ঠিক অনুরূপ উপদেশ দিয়ে বলেছেন—"আত্মচিন্তা মানুষের ভিতরে আত্মজ্ঞান আনয়ন করিয়া তাহাকে রিপুর উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়ের উৎপীড়ন হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক মহামুক্তি ও অনন্ত কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত করে। মানুষ যদি ভ্রান্ত বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া মায়াজাল ছেদন পূর্ব্বক নিয়ত প্রাণে আত্মস্মৃতি জাগাইয়া রাখিতে পারে, তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শান্তি-সুখে কালযাপন করিতে পারিবে।"

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ—জ্ঞানযোগঃ

সাধারণতঃ বেদান্তমতে 'নেতি নেতি' বিচারের দ্বারা আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ের যে সাধনপদ্ধতি—তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগের বর্ণনা-প্রসঙ্গে যে আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য বিচার করা হয়েছে, উপরোক্ত মতে তাহাই জ্ঞানযোগ। পরন্তু, গীতার এই চতুর্থ অধ্যায়ে তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব বিচারের কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নি। তথাপি, এই অধ্যায়কে কেন 'জ্ঞানযোগ' নামে অভিহিত করা হল—পাঠকের মনে সর্ব্বপ্রথম সেই প্রশ্ন উত্থিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা প্রয়োজন—এই অধ্যায়ে সর্ব্বপ্রথম যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভগবদবতার ব'লে পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর জন্ম ও কর্ম্ম যে দিব্য—সেই বিষয়টি তিনি প্রিয় সখা অর্জ্জুনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থিত করেছেন। এই অবতার-তত্ত্বের আলোচনাই এই অধ্যায়ের মুখ্য উপাদান। জ্ঞানযোগ বলতে এখানে বিশেষ ভাবে তারই প্রতিপাদন করা হয়েছে। উপনিষদুক্ত নেতিমূলক জ্ঞানমার্গ ও গীতোক্ত জ্ঞানযোগের এই যে পার্থক্য, সর্ব্বাগ্রে এখানে তা-ই প্রণিধানযোগ্য।

এস্থলে জানা আবশ্যক—গীতায় 'পরতত্ত্ব' বলতে কেবল অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব বুঝায় না। পরতত্ত্ব বলতে এখানে বুঝান হয়েছে ঈশ্বরতত্ত্ব বা পুরুষোত্তম-তত্ত্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্বের বর্ণনার পরে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবৎ-তত্ত্বের সূচনা দেওয়ার ইহাই মুখ্য কারণ।

চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনাতেই শ্রীভগবান্ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১

অন্বয়—শ্রীভগবান্‌ উবাচ। অহম্‌ ইমম্‌ অব্যয়ং যোগং বিবস্বতে প্রোক্তবান্‌ বিবস্বান মনবে প্রাহ ; মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ॥ ১

অনুবাদ—শ্রীভগবান্‌ বললেন—এই অব্যয় জ্ঞানযোগ আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে বলেছিলাম। পরে সূর্য্য নিজপুত্র মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন॥ ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ ২

অন্বয়—পরন্তপ! এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্‌ ইমং রাজর্ষয়ঃ বিদুঃ ; ইহ স যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ॥ ২

অনুবাদ—হে পরন্তপ! এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত ছিলেন। পরন্তু, কালক্রমে সেই যোগ বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয়।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্‌॥ ৩

অন্বয়—মে ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে এব প্রোক্তঃ ; এতৎ হি উত্তমং রহস্যম্‌॥ ৩

অনুবাদ—তুমি আমার ভক্ত ও সখা। এজন্য সেই প্রাচীন যোগের বিষয় আজ তোমাকে বললাম। ইহা অত্যন্ত গুহ্যতত্ত্ব॥ ৩

জ্ঞান—অনাদি অনন্ত

একদিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, জগতের কোন জ্ঞানই নূতন নয়। প্রতিটি জ্ঞান পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি বা পুনরাবিষ্কার মাত্র। যেমন, 'মাধ্যাকর্ষণ'-তত্ত্বটি (Law of Gravitation) বিশ্বপ্রকৃতির একটি চিরন্তন বিধান। মহা মনীষী ভাস্করাচার্য্য, পণ্ডিতপ্রবর স্যার আইজাক নিউটন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ তার আবিষ্কারক মাত্র। অর্থাৎ, এই জ্ঞান পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকবে। ঠিক তদ্রূপ গীতোক্ত এই জ্ঞান নিত্য ও সনাতন। সূর্য্য, মনু, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি রাজর্ষিগণের মধ্যে পরম্পরাক্রমে পূর্ব্বে ইহা প্রচলিত ছিল। বাহ্যতঃ বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকলেও তাঁরা ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ

ঋষি। অধ্যাত্ম দৃষ্টি নিয়েই তাঁরা তাঁদের যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতেন। অর্থাৎ, অন্তরে যোগযুক্ত হয়ে জগচ্চক্রের অনুবর্ত্তনই ছিল তাঁদের জীবনব্রত। বস্তুতঃ, ইহাই ভারতীয় আদর্শ। কবিবর রবীন্দ্রনাথ তারই আভাস দিয়ে বলেছেন—

"কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্বকর্ম্ম-ফল ব্রহ্মে দিতে উপহার।"

ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্ম করার এই যে নিগূঢ় রহস্য তাহাই ভারতের সত্যকার মর্ম্মবাণী। কালবশে সেই মহান্‌ রহস্য বিস্মৃত হয়ে ভারত-ভারতী যখন এক প্রকার মিথ্যা নৈষ্কর্ম্ম্যমূলক জ্ঞানবাদের কবলে পতিত হয়েছিল, তখনই শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়ে স্বীয় সখা অর্জ্জুনের মাধ্যমে সেই সনাতন সত্যতত্ত্বটি গীতাধর্ম্মের নামে প্রচার প্রতিষ্ঠা করেন।

অর্জ্জুন যখন শুনলেন—তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণই এই যোগের প্রথম প্রবক্তা তখন তাঁর মনে উদ্রিক্ত হল নিদারুণ সন্দেহ-সংশয়। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন—

অর্জ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—ভবতঃ জন্ম অপরং, বিবস্বতঃ জন্ম পরং ; ত্বম্‌ আদৌ প্রোক্তবান্‌ কথম্‌ এতৎ বিজানীয়াং॥ ৪

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন, আপনার জন্ম হয়েছে পরে এবং বিবস্বানের (সূর্য্যের) জন্ম হয়েছে পূর্ব্বে, সুতরাং কেমন করে বুঝব যে, আপনি পূর্ব্বে তাঁকে এই জ্ঞানের উপদেশ দিয়েছিলেন? ৪

শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতস্বরূপ বিষয়ে অর্জ্জুনের সংশয়

অর্জ্জুনের এ প্রশ্ন হতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে ভাগবৎস্বরূপ বলে উপলব্ধি করতে পারেন

নি এবং তখনো পর্যন্ত তিনি তাঁকে একজন মনুষ্য জ্ঞান ক'রে তাঁর সহিত সখারূপে ব্যবহার করছেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁর মুখে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ নির্দ্দেশ লাভ করার পরে তাঁর প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধাভক্তির ভাব জাগ্রত হলেও তিনি তখনও ধারণা করতে পারেন নি—সখারূপে যে মানুষটি তাঁর পুরোভাগে বিদ্যমান—তিনি কেবল নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নন, তিনি নরদেহে অবতীর্ণ স্বয়ং পুরুষোত্তম।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত, এই কালে পিতামহ ভীষ্ম এবং সাধকপ্রবর বিদুরই মাত্র শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। নন্দ, যশোদা ও অন্যান্য গোপগোপীগণও তাঁদের স্নেহ-প্রেমের আতিশয্যবশতঃ তাঁর প্রতি সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্‌ভাব রক্ষা করতে পারতেন না। শ্রীভগবানই স্বীয় মায়াশক্তির আবরণ সৃষ্টিপূর্ব্বক তাঁদের নিকট আত্মগোপন করে থাকতেন। ভক্তিশাস্ত্র মতে লীলাপুষ্টির জন্য এরূপ আত্মগোপন একান্ত প্রয়োজন। আলো-ছায়ার পটভূমি না থাকলে যেমন নাটক জমে না—ঠিক তদ্রূপ শ্রীভগবানের লীলানাট্যের পরিপুষ্টির জন্যই আবশ্যক হয়—এরূপ জ্ঞানাজ্ঞানের লুকোচুরি।

সখার উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ ৫

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ। মে তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি; অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ, পরন্তপ! ত্বং ন বেত্থ॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে, আমি সে সবই জানি। হে পরন্তপ, তুমি তা জান না॥ ৫

জীবের ও ভগবানের জন্মের পার্থক্য

জীবের ন্যায় ভগবানেরও পুনর্জ্জন্ম বা পুনরবতরণ ঘটে। তবে উভয়ের জন্মের মধ্যে ব্যবধান অনেক। জীব জন্মগ্রহণ করে স্বীয় প্রাক্তন কর্ম্মের

ফলভোগের জন্য, আর ভগবান্ অবতীর্ণ হন জীবোদ্ধারের নিমিত্ত। অজ্ঞানবশতঃ জীব জানে না যে, সে পূর্ব্বে কোথায় কি অবস্থায় ছিল। পক্ষান্তরে, মায়াধীশ ভগবান্ কদাপি এরূপ আত্মবিস্মৃত হন না। তিনি জানেন যে, স্বীয় লীলার পরিপুষ্টির জন্য তিনি বহুবার অবতার গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর এই ভগবল্লীলা একান্তই তাঁর ইচ্ছার অধীন।

পরবর্ত্তী শ্লোকে এই তত্ত্বটি ভালভাবে পরিষ্কার ক'রে শ্রীভগবান্ পুনরায় বললেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্যামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬

অন্বয়—অজঃ সন্ অপি অব্যয়াত্মা, ভূতানাম্ ঈশ্বর সন্ অপি, স্বাং প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি॥ ৬

অনুবাদ—আমি অজ বা জন্মরহিত হয়েও অধিকারী এবং সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হয়েও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে নিজের মায়ায় আবির্ভূত হই॥ ৬

অবতার-তত্ত্বের স্বরূপ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি, সর্ব্বভূতের যিনি বিভু, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিৎ শক্তিরূপে যিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বভূতে অনুস্যূত পরিব্যাপ্ত তাঁর পক্ষে সসীম ও ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হওয়া বাস্তবিক বিস্ময়কর ও রহস্যজনক। প্রাচীন বেদাদি শাস্ত্রে এরূপ অবতার-তত্ত্বের কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। বাল্মীকি-রামায়ণেও দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্র বহুলাংশে আদর্শ মানবরূপে বর্ণিত। গীতাতেই সর্ব্বপ্রথম বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই অবতার-তত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে নিজেকে অবতার বলে ঘোষণা করেছেন। পরবর্ত্তী যুগে পুরাণ, চণ্ডী ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে এই অবতার-তত্ত্বটি আরও সুন্দর, সুস্পষ্ট ও সরস ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে, হিন্দুসমাজের মধ্যেও অদ্যাপি প্রাচীন অর্ব্বাচীন এমন কয়েকটি ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান যারা অদ্যাপি অবতার-তত্ত্বে অবিশ্বাসী। জ্ঞানবাদী আচার্য্য ও পণ্ডিতগণ জীবকেই 'ব্রহ্ম' বলে স্বীকার করেন। তাঁদের

মতে জীব ও শিব তত্ত্বতঃ অভিন্ন। পরমেশ্বর জীবোদ্ধারের জন্য নরদেহে অবতীর্ণ হন—এই তত্ত্ব তাঁরা স্বীকার করেন না। বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্ম ও আর্য্য সমাজের আচার্য্যগণও অবতারবাদের কঠোর সমালোচক। তাঁরা বলেন—অনাদি, অনন্ত, নিরাকার ব্রহ্মসত্তা কদাপি সাকার, সান্ত ও সসীম হতে পারে না। তাঁরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন যে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরে সব কিছুই সম্ভবপর। তাঁরা বিস্মৃত হন—সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা স্বয়ং 'একোঽহং বহুস্যাম্' —সঙ্কল্প-বলে সাকার, সরূপ, সগুণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও বিচিত্র জীবজগৎরূপে প্রকটিত হয়েছেন। স্বরূপতঃ এক হয়েও তিনি আপনাকে বহুরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং করতে সমর্থ। সর্ব্বত্র প্রকাশমান বায়ু কি কোথাও কোথাও প্রয়োজনমত প্রবল প্রভঞ্জনরূপে প্রতিভাত হয় না? জগতের সর্ব্বভূতে সূক্ষাতিসূক্ষ্মরূপে অনুস্যূত যে-অগ্নিকণা, তা কি কোথাও কোথাও প্রয়োজনমত ভীষণ ও সর্ব্বগ্রাসী দাবালনরূপে প্রকাশ পায় না? বায়ু ও অগ্নির পক্ষে যখন তা সম্ভবপর, তখন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতে বিদ্যমান সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার পক্ষে নরশরীর ধারণ করা কেন অসম্ভব হবে? বস্তুতঃ, ভগবানের মধ্যে সমস্ত পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের সমন্বয় ও সমাবেশই সম্ভবপর। তিনি একাধারে সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, অনন্ত ও সান্ত। এজন্যই শাস্ত্রকার বলেছেন—"তাদৃশঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিধ্যেৎ পরমেশতা"—অর্থাৎ, এরূপ শক্তিমান্ না হলে তাঁকে পরমেশ্বর বলা যায় না।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ রাখা প্রয়োজন—খৃষ্টান ও ইসলামধর্ম্মিগণও অবতার-তত্ত্বে বিশ্বাসী। তবে তাঁদের মতে ঈশ্বর নিজে অবতাররূপে আবির্ভূত হন না; তিনি তাঁর শক্তিকে কখনও পুত্র কখনও মিত্ররূপে প্রেরণ করেন।

প্রশ্ন আসে, ভগবান্ যখন সর্ব্বশক্তিমান তখন তো তিনি স্বীয় অসীম ও অমোঘ সঙ্কল্পবলে মুহূর্ত্তের মধ্যে যাবতীয় গ্লানি-গ্লানি দূরীভূত ক'রে জীবোদ্ধারের ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারেন। তবে তাঁর পক্ষে এরূপ নরশরীর ধারণের প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যায়—ভগবানের পক্ষে তা যে অসম্ভব —এমন নয়। তবে সেরূপ ভাবে কার্য্যোদ্ধার করলে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এরূপ চেষ্টার ফলে লোকচিত্তে কেবল মাত্র বিস্ময়েরই সঞ্চার হয়। সে ক্ষেত্রে কেহ ভগবানের সেই কার্য্যের অনুসরণ বা অনুকরণ করতে

পারে না। পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ স্বয়ং এই বিষয়টি সুস্পষ্ট ক'রে বলেছেন—"সর্ব্ব কর্ম্মের অতীত হয়েও আমি যে সাধারণ মানুষের মত কাজ করি, তার একমাত্র উদ্দেশ্য লোকসংগ্রহ বা লোকশিক্ষা। এরূপ ভাবে আমি কর্ম্ম না করলে লোকে আমার সেই আদর্শের অনুসরণ ও অনুবর্ত্তন ক'রে উৎসন্নে যাবে—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।"

স্বীয় অবতার-তত্ত্বের হেতু আরও সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে অতঃপর শ্রীভগবান্ বললেন—

> **যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।**
> **অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭**
> **পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।**
> **ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮**

অন্বয়—ভারত! যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং ভবতি তদা অহং আত্মানং সৃজামি। সাধূনাং পরিত্রাণায়, দুষ্কৃতাং বিনাশায় ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ যুগে যুগে সম্ভবামি॥ ৭।৮

অনুবাদ—হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই॥ ৭।৮

অবতারত্বের হেতু

এই জগতে দুইটি পরস্পরবিরোধী শক্তি নিরন্তর কর্ম্মরত—এদের একটি কেন্দ্রানুগ বা কেন্দ্রমুখী (centripetal), অপরটি কেন্দ্রাতীগ বা কেন্দ্রাপসারী (centrifugal)। কেন্দ্রানুগ শক্তিটি জগতের সমস্ত কিছুকে মূল কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করছে এবং কেন্দ্রাতীগ শক্তিটি সমস্ত কিছুকে কেন্দ্রচ্যুত করে নিয়ে যাচ্ছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। বস্তুতঃ, এই দুইটি পরস্পরবিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলেছে নিরন্তর এবং তারই পরিণামে সমাজ-জীবনে ভারসাম্য ও শান্তিরক্ষার জন্য যে প্রচেষ্টা—গীতার ভাষায় তারই নাম ধর্ম্ম-সংস্থাপন।

সাধারণ অবস্থায় এই ধর্ম্ম-সংস্থাপনের দায়িত্বভার অর্পিত থাকে

প্রত্যেক সমাজের নেতৃস্থানীয় ধর্ম্মগুরু বা ধর্ম্মাচার্য্যের উপর। সমাজপতি ও রাষ্ট্রনায়কগণের সহায়তায় উক্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ আবশ্যক বিধি-বিধানের প্রবর্ত্তন ও যথোচিত প্রচার-প্রচেষ্টার দ্বারা এই মহান্ ব্রত সম্পন্ন করেন। কিন্তু, যখন কালচক্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনে গুরুতর ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যখন অশুভ শক্তিগুলি সমবেত ও সম্মিলিত হয়ে ভীমবেগে সমস্ত ন্যায়-নীতি ও নিয়মশৃঙ্খলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে জগতে ভয়াবহ অসুখ-অশান্তি, অনাচার-উপদ্রবের সৃষ্টি করে এবং তার ফলে সমাজের সাধুভাবাপন্ন ব্যক্তিরা যখন সেই ভীষণ প্রতিকূল শক্তির সম্মুখীন হয়ে সমাজজীবনে শান্তি ও সাম্য রক্ষা করতে অসমর্থ হন, তখন সেই ভয়াবহ উৎকট পরিস্থিতির সংস্কার-সংশোধনের জন্য প্রয়োজন হয় —ভগবৎ শক্তির অবতরণ।

সাধারণ অবস্থায় যেমন চোর ডাকাতের উপদ্রব অনাচার হতে সমাজজীবনকে রক্ষা করার জন্য চৌকিদার ও পুলিশের সহায়তা ও সহযোগিতাই যথেষ্ট ; পরন্তু, পরিস্থিতি যখন তদপেক্ষা জটিলতর ও ভয়ঙ্করস্বরূপ ধারণ করে তখন তার প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন হয়— উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর শাসন কর্ত্তৃত্ব। তাতেও যদি শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত না হয়, তবে সেই নিদারুণ বিদ্রোহ বিপ্লবের প্রতিকার প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজন হয় সর্ব্বোচ্চ শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ। বস্তুতঃ ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রয়োজনও ঠিক তদ্রূপ। ঋষি, মহর্ষি ও সাধারণ ধর্ম্মগুরুগণের দ্বারা যখন ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য বিদূরিত না হয়, তখন স্বয়ং ভগবান্ নরদেহে অবতীর্ণ হন সেই দুরূহ কার্য্য সংসিদ্ধির জন্য।

অবতারত্বের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ

গীতার মতে শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনটি— সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন। জগতের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাবধি যত অবতার বা পয়গম্বরের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের জীবন ও কার্য্যকলাপ অনুধাবন করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়—কেবলমাত্র শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনে অবতার-তত্ত্বের উক্ত তিনটি আদর্শ পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়েছে। শ্রীবুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি

অবতারগণের জীবনাদর্শের মধ্যে "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" ভাবটি অনেকখানি প্রচ্ছন্ন। পক্ষান্তরে, নৃসিংহ অবতারে দুষ্কৃতি দমনের ভাবটিই সর্ব্বাধিক প্রবল।

একশ্রেণীর সমালোচকের মতে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোকসংগ্রহের নামে যে ভয়াবহ হিংসা-নীতির আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেন, তার ফলে ভারতের ক্ষাত্রশক্তি চিরতরে ম্লান ও হীনপ্রভ হয়ে পড়ে এবং তারই পরিণামে আসে ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে বিগত সহস্র বর্ষের পরতন্ত্রতা। বলা বাহুল্য, এই সমালোচকগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবদবতার বলে স্বীকার করেন না। তা ছাড়া, তাঁদের উক্ত প্রকার অভিযোগ ও বিরূপ সমালোচনা যে একান্ত ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন তা সহজে অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ এঁরা বিস্মৃত হন যে, শ্রীকৃষ্ণের পরেও ভারতবর্ষে আবির্ভাব ঘটে চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, রাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজীর ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত রাজেন্দ্রবর্গের—যাঁদের অতুলনীয় ক্ষাত্রশক্তি যে কোনও দেশ ও জাতির পক্ষে গর্ব্ব ও গরিমার বিষয় বলে পরিগণিত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের জানা উচিত— শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে ভৃগুপুত্র পরশুরাম এই পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় করার জন্য ভীষণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন ; কিন্তু তার পরেও ক্ষাত্রশক্তি পুনরায় সিংহবিক্রমে শির উত্তোলন করে।

বস্তুতঃ এই প্রাকৃত জগতে ক্রূর ও দুর্দ্ধর্ষ আসুরিক শক্তিকে সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষেত্রে কেবল মাত্র প্রেম, ক্ষমা ও অহিংসানীতির দ্বারা বশীভূত করা সম্ভবপর নয়। রাষ্ট্রক্ষেত্রে অহিংসানীতির প্রথম প্রবর্ত্তক সম্রাট অশোকের জীবৎকালেই তাঁর স্বজনগণের মধ্য হতে যে ভীষণ বিদ্রোহের অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তাতেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রক্ষেত্রে অহিংসানীতির প্রবর্ত্তন করতে গিয়ে যে শোচনীয় ব্যর্থতার ইতিহাস রচনা করেছেন তার দুর্ভোগ ভারত-ভারতী আজ পদে পদে অনুভব করছে না কি?

বস্তুতঃ রাষ্ট্রক্ষেত্রের সনাতন নীতি হচ্ছে—সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ। সেই নীতিকে অস্বীকার করে কেবল এক পক্ষীয় অহিংসা-নীতির দ্বারা যাবতীয় সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা যে ভ্রান্ত ও মারাত্মক, চতুর্দ্দিকের অবস্থাচক্র অঙ্গুলিসঙ্কেতে আজ সেই সত্যই সুপ্রমাণ করেছে। এজন্যই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক হস্তে প্রেমের প্রতীক ঐ মুরলী ও অপর হস্তে দণ্ডনীতির প্রতীক

ঐ চক্র ধারণ করে জীবোদ্ধার বা ধর্ম-সংস্থাপনের যে সর্ব্বোত্তম আদর্শ প্রবর্ত্তন করেছেন—তার উপযোগিতা সর্ব্বকালে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই নীতি বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় সমস্যা-সমাধানের সুপরিকল্পিত বাস্তব নীতি ও ভগবদ্ বিধান। জগতে ন্যায় ও ধর্ম্মের মহিমা রক্ষার জন্য চিরকাল এই নীতিকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অধ্যাত্ম জীবনে প্রোজ্জ্বল রাখা প্রয়োজন। বস্তুতঃ, ইহাই সনাতন ধর্ম্মের মৌলিক আদর্শ। মধ্যযুগে এই আদর্শ বিস্মৃত হবার ফলে ভারত তথা হিন্দু জাতির পতনের পথ উন্মুক্ত হয়।

আশা ও আশ্বাসের বিষয়—সুদীর্ঘকাল পরে সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দের জীবনাদর্শের মধ্যে সেই সনাতন নীতিটি আজ পুনরায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আচার্য্যপ্রবরের প্রবর্ত্তিত সামগ্রিক পরিকল্পনার মধ্যে গীতোক্ত সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টগণের দমন ও ধর্ম্মসংস্থাপনারূপী সেই সমন্বিত ত্রয়ী নীতি একান্ত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত।

দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের উদ্দেশ্যে আচার্য্যপ্রবর বলেছেন—"**যে ধর্ম্ম ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে দুষ্ট দুর্ব্বৃত্তগণের অনাচার, অবিচার, অত্যাচার হতে রক্ষা করতে পারে না, যে ধর্ম্ম সমাজ জীবনে পুঞ্জীভূত পাপতাপ ও দুর্নীতি-অনাচার দূরীভূত করতে অসমর্থ, সে-ধর্ম্ম—ধর্ম্ম নয়, তা অপধর্ম্ম।**" এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ দিয়ে তিনি স্বীয় পার্ষদগণকে সূচনা দিয়েছেন—"**সাধু সন্ন্যাসী সব কিছুই সহ্য করতে পারে, পরন্তু ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, পুণ্যের নামে পাপকে কোন দিন প্রশ্রয় দিতে পারে না।**"

আচার্য্য প্রণবানন্দের সমগ্র জীবনব্যাপী কর্ম্মসাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—ধর্ম্মভিত্তিতে ভারতীয় জাতির পুনর্গঠন। কেবলমাত্র মৌখিক প্রচারের মাধ্যমে নয়, সুসংবদ্ধ ও সক্রিয় আন্দোলন-পরম্পরার মাধ্যমে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তিকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে তিনি চেয়েছিলেন—তাঁর সেই জাতিগঠনের আদর্শকে রূপায়িত করতে। এ বিষয়ে তিনি বলতেন—"লোকে জপ করে কাঠের মালায়, তুলসীর মালায় আর আমি আবাল্য জপ করে এসেছি জাতিগঠনের মালায়।" ভারতের চিরন্তন ধর্ম্মাদর্শের ভিত্তিতে ভারতীয় জাতির পুনর্গঠন ও তার মাধ্যমে বিশ্বসমস্যার সমাধান করাই ছিল তাঁর জীবন-ব্রত।

অবতারের প্রকারভেদ

অবতার-তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে আরও দু' একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। হিন্দুশাস্ত্রমতে অংশ, কলা, গুণ ও শক্তির আধারভেদে অবতার বহু প্রকার। স্বরূপতঃ এক হয়েও যুগপ্রয়োজনে ভগবচ্ছক্তি বিভিন্ন আধারে বিবিধরূপে প্রকটিত হন। এঁদের পারস্পরিক তুলনামূলক সমালোচনা একদিক দিয়ে অযৌক্তিক ও নিরর্থক। তথাপি, শাস্ত্রকারগণ বলেছেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরিপূর্ণ শক্তি ও গুণের আধার। তদনুপাতে অন্যান্য অবতার—শক্তি ও গুণে অপূর্ণ। যখন যে যুগে যেরূপ সমস্যা ও যে প্রকার ধর্ম্মগ্লানি প্রকট হয়, তার সমাধান বা দূরীকরণের জন্য শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন তদনুরূপ শক্তি ও গুণ নিয়ে। যে যুগে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে আবির্ভূত হন সে যুগের সমস্যা ছিল অতি ব্যাপক, জটিল ও দুরূহ। সমগ্র পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী তখন আসুরিকতার বর্ব্বর অত্যাচারে একান্ত নির্জিত। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, নরক, দুর্য্যোধনাদি দুর্ব্বৃত্তগণের নারকীয় অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে তখন সত্যকার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি, নীতি ও সদাচার বিলুপ্তির পথে উপনীত। সেই নিদারুণ দুর্দ্দিনের যখন ধর্ম্মগ্লানি অধোগতির শেষসীমায় আপতিত, শ্রীভগবানকে তখন অবতীর্ণ হতে হয়েছিল পরিপূর্ণ গুণ ও শক্তি নিয়ে।

জগতের বর্ত্তমান অবস্থাচক্র লক্ষ্য করলেও সেই দৃশ্যই নয়নসমক্ষে উদিত হয়। শুধু কোন দেশ, প্রান্ত, জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষ নয়, সারা বিশ্বের সমগ্র মানবসমাজে আজ জড়বাদের নামে নাস্তিক্যবাদ ও ভোগবাদের প্রবল আধিপত্য। অতুল বৈজ্ঞানিক শক্তির অধিকার লাভ ক'রে মানুষ আজ শুধু ভূলোকেই নয়, অন্তরীক্ষের গ্রহ-উপগ্রহেও স্বীয় অধিকার-প্রতিপত্তি জমাবার প্রচেষ্টায় উন্মত্ত। আণবিক শক্তির অপব্যবহারে উদ্যোগী হয়ে মানুষ আজ তার সহস্র সহস্র বর্ষার্জ্জিত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা-গৌরবকে ধ্বংস করতে উদ্যত। সুতরাং, আজও ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সীমা পরিসীমা নাই। এই ঘনঘোর তমিস্রার দুর্দ্দিনে তাই শ্রীভগবান সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য পরিপূর্ণ গুণ ও শক্তি নিয়ে প্রণবানন্দ-শরীরে অবতীর্ণ। তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্র ও কর্ম্মচক্রের সাফল্য যথাসময়ে পূর্ণ প্রকটিত হবে।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে স্বীয় অবতার-তত্ত্বের বর্ণনাপ্রসঙ্গে আরও বললেন—

জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ ৯

অন্বয়—অর্জ্জুন! যঃ মে এবং দিব্যং জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বতঃ বেত্তি সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি ; মাম্ এতি॥ ৯

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, আমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য ; এই বিষয়টি যিনি তত্ত্বতঃ অবগত, তিনি দেহত্যাগ ক'রে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন॥ ৯

ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্ম্মের জ্ঞান মোক্ষপ্রদ

শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম এবং প্রাকৃত মানুষের জন্ম কর্ম্মের মধ্যে ব্যবধান অনেক। সাধারণ লোক জন্মগ্রহণ করে স্বীয় বাসনাবশে এবং প্রাক্তন কর্ম্মের ফলভোগের জন্য। পক্ষান্তরে, শ্রীভগবান্ জগতে আবির্ভূত হন স্বেচ্ছায় ও স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। তাঁর শরীরও হচ্ছে অপ্রাকৃত-ভক্তিশাস্ত্রমতে তা হচ্ছে সচ্চিদানন্দনঘন বিগ্রহ। শ্রীভগবানের এই জন্মের পশ্চাতে প্রকৃতিরও কোন প্রভাব বা আধিপত্য থাকে না। বস্তুতঃ জন্মের ন্যায় শ্রীভগবানের কর্ম্মও অপ্রাকৃত। তাঁর সেই কর্ম্মের মধ্যে মোহাসক্তির স্থান নাই,—লোকসংগ্রহের দিব্য প্রেরণাই তাঁর সেই কর্ম্মের আদি, মধ্য ও অন্ত।

প্রশ্ন আসে—শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম অলৌকিক ও অপ্রাকৃত—তা না হয় বোঝা গেল। পরন্তু, তাঁর জন্ম ও কর্ম্মের মধ্যে এমন কি রহস্য আছে যা অবগত হলে মানুষ গতাগতির গোলকধাঁধা হতে চিরমুক্তি লাভ করে? উত্তরে বলা যায়, সাধক যখন ঠিক ঠিক অনুভব করতে পারেন যে, পরমাত্মা নিরাকার, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, অবাঙ্‌মনসগোচর এবং অজ হয়েও কেবল তাদের ন্যায় পাপী-তাপীর উদ্ধারের জন্য জগতে অবতরণ করেন, যখন তাঁরা সত্য সত্যই উপলব্ধি করেন যাঁর দর্শনের জন্য জন্ম জন্ম ধ'রে তাঁরা এত আকুল ব্যাকুল,—সংসারের দাবদাহ হতে মুক্তিলাভের জন্য যাঁর

কৃপা ও অনুগ্রহ লাভের আশায় তাঁরা যুগ যুগ ধরে এতখানি ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত, আজ তিনি অহৈতুকী কৃপাবশে নিজেই নিজেকে নবরূপে সৃষ্টি করে অপূর্ব্ব প্রেমঘনমূর্ত্তি নিয়ে তাঁদের পুরোভাগে আবির্ভূত এবং তাঁদের মত একজন হয়ে তাঁদের নিকট ধরা দেবার জন্য তিনি এতখানি আতুর ও আগ্রহান্বিত, যখন তাঁরা বুঝতে পারেন—নরাকারে আবির্ভূত সেই প্রেমাবতার শ্রীভগবান্ তাঁদের পরম প্রিয়, মাতা, সখা, সুহৃদ, পতি, পত্নী পুত্র, কন্যা এবং স্বজনগণ অপেক্ষাও অধিকতর দরদী মরমী ও ব্যথার ব্যথী, তখন তাঁরা সত্যসত্যই উপলব্ধি করেন—ভগবদবতার সেই পরম পুরুষোত্তমই তাঁদের একমাত্র সেব্য, অনুভব্য ও প্রার্থিতব্য—তাঁর সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে তাঁদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের বিসর্জ্জন দিয়ে এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হয়ে তাঁর অভিপ্রেত কর্ম্ম সম্পাদনের মধ্যেই তাঁদের পরম শান্তি ও পরম আনন্দ।

বস্তুতঃ এই ভাবে শ্রীভগবানের দিব্য জীবন ও দিব্য কর্ম্মের সংস্পর্শে আসার ফলে জীবের সংসারবন্ধন ক্রমশঃ ছিন্ন হয়ে যায় ; তাদের নিজেদের জীবন এবং কর্ম্মও শুদ্ধ ভাগবত স্বরূপ ধারণ ক'রে সফল ও সার্থক হয়ে যায় যুগযুগব্যাপী কৃচ্ছ্র কঠোর তপস্যার দ্বারাও যে পরা শান্তি ও মহামুক্তির অধিকারী হওয়া যায় না, অবতারগণের দিব্য লীলার সংস্পর্শে ও সাহচর্য্যে আসার ফলেই তাঁর প্রাপ্তি এই ভাবে অতি সরল, সহজ ও সুগম হয়ে যায়।

এই বিষয়টি পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণনা ক'রে শ্রীভগবান্ আবার বললেন—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০

অন্বয়—বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মাম্ উপাশ্রিতাঃ বহবঃ জ্ঞানতপসা পূতাঃ মদ্ভাবম্ আগতাঃ॥ ১০

অনুবাদ—আমাতে তন্ময় হয়ে, আমাকে একান্ত ভাবে আশ্রয় করে, আসক্তি, ভয় ও ক্রোধাদিবর্জ্জিত হয়ে বহু ব্যক্তি আমার জন্ম কর্ম্মের তত্ত্বালোচনারূপ জ্ঞানময় তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে আমার ভাবে নিমজ্জিত হয়ে যায়॥ ১০

গীতামৃত—অবতারের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষ স্বল্পশক্তিসম্পন্ন গুরু বা আচার্য্যের আশ্রয়ে তাঁর আদেশ, নির্দ্দেশমত অথবা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ ক'রে জপ-তপ, সাধন-ভজন ক'রে ক্রমশঃ চিত্ত-শুদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। পরন্তু, শ্রীভগবান্ যখন অভয়দাতা সদ্‌গুরুরূপে মায়াবদ্ধ জীবকুলকে স্বীয় অলৌকিক ভাগবত ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর মহাভাবে তাদিগকে ডুবিয়ে মজিয়ে আপ্লুত ও অভিভূত করে রাখেন, তখন ভগবানের সেই সাক্ষাৎ সংস্পর্শ লাভ করার ফলে তাদের অন্তরের প্রসুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মুহূর্ত্তে ভীমবেগে জাগ্রত হয়ে উঠে এবং তাদের জাগতিক বিষয়মোহ অচিরে বিনষ্ট হয়ে যায়। তাদের মন তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি সর্ব্বপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তি হতে অতি সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে পরিমুক্ত হয়ে যায়। দুকুলপ্লাবী বন্যাপ্রবাহে যেমন কোনও প্রান্তের সুচিরসঞ্চিত পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনারাশি অত্যল্পকালের মধ্যে ধৌত বিধৌত হয়ে যায়, তেমনই অবতার পুরুষের অপার প্রেম-পারাবারের বিপুল তরঙ্গপ্রবাহে সাধককুলের হৃদয়ের জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ-তাপ, ভয় ও অশান্তির আবর্জ্জনা মুহূর্ত্তেই দূরীভূত হয়ে শুচি শুদ্ধ ও পরম পবিত্র হয়ে যায়। প্রত্যেক জাতির জীবনে অবতার পুরুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রকট হয় এক অমল ধবল দিব্য যুগ।

বস্তুতঃ মুমুক্ষু অর্জ্জুনের হৃদয়-মনের জন্ম-জন্মান্তরের সন্দেহ-সংশয়ের নিরাকরণ ও বিষয়-মোহ অদ্যাপি বিদূরিত হয় নি। শ্রীভগবান্ এখানে তাই তাঁকে নিজের অবতারত্বের মহিমা বর্ণনা করে বরাভয় দিয়ে বললেন—হে সখে, তুমি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ো না। আমি যুগে যুগে যেমন ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হই, আজও তেমনই নরদেহে অবতীর্ণ। আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের রহস্য তুমি ভাল ভাবে অবগত হবার চেষ্টা কর, তাহলেই দেখবে অতি শীঘ্র তুমি তোমার মোহাসক্তি ও ভীতির বন্ধন হতে পরিমুক্ত হয়ে চিরশান্তির অধিকারী হবে।

অতঃপর শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে আরও সুস্পষ্ট সূচনা দিয়ে বললেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।। ১১

অন্বয়—পার্থ! যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, অহং তান্ তথা এব ভজামি ; মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে।। ১১

অনুবাদ—হে পার্থ, যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি তাকে সেই ভাবে তুষ্ট করি। মনুষ্যগণ যে যে পথের অনুসরণ করুক না কেন, সে সব আমারই পথ।। ১১

হিন্দুধর্ম্মের উদারতা ও মহত্ত্ব অতুলনীয়

ভগবানের শক্তি, গুণ ও মহত্ত্ব—অনন্ত অপার। তিনি একাধারে ক্ষর ও অক্ষর, নিরাকার ও সাকার, নির্গুণ ও সগুণ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,—তিনি বায়ু, বরুণ, সোম, বৃহস্পতি,—তিনি দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি সকল দেবদেবীর সমাহার। শ্রীভগবানের এই অনন্ত অপার ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি অতি দুর্জ্ঞেয় ও দুরধিগম্য। প্রশ্ন আসে—তবে কি তিনি অনুভূতি ও উপলব্ধির অতীত? মানুষ কি তবে তাঁকে গ্রহণ, বরণ ও ধারণা করতে একান্ত অক্ষম ও অসমর্থ? এই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তিনি এখানে স্বীয় সখাকে পুনরায় আশ্বাস দিয়ে বললেন—হে পার্থ, আমার রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য অপার অনন্ত—সন্দেহ নাই। তবে আমাকে জীব যেভাবে চায় বা ভজনা করে, আমি সেই ভাবে তার মনস্কামনা পূর্ণ করি। বেদ বলেছেন—"একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"। অর্থাৎ, মূলতঃ তিনি এক ; বিপ্র বা পণ্ডিতগণ তাঁকে বহুরূপে বর্ণনা করেন। একব্রহ্মবাদী হিন্দুধর্ম্মে বহু দেবদেবীর পরিকল্পনার রহস্য এখানে।

হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে—সাধক যে কোনও পন্থা অবলম্বন করুন না কেন, তাঁর প্রাণে যদি আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতার অভাব না থাকে তবে তিনি তাঁর মনোমত ভাবে সিদ্ধিলাভে অবশ্যই সমর্থ হবেন।

গীতার এই শ্লোকটির মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও সত্যকার আদর্শ কি, তা সম্যক্ ভাবে প্রকটিত হয়েছে। বস্তুত, এমন উদার, উদাত্ত ও সমন্বয়মূলক মহান্ আদর্শ জগতে কুত্রাপি আর কোনও ধর্ম্মে বর্ণিত ও প্রচারিত হয় নি। এজন্য ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন —"ইহাই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম। হিন্দু ধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই ; এবং এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্য আর নাই।"

অধ্যাত্ম সাধকের ভাব মুখ্যতঃ দুই প্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। সকাম ভাবের প্রশ্রয় ও প্রোৎসাহন গীতা কোথাও দেন নি। পরবর্ত্তী যুগে রচিত চণ্ডী সপ্তশতীর সহিত গীতার ভাবাদর্শের পার্থক্য এখানে। চণ্ডী সকাম ভাবের প্রার্থনায় ভরপুর। রূপ চাই, যশঃ চাই, ধন চাই, রাজ্য চাই, পুত্র চাই, মনোরমা ভার্য্যা চাই—এরূপ সকাম প্রার্থনাই চণ্ডীর মধ্যবিন্দু। পরন্তু, সাধক যদি সেখানে সেই প্রার্থনা কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত কামনাপূর্ত্তির জন্য না ক'রে সকলের কল্যাণের উদ্দেশ্যে করেন—তবেই তার সার্থকতা। পক্ষান্তরে, যে নিষ্কাম ভাব ও কর্ম্মসাধনার মাধ্যমে অচিরে জীবের মুক্তি ও শান্তির পথ পরিষ্কৃত হয় গীতা বারবার নানাভাবে তারই সমর্থন করেছেন।

এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ সূচনা দিয়ে শ্রীভগবান্ পরবর্ত্তী শ্লোকে বললেন—

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২

অন্বয়—ইহ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ দেবতাঃ যজন্তে; মানুষে হি লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি॥ ১২

অনুবাদ—ইহলোকে যারা কর্ম্মসিদ্ধি কামনা করে, তারা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করে। কারণ, মনুষ্যলোকে এরূপ সকাম কর্ম্মের ফল শীঘ্র লাভ হয়॥ ১২

সকাম উপাসনা শীঘ্র ফলপ্রদ হলেও নিন্দনীয়

এই সংসারে অধিকাংশ নরনারী সকাম ভাবের উপাসক। নানা প্রকার বাসনা-কামনা নিয়ে তারা বিবিধ দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়। অধ্যাত্ম-জীবনের প্রথম স্তরে অনেকের পক্ষে এরূপ ঘটাই স্বাভাবিক। শ্রীভগবান্ মানুষের এই দুর্ব্বলতা অনুভব করে বলেছেন—সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে মাত্র দু'একজনই প্রকৃত সিদ্ধি বা মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হয়। ধনৈষণা, যশ-এষণা প্রভৃতি শত প্রকার এষণা বা বাসনা কামনা তাদিগকে বিষয়সেবায় নিয়ত রাখে। এরূপ জাগতিক বাসনা-কামনা নিয়ে যারা পূজা-উপাসনা করে তাদের সে প্রয়াসও ব্যর্থ হয় না। বরং তাদের সেই সাধনা সহজেই ফলপ্রসূ হয়।

বস্তুত, আদর্শ যেখানে যত ক্ষুদ্র ও অনুন্নত তার প্রাপ্তিও সেখানে তত সহজসাধ্য। পরন্তু, এইরূপ সিদ্ধি দ্বারা তাদের বিষয়-বাসনা সাময়িক ভাবে কিঞ্চিৎ চরিতার্থ হলেও তার পরিপূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে না। উপরন্তু এর দ্বারা তাদের সংসার-বন্ধন উত্তরোত্তর দৃঢ় হয়। পরিশেষে কটুতিক্ত অভিজ্ঞতায় জর্জ্জরিত হয়ে তারা অনুভব করে—প্রকৃত মুক্তি বা শান্তির পথ এ নয়; সত্যকার শান্তি ও মুক্তি লাভ করতে হলে তাদিগকে ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হয়ে নিষ্কাম সাধনার দ্বারা ভগবানকে প্রসন্ন করতে হবে।

উপরোক্ত শ্লোকে শ্রীভগবান্ পরোক্ষে সকাম ভাবের নিন্দা করলেন। পরন্তু, অদ্যাপি লক্ষ লক্ষ নরনারী গীতার অধ্যয়ন, পারায়ণ ও শ্রবণ করেন জাগতিক বাসনা-কামনা নিয়ে। প্রত্যহ এক অধ্যায় করে গীতা অধ্যয়ন করলে বা গীতার উপদেশ শ্রবণ করলে পুণ্যলাভ হবে—এরূপ বাসনা নিয়ে অধিকাংশ নরনারী গীতার সেবা করে থাকেন। গীতামাহাত্ম্যেও এইরূপ ফলশ্রুতির ভুরি ভুরি বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে —বিষয়াবদ্ধ নরনারীকে গীতাধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করা। পরন্তু, অনেকে সমগ্র জীবন সেই সকাম ভাব নিয়েই অদ্যাপি গীতাপাঠ ও গীতাশ্রবণ করেন। বস্তুতঃ, এর ফলেই আজ এই গীতার দেশে নিষ্কাম সাধক সাধিকার সংখ্যা এত বিরল। প্রবর্ত্তক অবস্থায় সকাম সাধনার স্থান সাময়িক ভাবে থাকা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু সত্যকার গীতাপ্রেমী সাধকের কর্ত্তব্য—যথাসম্ভব সত্বর এই সকাম ভাবের ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়ে নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্ম ও কর্ম্মসাধনায় ব্রতী হওয়া।

পরবর্ত্তী শ্লোকে চতুর্বর্ণের উৎপত্তির বিষয়ের সঙ্কেত দিয়ে শ্রীভগবান্ বললেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ১৩

অন্বয়—ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টং, তস্য কর্ত্তারম্ অপি অব্যয়ম্ অকর্ত্তারং মাং বিদ্ধি॥ ১৩

অনুবাদ—গুণ কর্ম্মভেদে চতুর্ব্বর্ণ আমার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। আমি তার সৃষ্টিকর্ত্তা হলেও আমাকে অকর্ত্তা ও বিকাররহিত বলে জেনো॥ ১৩

চতুর্ব্বর্ণের উৎস ও প্রকৃত স্বরূপ

বৈদিক আর্য্যসমাজে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি কবে ও কীরূপে হয়েছে— এ নিয়ে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। এ বিষয়ে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলছেন—আমি এই বর্ণব্যবস্থার কর্ত্তাও বটে, অকর্ত্তাও বটে। বাহ্যতঃ, এই ভগবদুক্তি রহস্যময় বলে মনে হয়। এজন্য বিষয়টি একটু তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করা যাক্।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য পাঠে জানা যায়—প্রাথমিক বৈদিক সমাজে বর্ণভেদের স্থান ছিল না।

'ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥'

বর্ণ সকলের বিশেষ নাই। পূর্ব্বে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল। পরে কর্ম্মানুসারে বিবিধ বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ প্রাচীনতম বৈদিক সমাজে একই ব্রাহ্মণ-বর্ণের অস্তিত্ব ছিল; পরে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন কর্ম্ম বা বৃত্তিভেদের প্রয়োজন হয় তখন গুণানুসারে বর্ণভেদের সৃষ্টি হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের উল্লেখ আছে, তথায় শূদ্রবর্ণের উল্লেখ নাই। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজঃ উচ্যতে", জন্মকালে সকলে শূদ্র থাকে, সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণাদি দ্বিজবর্ণের উৎপত্তি হয়।

উপরোক্ত শাস্ত্রবাক্য হতে একটা কথা সুস্পষ্ট হয় যে, প্রথমে ইত্যাকার বর্ণবিভাগ ছিল না, পরে এর সৃষ্টি হয়েছে। কোনও পরিবারে যখন লোকসংখ্যা একান্ত কম থাকে, তখন সেখানে কোনও কর্ম্মবিভাগের প্রয়োজন হয় না। সময় ও সুযোগ মত তখন সকলে মিলেমিশে গৃহের কাজকর্ম্মগুলি সম্পন্ন করা হয়। পরন্তু, পরে যখন ক্রমশঃ সেই পরিবারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন প্রয়োজনবোধে পরিবারভুক্ত লোকদের মধ্যে গুণ ও দক্ষতা অনুসারে কাজগুলি ভাগ করে দেওয়া হয়। বৈদিক আর্য্যসমাজেও বর্ণভেদ বা বৃত্তিবিভাগ এই ভাবে বিকশিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন আসে—এরূপ প্রাকৃতিক নিয়মে যদি বর্ণবিভাগের সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে শ্রীভগবান্ কেন বললেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং" —চতুর্ব্বর্ণ আমারই সৃষ্টি। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—যা প্রাকৃতিক

বিধান তাহাই তো ভাগবত বিধান। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্যটিও এরূপ প্রাকৃতিক নিয়মে সম্পন্ন হচ্ছে না কি? বস্তুতঃ, ভগবান্ মানুষের ন্যায় প্ল্যান-প্রোগাম করে কৃত্রিম সৃষ্টির বিধান করেন না। এই মরজগতে সব কিছু প্রাকৃতিক নিয়মে পঞ্চীকরণের পদ্ধতিক্রমে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়; তার স্থিতি ও লয়ের কার্য্যও সম্পন্ন হয় সেই ভাবে। আকস্মিক সৃষ্টি বা আকস্মিক লয় বলে কোন কিছু এখানে নাই। বর্ণবিভাগের উৎপত্তিও যে সেইরূপে হয়ে থাকবে তাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। শুনা যায়—কাশ্মীর উপত্যকাটি মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শুধু ব্রাহ্মণ-বর্ণের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। সুতরাং একবর্ণ হতে ধীরে ধীরে প্রয়োজনের তাগিদে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ ঘটেছে—তাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। সমাজপতিগণও নিজেদের মতলবমত এরূপ বর্ণবিভাগের সৃষ্টি করেন নি। তবে জন্মগত বর্ণবিধান বা জাতিভেদ-প্রথা যে তাঁদের সৃষ্টি—তাতে সন্দেহ নাই। তাই বৌদ্ধযুগে সেই মনুষ্যসৃষ্ট জাতিভেদের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়েছিল এবং বর্ত্তমান যুগের এই ভেদ-বৈষম্যের নিদারুণ দুর্দ্দিনেও তদ্রূপ খানিকটা পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক বলে বিবেচিত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গ জানা উচিত—গুণ ও কর্ম্মগত বর্ণবিভাগ বা বৃত্তিভেদ কোন-না কোনরূপে সব দেশেই আছে ও চিরকাল থাকবে। প্রত্যেক সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য শিক্ষক, রক্ষক, পালক ও সেবক—এই চারটি বর্গের প্রয়োজন হয় না কি? আর ইহাই তো চতুর্ব্বর্ণ।

এই দিক দিয়েও বলা যায়—বর্ণবিভাগ সনাতন এবং সর্ব্বদেশে বর্তমান। ভগবান বা প্রকৃতিই এর বিধায়ক। এই প্রসঙ্গে এ বিষয়টিও জানা আবশ্যক—সগুণ ঈশ্বররূপে তিনি এর কর্ত্তা এবং নির্গুণ অব্যয় ব্রহ্মরূপে তিনি—অকর্ত্তা।

ভাগবত আদর্শ অনুসরণ করে কর্ম্ম করলে কী ভাবে কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়—তার বর্ণনা দিয়ে শ্রীভগবান্ এক্ষণে বললেন—

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪

অন্বয়—কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন, ইতি যঃ মাম্ অভিজানাতি সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে॥ ১৪

অনুবাদ—আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম আমাকে লিপ্ত করতে পারে না। (কেন না) কর্ম্মফলে আমার কোন স্পৃহা নাই। আমাকে যিনি এইভাবে জানেন তিনি কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না॥ ১৪

গীতাকার শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোত্তম কর্ম্মযোগী

শ্রীভগবানের কর্ম্মলীলাই সংসারী জীবের পক্ষে কর্ম্মসাধনার সর্ব্বোত্তম আদর্শ। সগুণ ঈশ্বররূপেও শ্রীভগবান্ একান্ত অনাসক্ত ভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পরিচালনা করেন। পরন্তু, তাঁর সে লীলা অনুষ্ঠিত হয়—অদৃশ্যে ও লোকলোচনের অগোচরে; সাধারণ জীবের পক্ষে তা এক প্রকার ধারণার অতীত। তবে তিনি যখন লোকসংগ্রহের নিমিত্ত নরশরীরে অবতীর্ণ হয়ে বাস্তব জগতে তাঁর কর্ম্মলীলার অনুষ্ঠান করেন, তখন তা সহজে অনুভবগম্য ও অনুকরণযোগ্য হয়। গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ এখানে স্বীয় জীবনের আচরিত সেই কর্ম্মাদর্শটি অর্জ্জুনের সমক্ষে উপস্থাপিত করে বললেন—হে সখে, তোমাকে আমি যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উপদেশ দিচ্ছি—এই দেখ—তা আমি নিজেই নিজ জীবনে কী ভাবে পালন করে চলেছি। এক দিক দিয়ে বিচার করলে কর্ত্তব্য বা করণীয় আমার কিছু নাই। কেন না, আমি আপ্তকাম বা সর্ব্বপ্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে। তথাপি, আমি লোকশিক্ষার নিমিত্ত নিরন্তর যে কর্ম্ম করছি তার ফলে আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই। যে কর্ম্মাসক্তি ও ফলাসক্তি বন্ধনের একমাত্র হেতু—তা হতে আমি চিরমুক্ত। আমার এই কর্ম্মকৌশল অবগত হয়ে কর্ম্ম করতে অভ্যস্ত হলে তোমার বন্ধনের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই। আর যদি তুমি মনে কর—আমার এই সুউচ্চ আদর্শে অনুসরণ করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাহলে শোন—

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ ১৫

অন্বয়—এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম্ম কৃতম্। তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং কর্ম্ম এব কুরু॥ ১৫

অনুবাদ—আমাকে এইরূপ জেনে পূর্ব্বেকার মুমুক্ষুগণ কর্ম্ম করেছেন, তুমি সেই পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলের অনুসরণ কর॥ ১৫

প্রাচীন পরম্পরার অনুসৃতি

পূর্ব্ববর্ত্তী মুমুক্ষুগণও সংসারাশ্রমে থেকে অনুরূপ ভাবে অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করে আত্মমুক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। আর সেই নিষ্কাম কর্ম্মসাধনার দ্বারা তাঁরা যে শুধু আত্মকল্যাণই লাভ করেছেন, তাই নয়, তার দ্বারা সাধিত হয়েছে অশেষ লোককল্যাণ। তুমি কেন তাঁদের অনুসৃত সেই আদর্শ অনুসরণ করে জীবন-সাধনায় সাফল্য লাভ করতে পারবে না? আরও বিচার করে দেখ—জটিল রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানও যখন নিষ্কাম ভাবে সম্ভবপর তখন সাধারণ গৃহীর সংসারাশ্রমের যে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য—তা কেন তদ্রূপ নিষ্কাম ভাবে করা সম্ভব হবে না? তথাপি তুমি যদি বল—এই কর্ম্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুরূহ ও দুর্জ্ঞেয়, তবে আমি সেই কর্ম্মরহস্যের সমাধান-সূত্র কি—তাই এক্ষণে তোমাকে বলছি। বিচারপূর্ব্বক তা অনুধাবনের চেষ্টা কর।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১৬

অন্বয়—কিং কর্ম্ম? কিম্ অকর্ম্ম? ইতি অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ, যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে তৎ কর্ম্ম তে প্রবক্ষ্যামি॥ ১৬

অনুবাদ—কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি—এ বিষয়ে পণ্ডিতগণও মোহপ্রাপ্ত হন (বুঝতে অক্ষম হন)। সুতরাং, সেই কর্ম্মরহস্য তোমাকে এক্ষণে বলছি—যা অবগত হলে তুমি অশুভ (সংসারবন্ধন) হতে মুক্ত হতে পারবে॥ ১৬

কর্ম্মতত্ত্ব—অতীব দুর্জ্ঞেয়

পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণের প্রদর্শিত কর্ম্মাদর্শ অনুসরণ করে কর্ম্ম করতে পারলে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায় এ কথা সত্য। পরন্তু,

প্রকৃত শ্রদ্ধাবুদ্ধি বা প্রকৃষ্ট বিচারশক্তির অভাব হলে মহাপুরুষগণের আচরণও অনেক সময় অনুভবগম্য হয় না। এজন্য দেখা যায়—লক্ষ লক্ষ ঋষি-মুনি এবং অগণিত গুরু ও আচার্য্যপরিসেবিত এই ধর্ম্মভূমি ভারতভূমিতেও কোটি কোটি নরনারী স্বীয় স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে অদ্যাপি মোহ, আসক্তি ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের পুরোভাগে বিদ্যমান থেকে এত কাল নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মলীলার অনুষ্ঠান করলেও সখা অর্জ্জুন তাঁর সেই জীবনাদর্শ হতে কর্ম্মরহস্য অবগত হতে পারেন নি। তাই এখানে বলা হচ্ছে—পণ্ডিতগণও অনেক সময়ে কর্ম্ম এবং অকর্ম্মের যে প্রকৃত রহস্য তা উপলব্ধি করতে অক্ষম হন। পরবর্ত্তী শ্লোক দুটিতে এই কারণে শ্রীভগবান্ কর্ম্মতত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে বললেন—

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ১৭

অন্বয়—কর্ম্মণঃ অপি বোদ্ধব্যং বিকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যম্ অকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং ; হি কর্ম্মণঃ গতি গহনা॥ ১৭

অনুবাদ—কর্ম্ম কি, বিকর্ম্ম কি এবং অকর্ম্মই বা কি—তা যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কেন না, কর্ম্মের গতি অতি গহন বা দুর্জ্ঞেয়॥ ১৭

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥ ১৮

অন্বয়—যঃ কর্ম্মণি অকর্ম্ম, চ অকর্ম্মণি চ যঃ কর্ম্ম পশ্যেৎ, সঃ মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ ; সঃ যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥ ১৮

অনুবাদ—যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন তিনিই মনুষ্য-সমাজে জ্ঞানী, যোগী ও সর্ব্বকর্ম্মপারদর্শী॥ ১৮

কর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য

সত্যকার কর্ম্মযোগী সাধক তাঁর নির্ম্মল ও দিব্য দৃষ্টির সহায়ে কর্ম্ম,

বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম-তত্ত্বের উপরোক্ত রহস্য অনুধাবন করে কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শনের চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানদৃষ্টি উন্মোচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করবেন—কাজ করে অন্তর্নিহিত প্রকৃতি—আত্মা নন (সাংখ্য মত)। অথবা বেদান্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরই সর্ব্বময় কর্ত্তা ; জীব তাঁর হস্তসঞ্চালিত যন্ত্রমাত্র। তিনি তখন স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করেন—শ্রীভগবানই তাঁর দেহরূপ যন্ত্রের মাধ্যমে সকল কর্ম্ম করছেন। এখানে তাঁর নিজের কর্ত্তৃত্ব বলে কিছু নাই। সুতরাং, ভগবৎ নির্দ্দেশে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্মপরম্পরার মধ্যে তিনি শান্ত ও নির্ব্বিকার থেকে সেই কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করেন। পক্ষান্তরে, তিনি অনুভব করেন—তাঁর বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল যখন শান্ত ও সংযত ভাবে অবস্থান করে তখন তাঁর মন বা অন্তরিন্দ্রিয় শান্ত ও সংযত থাকে না। তাঁর মনেও তখন আকাশ-পাতাল চিন্তার জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। এই অবস্থাতে তিনি সেই অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন।

কর্ম্ম কি? এ বিষয়ে শ্রীভগবান্ গীতায় অন্যত্র বলেছেন—"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।" অর্থাৎ, প্রাণিগণের উৎপত্তি ও অভ্যুদয়কারক যে ত্যাগমূলক প্রচেষ্টা—তা-ই কর্ম্ম। গীতোক্ত এই কর্ম্মসংজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চেষ্টা কর্ম্ম হলেও তা বিহিত কর্ম্ম নয়। বিহিত কর্ম্ম তাকে বলা চলে—যার দ্বারা নিজের ও অপরের হিত সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে কর্ম্মীর প্রাণে বিন্দুমাত্র কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি বা ফলাসক্তির ভাব বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং, এইরূপ কর্ম্ম কর্ম্মীর বন্ধনের কারণ হয় না।

বিকর্ম্ম-তত্ত্বটিও এই ভাবে বোঝা প্রয়োজন। বিকর্ম্ম শব্দটির দু' প্রকার অর্থ পরিদৃষ্ট হয়—বিশেষ কর্ম্ম ও বিগর্হিত কর্ম্ম। পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী এদের যে কোন একটি অর্থ গ্রহণ করেছেন। আমরা এখানে শেষোক্ত অর্থটি গ্রহণ করা সমীচীন মনে করি। বিকর্ম্ম বা শাস্ত্রবহির্ভূত নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করলে ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে কী রূপ অশুভ ফল প্রসূত হয়—তা সহজেই অনুমেয়। কর্ম্মের নামে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, জাল-জুয়াচুরি, পরস্ত্রী-গমন প্রভৃতি পাপগুলি প্রশ্রয় পেলে মানুষের শুধু ইহকাল নয় পরকালের যাবতীয় সুখ-শান্তি-সৌভাগ্য বিনষ্ট

হয়ে যায়। কর্ম্মীর মন যদি সত্য সত্যই কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিহীন ও ফলাসক্তিশূন্য হয়, তবে এরূপ হীন কর্ম্মে তার আদৌ রুচি হয় না। আর ভুলক্রমেও যদি তার দ্বারা এরূপ কোন অন্যায় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়ে যায় তথাপি কর্ত্তৃত্বাভিমানে ও ফলাসক্তির অভাবের দরুণ সেই কর্ম্মের জন্য তাকে প্রত্যবায়ভাগী হতে হয় না।

এইরূপ ভাবে অকর্ম্ম-তত্ত্বটি কি?—তাও ভাল ভাবে জানা প্রয়োজন। সাধারণতঃ অকর্ম্মের অর্থ কর্ম্মরাহিত্য বা কর্ম্ম না করার ভাব। কর্ম্ম না করে চুপচাপ বসে থাকলে তার পরিণামে আসে দেহ-মনের জড়ত্ব। এরূপ অকর্ম্ম বা আলস্য ঔদাস্যের প্রশ্রয় দিলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনেও তার বিষম প্রতিক্রিয়া বা অধঃপতন হওয়াটাই স্বাভাবিক।

সদ্‌গুরুর আশ্রিত শিষ্যই সহজে কর্ম্মরহস্য অবগত হন

সদ্‌গুরুর আশ্রিত বিবেকী শিষ্যের পক্ষে কর্ম্মতত্ত্বটির এই গহন রহস্য অবধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজতর। কেন না এইরূপ আশ্রিত শিষ্য প্রথমতঃ উপলব্ধি করেন—শ্রীগুরুচরণে আত্মসমর্পণ করার পর হতে তার যাবতীয় কাজকর্ম্ম, আশা-আকাঙ্ক্ষা তার সেই আশ্রয়দাতা সদ্‌গুরুর আদেশ-নির্দ্দেশেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অর্থাৎ, যন্ত্রীরূপে তিনি তাঁকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নিচ্ছেন। সুতরাং, সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলাফলের জন্য তার আর চিন্তা-ভাবনা কি? এই অবস্থায় শিষ্য তার দেহেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্মের মধ্যে 'অকর্ম্ম' দর্শন করেন এই তত্ত্বটি বোঝাবার জন্য সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দ তাঁর আশ্রিত সন্তানগণকে লক্ষ্য করে বলতেন—"শরীরটি সঙ্ঘের কাজ কর্ম্মে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইবে, কিন্তু মনটি পড়িয়া থাকিবে এক স্থানে—সদ্‌গুরুর চরণমূলে।"

বস্তুতঃ, গুরুর কৃপায় শিষ্য তখন সত্যসত্যই উপলব্ধি করতে পারেন, 'আমি কর্ম্ম করি' এইরূপ অভিমান যেমন বন্ধনের কারণ, 'আমি কর্ম্ম করি না'—এইরূপ অভিমানও তেমনই বন্ধনের হেতু। কারণ, যতদিন মনে আমিত্বের বিন্দুমাত্র অভিমান ও ফলাসক্তি বিদ্যমান থাকে ততদিন কর্ম্ম করলেও যেমন বন্ধন হয়, কর্ম্ম না করে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকলেও তেমনি

কর্ম্মবন্ধনের আশঙ্কা থাকে। কেন না, এইরূপ নিশ্চেষ্ট অবস্থায় কর্ম্মক্ষয় না হয়ে বরং তমোভাব শতগুণ বর্দ্ধিত হয়ে তার কর্ম্মবন্ধন আরও দীর্ঘস্থায়ী ও দৃঢ়তর করে তোলে। সুতরাং, সর্ব্বাবস্থায় সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশ মত চলা ও কর্ম্ম করাই কর্ম্মবন্ধন হতে মুক্তিলাভের সহজ ও সরল উপায়।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯

অন্বয়—যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ বুধাঃ জ্ঞানাগ্নি দগ্ধকর্ম্মাণং তং পণ্ডিতম্ আহুঃ॥ ১৯

অনুবাদ—যাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ও কামনা আসক্তিবর্জ্জিত, জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা যাঁর কর্ম্মসমূহ দগ্ধ হয়েছে—সেরূপ ব্যক্তিকে জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলে অভিহিত করেন॥ ১৯

গীতার দৃষ্টিতে প্রকৃত জ্ঞানী কে?

সাধারণ অজ্ঞান ব্যক্তি কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তির বশে যাবতীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে এবং তার ফলে সে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আত্যন্তিক দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করে। পরন্তু, জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ ও আচরণ অন্যরূপ। তাঁর কর্ম্মপ্রেরণার পশ্চাতে কোনরূপ কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ও ফলাসক্তির ভাব বিদ্যমান থাকে না। সদ্‌গুরুর বা ভগবানের প্রেরণায় সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে তিনি সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং এইরূপ মমত্ববুদ্ধিবর্জ্জিত নির্ম্মল জ্ঞানলাভ করার ফলে তাঁর যাবতীয় কর্ম্ম বিশুদ্ধ স্বরূপ ধারণ করে। আর্ষদৃষ্টিতে এইরূপ বিবেকী ব্যক্তিই সত্যকার জ্ঞানী বলে অভিহিত। অধুনা, আমরা কিন্তু 'পড়ুয়া' পণ্ডিতকেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত বা জ্ঞানী বলে সম্মান করে থাকি। বলা বাহুল্য, এইরূপ অশুদ্ধচিত্ত জ্ঞানাভিমানিগণের নেতৃত্বের ফলে আজিকার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের এতখানি অধোগতি ও অধঃপতন।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

অন্বয়—সঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ, কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিৎ এব ন করোতি॥ ২০

অনুবাদ—যিনি কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে আসক্তি পরিহার করেন, যিনি আত্মতৃপ্ত এবং অন্যের আশ্রয়ের ভরসা রাখেন না, তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হলেও কিছুই করেন না॥ ২০

গীতামৃত—নির্ম্মল জ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ কর্ম্মীর লক্ষণের বর্ণনা-প্রসঙ্গে এখানে বলা হচ্ছে—এরূপ ব্যক্তি সর্ব্বদা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে আসক্তিবর্জ্জিত এবং তারই ফলে তিনি নিত্যানন্দময় ও নিরপেক্ষ অবস্থা লাভ করেন। এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় সুখ, শান্তি ও আশ্রয়ের নিমিত্ত কদাপি অন্যের প্রত্যাশী হন না, তিনি তখন আত্মানন্দে ও আত্মাশ্রয়ে চিরস্থির ও চিরবিভোর। এরূপ সুউচ্চ অবস্থাতেও তাঁর লোকসংগ্রহমূলক কর্ম্ম কদাপি বন্ধ থাকে না। তবে তখনকার তাঁর সেই কর্ম্ম অকর্ম্মের অনুরূপ। কেন না, সেই কর্ম্ম সম্পূর্ণ অহংবুদ্ধিবর্জ্জিত ও সদ্‌গুরু বা ভগবন্নির্দ্দেশে অনুষ্ঠিত। সুতরাং, তার ফলাফলেও তিনি উদাসীন ও নির্ব্বিকার। বস্তুতঃ, এইরূপ কর্ম্মই গীতোক্ত ভাগবত কর্ম্ম।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১

অন্বয়—নিরাশীঃ যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ কেবলং শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি॥ ২১

অনুবাদ—যিনি কামনাত্যাগী, যিনি সংযতেন্দ্রিয়, যিনি সর্ব্ব প্রকার দান গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত, তাদৃশ ব্যক্তি কেবল শরীরের দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেও ফলভোগী হন না॥ ২১

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২

অন্বয়—যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বাতীতঃ, বিমৎসরঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে॥ ২২

অনুবাদ—যিনি আপনা হ'তেই যা কিছু লাভ হয় তাতেই পরিতুষ্ট, যিনি

দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, মাৎসর্য্য ও বৈরভাবশূন্য, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন—তিনি কর্ম্ম করেও কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না। ২২

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

অন্বয়—গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় কর্ম্ম আচরতঃ সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

অনুবাদ—যিনি আসক্তিশূন্য, রাগাদ্বেষাদি দোষপরিমুক্ত, যাঁর চিত্ত আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, যিনি যজ্ঞার্থে (ভগবদ্ তৃপ্ত্যর্থে) কর্ম্ম করেন, তাঁর কর্ম্মসমূহ ফলসহ বিনষ্ট হয়ে যায়। ২৩

গীতামৃত—উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে জ্ঞাননিষ্ঠ আদর্শ কর্ম্মযোগীর লক্ষণসমূহ বর্ণিত হয়েছে। গীতায় আদর্শ কর্ম্মী, আদর্শ জ্ঞানী ও আদর্শ ভক্তের উপযোগী যে সমস্ত লক্ষণসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে সূচিত হয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য অতি কম। এতেই বোঝা যায়, গীতা সমন্বয়মূলক মহাগ্রন্থ। কর্ম্ম-জ্ঞান-ধ্যান-ভক্তির সমন্বয়-সাধনই গীতার মূল লক্ষ্য। পরন্তু, জ্ঞানবাদী টীকাকারগণ উপরোক্ত গুণগুলির মধ্যে কর্ম্মত্যাগের লক্ষণের সূচনা দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন—গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য নিবৃত্তিমূলক জ্ঞানবাদের প্রচার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—"শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্" এই শ্লোকার্দ্ধের তাঁরা অর্থ করেছেন, কেবলমাত্র শরীর রক্ষার উপযোগী ভিক্ষাটনাদি কর্ম্মগুলি এমন নিষ্কাম ভাবে করতে হবে যাতে পাপ স্পর্শ না করে। পরন্তু, সমগ্র গীতাগ্রন্থখানি অধ্যয়ন করলে স্পষ্টই অনুভব করা যায়—গীতা পুনঃ পুনঃ আত্মকল্যাণ ও জগৎকল্যাণের জন্য যাবতীয় কার্য্যকে নিষ্কাম ভাবে করার নির্দ্দেশ দান করেছেন। কর্ম্মবিতৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধকর্ম্মে প্রযুক্ত করার জন্য শ্রীভগবানের যে অপার প্রেরণা ও আগ্রহ ছিল—তা কে অস্বীকার করতে পারে? ভগবান্ উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে এই বিষয়টি ভালভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, অনাসক্ত ভাবে ও কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিহীন হয়ে কাজ করলে কোন কর্ম্মফলই কর্ম্মীকে স্পর্শ করতে পারে না। এরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত তার সমস্ত কর্ম্মই যজ্ঞরূপে পরিণত হয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, গীতাকারের এই মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে পরবর্ত্তী টীকাকারগণ নিজেদের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য কখনও জ্ঞান, কখনও বা ভক্তিমার্গের প্রাধান্য প্রচারে অত্যাগ্রহী হয়ে নিষ্কাম কর্ম্মকেও গৌণ স্থান দিয়েছেন—যার ফলে বিগত সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিপথে পরিচালিত হয়ে ভারতীয় জাতি ও সমাজকে ইহবিমুখ ও নৈষ্কর্ম্ম্যবাদী করে তুলেছে এবং সেই আত্মদৌর্ব্বল্যের সুযোগে বৈদেশিক শত্রুসমূহ পুনঃ পুনঃ আঘাত আক্রমণ ক'রে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের অশেষ ক্ষতিসাধন করেছে। আজ সময় এসেছে—সেই ভুলের সংশোধনপূর্ব্বক ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজকে পুনরায় জ্ঞান-ধ্যান-ভক্তি-মিশ্র কর্ম্মযোগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত ক'রে আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে পুনরায় সুস্থ ও সবল করে তোলার।

বর্ত্তমান যুগে এই সুমহান্ ব্রতোদ্ধারে কটিবদ্ধ হয়েছিলেন সুমহান্ কর্ম্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ ও সঙ্ঘনেতা আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ। বস্তুতঃ, তাঁদের প্রচারিত জীবনবাদ ও ধর্ম্মাদর্শের মধ্যে গীতোক্ত কর্ম্মযোগ আজ পুনরায় সত্যকার স্বরূপ পরিগ্রহ করেছে। ভারত-ভারতীর অবশ্য কর্ত্তব্য—তাঁদের প্রদর্শিত সেই পথে অগ্রসর হয়ে এই যুগধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করা।

জ্ঞানীর লক্ষণের বর্ণনা-প্রসঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলা হয়েছে—"যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।।" জ্ঞানী ব্যক্তি যজ্ঞের নিমিত্ত (ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে) যে কর্ম্ম করেন তা ফলসহ বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং তা আর বন্ধনের কারণ ঘটায় না। এক্ষণে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্লোকে সেই যজ্ঞ যে কী রূপ এবং কত প্রকারের হতে পারে তারই বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।। ২৪

অন্বয়—অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং, তেন ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্।। ২৪

অনুবাদ—অর্পণ বা যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম, ঘৃতাদি যজ্ঞসামগ্রী ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম,

যিনি যজ্ঞের হোতা তিনিও ব্রহ্ম—এরূপ জ্ঞানে যজ্ঞরূপ কর্ম্মে যিনি একাগ্রচিত্ত তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।। ২৪

যজ্ঞের সর্ব্বোত্তম রূপ

মীমাংসকদের সকাম যজ্ঞতত্ত্ব ও গীতোক্ত জ্ঞানমূলক নিষ্কাম এই যজ্ঞতত্ত্বের মধ্যে ব্যবধান প্রভূত। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যজ্ঞকর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্মের নামান্তর। এরূপ অবস্থায় যজ্ঞকারী সমস্ত কিছুকেই ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। তবে এই উচ্চতম দৃষ্টি একদিনে বা অতি সহজে লাভ করা যায় না। পরম শ্রদ্ধা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবেক-বিচার সহকারে দীর্ঘকাল যাবৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে করতে যাজক এই অন্তিম অবস্থা লাভ করেন। বৈদিক ঋষি—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই মহাবাক্যের মধ্যে বহুপূর্ব্বে এই তত্ত্বটি প্রচার করেছেন।

শুধু যে যজ্ঞকর্ম্মের দ্বারা এই উচ্চতম ব্রহ্মানুভূতি লাভ করা যায়, তা-ই নয়। 'নেতি নেতি'মূলক বৈরাগ্যবিচারের সাধনার দ্বারাও সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধিরূপ এই দিব্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর। মহর্ষি পতঞ্জলিসূচিত অষ্টাঙ্গ যোগমার্গের সাধনার চরম অনুভূতিও ইহাই। আবার ভাগবতবর্ণিত যে ভক্তিমূলক নামস্মরণ, পূজার্চ্চনার সাধনা—তাঁর মাধ্যমেও প্রেমিক সাধক এই উচ্চতম স্থিতি লাভ ক'রে সর্ব্বত্র ও সর্ব্ববস্তুতে তাঁর ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করে ধন্য হন। বৈষ্ণব সাধক এই দিব্য অনুভূতির কথা তদীয় মার্ম্মিক ভাষায় বর্ণনা করে বলেছেন—

"সীয়া রামময় সব জগ জানি
করহুঁ প্রণাম জুড়ি যুগ পাণি।"

বস্তুতঃ, হিন্দু সাধক কেবলমাত্র নিজের মধ্যে বা তাঁর ইষ্টমূর্ত্তির মধ্যে ভগবৎ দর্শন করে সন্তুষ্ট হন না। তিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বভূতে তাঁর ইষ্টকে দর্শন করে আপ্তকাম ও ব্রহ্মভূত হ'ন।

হিন্দুর বেদান্ত শাস্ত্র মতে জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে যে ভেদ-দর্শন, তা-ই যাবতীয় দুঃখ-অশান্তির মূল। সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতি বা আত্মানুভূতি লাভের পরে যখন এই ভেদবুদ্ধির চিরাবসান ঘটে, তখনই হয় দুঃখের চরম নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি। এই সুউচ্চ অনুভূতি লাভ করেই ভারতের প্রাচীন ঋষি আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে আবেগভরে গেয়েছিলেন—"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি

সিন্ধবঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, অনিলে, জলে, নদ-নদীতে, ফল-ফুলে সর্ব্বত্র মধু বর্ষিত, ভূলোকে দ্যুলোকে সর্ব্বত্রই আনন্দের ধারা প্রবাহিত, দুঃখ-অশান্তির লেশমাত্র কোথাও নাই।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ২৫

অন্বয়—অপরে যোগিনঃ দৈবম্ এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে, অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞেন এবং যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি॥ ২৫

অনুবাদ—অপর যোগিগণ দেবযজ্ঞই অনুষ্ঠান করেন। অন্য কেহ কেহ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞ দ্বারাই যজ্ঞার্পণ করেন (সেই কর্ম্ম যজ্ঞে অর্পণ করেন)॥ ২৫

দৈব-যজ্ঞ

গীতার মতে যজ্ঞ বহুবিধ। স্বীয় স্বীয় রুচি প্রকৃতি অনুসারে যাজকগণ ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে ব্রতী হন। যাঁরা ভক্তিমার্গী বা ভক্তিবাদী এবং বিভিন্ন দেবদেবীর অস্তিত্ব ও শক্তিতে বিশ্বাসী—তাঁরা তাঁদের বরাশিস্ লাভের জন্য তাঁদের প্রীতির উদ্দেশ্যে বিবিধ দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। প্রাচীন কালে এরূপ যাজকগণ ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সোম, বৃহস্পতি প্রভৃতি তৎকাল-প্রচলিত দেবগণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ সকাম যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন। একালেও শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি দেবদেবীগণের উদ্দেশ্যে অনুরূপ যজ্ঞ ও পূজার প্রথা পরিদৃষ্ট হয়। গীতার ভাষায় ইহাই দৈবযজ্ঞ। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এরূপ যজ্ঞের পক্ষপাতী নন। তাঁরা জ্ঞানদৃষ্টিতে যজ্ঞাগ্নিকে ব্রহ্মাগ্নি এবং সমগ্র যজ্ঞকর্ম্মটিকে ব্রহ্মকর্ম্মরূপে দর্শন ক'রে জ্ঞানের সাধনার দ্বারা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬

অন্বয়—অন্যে শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি। অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদীন্ বিষয়ান্ জুহ্বতি॥ ২৬

অনুবাদ—অন্য কেহ কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে, আর কেহ কেহ শব্দাদি বিষয়রাশিকে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দান করে থাকেন॥ ২৬

সংযম-যজ্ঞ ও ইন্দ্রিয়-যজ্ঞ

এক্ষণে সংযম-যজ্ঞ ও ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের স্বরূপ কি,—তা-ই বর্ণিত হচ্ছে। চক্ষুঃ, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপ, শব্দ প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় প্রিয় বিষয়গুলির প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট। তাদের এই স্বাভাবিক অনুরাগ বা আকর্ষণ যদি বৈরাগ্য ও বিবেকবিচারের দ্বারা সংযত না হয় তবে তা পরিণামে সর্ব্বনাশের কারণ হয়। বিবেকী সাধক তাই বিষয়ভোগ কালে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ও সংহত রাখবার চেষ্টা করেন।

বিশেষ প্রয়োজনবশে যদি কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সেবার আবশ্যকতা অনুভূত হয় তবে তিনি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখেন, অসাবধানতাবশতঃ যেন তাঁর ইন্দ্রিয়বৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল স্বরূপ ধারণ না করে। ইহাই সংযম-যজ্ঞের অনুশীলন।

এক্ষণে ইন্দ্রিয়-যজ্ঞ কি—তাহাই বিবেচ্য। ইন্দ্রিয়-যজ্ঞ বলতে এখানে বোঝান হচ্ছে—রূপ, রসাদি বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়-রূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। অর্থাৎ, প্রয়োজনবোধে বিষয়সমূহ স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয়ের প্রতি আকৃষ্ট বা পরিচালিত হতে পারে। পরন্তু, ইত্যাকার বিষয়সংস্পর্শে যেন মনে রাগদ্বেষ উৎপন্ন না হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—প্রাণরক্ষার দায়ে জিহ্বেন্দ্রিয় আহার্য্য বস্তুত অবশ্যই গ্রহণ করবে, তবে ভোজন কালে যেন ভোগ্য বস্তুর প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ বা আসক্তির ভাব জাগ্রত না হয়। ভোক্তার যেন এইকালে স্মরণ থাকে—শরীররক্ষার জন্যই আহার, ভোগের জন্য নহে। গীতার ভাষায় ইহাই ইন্দ্রিয়-যজ্ঞ। বলা বাহুল্য, সংযম-যজ্ঞ ও ইন্দ্রিয়-যজ্ঞ হচ্ছে—একে অন্যের পরিপূরক।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭

অন্বয়—অপরে সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি॥ ২৭

অনুবাদ—অপর যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণের ও প্রাণাদির কর্ম্মরাশিকে জ্ঞানোদ্দীপিত আত্মসংযম-যোগরূপ অগ্নিতে হোম করে থাকেন।

আত্মসংযম-যজ্ঞ

এক্ষণে ধ্যানযোগীরা কী রূপে যজ্ঞ করেন সংক্ষেপে অতি সুন্দর ভাষায় তারই বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, ধ্যানযোগীরা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থরূপ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমান রূপ পঞ্চ প্রাণের যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাদিগকে ধ্যানযোগের দ্বারা ধীরে ধীরে সংযত ও সংহত করে আত্মতত্ত্বে সমাহিত হন।

ধ্যানযোগের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে—অন্তঃকরণের সমস্ত বৃত্তির নিরোধ। কারণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র বৃত্তি ও প্রাণচাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ সমাধির চরম অবস্থা লাভ হয় না। এজন্য ধ্যানযোগী সর্ব্বদা সামগ্রিক সংযমসাধনার উপযোগী অনুকূল স্থান, কাল, পরিবেশ, আহার্য্য প্রভৃতির ব্যবস্থার একান্ত পক্ষপাতী। গীতার ভাষায় ধ্যানযোগীর এই সাধনা আত্মসংযম-যজ্ঞ নামে অভিহিত।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮

অন্বয়—দ্রব্যযজ্ঞাঃ, তপোযজ্ঞাঃ, যোগযজ্ঞাঃ, তথা অপরে সংশিতব্রতাঃ যতয়ঃ স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ॥ ২৮

অনুবাদ—কেহ দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ, কেহ তপোযজ্ঞপরায়ণ, কেহ যোগযজ্ঞপরায়ণ, কেহ বা সংযতচিত্ত, দৃঢ়ব্রত স্বাধ্যায় (যজ্ঞপরায়ণ) ও জ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ॥ ২৮

দ্রব্য-যজ্ঞ

লৌকিক জগতে পিতামাতা যেমন স্বীয় স্বীয় সন্তান-সন্ততির কল্যাণ ও সুখশান্তির নিমিত্ত গৃহবাটিকা নির্ম্মাণ ও শক্তি-সাধ্যমত ধন-সম্পদের ব্যবস্থা করাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলে মনে করেন, পরম পিতা

শ্রীভগবান্‌ও তেমনি স্বীয় প্রজাকুলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য ইহজগতে বহুবিধ উপাদেয় ভোগ্যসামগ্রী সৃষ্টি করেন। সংসারাশ্রমে পুত্র-কন্যাদের যেমন কর্ত্তব্য—পিতা-মাতার সহায়-সম্পদের বিনিময়ে তাঁদের সেবা-যত্ন ক'রে সেই পিতৃঋণ পরিশোধ করা, অধ্যাত্মক্ষেত্রেও তেমনি বিশ্বজীবের কর্ত্তব্য হচ্ছে—ভগবৎ প্রদত্ত ভোগ্যসামগ্রীর অগ্রভাগ তাঁকে অর্পণ করে দেবঋণ পরিশোধ করা। শাস্ত্রে দেবোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত দ্রব্যদানরূপ এই যজ্ঞ 'দ্রব্যযজ্ঞ' নামে কথিত।

তপোযজ্ঞ

তপোযজ্ঞ বলতে বোঝায়—কঠোর ব্রতোপবাসপরায়ণ হয়ে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ বরণ করা। রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে সব সমাজে এরূপ এক শ্রেণীর নরনারী পরিদৃষ্ট হয়—যাঁদের এরূপ কৃচ্ছ্র তপশ্চর্য্যায় বিশেষ রুচি বা নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। 'পঞ্জিকা' এদের সাথের সাথী। পঞ্জিকাসূচিত দিন-ক্ষণ-তিথি লক্ষ্য ক'রে এঁরা পর্ব্বে পর্ব্বে উপবাস এবং অন্যান্য বহু প্রকার ব্রত-নিয়ম পালন করাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলে মনে করেন।

যোগ-যজ্ঞ

যোগ-যজ্ঞ বলতে ধ্যান-ধারণার অনুশীলন বোঝায়। পাতঞ্জল দর্শনে ইত্যাকার সাধনা অষ্টাঙ্গ যোগ বা রাজযোগ নামে খ্যাত। এই সাধনা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী না হলেও অধিকারী বিশেষে ইহা অত্যন্ত হিতপ্রদ।

স্বাধ্যায়-যজ্ঞ

ব্রতপরায়ণ হয়ে নিয়মিত বেদাদি শাস্ত্রানুশীলনই প্রাচীন কালে 'স্বাধ্যায়-যজ্ঞ' নামে অভিহিত হত। পরন্তু, অবস্থা চক্রের পরিবর্ত্তনের ফলে অধুনা যখন বেদপাঠ বা বেদাধ্যয়ন জনসাধারণের আয়ত্তের বহির্ভূত হয়েছে, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি আর্ষ-গ্রন্থ, মহাপুরুষদের জীবনী এবং তাঁদের উপদেশাবলীর অধ্যয়নও এই যজ্ঞের অন্তর্গত। ঋষিগণ পরিশোধের নিমিত্ত এককালে এই স্বাধ্যায়-যজ্ঞের বিশেষ

বিধান ছিল। তা ছাড়া, সেই যুগে মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়ায় ইত্যাকার স্বাধ্যায়-যজ্ঞের দ্বারা শাস্ত্রবচনসমূহ শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমে কণ্ঠস্থ রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই জন্য সেকালে বলা হত "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"। অর্থাৎ, অধীত শাস্ত্রবিদ্যার বোধ বা জ্ঞান অপেক্ষাও আবৃত্তি মহত্তর। বলা বাহুল্য, শাস্ত্রগ্রন্থের পঠন-পাঠন দ্বারা তার ধারা-প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখার জন্যই সে যুগে এইরূপ আবৃত্তির মহত্ত্ব-গরিমা বিশেষ ভাবে ঘোষিত হয়েছিল।

বেদার্থপরিজ্ঞান-যজ্ঞ

অধীত শাস্ত্রজ্ঞানের উপর পুনঃ পুনঃ মনন ও বিচারের দ্বারা সেই জ্ঞানকে জীবনে অধিগত করাই এই যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাধ্যায়-যজ্ঞ হতে জ্ঞান-যজ্ঞকে পৃথক ভাবে বর্ণনা করার হেতু এই যে,—কেহ কেহ নিয়মিত শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রচর্চ্চাকেই যথাসর্ব্বস্ব মনে করে থাকেন। পরন্তু, শাস্ত্রজ্ঞান যতদিন পর্য্যন্ত প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি আচরণে কার্য্যকরী হয়ে না ওঠে ততদিন তার দ্বারা বিশেষ হিত সাধিত হয় না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য —বেদাদি উচ্চাঙ্গের শাস্ত্রগ্রন্থের দেশে পরবর্ত্তীকালে শাস্ত্র ও ধর্ম্মের নামে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে কম ধর্মান্ধতা, সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার প্রশ্রয় পায় নি! অগণিত তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, পাণ্ডা-পুরোহিত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এই দেশে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে অদ্যাপি কোটি কোটি ভারত-ভারতীকে হীন, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, ও অনাচরণীয় করে রাখা হয়েছে—যার ফলে তারা অনেকেই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ পরিহার করে পরধর্ম্ম ও অন্য সমাজের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করছে। ইহাতেই সপ্রমাণ হয়—কেবলমাত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন বা শাস্ত্রচর্চ্চাই ধর্ম্ম ও সমাজরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়—যদি না সেই অধীত শাস্ত্রবিদ্যাকে ব্যবহারিক জীবনে যথাযথ প্রয়োগ করার নিয়মিত বিধি-ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥ ২৯

অন্বয়—তথা অপরে অপানে প্রাণাং, প্রাণে অপানং জুহ্বতি ; অপরে প্রাণাপানগতিঃ রুদ্ধাঃ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ নিয়তাহারাঃ অপরে প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥ ২৯

অনুবাদ—আর অন্য কেহ কেহ অপানে প্রাণ, প্রাণে অপান আহুতি দেন, কেহ প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করে প্রাণায়াম-পরায়ণ হন ; অপর কেহ কেহ সংযতাহার হয়ে প্রাণে প্রাণকে আহুতি দেন॥ ২৯

প্রাণায়াম-যজ্ঞ

এই শ্লোকে পূরক-রেচক-কুম্ভকরূপী প্রাণায়ামের ত্রিবিধ প্রণালী আলোচিত হয়েছে। প্রাণায়াম—হঠযোগ ও রাজযোগের একটি বিশিষ্ট সাধনপদ্ধতি। রাজযোগ-মতে প্রাণ অপান বায়ুর সহিত মানুষের দেহ-মনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এই দুইটি বায়ু যতদিন অনিয়ন্ত্রিত থাকে ততদিন মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্থৈর্য্য ও সমতার ভাব রক্ষিত হয় না। অথবা, সে পর্য্যন্ত তার দেহ-মন—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনরূপী দৈব স্তরে নিবদ্ধ থেকে বিবিধ ঘাত-প্রতাঘাতে প্রতিনিয়ত আন্দোলিত ও বিচলিত হতে থাকে। সাম্য ও শান্তিকামী মানুষের পক্ষে তাই প্রয়োজন—পূরক, রেচক ও কুম্ভকের প্রণালী অবগত হয়ে প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিকে সংযত ও নিরুদ্ধ ক'রে কুম্ভকের স্থিতিতে শান্ত ভাবে অবস্থান করা। কী ভাবে তা সম্ভবপর —উপরোক্ত শ্লোকে গীতা তার কিঞ্চিৎ আভাস দান করেছেন।

এ বিষয়ে প্রাথমিক সূচনা হচ্ছে—প্রাণ বায়ুকে হৃদয় মধ্যে প্রশ্বাসের দ্বারা আকর্ষণ করে অপান বায়ুর বহিশ্চারিণী গতিকে রোধ করা। ইহাই প্রাণে অপানের আহুতি। দ্বিতীয়তঃ নিশ্বাসের সহায়তায় অপান বায়ুকে ভিতরে আকর্ষণ ক'রে প্রাণবায়ুর অন্তশ্চারিণী গতিকে রোধ করা—ইহাই অপানে প্রাণের আহুতি। অতঃপর প্রাণ ও অপানের উভয়বিধ গতিকে নিরুদ্ধ করে দেহমধ্যে নিবদ্ধ করে রাখা। এইরূপ অভ্যাসকে কুম্ভক বলা হয়। উপরোক্তরূপে কুম্ভকের অভ্যাস দৃঢ় হলে প্রাণবায়ুতে হয় ইন্দ্রিয়গণের আহুতি।

অভিজ্ঞ সদ্গুরুর প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ ব্যতীত কঠিনতর প্রাণায়ামের অনুশীলন করতে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। প্রাণায়ামাভ্যাসীর পক্ষে

অনুকূল স্থান, কাল ও পরিমিত আহার্য্যের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া অত্যাবশ্যক।

সর্ব্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।। ৩০
নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম।। ৩১

অন্বয়—এতে সর্ব্বে অপি যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি। কুরুসত্তম! অযজ্ঞস্য অয়ং লোকঃ ন অস্তি, অন্য কুতঃ? ৩০।৩১

অনুবাদ—এই সকল যজ্ঞকারিগণ যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক নিষ্পাপ হয়ে যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করে সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করে থাকেন। কুরুসত্তম! যজ্ঞানুষ্ঠানবিহীনের ইহলোকই নাই; অন্য লোক কোথায়? ৩০।৩১

গীতামৃত—যজ্ঞনীতি বিশ্বচরাচরের নিয়ন্ত্রণের সুপরিকল্পিত সুমহতী নীতি। এই নীতির পশ্চাতে রয়েছে আদান ও প্রদানের মহাভাব। অর্থাৎ, যাঁরা এ বিশ্ব সংসারে সুখ-শান্তি ও অভ্যুদয় কামনা করেন। তাঁরা আদান-প্রদানরূপী যজ্ঞনীতি অনুসরণ করে চলবেন। কবি বলছেন—

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।।

* * *

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও।
তার মত সুখ কোথাও কি আছে।
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।।"

কবিবর্ণিত উপরোক্ত ভাবধারার মধ্যেই যজ্ঞনীতিটি অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। জগতের মানুষ আজ শুধু নেবার জন্য বা স্বীয় স্বার্থাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত ব্যগ্র। দেবার আকাঙ্ক্ষা বা পরার্থে আত্মদানের আগ্রহ

আজ তাদের নাই। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান জগতের যাবতীয় অসুখ, অশান্তি দ্বন্দ্ব-বিরোধের মূল কারণ এখানে। গীতা তাই বহু পূর্ব্বে জীবকে সতর্ক করে বলেছিলেন—যারা যজ্ঞনীতি অনুসরণ করে না তাদের ইহলোকের সুখ-সৌভাগ্য নাই, পরকালের কল্যাণ ও মুক্তির আশা তো তাদের সুদূরপরাহত। পক্ষান্তরে, যারা এই প্রকার ত্যাগমূলক যজ্ঞ সম্পাদনের শেষে অথবা ঈশ্বরের প্রসন্নতা বিধানের জন্য পূজা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং সমাজহিতার্থে সেবামূলক কাজকর্ম করার পরে যা অবশিষ্ট থাকে, তা গ্রহণ করেন তাঁরাই শুধু পরম অমৃত বা শান্তির অধিকারী হন।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।। ৩২

অন্বয়—ব্রহ্মণঃ মুখে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ, তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি, এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।। ৩২

অনুবাদ—বেদমুখে এরূপ বহুপ্রকার যজ্ঞ ব্যাখ্যাত, সে সকলই কর্ম্মোদ্ভূত জানবে; এরূপ জেনে মুক্তি লাভ করবে।। ৩২

গীতামৃত—বেদে বহুপ্রকার যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং গীতাতেও এতক্ষণ বহুবিধ যজ্ঞের বর্ণনা দেওয়া হল। উপরোক্ত সমস্ত প্রকার যজ্ঞই কর্ম্মমূলক এবং এই কর্ম্ম সামান্য কর্ম্ম নয়—ইহা ব্রহ্মকর্ম্ম। কেন না, ব্রহ্ম বা ভগবানের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কর্ম্ম উৎসৃষ্ট এবং আত্মত্যাগই এদের মৌলিক ভিত্তি। যজ্ঞতত্ত্বকে এরূপ উদার ও গভীর ভাবে অবগত হলে তা মুক্তির কারণ হয়। কেন না, উচ্চতম জ্ঞানদৃষ্টি নিয়ে এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হওয়ায় তার ফল কদাপি বন্ধনপ্রদ হতে পারে না।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।। ৩৩

অন্বয়—পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্; পার্থ! সর্ব্বম্ অখিলং কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।। ৩৩

অনুবাদ—হে পরন্তপ, দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ! সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।। ৩৩

গীতামৃত--দ্রব্যময় যজ্ঞ সাধারণতঃ সকাম ভাবমূলক। দেবদেবীর নিকট হতে বরাশিস্ লাভ করে ঐহিক সুখ ও অভ্যুদয় লাভের নিমিত্ত সাধারণতঃ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং, জ্ঞানযজ্ঞ (যা কেবল মাত্র পারলৌকিক মোক্ষ লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হয়) অপেক্ষা তা নিকৃষ্ট। বস্তুতঃ কর্ম্ম যদি চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়, তবে সেই কর্ম্ম পরিশেষে জ্ঞানে লয়প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মের সার্থকতা এখানে। তবে গীতা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করতে উৎসাহ দিয়েছেন। সুতরাং, গীতার দৃষ্টিতে কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক বলে জ্ঞানলাভের পক্ষে তা যেমন একান্ত অপরিহার্য্য, অন্যদিকে জ্ঞান লাভের পরেও কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে লোকশিক্ষার জন্য। অন্যান্য উপনিষদের সহিত গীতার পার্থক্য এখানে। ঔপনিষদিক সাধনা কর্ম্মকে বহুলাংশে চিত্তশুদ্ধির সহায়করূপে স্বীকৃতি দান করেন। পরন্তু, গীতা চিত্তশুদ্ধির জন্য যেমন কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন, জ্ঞানলাভের পরেও তেমনি কর্ম্মের মহত্ত্ব ঘোষণা করেছেন। গীতার এই শিক্ষা তাই অনুপম ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সনাতন ধর্ম্মেরই ইহাই পরিপূর্ণ আদর্শ। এই আদর্শে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দুজাতি পুনরায় সগৌরবে উন্নতশীর্ষ হয়ে বিশ্ববরেণ্য হয়ে উঠবে।

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪

অন্বয়—প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া চ তৎ বিদ্ধি ; তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি।। ৩৪

অনুবাদ—প্রণাম, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা জ্ঞান লাভ কর ; তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করবেন।। ৩৪

আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজন—
অনন্যশরণাগতি ও সদ্‌গুরুর বিশেষ অনুগ্রহ

তত্ত্বজ্ঞান লাভের ঐকান্তিক উৎকণ্ঠা নিয়ে কোন সাধক যখন শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর চরণে উপনীত হন এবং পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পাদবন্দনাপূর্ব্বক তাঁর নিকট স্বীয় জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলি নিবেদন ক'রে

সেবা ও পরিচর্য্যার দ্বারা তাঁকে পরিতুষ্ট করেন, তখন সেই তত্ত্বজ্ঞ ও কৃপালু সদ্‌গুরু তাঁকে আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী আদেশ-উপদেশ দান করেন। মাত্র এইরূপ অবস্থায় সেই আচার্য্যপ্রদত্ত উপদেশ বিশেষ কার্য্যকীর হয়।

বস্তুতঃ, মানুষের প্রাণের আন্তরিক আকুতি বা আশা-আকাঙ্ক্ষা কখনও ব্যর্থ বা নিষ্ফল হয় না। তবে এজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—আত্মপ্রস্তুতি। অর্জ্জুন এতদিন শিষ্যত্বের সত্যকার গুণ ও অধিকার লাভ করেন নাই। তাই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ সদ্‌গুরু তাঁর সমক্ষে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি শরণাগত ভাবে তাঁর নিকট এতদিন জ্ঞানপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হন নি এবং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁর সমক্ষে আচার্য্যভাবে প্রকট হন নি। এ বিষয়ে সঙ্ঘগুরু আচার্য্য প্রণবানন্দ স্বীয় সন্তানদের লক্ষ্য করে বলেছেন—"লোক আশ্রয় পাইয়াও নিরাশ্রয় হয়, নিরাশ্রয়ের মত থাকে, যদি শরণাগত ও শরণাপন্ন হইয়া না চলে। নিজ নিজ খেয়ালখুশী মত চলিলে, নিজের মতলব ও ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিলে কোন সাহায্যই সেখানে পৌছিতে পারে না, আমার শক্তি সেখানে কোন কাজ করিতে পারে না। গ্রহণেচ্ছু (receptive) না হইলে আমার সাহায্য যাইয়াও ফিরিয়া আসে। যে সাহায্য ঠিক ঠিক চায়, সেই সাহায্য পায়।"

উপরোক্ত মহাজনবাক্য হতে স্বতঃই সপ্রমাণ হয়—মণিকাঞ্চনের সংযোগের ন্যায় যেখানে ভক্তিমান, সেবাপরায়ণ ও আগ্রহশীল শিষ্যের সহিত পরম কৃপালু ও সমর্থ সদ্‌গুরুর নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক সাধিত হয় সেখানেই সদ্‌গুরুপ্রদত্ত জ্ঞান সুফলপ্রসূ হয়।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫

অন্বয়—পাণ্ডব! যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি, যেন অশেষেণ ভূতানি আত্মনি অথো ময়ি দ্রক্ষ্যসি॥ ৩৫

অনুবাদ—হে পাণ্ডব! যা জানলে পুনরায় মোহ প্রাপ্ত হবে না, যা জ্ঞাত হলে চরাচর সর্ব্বভূত আত্মাতে এবং আমাতে দর্শন করতে পারবে॥ ৩৫

আত্মজ্ঞানের স্বরূপ

হে পাণ্ডব, কৃপালু সদ্গুরুর সাক্ষাৎ প্রেরণা এবং সদুপদেশে শ্রদ্ধালু ও জিজ্ঞাসু শিষ্য যে জ্ঞানলাভ করেন,—তার স্বরূপ কি তাও তোমাকে বলছি। তুমি মন দিয়ে শোন—সত্যকার অধ্যাত্মজ্ঞান শোক-মোহনিবারক। এরূপ জ্ঞানের অভাবের জন্যই তুমি স্বজনবিয়োগের ভয়ে ও যুদ্ধের ফলাফল চিন্তা করে এতখানি কাতর হয়ে পড়েছ।

জেনে রাখ—তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির মনে আমি, তুমি, তিনি—এই সমস্ত ভেদভাব থাকে না। আত্মজ্ঞান লাভের ফলে তিনি চরাচর বিশ্বকে নিজের মধ্যে দর্শন করেন। শুধু তাই নয়—তিনি এই সমস্ত ভূতগ্রামকে আমার (ভগবানের) মধ্যেও দর্শন করেন। অর্থাৎ, যিনি আত্মবিদ্, তিনি সমস্ত কিছুতে নিরন্তর আত্মদর্শন ও ব্রহ্মদর্শন করে থাকেন। তাঁর দৃষ্টিতে ভেদভাবের চির অবসান ঘটে! হে অর্জ্জুন! তুমি অজ্ঞতাবশতঃই পাণ্ডবগণকে নিজ ও কৌরবগণকে পৃথক্‌রূপে দর্শন করছ এবং এই আত্মপর ভেদবুদ্ধির জন্যই তোমার অন্তরের এই ভয়ভীতি বা শোক-দুঃখ। আত্মজ্ঞান লাভের ফলে তুমি যখন সকলের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সকলকে দর্শন করবে এবং যখন জানতে পারবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই ভগবানের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, সুতরাং, তাঁর মধ্যেই নিহিত, তখন তুমি শোকমোহের অতীত যে আনন্দময় কৈবল্যাবস্থা—তাই লাভ করে ধন্য হবে।

এখানে প্রশ্ন আসে—সর্ব্বভূতে এইরূপ অভেদ দর্শন বা আত্মদর্শনের পরে আবার কর্ম্মের অবকাশ কোথায়? অর্থাৎ, সাধক যখন সব কিছুই ব্রহ্মময় দেখেন তখন তাঁর দৃষ্টিতে দোষ ত্রুটি, অভাব-অভিযোগ বলে কিছু পরিদৃষ্ট হতে পারে কি? সুতরাং, সেই পরম কৈবল্যস্থিতি লাভ করার পরে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা থাকে কেমন করে?

বস্তুতঃ তথাকথিত জ্ঞানবাদীরাও অনুরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন—চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু জ্ঞান লাভের পরে সেই কর্ম্মপ্রবৃত্তি সমূলে বিনষ্ট হয়। পরন্তু, এখানে জানা আবশ্যক, গীতাতে শ্রীভগবান্ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়ে বলেছেন—জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরাও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করবেন। সুতরাং, জ্ঞানবাদীর কর্ম্মত্যাগ ও গীতার এই কর্ম্মবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? প্রশ্নটি জটিল সন্দেহ নাই। তথাপি উত্তরে বলা

যায়—জ্ঞানবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন—"ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ"—অর্থাৎ, ভাবের দৃষ্টিতে সর্ব্বদা অদ্বৈতভাব রক্ষা করবে। পরন্তু, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কদাপি এইরূপ অদ্বৈত ভাবের প্রশ্রয় দেবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র ভাবময় দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুর মধ্যে নিজকে দর্শন করেও ব্যবহারিক জগতে আদর্শ মানবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব উদ্‌যাপন করেছেন। বালী, রাবণ প্রভৃতি দুষ্ট-দুর্বৃত্তগণের মধ্যে তিনি ভাবময় দৃষ্টিতে আত্মদর্শন করেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাদিগকে তাদের কু-কার্য্যের নিমিত্ত সমুচিত দণ্ডদানে ইতস্ততঃ করেন নি। শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বিশ্বরূপ দর্শন দানের কালে নিজের মধ্যে শত্রু, মিত্র এবং বিশ্বচরাচর সমস্ত কিছুই নিহিত রয়েছে—এই ভাবে প্রকট হয়েও অর্জ্জুনকে শত্রুবধে এমন কি জ্ঞাতিবধে পর্য্যন্ত প্রোৎসাহিত করেছেন। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হতে সুস্পষ্ট হয় যে, জীবন্মুক্ত জ্ঞানী পুরুষ তাঁর অত্যুচ্চ জ্ঞানের ভূমিকায় আরূঢ় হয়ে সমস্ত কিছুই আত্মবৎ বা ব্রহ্মবৎ দর্শন করেন বটে ; কিন্তু ব্যবহারিক ভূমিকায় অবতরণ করে তিনি লোকসংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্মে নিযুক্ত হতে পারেন—গীতা এখানে সেই ভাবেরই ইঙ্গিত করেছেন।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬

অন্বয়—চেৎ সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপি পাপকৃত্তমঃ অসি, জ্ঞানপ্লবেন এব সর্ব্বং বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬

অনুবাদ—যদি তুমি সকল পাপী হতেও অধিকতর পাপাচারী হও, তথাপি তুমি জ্ঞানরূপ তরণীর দ্বারা সকল পাপ (সমুদ্র) উত্তীর্ণ হবে।। ৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭

অন্বয়—অর্জ্জুন! যথা সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ এধাংশি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে॥ ৩৭

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মরাশিকে ভস্মসাৎ করে থাকে।। ৩৭

জ্ঞানের পাপহারিণী শক্তি

হে অর্জ্জুন! তুমি সৎকুলজাত ও শুভসংস্কারাপন্ন। এমতাবস্থায় তোমার মনে পাপ-তাপের ভয়-ভাবনা থাকা উচিত নয়। তবুও যদি মনে কর—তুমি মহান্ পাতকী এবং অশেষ অপরাধে অপরাধী, তথাপি তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই। কেন না, তোমাকে আমি এতক্ষণ যে জ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছি—তার শক্তি অপরিসীম, সেই জ্ঞান লাভ করতে পারলে তোমার মনে আর কোন পরিতাপের ভয় ভাবনা থাকবে না। সম্মুখে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র দর্শন করে পারের যাত্রী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। পরন্তু, যখনই সে পারে যাবার উপযোগী কোন সুদৃঢ় তরণীর সন্ধান পায়, তখনই সে ভয়ভীতিমুক্ত হয় না কি? কারণ, তখন সে জানতে পারে যে, সে এই সুযোগ্য তরণীর সাহায্যে অনায়াসে ও নিরাপদে পরপারে যেতে সক্ষম হবে। ঠিক তেমনি জ্ঞানরূপ তরণীর সন্ধান পেলে সাধকের ভবসমুদ্র পারের আর কোন ভয় থাকে না।

হে সখে! আরও শোন—অগ্নি সর্ব্বভুক্, কাষ্ঠই হোক্ বা অন্য যে কোন ইন্ধন-দ্রব্য হোক, অগ্নি তা মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত করে ফেলে। আত্মজ্ঞানকেও তুমি তেমনি মহাপাবক অগ্নিস্বরূপ বলে জান। এই জ্ঞানাগ্নি অন্তরে একবার প্রজ্জ্বলিত হলে জন্মজন্মান্তরের গ্লানি-গ্লানি ও পাপতাপের সংস্কার মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সুতরাং, জ্ঞানের এই অনন্ত পাবনী শক্তির কথা যদি তুমি স্মরণ কর তবে তোমার আর ভয়-ভীতি ও শোক-দুঃখের অবসর-অবকাশ থাকবে না। তুমি তখন নিরন্তর নিজকে নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ও নিষ্কলঙ্ক মনে করে পরম আনন্দময় অবস্থা লাভ করবে।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।। ৩৮

অন্বয়—ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং ন হি বিদ্যতে, কালেন যোগসংসিদ্ধঃ স্বয়ম্ আত্মনি তৎ বিন্দতি।। ৩৮

অনুবাদ—ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পাবক বা শোধক আর কিছুই নাই। কালক্রমে কর্ম্মযোগসিদ্ধ পুরুষ আপনা থেকেই সেই জ্ঞান লাভ করে থাকেন।। ৩৮

কর্ম্মযোগই জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

জ্ঞানের মহত্ত্ব-গৌরব কি? জ্ঞানলাভ করলে কী রূপ ফললাভ হয়—তা এতক্ষণ আলোচিত হল। এক্ষণে সেই জ্ঞান কী ভাবে লাভ করা যায় তারই সূচনা দেওয়া হচ্ছে।

সাধারণ ভৌতিক জ্ঞান বুদ্ধিগ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়গণের মাধ্যমে বুদ্ধি বহির্বিষয় হতে এই জ্ঞান আহরণ করে থাকে। পরন্তু, আত্মজ্ঞান লাভের উপায় স্বতন্ত্র। এই জ্ঞান পূর্ব্ব হতেই সাধকের অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকে। সাধনার দ্বারা চিত্ত যতই বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল স্বরূপ ধারণ করতে থাকে ততই সেই জ্ঞান মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হতে থাকে। তবে এই চিত্তশুদ্ধির উপায় এক নয়—গীতায় এ বিষয়ে বহুবিধ সাধনার সঙ্কেত আছে। এখানে এই শ্লোকে চিত্তশুদ্ধির জন্য যে উপায়টি সূচিত হয়েছে তা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সাধনা। অর্থাৎ, ঈশ্বরে যোগযুক্ত হয়ে তাঁর প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করতে থাকলে ক্রমশঃ অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হয়ে যায় এবং তার ফলে অন্তর্নিহিত জ্ঞান আপনা হতেই প্রস্ফুরিত হয়।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।। ৩৯

অন্বয়—শ্রদ্ধাবান্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে ; জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি।। ৩৯

অনুবাদ—যিনি শ্রদ্ধালু, নিষ্ঠাপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় তিনি জ্ঞানলাভ করেন। জ্ঞানলাভ হলে তিনি অচিরে পরম শান্তিপ্রাপ্ত হন।। ৩৯

জ্ঞানলাভের উপযোগী সাধনত্রয়

গীতার মতে জ্ঞানলাভের জন্য সাধকের প্রয়োজন তিনটি গুণ—শ্রদ্ধা, তৎপরতা বা নিষ্ঠা এবং ইন্দ্রিয়সংযম। জ্ঞানলাভেচ্ছু সাধকের জানা উচিত—জ্ঞান-মন্দিরে প্রথম দ্বার হচ্ছে শ্রদ্ধা—"আদৌ শ্রদ্ধা"। বস্তুতঃ, শ্রদ্ধা

ব্যতীত জ্ঞানলাভের আশা সুদূরপরাহত। 'শ্রদ্ধা' বলতে বোঝায়—গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অটুট ও অবিচলিত বিশ্বাস। অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের পথে তর্কের স্থান নাই—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' অর্থাৎ তর্কের দ্বারা সেই পরমতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। বস্তুতঃ, ঈশ্বর বা পরমাত্মার অস্তিত্বেই যার বিশ্বাস নাই তার পক্ষে অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ কী রূপে সম্ভবপর? অর্থাৎ, যাঁকে অবগত হবার জন্যই সাধনা, জপ-তপ, পূজা-পাঠ, ধ্যান-ধারণা—তাঁর অস্তিত্বের বিষয়ে যদি তোমার মনে ঘোর সন্দেহ বিদ্যমান থাকে তবে তাঁকে লাভ করার জন্য তোমার অন্তঃকরণে আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে কেমন করে? এ জন্যই জ্ঞানার্থী সাধকের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অটুট বিশ্বাস। তবে যদি কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েও বিনয়-বিনম্র চিত্তে জিজ্ঞাসু হয়ে কোন মহাপুরুষের শরণাপন্ন হন তবে তা বিশেষ দোষাবহ নয়; বরং কল্যাণপ্রদ। এজন্যই পূর্ব্বে বলা হয়েছে—সর্ব্বাগ্রে সদ্‌গুরুর চরণ বন্দনা করে এবং সেবাশুশ্রূষাপরায়ণ হয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় অগ্রসর হতে হবে।

আজিকার এই বৈজ্ঞানিক যুগে 'শ্রদ্ধা' শব্দটি কর্ণগোচর হবার সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর তথাকথিত জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি ব্যঙ্গোক্তি ক'রে বলে ওঠেন —"তবে কি আমাদের অন্ধ শ্রদ্ধা নিয়ে, যা বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে, বিনা যুক্তি প্রমাণে সব কিছু মেনে নিতে হবে?" বলা বাহুল্য, এই সমস্ত পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিদের ইত্যাকার উক্তির পশ্চাতে রয়েছে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার মূল সূত্রের কথা। অর্থাৎ, আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য প্রয়োজন হয়—পদে পদে সংশয় সন্দেহমূলক যুক্তি-বিচার এবং প্রমাণ-প্রয়োগ। অনেকখানি সন্দেহ-সংশয় নিয়েই বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের গবেষণা-কার্য্য আরম্ভ করেন এবং যতক্ষণ তাঁরা কোন তথ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় যুক্তি ও প্রমাণ লাভ না করেন ততক্ষণ তার সত্যতা বিষয়ে তাঁরা স্বীকৃতি দানে প্রস্তুত হন না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইহাই প্রচলিত ধারা।

অনুরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে আজকালকার বিদ্যাভিমানীরা অধ্যাত্মজ্ঞানকেও তর্ক-যুক্তি এবং প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা জানবার ও বোঝবার হঠাগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। পরন্তু, অধ্যাত্মজ্ঞান আহরণের ব্যাপারে

উপরোক্ত নীতি সর্ব্বাংশে কার্য্যকরী হয় না। এক্ষেত্রে সাধকের প্রথম প্রয়োজন হয়—সদ্‌গুরুর প্রতি পরম শরণাগতি এবং শাস্ত্রবাক্যের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা। তবে কি ধর্ম্মজগতে তর্ক বা যুক্তির স্থান একেবারেই নাই? নিশ্চয়ই আছে। হিন্দুশাস্ত্র কোন সাধককে বিনা বিচারে কোন কিছু গ্রহণ করার জন্য নির্দ্দেশ দেন নি। এক্ষেত্রেও শিষ্যকে পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয় তার অন্তরের সমস্ত প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাগুলি গুরুচরণে উপস্থাপিত করতে। পূর্ব্বের একটি শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—"পরিপ্রশ্নেন," অর্থাৎ, শিষ্য পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়ের মীমাংসা করে নেবেন। এজন্য গীতা এবং অন্যান্য বহু উপনিষদ্ রচিত হয়েছে গুরু-শিষ্য-সংবাদরূপে। তবে অধ্যাত্মজ্ঞান ও ভৌতিক বিজ্ঞান লাভের প্রণালীর মধ্যে পার্থক্যটিও এই প্রসঙ্গে ভাল ভাবে জানা প্রয়োজন। যারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত তাদিগকেও কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে মেনে নিয়ে তারপরে গবেষণায় অগ্রসর হতে হয়। অধ্যাত্মক্ষেত্রেও তেমনি ঈশ্বর ও পরমাত্মার অস্তিত্বে বা চরম কৈবল্যময় স্থিতির অস্তিত্বে বিশ্বাস নিয়েই সেই জ্ঞানলাভের অগ্রসর হতে হয় এবং এই জ্ঞানলাভের পথে সাধকের প্রাণে যখনই কোন সংশয়-সন্দেহের উদ্রেক হয় তখনই তা বিনীত ভাবে সদ্‌গুরুর নিকট নিবেদন করে তার মীমাংসা করার প্রয়োজন হয়। অধ্যাত্ম জগতের সাধকের পক্ষে শ্রদ্ধা-বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তাই সর্ব্বাধিক। একজন বিজ্ঞানের ছাত্র তার অধ্যাপকের প্রতি পরিপূর্ণ শরণাগতি ও সেবাপরায়ণতার ভাব রক্ষা না করেও অনেক বিষয়ের জ্ঞানলাভ করতে পারে; কিন্তু অধ্যাত্মজগতে তা অসম্ভব। এই জন্যই গীতাদি হিন্দুশাস্ত্র 'শ্রদ্ধা' শব্দটির উপর এতখানি জোর দিয়েছেন।

জ্ঞানলাভের জন্য দ্বিতীয় প্রয়োজন—নিষ্ঠা। বস্তুতঃ, যার মধ্যে সাধননিষ্ঠা বা অধ্যবসায় নাই, সে কোনদিন কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হতে পারে না। সদ্‌গুরু যতই মহান্ ও শক্তিশালী হোন না কেন এবং তাঁর প্রদত্ত উপদেশ এবং শিক্ষাপ্রণালী যতই সুন্দর ও সুব্যবস্থিত হোক না কেন, আশ্রিত শিষ্য যদি একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হবার জন্য প্রাণপাতী প্রচেষ্টা না করে তবে তার পক্ষে সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব। এজন্যহ বলা হয়েছে—শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে

চাই—নিষ্ঠা বা "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"—এই ভাবের সুকঠোর সঙ্কল্প।

জ্ঞানলাভের জন্য তৃতীয় প্রয়োজন—ইন্দ্রিয়সংযম। দশটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেমন জ্ঞান ও শক্তি লাভ করা যায়, তেমনি সেই ইন্দ্রিয়গণের ছিদ্রপথ দিয়ে সব শক্তি ও জ্ঞানের বহির্গমনেরও অনন্ত সম্ভাবনা বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা একটি সুন্দর ও পবিত্র বস্তু দর্শন করলে যেরূপ নির্ম্মল জ্ঞান ও শক্তি লাভ করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন অপবিত্র বস্তু বা কুদৃশ্য দর্শন করলে তদ্রূপ তার বিপরীত ফল লাভ হয়। এজন্যই প্রয়োজন—ইন্দ্রিয়সংযম। তবে ইন্দ্রিয়সংযমের অর্থ এই নয় যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারগুলিকে নিরুদ্ধ করে তাদের অক্ষম অকর্ম্মণ্য করে তোলা। এখানে ইন্দ্রিয়সংযম বলতে বোঝান হচ্ছে—ইন্দ্রিয়গণের যে দুষ্প্রবৃত্তি তা দমন ক'রে তাদের গুণ ও শক্তিকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের পথে পরিচালিত করা। ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ সংযমের মধ্য দিয়েই সাধক আত্মজ্ঞান লাভের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে অন্তিমে পরম সিদ্ধি অর্জ্জনে সক্ষম হন।

এখানে বলা প্রয়োজন—বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের জন্যও শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও ইন্দ্রিয়সংযমের প্রয়োজনীয়তা একান্ত কম নয়। একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক গবেষক একদা বলেছিলেন—"আমি সারাদিন আমার গবেষণা-কার্য্যে এমন তন্ময় হয়ে থাকি যে কুচিন্তা কাকে বলে তা আমি জানি না।" সুতরাং, জ্ঞান ও বিজ্ঞান—এই উভয়বিধ সাধনায় প্রয়োজন হয়—শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও ইন্দ্রিয়সংযম। তবে অধ্যাত্মপন্থী সাধকের পক্ষে শ্রদ্ধার যতখানি গভীরতা প্রয়োজন, বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে হয়তো ততখানি আবশ্যক নাও হতে পারে। গীতার পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলেছেন—হে অর্জ্জুন তুমি আমাকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সহিত জান। এতেই বোঝা যায়—ভারতীয় দৃষ্টিতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধানের গণ্ডী সৃষ্টি করা হয় নি। ভারতের সুপ্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র একাধারে ছিলেন ধার্ম্মিক ও বৈজ্ঞানিক। পণ্ডিত জহরলাল তাই তাঁকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও অনুকরণের পাত্র বলে প্রচার করেছেন।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪০

অন্বয়—অজ্ঞঃ অশ্রদ্দধানঃ সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি ; সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি, ন পরঃ, ন সুখম্॥ ৪০

অনুবাদ—অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়ী ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। এরূপ সংশয়াপন্ন ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই॥ ৪০

সংশয়ী ব্যক্তির পরিণাম

শ্রদ্ধালু, আদর্শনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরম জ্ঞানের অধিকারী হয়ে কী রূপে সুবিমলা শান্তির অধিকারী হন তা পূর্ব্বে সূচিত হয়েছে। এক্ষণে যে ব্যক্তি অজ্ঞান, অশ্রদ্ধালু ও সংশয়ভাবাপন্ন তার অবস্থা বর্ণনা করে বলা হচ্ছে যে, এরূপ ব্যক্তি ইহলোকের সুখ-সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয় এবং পরলোকের মোক্ষ-মুক্তির অধিকারও এরা লাভ করে না। উপরন্তু, তাদের জীবন হয়—সুখহীন বা নিরানন্দময়। এরূপ ব্যক্তির অন্তিম পরিণাম হয় —বিনাশ বা মৃত্যু।

অজ্ঞ, অশ্রদ্ধালু ব্যক্তি মোক্ষ-মুক্তির অধিকারী হয় না সত্য ; কিন্তু এরূপ ব্যক্তি ঐহিক সুখ-সৌভাগ্য বা উন্নতি-অভ্যুদয় কেন লাভ করবে না—এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এরূপ অশ্রদ্ধালু ও সংশয়ী ব্যক্তির মন সন্দেহ-দোলায় নিত্য দোদুল্যমান। স্থির লক্ষ্য বা আদর্শনিষ্ঠা বলে কোন কিছু তার থাকে না। এরূপ অবস্থায় সে জাগতিক যে কোন কাজকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করুক না কেন সেই কাজে সাফল্য লাভ করা তার পক্ষে সম্ভবপর কি?

শোনা যায়—সম্রাট ঔরঙ্গজেব এতদূর সংশয়ভাবাপন্ন ছিলেন যে, তিনি স্বীয় পিতামাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, অমাত্য এমন কি নিজের পুত্রদের প্রতিও নিরন্তর সংশয়ের ভাব পোষণ করতেন এবং তাঁদের কারো কারো বিনাশের জন্য তিনি নিরন্তর ষড়যন্ত্রের জাল সৃষ্টি করতেন। তাঁর এই সন্দেহ-সংশয়ের পরিণাম মারাত্মক হয়। তাঁর জীবৎকালেই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি নিজে অতি শোচনীয় ভাবে মৃত্যুর কবলতি হন। শোনা যায়, ঔরঙ্গজেব নাকি নাস্তিক ছিলেন না। নিষ্ঠাসহকারে তিনি তাঁর ঐহিক

চাই—নিষ্ঠা বা "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"—এই ভাবের সুকঠোর সঙ্কল্প।

জ্ঞানলাভের জন্য তৃতীয় প্রয়োজন—ইন্দ্রিয়সংযম। দশটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেমন জ্ঞান ও শক্তি লাভ করা যায়, তেমনি সেই ইন্দ্রিয়গণের ছিদ্রপথ দিয়ে সব শক্তি ও জ্ঞানের বহির্গমনেরও অনন্ত সম্ভাবনা বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা একটি সুন্দর ও পবিত্র বস্তু দর্শন করলে যেরূপ নির্মল জ্ঞান ও শক্তি লাভ করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন অপবিত্র বস্তু বা কুদৃশ্য দর্শন করলে তদ্রূপ তার বিপরীত ফল লাভ হয়। এজন্যই প্রয়োজন—ইন্দ্রিয়সংযম। তবে ইন্দ্রিয়সংযমের অর্থ এই নয় যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারগুলিকে নিরুদ্ধ করে তাদের অক্ষম অকর্মণ্য করে তোলা। এখানে ইন্দ্রিয়সংযম বলতে বোঝান হচ্ছে—ইন্দ্রিয়গণের যে দুষ্প্রবৃত্তি তা দমন ক'রে তাদের গুণ ও শক্তিকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের পথে পরিচালিত করা। ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ সংযমের মধ্য দিয়েই সাধক আত্মজ্ঞান লাভের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে অন্তিমে পরম সিদ্ধি অর্জ্জনে সক্ষম হন।

এখানে বলা প্রয়োজন—বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের জন্যও শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও ইন্দ্রিয়সংযমের প্রয়োজনীয়তা একান্ত কম নয়। একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক-গবেষক একদা বলেছিলেন—"আমি সারাদিন আমার গবেষণা-কার্য্যে এমন তন্ময় হয়ে থাকি যে কুচিন্তা কাকে বলে তা আমি জানি না।" সুতরাং, জ্ঞান ও বিজ্ঞান—এই উভয়বিধ সাধনায় প্রয়োজন হয়—শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও ইন্দ্রিয়সংযম। তবে অধ্যাত্মপন্থী সাধকের পক্ষে শ্রদ্ধার যতখানি গভীরতা প্রয়োজন, বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে হয়তো ততখানি আবশ্যক নাও হতে পারে। গীতার পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলেছেন—হে অর্জ্জুন তুমি আমাকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সহিত জান। এতেই বোঝা যায়—ভারতীয় দৃষ্টিতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধানের গণ্ডী সৃষ্টি করা হয় নি। ভারতের সুপ্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র একাধারে ছিলেন ধার্ম্মিক ও বৈজ্ঞানিক। পণ্ডিত জহরলাল তাই তাঁকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও অনুকরণের পাত্র বলে প্রচার করেছেন।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।। ৪০

অন্বয়—অজ্ঞঃ অশ্রদ্দধানঃ সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি ; সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি, ন পরঃ, ন সুখম্।। ৪০

অনুবাদ—অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়ী ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। এরূপ সংশয়াপন্ন ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই।। ৪০

সংশয়ী ব্যক্তির পরিণাম

শ্রদ্ধালু, আদর্শনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরম জ্ঞানের অধিকারী হয়ে কী রূপে সুবিমলা শান্তির অধিকারী হন তা পূর্ব্বে সূচিত হয়েছে। এক্ষণে যে ব্যক্তি অজ্ঞান, অশ্রদ্ধালু ও সংশয়ভাবাপন্ন তার অবস্থা বর্ণনা করে বলা হচ্ছে যে, এরূপ ব্যক্তি ইহলোকের সুখ-সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয় এবং পরলোকের মোক্ষ-মুক্তির অধিকারও এরা লাভ করে না। উপরন্তু, তাদের জীবন হয়—সুখহীন বা নিরানন্দময়। এরূপ ব্যক্তির অন্তিম পরিণাম হয় —বিনাশ বা মৃত্যু।

অজ্ঞ, অশ্রদ্ধালু ব্যক্তি মোক্ষ-মুক্তির অধিকারী হয় না সত্য ; কিন্তু এরূপ ব্যক্তি ঐহিক সুখ-সৌভাগ্য বা উন্নতি-অভ্যুদয় কেন লাভ করবে না—এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এরূপ অশ্রদ্ধালু ও সংশয়ী ব্যক্তির মন সন্দেহ-দোলায় নিত্য দোদুল্যমান। স্থির লক্ষ্য বা আদর্শনিষ্ঠা বলে কোন কিছু তার থাকে না। এরূপ অবস্থায় সে জাগতিক যে কোন কাজকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করুক না কেন সেই কাজে সাফল্য লাভ করা তার পক্ষে সম্ভবপর কি?

শোনা যায়—সম্রাট ঔরঙ্গজেব এতদূর সংশয়ভাবাপন্ন ছিলেন যে, তিনি স্বীয় পিতামাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, অমাত্য এমন কি নিজের পুত্রদের প্রতিও নিরন্তর সংশয়ের ভাব পোষণ করতেন এবং তাঁদের কারো কারো বিনাশের জন্য তিনি নিরন্তর ষড়যন্ত্রের জাল সৃষ্টি করতেন। তাঁর এই সন্দেহ-সংশয়ের পরিণাম মারাত্মক হয়। তাঁর জীবৎকালেই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি নিজে অতি শোচনীয় ভাবে মৃত্যুর কবলতি হন। শোনা যায়, ঔরঙ্গজেব নাকি নাস্তিক ছিলেন না। নিষ্ঠাসহকারে তিনি তাঁর ঐহিক

ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য নিত্য নিয়মিত নমাজ বা প্রার্থনা করতেন। পরন্তু, এতৎসত্ত্বেও সংশ্রয়প্রবণতাই তাঁর অনিষ্ঠের কারণ হয়।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪১

অন্বয়—ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ আত্মবন্তং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি॥ ৪১

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়, যাঁর কর্ম্মসকল ভগবানে সমর্পিত, জ্ঞানপ্রভাবে যাঁর সংশয়সমূহ ছিন্ন হয়েছে, এরূপ ব্যক্তিকে কর্ম্মফল আবদ্ধ করতে পারে না॥ ৪১

যোগযুক্ত ব্যক্তিই বন্ধনমুক্ত

যে ব্যক্তি কর্ম্মযোগের আদর্শ অনুসরণ ক'রে তাঁর যাবতীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টা ভগবানে অর্পণ করতে অভ্যস্ত; অর্থাৎ যিনি ভগবৎ প্রেরণায় ও ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তিনি অচিরে শুদ্ধচিত্ত হয়ে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হন। হে ধনঞ্জয়, জেনে রাখ—এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি চিরতরে সংশয়মুক্ত হন; এরূপ অবস্থায় তিনি নিরন্তর কর্ম্মরত থাকলেও তাঁর সেই কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না।

এই শ্লোকে স্পষ্টই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে—জ্ঞানলাভের পরেও সাধক নিরন্তর কর্ম্মরত থাকবেন। গীতোক্ত কর্ম্মযোগভিত্তিক জ্ঞানযোগের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪২

অন্বয়—ভারত! তস্মাৎ জ্ঞানাসিনা আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থম্ এনং সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগম্ আতিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ।। ৪২

অনুবাদ—হে ভারত, তোমার অন্তঃকরণস্থ অজ্ঞানজনিত এই সংশয় সন্দেহ জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা ছিন্ন করে উত্থিত হও ও কর্ম্মযোগের আদর্শ অবলম্বন কর॥ ৪২

জ্ঞানের পরিণাম হয় কর্ম্মযোগে অনুরক্তি

হে ভারত! এতক্ষণে তোমার বোঝা উচিত—এতকাল তুমি কর্ম্মত্যাগের পক্ষে বা অনুকূলে যত যুক্তি প্রদর্শন করেছ তা তোমার অজ্ঞানজনিত সংশয়বুদ্ধির ফল। এখন তুমি যখন জ্ঞানের শক্তি ও মহত্ত্ব-গৌরব সম্বন্ধে অবহিত হয়েছ, তখন আর সংশয়-সন্দেহ কেন? এখন তুমি তোমার লব্ধ জ্ঞানরূপ অসি সহায়ে তোমার সমস্ত সংশয়-সন্দেহ ছিন্ন করে মোহমুক্ত হয়ে উঠ ও যুদ্ধকর্ম্মে ব্রতী হও।

আচার্য্য প্রণবানন্দজীও ঠিক অনুরূপ সূচনা দিয়ে স্বীয় আশ্রিত বিভ্রান্ত সন্তানগণকে তাঁর নির্দ্ধারিত কর্ম্মযোগে নিযুক্ত করেছেন—**"ধর সুতীক্ষ্ণ বিবেক বৈরাগ্যের অসি; ছিন্ন করিয়া ফেল যাবতীয় মায়া-মোহ-ভ্রম-ভ্রান্তির কুসংস্কার-জাল। এইরূপে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব হইয়া পরিত্রাণ কর পতিতকে, রক্ষা কর বিপন্নকে, আশ্রয় দাও নিরাশ্রয়কে, শান্তি-সুখ দাও সন্তপ্তকে।"**

আচার্য্যপ্রবরের উপরোক্ত জ্বলন্ত নির্দ্দেশ গীতার সিংহ-নিনাদকারী শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপরোক্ত উক্তিরই অবিকল প্রতিধ্বনি নয় কি? এই নির্দ্দেশবাণী অনুসরণ করেই তার সঙ্ঘ-সন্তানগণ আজ দেশ, জাতি ও জগতের সেবায় কর্ম্মব্রতী। তাঁর এই বাণীকে যুগবাণী বলে গ্রহণ করলেই আজ বিশ্বমানবের মহাকল্যাণ সাধিত হবে।

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ—কর্ম্মসন্ন্যাসযোগঃ

গীতোক্ত পঞ্চম অধ্যায়ের নাম সন্ন্যাসযোগ। অর্থাৎ, সন্ন্যাসের প্রকৃত লক্ষণ ও স্বরূপ কি—এই অধ্যায়ে মুখ্যতঃ তা-ই আলোচিত হয়েছে। 'সন্ন্যাস' বলতে সাধারণ লোকের ধারণা—সর্ব্বকর্ম্মের সম্যক্ ন্যাস বা ত্যাগ। এতকাল পর্য্যন্ত সন্ন্যাসের এরূপ ধারণাই অনেকটা প্রচলিত ছিল। গীতাকার শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসের এই অর্থের সমর্থন দেন নি। বুদ্ধিযোগ ও কর্ম্মযোগের সম্বন্ধেও তিনি এ পর্য্যন্ত যে সব অভিমত প্রকাশ করেছেন অর্জ্জুনের নিকট তাও সুস্পষ্ট বলে মনে হয় নি। তাঁর মন এখনও তাই সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে তিনি স্বীয় মনের এই সংশয় প্রকাশ করে বলেছিলেন—হে কেশব, তোমার মতে যখন কর্ম্ম হতে বুদ্ধি বা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তখন তুমি আমাকে এই ঘোর হিংসাত্মক যুদ্ধকার্য্যে কেন নিযুক্ত করছ? তোমার কথাগুলি আমার নিকট দুর্ব্বোধ্য ও অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে। এই অধ্যায়ের প্রথমে পুনরায় অর্জ্জুন ঠিক অনুরূপ প্রশ্ন ক'রে বললেন—

॥ অর্জ্জুন উবাচ ॥

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ, কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সংন্যাসং পুনঃ যোগং চ শংসসি; এতয়োঃ যৎ মে শ্রেয়ঃ তৎ একং সুনিশ্চিতং ব্রূহি॥ ১

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! তুমি একই সঙ্গে কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগের প্রশংসা করছ। এই দুই এর মধ্যে যেটি শ্রেয়স্কর—তা-ই আমাকে নিশ্চিত করে বল॥ ১

কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস সম্পর্কে অর্জ্জুনের সংশয়

সংশয়ব্যাধি মানব-মনের একটি চিরন্তন দুরূহ অন্তরায়। এই ব্যাধি যদি কারুর মনে একবার দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে তবে তার নিরসন সহজসাধ্য নয়। পূর্ব্ব পরম্পরাগত প্রথা ও সংস্কারবশে অর্জ্জুন আত্মকল্যাণের পক্ষে কর্ম্মত্যাগকেই সর্ব্বোত্তম উপায় বলে স্থির করে নিয়েছেন। সদ্গুরুরূপী শ্রীভগবানের উপদেশেও তাঁর মন হতে সেই সংস্কার সহজে দূরীভূত হচ্ছে না। এতেই সপ্রমাণ হয়—অর্জ্জুনের আত্মসমর্পণ এখনও অপূর্ণ। তাই তিনি সন্দিগ্ধ মনে পুনঃ পুনঃ ইত্যাকার প্রশ্ন করছেন। পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ সংশয়ী ব্যক্তির অন্তিম পরিণাম যে বিনাশ—তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেও তিনি এখনও সেই সন্দেহ-সংশয়েরই সেবা করে চলেছেন। তিনি হয়তো ভাবছেন—সখা শ্রীকৃষ্ণ তো একথা স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন—জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হয় না, জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই, সর্ব্বকর্ম্ম জ্ঞানেই পরিসমাপ্তি হয়। সুতরাং, জ্ঞানই হয়তো কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে সখা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন—নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি ঘটে না এবং শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী-ব্যক্তিরা নিরন্তর কর্ম্ম করেও বন্ধনপ্রাপ্ত হন না। এইরূপে কখনও জ্ঞানের প্রশংসা, কখনও কর্ম্মযোগের মহত্ত্ব ঘোষণা করায় অর্জ্জুনের সন্দেহ-সংশয় পুনরায় উদগ্র হয়ে উঠেছে। অর্জ্জুনের উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্ম-সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ। সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ; তয়োঃ তু কর্ম্ম-সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে॥ ২

অনুবাদ—ভগবান্ বললেন—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ॥ ২

কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে—গীতাযুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস—এই দুটি সাধনমার্গই প্রচলিত ছিল। তবে বৈদিক যাগ-যজ্ঞমূলক কর্ম্মমার্গ যখন সকাম ভাবের প্রাবল্যে মলিন ও গ্লানিযুক্ত হয়ে উঠেছিল, তখন সেই যজ্ঞকর্ম্ম পরিহার করে সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করাই সে যুগে অধিকতর প্রশস্ত ও শ্রেয়ঃ বলে বিবেচিত হয়েছিল। উপনিষদ, সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগদর্শনে এই ত্যাগমূলক সন্ন্যাসযোগের সাধনাই অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করেছে।

শ্রীভগবান্ এখানে সেই কথার পুনরুল্লেখ করে বললেন—নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও সত্যকার সন্ন্যাসযোগ—এই উভয় পন্থাই মোক্ষপ্রদ। তবে কর্ম্মত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ বা জ্ঞানমার্গের অনুসরণ অপেক্ষা কর্ম্মযোগের সাধনা প্রশস্ততর। কেন না, তার দ্বারা আত্মকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজস্থিতিমূলক লোকসংগ্রহের বিশেষ সহায়তা হয়। তবে এ প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে প্রকৃত সন্ন্যাসীর স্বরূপ-লক্ষণ কি—তা জানা প্রয়োজন। হে সখে, এ বিষয়ে তাই তুমি আমার উপদেশ অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩

অন্বয়—মহাবাহো! যঃ ন দ্বেষ্টি, ন কাঙ্ক্ষতি, স নিত্য-সন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ, নির্দ্বন্দ্বঃ হি সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩

অনুবাদ—হে মহাবাহো, যিনি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, কোন কিছুর প্রতি যিনি দ্বেষভাবও রাখেন না, তাঁকেই আদর্শ সন্ন্যাসী ব'লে জেনো। এরূপ রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্য, শুদ্ধচিত্ত পুরুষ অনায়াসে সংসার-বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করেন॥ ৩

গীতামৃত—শ্রীভগবানের এই উক্তির অর্থ হচ্ছে—কর্ম্মত্যাগের সঙ্গে সন্ন্যাসের কোন সম্বন্ধ-সম্পর্ক নাই। কর্ম্মত্যাগ না করেও যদি মনকে নিষ্কাম ও রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্য করা যায় তদ্দ্বারাই সন্ন্যাসের প্রকৃত অবস্থা লাভ করা যায়। তবে কর্ম্মত্যাগী সাংখ্য বা জ্ঞানবাদীদের যে মোক্ষলাভ হয় না,—তা নয়।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৪

অন্বয়—বালাঃ সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ প্রবদন্তি, পণ্ডিতাঃ নয়, একম্ অপি আস্থিতঃ উভয়োঃ ফলং বিন্দতে॥ ৪

অনুবাদ—বালকের ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিগণই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ বলে থাকেন ; পণ্ডিতগণ এরূপ বলেন না। এদের একটি ভালভাবে অনুষ্ঠিত হলে উভয়ের ফল লাভ করা যায়॥ ৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫

অন্বয়—সাংখ্যৈঃ যৎ স্থানং প্রাপ্যতে যোগৈঃ অপি তৎ গম্যতে ; যঃ সাংখ্যং চ যোগং চ একং পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫

অনুবাদ—(কর্ম্মত্যাগী) সাংখ্যগণ যে স্থান লাভ করেন কর্ম্মযোগীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হন। যিনি কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে এক দেখেন—তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী॥ ৫

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের ফল একই

গীতার মতে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। সন্ন্যাসের দ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, কর্ম্মযোগের দ্বারাও সেই ফলই লাভ করা যায়। সুতরাং, যাঁরা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ—তাঁরা কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাসকে এক বলেই মনে করেন। কারণ, উভয়েরই ফল মোক্ষপ্রদ ; সুতরাং, এক ও অভিন্ন। মানব জীবনের চরম লক্ষ্যরূপী মোক্ষ-বস্তুটি যখন উক্ত উভয় প্রকার সাধনার সাহায্যে লাভ করা সম্ভবপর তখন তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আদর্শ সন্ন্যাসী তাই কখনও কর্ম্মযোগকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন না। পরন্তু, দুঃখের বিষয়—আজও নিবৃত্তিপন্থী এমন বহু জ্ঞানবাদী সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা কর্ম্মযোগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পর্য্যায়ের সাধনা বলে গণ্য করেন। গীতা এই মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী।

এ বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়ে শ্রীভগবান্ বলছেন—

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬

অন্বয়—মহাবাহো অযোগতঃ সন্ন্যাসঃ তু দুঃখম্ আপ্তুং ; যোগযুক্তঃ মুনিঃ ন চিরেণ ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি॥

অনুবাদ—হে মহাবাহো, কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস কেবল দুঃখের কারণ হয়। পক্ষান্তরে, কর্ম্মযোগযুক্ত সাধক অচিরেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন॥ ৬

কর্ম্মযোগের আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্মসন্ন্যাস ব্যর্থ ও দুঃখপ্রদ

সত্যকার সন্ন্যাসের পথ ক্লেশসাধ্য। আবেশের বশে মুহূর্ত্তের সংকল্পে সংসারাশ্রমের যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করাও অযৌক্তিক। এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন—যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে রাজবৈভব ভোগ করে বিষয়সেবার পরিণাম কি—তা অনুভব করে বিষয়বিমুখ হয়েছে সেই প্রকৃত সন্ন্যাসের অধিকারী। অর্থাৎ, প্রাক্তন সংস্কার বিশেষ অনুকূল ও প্রবল থাকলে মানুষ প্রথম যৌবনে সংসারশ্রম পরিহার করে ত্যাগব্রত গ্রহণ করতে পারে। নচেৎ যারা মর্কট-বৈরাগী তাদের দুঃখ কষ্টের অন্ত থাকে না। বর্ত্তমান ভারতে এক শ্রেণীর তথাকথিত ভেকধারী বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের অবস্থা লক্ষ্য করলে এই বিষয়ের সত্যতা সহজেই অনুমান করা যায়।

বস্তুতঃ, কর্ম্মযোগের আশ্রয় নিয়ে নিষ্কামভাবে ও নিষ্ঠা সহকারে গুরুসেবা ও গুরুর আদেশ-নির্দ্দেশ পালন না করলে সন্ন্যাসপন্থী সাধকগণেরও চিত্ত শুদ্ধ ও মালিন্যবর্জ্জিত হয় না। এজন্যই এখানে সুস্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে—কর্ম্মযোগযুক্ত সাধকই অচিরে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন।

সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দ স্বীয় ত্যাগী পার্ষদগণকে সন্ন্যাসের সত্যকার আদর্শ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে মন্তব্য করেছেন—"সন্ন্যাসীর জীবনের নূতন আদর্শ দেশকে দেখাইতে হইলে তোমাদের ন্যায় এরূপ কতক সন্ন্যাসীকে

জীবজগতের মহাকল্যাণ ও মহামুক্তি বিধানার্থে শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া দেহের বিন্দু বিন্দু পবিত্র শোণিত দেশের এই মহামলিনতা বিমোচনার্থে ব্যয় করিতে হইবে। ঘোর তমসাচ্ছন্ন সন্ন্যাসী সমাজের কলঙ্ক-কালিমা দূর করিতে হইলে তাহাদের প্রাণে যথেষ্ট কর্ম্মশক্তি জাগাইয়া দিতে হইবে।" আবার বলেছেন—**"এই দেশ সাধু-সমাজের মুখপানে প্রকৃত শক্তি ও শান্তিলাভের জন্য তাকাইয়া আছে। সুতরাং, অচিরে অবিলম্বে সন্ন্যাসিগণকে আপনাদের পরম পবিত্র ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ লইয়া জাতির পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইতে হইবে।"**

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭

অন্বয়—যোগযুক্তঃ বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে॥ ৭

অনুবাদ—যিনি কর্ম্মযোগে যুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, সংযত ও জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বভূতের আত্মায় যার আত্মস্বরূপ, এরূপ সম্যগ্দর্শী ব্যক্তি কর্ম্ম করেও কর্ম্মে আবদ্ধ হন না॥ ৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯

অন্বয়—যুক্তঃ তত্ত্ববিৎ পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ কিঞ্চিৎ এব ন করোমি ইতি মন্যেত॥ ৮।৯

অনুবাদ—কর্ম্মযোগী তত্ত্বদর্শী পুরুষ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিঃশ্বাস-গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ প্রভৃতি কাজ করেও মনে করেন ইন্দ্রিয়গণই স্বীয় স্বীয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে। আমি কিছু করি না॥ ৮।৯

কর্ম্মযোগীর লক্ষণ

কর্ম্মযোগের সাধনায় যিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন তিনি কী রূপ স্থিতিতে অবস্থিত থাকেন, উপরোক্ত শ্লোক তিনটিতে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এরূপ ব্যক্তি জগতের সর্ব্ববিধ ব্যবহারিক কাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েও সদাসর্ব্বদা নির্লিপ্ত ও অনাসক্ত থাকেন। তাঁর ইন্দ্রিয়সকল নিরন্তর স্বীয় স্বীয় বিষয়ের সেবায় নিরত থাকলেও তার দ্বারা তাঁর হৃদয়-মনে কোনও বিকার উৎপন্ন হয় না। কেন না, তিনি জিতেন্দ্রিয় এবং রাগ-দ্বেষবর্জ্জিত। বস্তুতঃ, এরূপ উচ্চ-অবস্থায় অবস্থিত হয়ে কর্ম্মে ব্রতী হওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়াই গীতার প্রধানতম শিক্ষা। অর্থাৎ, সাধারণ লোক অজ্ঞান অবস্থায় আসক্তির বশে যে সমস্ত কাজ ক'রে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়, কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিহীন হয়ে অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত ভাবে সেই সমস্ত কাজ-কর্ম্ম কী ভাবে সম্পন্ন করা যায়—তাই গীতা-ধর্ম্মের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০

অন্বয়—যঃ ব্রহ্মণি আধায় সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি করোতি। সঃ অম্ভসা পদ্মপত্রমিব পাপেন ন লিপ্যতে॥ ১০

অনুবাদ—যিনি ব্রহ্মে সমুদয় কর্ম্ম স্থাপন পূর্ব্বক আসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে কর্ম্ম করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না, যেমন পদ্মপত্র জলসংস্পৃষ্ট হয়েও জল দ্বারা লিপ্ত হয় না॥ ১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ১১

অন্বয়—যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবল্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি॥ ১১

অনুবাদ—কর্ম্মযোগিগণ ফলকামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিহার করে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম্ম করে থাকেন।

ব্রহ্মে কর্ম্মস্থাপনা কীরূপ?

'ব্রহ্ম' বলতে সাধারণতঃ নিরাকার নির্গুণ, ব্রহ্মসত্তা বোঝায়। এরূপ ব্রহ্মে কর্ম্মস্থাপনপূর্ব্বক কর্ম্ম করার নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তা কী-রূপে সম্ভবপর তা-ই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। পদ্মপত্রে জল স্থাপন করলে সেই জল ঐ পত্রকে লিপ্ত করতে পারে কি? নিশ্চয় না। নির্গুণ ব্রহ্মে কর্ম্ম স্থাপন করলেও ঠিক তেমনিই সেই কর্ম্ম ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না। কারণ ইত্যাকার ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার বিকারের অতীত। তিনি নিজেও কর্ম্ম করেন না। কর্ম্ম করেন প্রকৃতি। প্রকৃতি স্বীয় প্রবৃত্তিবশে যাবতীয় ভাল-মন্দ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। নির্গুণ ব্রহ্ম এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও অসঙ্গ। সাধক যখন অহংবুদ্ধি ও ফলাসক্তি পরিহার করে নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করেন তখন তাঁর মন ও দেহেন্দ্রিয় কর্ম্মরত থাকলেও সেই কর্ম্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। নির্গুণ ব্রহ্মে কর্ম্মস্থাপনার স্বরূপ ও মহিমা ইহাই।

পক্ষান্তরে, 'ব্রহ্ম' বলতে সগুণ ব্রহ্মও বোঝায়। এই সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। তাঁতে কর্ম্মস্থাপন্ করলে কী রূপ পরিণাম হয়—তা এক্ষণে আলোচনা করা যায়। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—ঈশ্বর নির্গুণ ব্রহ্মের ন্যায় নিষ্ক্রিয় বা অকর্ত্তা নন। তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, ভর্ত্তা, সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরয়িতা ও ভোক্তা। তাঁতে কর্ম্মস্থাপন করলে কর্ম্মীর মনে স্বতঃই এই জ্ঞান উদিত হয় যে তার হৃদয়স্থিত শ্রীভগবান্ই যন্ত্রী এবং সে তাঁর হস্তের যন্ত্রমাত্র। হৃদ্দেশে অবস্থিত থেকে তিনি তার দেহ-মন-বুদ্ধির দ্বারা নিরন্তর তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ করছেন। সুতরাং, এখানে কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ও ফলাসক্তি না থাকায় তার বন্ধনের কোন প্রকার ভয় নাই।

পরে যথাস্থানে আমরা দেখবো, গীতা পুরুষোত্তম-তত্ত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই বিষয়টি পরিস্ফুট ক'রে স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন—হে সখে, তুমি যদি সংসারবন্ধন হতে চিরতরে বিমুক্ত হয়ে পরম শান্তি লাভ করতে চাও তবে তুমি তোমার কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ও ফলাসক্তি আমাতে অর্পণ করে কর্ম্মের সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও। জেনে রাখ—আমি কেবলমাত্র তোমার বাহ্য রথের সারথি নই; তোমার জীবন-রথেরও আমি পরিচালক।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২

অন্বয়—যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং শান্তিম্ আপ্নোতি অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে॥ ১২

অনুবাদ—নিষ্কাম কর্ম্মযোগিগণ কর্ম্মফল ত্যাগ করে পরম শান্তি লাভ করেন। বহির্মুখ সকাম ব্যক্তিগণ বাসনাবশতঃ কর্ম্মফলে আসক্ত হয়ে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়॥ ১২

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥ ১৩

অন্বয়—বশী দেহী মনসা সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য নবদ্বারে পুরে ন এব কুর্ব্বন্ ন এব কারয়ন্ সুখম্ আস্তে॥ ১৩

অনুবাদ—জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সমস্ত কর্ম্ম মনে মনে পরিহার করে নবদ্বারযুক্ত দেহে সুখে বাস করেন। তিনি নিজে কিছু করেন না, অন্যকেও কিছু করান না॥ ১৩

যুক্ত ও অযুক্ত কর্ম্মীর অন্তিম অবস্থা

কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি যাবতীয় বন্ধনের হেতু এবং তার ত্যাগেই পরম শান্তি। গীতা এই প্রসঙ্গটি নানা ভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার—গীতা ফলাসক্তি ত্যাগের উপর জোর দিলেও কদাপি কর্ম্মত্যাগের নির্দ্দেশ দেন নি। এখানে সুস্পষ্টরূপে বলা হচ্ছে—সাধক আত্মশুদ্ধির জন্য সর্ব্বদা কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি পরিহার করে কর্ম্মযোগে নিরত থাকবেন। এরূপ করলেই নবদ্বার-যুক্ত এই ভৌতিক শরীরে অবস্থিতি কালে সাধক শাশ্বতী শান্তির অধিকারী হবেন। পক্ষান্তরে, সকাম ভাব নিয়ে আসক্তির বশে কর্ম্ম করলে বন্ধনের আশঙ্কা থাকবেই। উপরোক্ত শ্লোকটিতে 'সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য'—বাক্যটির অর্থ হচ্ছে সাধক সর্ব্ব কর্ম্ম মনে মনে পরিহার করবেন, বাহ্যতঃ নয়। অর্থাৎ, তাঁর বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ যথাবৎ ক্রিয়াশীল থাকবে; ...

অন্বয়—প্রভুঃ লোকস্য কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি ন সৃজতি ; কর্ম্মফলসংযোগং ন ; তু স্বভাবঃ প্রবর্ত্ততে॥ ১৪

অনুবাদ—প্রভু (আত্মা) লোকের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, কর্ম্ম সৃষ্টি করেন না এবং কর্ম্মফলও সৃষ্টি করেন না। স্বভাব বা প্রকৃতিই সমস্ত করেন॥ ১৪

গীতায় সাংখ্যের প্রভাব

গীতার এই পঞ্চম অধ্যায়টি কাপিল সাংখ্যের মতবাদে অনেকখানিই প্রভাবিত। গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য যে পুরুষোত্তমতত্ত্ব তার বর্ণনা এখানে তেমন নাই। এই প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক, সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শনগুলির উপর সাংখ্যের প্রভাব অসামান্য। গীতাদি বেদান্ত-শাস্ত্র সাংখ্যমতকে পূর্ণতঃ স্বীকার করেন নি বটে ; তবে গীতা স্বীয় ধর্ম্মমতের প্রতিপাদনের জন্য স্থানে স্থানে সাংখ্যমতকে গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করেন নি।

উপরোক্ত শ্লোকটিতে হুবহু সাংখ্যের মত অনুসরণ ক'রে বলা হয়েছে —প্রভু বা আত্মা নিষ্ক্রিয় বা অকর্ত্তা। তিনি যেমন নিজে কোন কিছু করেন না ও কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না, তেমনি অন্যের দ্বারাও কিছু করান না। অর্থাৎ, জগচ্চক্রের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রকৃতিরই সর্ব্বময় কর্তৃত্ব। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যরূপী ফলের ভোক্তাও তাই তিনি।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রকৃতি জড়া অথচ ক্রিয়াশীলা এবং পুরুষ চেতন অথচ নিষ্ক্রিয়। প্রশ্ন হতে পারে—প্রকৃতি যখন জড়া তখন তার পক্ষে এরূপ বুদ্ধিমত্তা ও নিপুণতার সহিত সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কার্য্যের সঞ্চালন কী রূপে সম্ভবপর? উত্তরে সাংখ্যকার কপিল বলেন—প্রকৃতি জড়া হলেও চেতন পুরুষের সহিত তার যখন সংযোগ ঘটে তখন তার প্রতিক্রিয়ায় তাদের উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক গুণ-ধর্ম্মের সঞ্চার ঘটে এবং তার পরিণামে প্রকৃতি সচেতন ও কর্ম্মপরায়ণা হয়ে ওঠে এবং পুরুষ অজ্ঞান ও মোহগ্রস্ত হয়ে প্রকৃতির যাবতীয় ...

চেতন পুরুষের সংস্পর্শে আসার ফলে জড়া প্রকৃতি সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠায় তার পক্ষে সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কার্য্য সম্পাদন সহজসাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, ইহাই আবার পুরুষের পতনের কারণ ঘটায়। কেন না স্বীয় শান্ত, নির্ব্বিকার, আনন্দময় স্বভাব হারিয়ে পুরুষ তখন অশান্ত, চঞ্চল ও সুখ-দুঃখের অধীন হয়ে পড়েন। মুক্ত শিব তখন বদ্ধ হয়ে প্রকট হন জীবরূপে।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫

অন্বয়—বিভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতং চ এব ন আদত্তে, অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতং তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি॥ ১৫

অনুবাদ—বিভু বা সর্ব্বব্যাপী আত্মা কারও পাপ-পুণ্য গ্রহণ করেন না। জীব অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে বলেই মোহ প্রাপ্ত হয়॥ ১৫

আত্মা ও জীবের ভেদ

মানুষের মধ্যে আত্মত্ব ও জীবত্ব—দুই-ই বিদ্যমান। জ্ঞানমার্গের সাধনার দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হয়ে দেহী যখন নিজকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা বলে ধারণা করতে পারেন তখন তিনি সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের অতীত হন। এই অবস্থায় দেহমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলের দ্বারা তিনি আর প্রভাবিত হন না। তিনি তখন স্বীয় শান্ত দান্ত নির্ব্বিকার স্বরূপে অবস্থান করেন। পক্ষান্তরে, দেহী যখন অজ্ঞানবশে নিজেকে দেহোপাধিবিশিষ্ট জীব জ্ঞান ক'রে বাসনার বশে নানাবিধ শুভাশুভ ও ভালমন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন তখন সেই কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তির ফলে তিনি সুখ-দুঃখ ও পাপ-পুণ্যের ফলভোগী হন। এরূপ বদ্ধাবস্থায় জীবের পরম কর্ত্তব্য—সদ্গুরুর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর আদেশ-নির্দ্দেশ অনুসরণ করে ধীরে ধীরে এই জীবত্বের সংস্কার হতে পরিমুক্ত হয়ে পুনরায় স্বীয় শান্ত শিব স্বরূপে প্রত্যাগত হওয়া। এজন্য প্রয়োজন—আত্মবিস্মৃতির সেই মহাঘোর হতে বিমুক্ত হয়ে জীবের আত্মবোধ ও আত্মস্মৃতির মহাভাবে উন্নীত ও চির জাগ্রত থাকা।

এরূপ আত্মবিস্মৃত সাধক সন্তানের প্রাণে আত্মস্মৃতির চেতনা ও প্রেরণা

জাগ্রত করার জন্য নবযুগের আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ তাকে বজ্রদৃঢ় সংকল্প গ্রহণের নির্দ্দেশ দিয়ে বলেছেন—**"এতকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যে মোহে আমি নিমজ্জিত ছিলাম, সেই মোহ, সেই স্মৃতি, সেই জঘন্য ভাব আমার ধ্বংস হোক। যে-বুদ্ধি আমাকে নানা বাসনাজালে বিজড়িত করিত আমার সেই বুদ্ধি আজ বিনষ্ট হোক।"**

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্॥ ১৬

অন্বয়—যেষাং তু তৎ অজ্ঞানং আত্মনঃ জ্ঞানেন নাশিতং তেষাং তৎ জ্ঞানম্ আদিত্যবৎ পরং প্রকাশয়তি॥ ১৬

অনুবাদ—কিন্তু যাদের আত্মবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা সে অজ্ঞান বিনষ্ট হয় তাদের সেই আত্মজ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়॥ ১৬

আত্মবিবেকই জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশক

মধ্য গগনে প্রভাদীপ্ত সূর্য্যদেব দেদীপ্যমান। পরন্তু ঘনঘোর কৃষ্ণ মেঘের দ্বারা সেই তপনদেব আবৃত হওয়ায় চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্র অন্ধকার পরিব্যাপ্ত। অকস্মাৎ পবনবেগে সেই পুঞ্জীভূত মেঘরাশি অপসৃত হওয়ায় সূর্যদেব প্রকাশিত হলেন এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই ধূসর অন্ধকার কোথায় মিলিয়ে গেল। সাধকের হৃদয়কন্দরস্থ জ্ঞানসূর্য্য সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। তাঁর অন্তরাকাশে ভাস্বর দ্যুতিময় জ্ঞানসূর্য্য চিরপ্রদীপ্ত। দেহাধ্যাসরূপী মোহ ও অজ্ঞানের দ্বারা যুগ যুগ ধ'রে তা আবৃত ও আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। সদ্গুরু-প্রদর্শিত পথে আত্মবোধ ও আত্মস্মৃতির অনুশীলন করলে সেই জ্ঞানসূর্য্য পুনরায় তার প্রখর জ্যোতিঃ নিয়ে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেন।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭

অন্বয়—তদ্বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি॥ ১৭

অনুবাদ—যাঁদের বুদ্ধি পরমাত্মায় নিবিষ্ট, তাতেই যাঁদের আত্মভাব এবং

তাতেই যাঁদের নিষ্ঠা, তিনি যাঁদের পরম গতি ও অনুরাগের পাত্র—তাঁদের আর পুনরায় দেহধারণ করতে হয় না। ১৭

আত্মজ্ঞানই পুনর্জ্জন্মের নিবারক

সাধারণ অজ্ঞান মানুষের বিষয়ভোগেই পরমানন্দ। এজন্য অজ্ঞান ব্যক্তিরা মোক্ষ বা মুক্তির ধার ধারে না এবং এই গতাগতির ভয়েও তারা ভীত সন্ত্রস্ত নয়। বরং মৃত্যুর পরে পুনরায় দেহ ধারণের সুযোগ লাভের জন্যই তারা লালায়িত হয়। তবে এইরূপ ঘোর মোহাসক্তি ও অজ্ঞানাবস্থা মানুষের চিরকাল থাকে না। কেন না, তার যে প্রকৃত স্বরূপ তাতে মোহ বা অজ্ঞানের লেশমাত্র স্থান নাই। তার সেই স্বরূপ হচ্ছে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। অভিজ্ঞতার কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে আজ হোক আর কাল হোক, এজন্মে হোক অথবা পরজন্মে হোক, একদিন না একদিন বিষয়ভোগের চরম পরিণাম যে ঐকান্তিক দুঃখপ্রদ, সেই জ্ঞান তাঁর হৃদয়ে উদিত হবেই এবং বিবেকোদয়ের সেই শুভমুহূর্তে তাঁর বুদ্ধি ক্রমশঃ আত্মস্থ, আত্মনিষ্ঠ, আত্মাশ্রয়ী ও আত্মানন্দী হয়ে উঠবে। আর এই অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর দেহ-বুদ্ধি চিরতরে দূরীভূত হওয়ার ফলে তিনি মহামুক্তির অধিকারী হবেন। দেহ-ধারণের আর কোন সম্ভাবনাই তখন তাঁর থাকবে না।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।। ১৮

অন্বয়—পণ্ডিতাঃ বিদ্যাবিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি, শুনি শ্বপাকে চ সমদর্শিনঃ। ১৮

অনুবাদ—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গো, হস্তী, কুকুর—সকলের মধ্যে সেই একই আত্মা বিরাজিত, এই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ সমদর্শী হন।। ১৮

সমদর্শিতাই জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ

বাহ্য ও স্থূল দৃষ্টিতে এই জগতে ভেদ ও বৈষম্যের অন্ত নাই। এখানে এমন দুটি বস্তু বা ব্যক্তি নাই—যাদের রূপ, গুণ, আকৃতি-প্রকৃতি ঠিক সদৃশ

বা তুল্যরূপ। এদের মধ্যে কিছু না কিছু ভেদ-বৈষম্য বা বৈচিত্র্য থাকবেই। এই ভিন্নতা বা বৈচিত্র্যই জগতের মূলনীতি। ভগবান্ একই ছিলেন ; তাঁর মধ্যে জাগ্রত হল—সিসৃক্ষা বা সৃজনেচ্ছা। তখন তিনি সঙ্কল্পপূর্ব্বক নিজেই প্রকট হলেন বহুরূপে। একই বস্তুর মধ্য হতে এইরূপে বহুত্ব বা বৈচিত্র্যের হল প্রকাশ-বিকাশ। কিন্তু তখন তাদের পরস্পরের রূপ-গুণ-প্রকৃতি-আকৃতির মধ্যে কোন প্রকার সাদৃশ্য রইল না। এ এক বিচিত্র ব্যাপার! এরূপ কেন হল—তার উত্তরে বলা হয়েছে—ইহা সেই মায়াবী ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তির অপূর্ব্ব লীলাখেলা। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনন্ত ইচ্ছাময়। তাই তাঁতে অসম্ভব বলে কিছু নাই। গীতাদি বেদান্ত-গ্রন্থ বলেন—এই যে নানাত্ব-দর্শন, এর মূলে রয়েছে জীবের অজ্ঞানতা। স্বপ্নে মানুষ বহু বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী ঘটনা বা দৃশ্য লক্ষ্য ক'রে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও প্রসন্ন হয়, আবার কখনও ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু স্বপ্ন যখন ভেঙ্গে যায় তখন সে উপলব্ধি করে—যা কিছু এতক্ষণ ঘুমের ঘোরে দেখেছি তার কোন বাস্তব সত্তা নাই। এ সব মনের ভ্রান্তি বা অলীক কল্পনাজাল মাত্র। নিদ্রাবস্থায় যখন মনের উপর কোন বশ্যতা ছিল না, তখন তার মনে এসব উদ্ভট চিন্তা ও কল্পনার উদ্ভব হয়েছে—জাগ্রত বা জ্ঞানের অবস্থায় থাকলে এরূপটা কখনও সম্ভবপর হত না। বেদান্ত বলেছেন—মানুষের যতদিন অজ্ঞানের অবস্থা, ততদিন তার এই বহুত্ব ও নানাত্ব-দর্শন। সত্যকার জ্ঞান যখন হবে, তখন এই ভেদদর্শন চিরতরে মিটে যাবে এবং তখন স্পষ্ট উপলব্ধি হবে—এই ভেদ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহান্ ঐক্য ও সাম্য বিদ্যমান।

একই পিতামাতার ঔরসজাত পুত্রকন্যাগণ ততদিন বিরোধ-বিসম্বাদে রত থাকে যতদিন তারা অজ্ঞান থাকে। যখন তারা ঠিক ঠিক বুঝতে পারে যে তাদের সকলের দেহে একই জনক-জননীর শোণিতধারা বিদ্যমান এবং তাঁদের আদর-যত্নে তারা সকলে সমভাবে প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত তখন তারা বিরোধ-বিসম্বাদ পরিহার ক'রে পরস্পরের মধ্যে একত্ব বা সমত্বের ভাব অনুভব ক'রে শান্তি লাভ করে। এক্ষেত্রেও অনেকটা সেই কথা। উচ্চতম সমাধির স্থিতিতে সাধক যখন উন্নীত হন তখন তিনি সর্ব্বত্র ও সব কিছুতে কেবলমাত্র ব্রহ্ম বা আত্মাকে দর্শন করেন। সেই অবস্থায় তাঁর জ্ঞানদৃষ্টিতে আর অন্য কোন কিছু ভেদ-বৈষম্য প্রতিভাত হয় না।

পক্ষান্তরে, যখন তাঁর মন সেই উচ্চতম ব্রাহ্মীস্থিতি হতে নিম্নে অবতরণ করে তখন তাঁর দৃষ্টিতে ভেদ ও অভেদ দুইয়েরই দর্শন হয়। তখন তিনি ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হস্তী, গো প্রভৃতিকে পৃথক্ পৃথক্ জীবরূপেও দেখেন, আবার এদের সকলের অন্তরের অন্তঃস্থলে যে একই আত্মা বিদ্যমান, তাও দর্শন করেন। আর এরূপ অনুভূতির ফলে তাঁরা এদের কাউকে অধিক আদর এবং কাউকে অনাদর করেন না। বরং তাদের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে পরম সহানুভূতি বশে তাদের সেবা-যত্নে অগ্রসর হন। ব্রাহ্মণের মধ্যে তিনি অবশ্য চণ্ডালের চেয়ে অনেক অধিক গুণ ও মহত্ত্ব দর্শন করেন। কিন্তু এই যে ভেদ বা গুণ ও মহত্ত্বের ভিন্নতা তাকে তিনি তাদের আত্মবিকাশের বিবিধ স্তরের সাময়িক তারতম্য বলে মনে করেন। উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা দিতে পারলে সেই অজ্ঞান মূর্খ চণ্ডালও ধীরে ধীরে ক্রমশঃ একদিন না একদিন ব্রাহ্মণের অনুরূপ সদ্গুণ ও সদ্ভাবের অধিকারী হতে পারবে —এই বিষয়টি তখন তিনি এমন জ্বলন্ত ভাবে অনুভব করেন যে তিনি সেই চণ্ডালকে উচ্চতর জ্ঞান ও শক্তি দানের জন্য আকুল-ব্যাকুল ও উদ্যোগী হয়ে উঠেন। জীবন্মুক্ত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা তাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দয়ালু ও লোকসংগ্রহমূলক কর্ম্মে সবচেয়ে অধিক উৎসাহী। জীবোদ্ধারের জন্য তাই তাঁরা দিবারাত্র পরিশ্রম করেন। এমন কি এজন্য হাসিমুখে মৃত্যুপর্য্যন্ত বরণ করতেও তাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, সক্রেটিস, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, প্রণবানন্দ প্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবনে এই সত্য বার বার পরীক্ষিত হয়েছে। এঁরা পতিত জীবকুলের উদ্ধারের জন্য কত অসাধ্য সাধন, কত দুঃখ ক্লেশই না বরণ করেছেন!

বিকৃত ব্যাখ্যা

গীতার এই শ্লোকটি আবার একশ্রেণীর রক্ষণশীল গোঁড়া পণ্ডিত ও আচার্য্যের দ্বারা বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে। তাঁরা বলেন—গীতা তত্ত্বের দিক দিয়ে (তত্ত্বতঃ) ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের মধ্যে সমত্ব দর্শনের আদেশ উপদেশ করেছেন। পরন্তু, চণ্ডালের সহিত সমবর্ত্তন বা সমব্যবহারের নির্দ্দেশ দেন নি। সুতরাং, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ কখনও অনাচারী চণ্ডাল বা

অন্ত্যজগণকে স্পর্শ করবেন না ; এরূপ করলে তাঁদের পতন অবশ্যম্ভাবী। নিজেদের পবিত্রতা ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁরা এদের সংস্পর্শ সর্ব্বদা এড়িয়ে চলবেন।

বলা বাহুল্য, এরূপ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও বিচারের ফলেই হিন্দুসমাজে পরবর্ত্তী কালে মানুষে মানুষে এরূপ জঘন্য ভেদভাব প্রশ্রয় পেয়েছে। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে রচিত হয়েছে এতখানি আকাশ-পাতাল ব্যবধান—যার ফলে কোটি কোটি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু স্বধর্ম্ম পরিহার ক'রে দলে দলে অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদের সুনিশ্চিত কারণও ইহাই। বস্তুতঃ, স্বামী বিবেকানন্দও এই জন্যই সখেদে মন্তব্য করেছেন—"হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব কিছু আজ ঢুকেছে হেঁসেল ঘরে। 'ছুয়ো না ছুয়ো না' হয়েছে আজ হিন্দুর জপমন্ত্র"। নবযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও সমন্বয়াচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীও বলেছেন—"অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তা ব'লে কোন বিধান সত্যকার হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রে নাই। পরবর্ত্তী যুগের এক শ্রেণীর স্বার্থান্ধ ধর্ম্মগুরু ও সমাজপতিগণ তাদের কু-অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য হিন্দুশাস্ত্রের এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুতঃ মানুষের নিকট কোন মানুষ অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় হতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মকে বাঁচাতে হলে অবিলম্বে তার মধ্য হতে এই জঘন্য কুসংস্কার ও ঘৃণিত ভেদ-বুদ্ধিকে দূর করতে হবে।"

উপরোক্ত যুগাচার্য্যদ্বয়ের সমাজসংস্কারমূলক এই ইঙ্গিতগুলি বিশেষ মনন ও অনুসরণযোগ্য।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯

অন্বয়—যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতম্, ইহ এব তৈঃ সর্গঃ জিতঃ ; হি ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষং চ তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি এব স্থিতাঃ॥ ১৯

অনুবাদ—যাঁদের মন সাম্যে স্থিত তাঁরা ইহলোকেই সংসারকে জয় করেন। ব্রহ্ম সম ও নির্দ্দোষ ; এজন্য সমদর্শিগণ সেই ব্রহ্মেই অবস্থিত থাকেন॥ ১৯

সমদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি জীবন্মুক্তির অধিকারী হন

কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতে ইহলোকে বা ভৌতিক দেহে আবদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত কেহ মোক্ষ বা মুক্তির অধিকারী হয় না। সনাতন ধর্ম্ম যে এই মতের সমর্থন করেন না, তা গীতার উপরোক্ত শ্লোকেই সপ্রমাণ হয়। "Man is a born sinner"—মানুষ জন্ম হতেই পাপী। ইহজীবনে সে কখনও সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত হতে পারে না। এইরূপ মতবাদ যে সব ধর্ম্ম প্রচার করে গীতাপ্রচারিত ভাগবত ধর্ম্ম তার জ্বলন্ত প্রতিবাদস্বরূপ। গীতা বলেন —সমদর্শী সাধক ইহজীবনেই সংসারকে বা জন্ম-মরণরূপী গতিপ্রবাহকে জয় করতে সমর্থ। অর্থাৎ, মনুষ্য-জীবনের যে চরম সিদ্ধি তা ইহজীবনেই সাধ্য ; মৃত্যুর পরেই মাত্র সেই পরমপদ লাভ করতে হবে এমন কথা নয়। তবে সনাতন ধর্ম্মে জীবন্মুক্তির যেমন স্থান আছে, তেমনই রয়েছে বিদেহ ও ক্রমমুক্তির স্থান। অর্থাৎ, সাধক পুরুষার্থ এবং গুরু-কৃপাবলে দেহত্যাগের পূর্ব্বেই জীবন্মুক্তির চরম অবস্থা লাভ করে ধন্য হতে পারেন, অথবা মৃত্যুর পরেও তিনি সেই অবস্থা লাভ করতে সক্ষম হন। ব্রহ্ম সম ও নির্দ্দোষ। সমদর্শিতা ও পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করলে জ্ঞানী সাধক যে এই জন্মেই মুক্তিলাভ করবেন—তাতে আশ্চর্য্য কি?

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০

অন্বয়—ব্রহ্মণি স্থিতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ ব্রহ্মবিৎ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ॥ ২০

অনুবাদ—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, মোহবর্জ্জিত ও ব্রাহ্মীস্থিতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রিয়বস্তু লাভে অত্যধিক প্রসন্ন এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে আদৌ উদ্বিগ্ন হন না॥ ২০

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মানসিক স্থিতি

নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা ও ব্রহ্মবিচারণার দ্বারা সাধক যখন ব্রাহ্মীস্থিতিতে বা আত্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁর মানসিক অবস্থা কীরূপ হয় এক্ষণে তারই বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি সাধনার দ্বারা মালিন্যবর্জ্জিত

হওয়ার ফলে চিরতরে স্থির ও বিশুদ্ধ স্বরূপ ধারণ করে। এই কারণে তাঁর মনে আর অজ্ঞান বা মোহাসক্তির লেশমাত্র বিদ্যমান থাকে না। তিনি ব্রহ্মানন্দে বিভোর থেকে সুখ-দুঃখের অতীত, দ্বন্দ্বাতীত স্থিতি লাভ করেন। এইরূপ ব্যক্তির মন জাগতিক ভাল-মন্দ কোন কিছুতেই বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১

অন্বয়—বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা আত্মনি যৎ সুখং বিন্দতি, সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে॥ ২১

অনুবাদ—বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত ও ব্রহ্মভাবে সমাহিত ব্যক্তি আত্মাতে আনন্দ লাভ করেন। এই অবস্থায় তিনি অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করেন॥ ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২

অন্বয়—কৌন্তেয়! সংস্পর্শজাঃ হি যে ভোগাঃ তে দুঃখযোনয়ঃ এব, আদ্যন্তবন্তঃ তেষু বুধঃ ন রমতে॥ ২২

অনুবাদ—বিষয়ভোগজনিত যে সুখ তা দুঃখেরই কারণ এবং তা আদি ও অন্তবিশিষ্ট। জ্ঞানী ব্যক্তি তাতে প্রমত্ত হন না॥ ২২

জ্ঞানী ক্ষণিক বিষয়ানন্দে প্রমত্ত না হয়ে অক্ষয় আনন্দে রত হন

বিষয়াসক্ত ভোগী ও ব্রহ্মানন্দে সমাহিত ব্যক্তির অনুভূতির তারতম্য কি—তাই বর্ণনা করে শ্রীভগবান্ এক্ষণে বলছেন—পাঞ্চভৌতিক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের যেমন আদি আছে, তেমনি অন্তও আছে। সুতরাং, তাদের সংস্পর্শে যে সুখ লাভ হয়, তাও যে ক্ষণিক ও অস্থায়ী হবে—তাতে সন্দেহ কি? আর শুধু কি তাই? সেই ক্ষণিক বিষয়ভোগের যে প্রতিক্রিয়া তা দীর্ঘস্থায়ী ও অশেষ দুঃখপ্রদ। এজন্য আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন—

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ।
পশ্চাদন্তে শরীরে রোগঃ॥

অর্থাৎ, সুখলাভের আশায় মানুষ স্ত্রীসঙ্গ করে এবং তার ফলে ভীষণ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করে। কেবলমাত্র স্ত্রী-সম্ভোগ নয়, জগতের যাবতীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের উপভোগেরও পরিণাম ইহাই। এতৎসত্ত্বেও মানুষের বিষয়মোহ কি দুর্ব্বার! পক্ষান্তরে, যে সব ভাগ্যবান্ সাধক অভিজ্ঞতার কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে বিষয়বিতৃষ্ণ হয়ে আত্মজ্ঞান লাভে তৎপর হন এবং সেই সাধননিষ্ঠাতেই নিমগ্ন থাকেন তাঁদের সুখের অন্ত নাই।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩

অন্বয়—যঃ শরীর বিমোক্ষণাৎ প্রাক্ কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্ ইহ এব সোঢ়ুং শক্নোতি সঃ যুক্তঃ সঃ সুখী নরঃ॥ ২৩

অনুবাদ—যে ব্যক্তি দেহত্যাগের পূর্ব্বে এই সংসারে থেকেই কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করতে পারেন তিনি যোগী, তিনিই সুখী॥ ২৩

কাম-ক্রোধের বেগধারণে সমর্থ ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী ও মুক্ত

কাম-ক্রোধের প্রতিক্রিয়াই চিত্তচাঞ্চল্যের মুখ্য কারণ। কাম-ক্রোধকে জয় করাই তাই সাধনজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। ব্রহ্মচর্য্যঘনবিগ্রহ আচার্য্য প্রণবানন্দের মতে—**রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়সংযমই ধর্ম-জীবনের মূল ভিত্তি।** যার মন সদা সর্ব্বদা রিপু-ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় তাড়িত, তার ধর্ম-তত্ত্বোপলব্ধির চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

জগতের সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণ এজন্যই ইন্দ্রিজয়ের উপর এতটা গুরুত্ব দান করেছেন। তবে এ বিষয়ে কেউ কেউ বলেন—শরীর যতদিন আছে ততদিন কাম-ক্রোধের প্রভাব অল্প বিস্তর থাকবেই। গীতা কিন্তু বলেন—দেহত্যাগের পূর্ব্বেই কাম-ক্রোধের বেগকে সম্পূর্ণরূপে জয় করতে হবে। তা না হলে সেই পরম ও নিত্য সুখের অধিকারী হওয়া যাবে না।

অর্থাৎ, মোক্ষার্থী ব্যক্তিকে ইহজীবনেই পরিপূর্ণ জিতেন্দ্রিয়ত্বের অবস্থা আয়ত্ত করতে হবে। হয়তো কোন বিশেষ কারণে সাধকের মনে কাম-ক্রোধের ভাব বা তরঙ্গ সাময়িক ভাবে জাগ্রত হতে পারে; কিন্তু তাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে তার সেই প্রতিক্রিয়াকে নিঃশেষে বন্ধ করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হতে হবে। এ জন্য প্রথম প্রয়োজন—প্রবর্ত্তক অবস্থায় বিবেক ও বিচার সহকারে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যকর বিষয়বস্তু হতে দূরে অবস্থান করা। তারপর ক্রমশঃ যখন মনের ধারণা বা সহ্যশক্তি বর্দ্ধিত হয়ে ওঠে তখন প্রয়োজনমত কিছু কিছু বিষয়সংস্পর্শে আসা। তবে ঐ সময়ে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন—যাতে ইত্যাকার সাময়িক বিষয়সংস্পর্শ মানসিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না করতে পারে। চিত্তসংযমের সর্ব্বপ্রকার প্রয়াস সত্ত্বেও মানসিক চঞ্চলতা যদি দূরীভূত না হয় তবে প্রয়োজন—জপ, ধ্যান ও আন্তরিক প্রার্থনা দ্বারা সেই মানসিক উদ্বেগকে শান্ত ও সংযত করা এবং ভবিষ্যতে যাতে মনে এরূপ প্রতিক্রিয়া আর না সৃষ্ট হয় তার জন্য আরও সাবধান সতর্ক হওয়া। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করতে থাকলে ক্রমশঃ মনের স্বচ্ছতা ও ধারণাশক্তি এরূপ প্রবল হয়ে উঠবে যে তখন কাম-ক্রোধের বেগকে সহ্য করার শক্তি সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং তার ফলে শুধু জাগ্রত অবস্থায় নয়, নিদ্রিত অবস্থাতেও আর কোন প্রকার মানসিক চাঞ্চল্য মনোবুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারবে না। জিতেন্দ্রিয়ত্বের এই সু-উচ্চ অবস্থায় সাধকের দেহ-মনে যে অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দ অনুভূত হয় তার অন্ত ও অবধি থাকে না। তখন শত প্রকার ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে অবস্থিত থাকলেও তার প্রশান্তির অভাব ঘটে না। মানব জীবনের এই সুদুর্লভ অবস্থা কতই না তৃপ্তি, শান্তি, আশ্বাস ও আনন্দপ্রদ। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা জানা প্রয়োজন—'গুরুকৃপা' ব্যতীত কেবলমাত্র 'আত্মকৃপা' বা আত্মচেষ্টার দ্বারা এই পরম বাঞ্ছিত সু-উচ্চ অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর নয়। গুরুগীতায় তাই বলা হয়েছে—"মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।"

সাধকের মন কীরূপ অবস্থায় উন্নীত হলে তার পক্ষে কাম-ক্রোধাদি রিপুর কবল হতে চিরবিমুক্ত হয়ে অপার শান্তিময় স্থিতিলাভ সম্ভবপর হয়—নিম্ন শ্লোকটিতে তারই বর্ণনা দিয়ে গীতাকার বললেন—

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি॥ ২৪

অন্বয়—যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরারামঃ, তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ এব, সঃ যোগী ব্রহ্মভূতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ অধিগচ্ছতি॥ ২৪

অনুবাদ—যাঁর আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই আরাম আত্মাতেই যাঁর আলোক বা প্রকাশ, সেই যোগী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন॥ ২৪

আত্মানন্দী ব্যক্তিই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন

মানুষের অন্তরস্থিত আত্মাই অপার সুখ শান্তি ও জ্যোতির আধার বা উৎস। বাহ্য জাগতিক বিষয়ানন্দ সেই অন্তর্নিহিত আত্মানন্দের ন্যূনতম ছায়ামাত্র। প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা সাধকের মধ্যে যখন বাহ্য বিষয়ানন্দ ও অন্তরস্থ আত্মানন্দের এই তারতম্য-বুদ্ধি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তখন তার মনে আর সেই ক্ষণিক বিষয়ানন্দের প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি বা অনুরাগ থাকে না। অমৃতের আস্বাদ লাভ করলে কি কেউ তুচ্ছ চিটা গুড়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়? এই বিষয়টির প্রতি আভাস দিয়ে উপনিষদের ঋষি অনুপম ভাষায় বলেছেন—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ (কঠঃ ২।১)

স্বয়ম্ভূ প্রজাপতি ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখী করে সৃষ্টি করেছেন ; তাই জীব সর্ব্বাগ্রে বহির্বিষয়-সমূহ দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে নয়। কোন কোন ধীর বিবেকী ব্যক্তি অমৃতত্বের অভিলাষী হয়ে ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক অন্তরাত্মাকে দর্শন করেন।

গীতামৃত—বলা বাহুল্য, বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখের প্রতি নিদারুণ নিরাসক্তি বা ঘৃণার ভাব জাগ্রত না হলে মানুষ অন্তর্মুখী হয়ে আত্মস্থ, আত্মারাম, আত্মক্রীড় হবার জন্য আকুল, ব্যাকুল হয় না। তবে ভাগ্যবশে যাঁরা এই

অন্তর্মুখীনত্বের অবস্থা লাভ করেন তাঁরা চিরতরে ব্রহ্মভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পরমানন্দের অধিকারী হন। তুচ্ছ বিষয়ানন্দের প্রতি তখন তাঁদের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ থাকে না। প্রশ্ন আসে—এই অবস্থায় জীবন্মুক্ত পুরুষ কি তবে বাহ্য কর্ম্ম পরিহার করে নিরন্তর সমাধিমগ্ন থাকেন? গীতার মতে ব্রহ্মনির্ব্বাণের অন্তিম পরিণাম যে ইহা নয়, পরবর্ত্তী শ্লোকটিতে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫

অন্বয়—ক্ষীণকল্মষাঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে॥ ২৫

অনুবাদ—যাঁরা নিষ্পাপ, সংশয়শূন্য, সংযতচিত্ত, পরহিতব্রতে নিরত, সেইরূপ ঋষিগণই ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন॥ ২৫

ব্রহ্মনির্ব্বাণেচ্ছু সাধকের অন্যতম লক্ষণ পরহিত-পরায়ণতা

ব্রহ্মনির্ব্বাণের বা ব্রাহ্মীস্থিতির তাঁরাই সত্যকার অধিকারী যাঁরা সাধনার দ্বারা নিষ্কলুষ, সংশয়শূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হয়েছেন—কেবল ইহাই নয়, যাঁরা প্রতিনিয়ত পরহিতব্রতে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁরাই ব্রহ্মনির্ব্বাণের অধিকার লাভ করেন। সুতরাং, 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' শব্দটির দ্বারা ব্রহ্মভাবে বিলীন হয়ে নিরন্তর সমাধিমগ্ন থাকার অবস্থা বোঝায় না। যাঁরা আত্মমুখী, আত্মারাম ও আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকে নিরন্তর বিশ্বহিতে নিরত থাকেন, গীতার মতে তাঁরাই সত্যকার জীবন্মুক্ত যোগী। পরবর্ত্তী শ্লোকটিতে এই অবস্থাটি আরও পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

অন্বয়—কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাং বিদিতাত্মনাং যতীনাম্ অভিতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে॥ ২৬

অনুবাদ—কামক্রোধবিমুক্ত, সংযতচিত্ত, আত্মদর্শী যতিগণের ব্রহ্মনির্বাণ নিকটে ও চারিদিকে বিদ্যমান।। ২৬

গীতামৃত—যাঁরা প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় ও আত্মজ্ঞানী গীতার মতে তাঁদের ব্রহ্মনির্ব্বাণের অবস্থা জাগ্রত ও অক্ষুণ্ন থাকে। অর্থাৎ, গুরুনির্দিষ্ট সাধনার সহায়তায় যাঁরা তাঁদের রিপু ও ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে আত্মতত্ত্বের অনুভূতি লাভ করেছেন, তাঁদের আর পতনের ভয় থাকে না। তাঁদের অহংবুদ্ধি চিরতরে পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় এবং তাঁরা যে পরিপূর্ণ ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন তাতে তাঁরা নিরন্তর অবস্থান করেন। তবে এই অবস্থাতেও তাঁদের লোকসংগ্রহমূলক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।। ২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।। ২৮

অন্বয়—বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিষ্কৃত্বা চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব নাসাভ্যন্তর-চারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ মোক্ষপরায়ণঃ যঃ মুনিঃ সঃ সদা মুক্তঃ এব।। ২৭-২৮

অনুবাদ—বাহ্য বিষয় সংস্পর্শ পরিহার করে, চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রূযুগলের মধ্যে আবদ্ধ করে যিনি ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে সংযত করেছেন এবং যিনি ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধবর্জ্জিত ও মোক্ষপরায়ণ তিনি সর্ব্বদা মুক্ত।। ২৭-২৮

মনোজয়ের উপায়রূপে পাতঞ্জল যোগাঙ্গের স্বীকৃতি

মনোজয় বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধের সহজ উপায় কি? এখানে তার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—তা, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত ধ্যানযোগের ভূমিকাস্বরূপ। বস্তুতঃ এজন্য প্রথম প্রয়োজন—প্রত্যাহারের সাহায্যে মনকে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যকর বিষয়সমূহ হতে দূরে সরিয়ে নেওয়া; দ্বিতীয়তঃ প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তাদের গতিকে নাসিকার অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখা; তৃতীয়তঃ বহির্মুখী দৃষ্টিকে ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থির ভাবে স্থাপিত রাখা। উপরোক্ত বাহ্যপ্রয়োগগুলি যুগপৎ

অনুশীলন করলে সাধকের মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় সহজে সংযত ও বশীভূত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, ইত্যাকার সাধনপদ্ধতি পাতঞ্জলবিহিত রাজযোগেরই অঙ্গবিশেষ। মনোজয়ের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ও উপযোগী মনে করে গীতা এই সাধনপ্রণালীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সাধককে তার অনুসরণের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। পরন্তু, এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক—গীতা মনোজয়ের সাধনপদ্ধতি হিসাবে উক্ত সাধনাঙ্গগুলি গ্রহণ করলেও পাতঞ্জল যোগ ও গীতাধর্ম্মের অন্তিম লক্ষ্য এক নয়। পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগের সমাধি হচ্ছে--এক নিশ্চল জ্যোতির্ম্ময় সত্তায় মন-বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিলয় সাধন। ঈদৃশ সমাধি লাভের পরে রাজযোগী সেই সমাধির সম্বিদানন্দে বিভোর হয়ে থাকেন; লোকসংগ্রহমূলক দায়িত্বভার গ্রহণের বিশেষ ইচ্ছা বা আগ্রহ তখন তাঁর থাকে না। গীতোক্ত সাধনার অন্তিম সিদ্ধি যে তা নয় এই অধ্যায়ের শেষোক্ত শ্লোকটির মর্ম্মার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।। ২৯

অন্বয়—যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিম্ ঋচ্ছতি।। ২৯

অনুবাদ—যোগসিদ্ধ মুক্তপুরুষ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যাসমূহের ভোক্তা, সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ও সর্ব্বলোকের সুহৃদ জ্ঞান করে পরম শান্তি লাভ করেন।। ২৯

গীতামৃত—পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বরবাদী হলেও ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা সেখানে গৌণ। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরবাদই যে গীতার মধ্যবিন্দু ও মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়—এই অধ্যায়ের এই অন্তিম শ্লোকটিতেই সেই তত্ত্বটী বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ—ধ্যানযোগঃ

এই অধ্যায়ে ধ্যানযোগের সাধনপ্রণালী সবিশেষ বর্ণিত হওয়ায় এই অধ্যায়টি 'ধ্যানযোগ' নামে অভিহিত। সাধারণতঃ 'যোগ' শব্দটির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে আসন প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার, সমাধি প্রভৃতি রাজযোগের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলির স্মৃতি জাগ্রত হয়। এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ও তা-ই। তবে সমগ্র গীতা-গ্রন্থে 'যোগ' শব্দটি যে কোথাও এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি—নানা প্রসঙ্গে তা আমরা উপলব্ধি করেছি। গীতার মতে 'যোগ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে—সংযোগ-সাধন অর্থাৎ, যে সাধন-প্রণালীর মাধ্যমে আত্মা ও পরমাত্মা অথবা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সংযোগ সাধিত হয়—তাই যোগ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে যে 'কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ' ব্যাখ্যাত হয়েছে তারই সঙ্গতি টেনে এই অধ্যায়ের প্রথমেই শ্রীভগবান্ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ ১

অন্বয়—যঃ কর্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ কার্য্যং কর্ম্ম করোতি সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ। ন নিরগ্নিঃ, ন চ অক্রিয়ঃ॥ ১

অনুবাদ—কর্ম্মফলের আশা না রেখে যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন তিনি সন্ন্যাসী, তিনি যোগী। যিনি অগ্নি স্পর্শ করেন না, যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেন না এবং যিনি কর্ম্মহীন থাকেন—তিনি নন॥ ১

গীতার মতে কর্ম্মফলত্যাগীই সন্ন্যাসী, কর্ম্মত্যাগী নয়

গীতার পূর্ব্ববর্তী যুগে 'সন্ন্যাস' বলতে সংসারত্যাগ বা কর্ম্মত্যাগ

বোঝাত। গীতা এই ধারণার বিরোধিতা করেন। এ বিষয়ে গীতার অভিমত কি—তাই উপরোক্ত শ্লোকটিতে সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। গীতাকার শ্রীভগবান্ তাই বলেছেন—যারা অগ্নি স্পর্শ করে না, যারা যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম্মে অংশ গ্রহণ করে না, অথবা যারা দেহেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত অন্যান্য শারীরিক কর্ম্ম পরিহার করে—তারা প্রকৃত সন্ন্যাসের অবস্থা লাভ করে না।

ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগই সন্ন্যাসের মূল কথা। ফলাসক্তি পরিহার করে কর্ত্তব্যবোধে করণীয় কাজগুলি অনুষ্ঠান করলেই সন্ন্যাসের পরম স্থিতি লাভ করা যায়। অর্থাৎ, গীতার মতে বাহ্য ত্যাগ ত্যাগ নয়, অন্তরের ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

অন্বয়—পাণ্ডব! যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ তং যোগং বিদ্ধি, অসংন্যস্তসংকল্পঃ হি কশ্চন যোগী ন ভবতি॥ ২

অনুবাদ—হে পাণ্ডব! যাকে সন্ন্যাস বলে—তাকেই যোগ জেনো। সংকল্প ত্যাগ করতে না পারলে কেহ যোগী হতে পারে না॥ ২

সংকল্পত্যাগ ব্যতীত যোগ হয় না

গীতার মতে সংকল্প বা কামনাত্যাগই হচ্ছে মূল কথা। অর্থাৎ, কর্ম্ম, জ্ঞান, সন্ন্যাস, ধ্যান, ভক্তি প্রভৃতি সকল প্রকার সাধনা তখনই সফল ও সার্থক হয় যখন সাধক ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করে তাদের অনুষ্ঠান করেন। পক্ষান্তরে, ফলের প্রতি আসক্তি থাকা পর্য্যন্ত উপরোক্ত কোন সাধনাই মোক্ষ বা শান্তিপ্রদ হয় না। বিভ্রান্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীভগবান্ বললেন —হে পাণ্ডুপুত্র, তুমি কর্ম্মত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসের পক্ষপাতী হয়েছ, কিন্তু তোমার ভাল ভাবে উপলব্ধি করা উচিত—কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাসে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কেন না, কর্ম্মযোগের সাধনাতেও যেমন ফলাসক্তির ত্যাগ একান্ত প্রয়োজন, সন্ন্যাসযোগের সাধনাতেও তদ্রূপ ফলাসক্তি বর্জ্জন একান্ত আবশ্যক ও অনিবার্য্য। কারণ, ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগ ব্যতীত কোন যোগই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং, আসক্তিশূন্য হয়ে যোগযুক্ত চিত্তে তুমি কর্ম্মব্রত গ্রহণ কর।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩

অন্বয়—যোগম্ আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে। তস্য যোগারূঢ়স্য শমঃ এব কারণম্ উচ্যতে॥ ৩

অনুবাদ—যোগসাধনায় আরোহণেচ্ছু মুনি বা সাধকের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মই কারণ বা অবলম্বন। যোগারূঢ় অবস্থায় চিত্তের সাম্য বা সমতাই সিদ্ধযোগীর পরম আশ্রয়।। ৩

গীতামৃত—অধ্যাত্মস্তরের যিনি প্রবর্ত্তক সাধক, তাঁর আত্মকল্যাণ ও আত্মোন্নতির প্রধান অবলম্বন হচ্ছে—নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগের সাধনার দ্বারা এক দিকে যেমন তার অন্তরের প্রসুপ্ত শক্তি ও চেতনা ক্রমশঃ জাগ্রত হয়ে তাকে তামসিকতামুক্ত করে, অন্যদিকে তেমনি তা তার চিত্তশুদ্ধির পরম সহায়ক হয়ে উঠে। এজন্যই এখানে বলা হয়েছে —যোগমার্গে আরোহণেচ্ছু সাধকের পক্ষে কর্ম্মযোগই প্রধান কারণ বা অবলম্বন। আর এরূপ সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে শুদ্ধচিত্ত হয়ে যিনি সাধনার সুউচ্চ স্থিতি লাভ করেন বা জীবন্মুক্ত অবস্থায় উন্নীত হন তাঁর প্রধান আশ্রয় বা অবলম্বন হয়—প্রজ্ঞানলব্ধ মানসিক প্রশান্তি। এই অবস্থায় শুভাশুভ, ভাল-মন্দ, জয়-পরাজয়, কোন কিছুই আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং, এই সময়ে সেই যোগারূঢ় পুরুষ যদি লোককল্যাণের জন্য কর্ম্মব্রতী হন, তবে তাঁর দ্বারা সমাজস্থিতি রক্ষার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা হয়।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪

অন্বয়—যদা হি সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী ইন্দ্রিয়ার্থেষু কর্ম্মসু ন অনুষজ্জতে তদা যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে॥ ৪

অনুবাদ—যখন সাধক সকল সঙ্কল্প ত্যাগ করায় রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে এবং কর্ম্মে আসক্ত হন না তখন তিনি 'যোগারূঢ়' বলে কথিত হন॥ ৪

যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ

যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ কি—তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়ে এক্ষণে শ্রীভগবান্ বললেন—যিনি সর্ব্ব প্রকার সঙ্কল্পত্যাগী, যিনি রূপ-রসাদি ভোগ্য বিষয়ে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হন না এবং যাবতীয় ভাল-মন্দ বা শুভাশুভ কার্য্যে যিনি অনাসক্ত—তিনিই যোগারূঢ় বা জীবন্মুক্ত। বস্তুতঃ, ভোগাকাঙ্ক্ষা, কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তিই জীবের সংসারবন্ধনের মুখ্যতম কারণ। যিনি সাধনার দ্বারা এই অবস্থাত্রয়কে পূর্ণরূপে জয় করেছেন, শত প্রকার লোভনীয় বস্তুর মধ্যে অবস্থান করেও যিনি ক্ষণিকের তরে প্রলুব্ধ হন না এবং কোনরূপ কর্ম্মে যার আর কোন মমত্ববোধ ও ফলভোগে বিন্দুমাত্র আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে না, অর্থাৎ যিনি সম্যক্ জিতেন্দ্রিয় ও অনাসক্ত, গীতার মতে তিনিই যোগারূঢ়। বলাবাহুল্য, মানব জীবনের ইহাই চরম অবস্থা।

এইরূপ শান্ত, নির্ব্বিকার স্থিতি কীরূপে লাভ করা যায়, তা-ই বর্ণিত হয়েছে—পরবর্ত্তী দুটি শ্লোকে।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫

অন্বয়—আত্মনা আত্মানম্ উদ্ধরেৎ। আত্মানং ন অবসাদয়েৎ হি আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ॥ ৫

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬

অন্বয়—যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ আত্মা তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ অনাত্মনঃ তু আত্মা এব শত্রুবৎ শত্রুত্বে বর্ত্তেত॥ ৬

অনুবাদ—আত্মার দ্বারাই আত্মার উদ্ধার সাধন করবে, আত্মাকে কদাপি অবসন্ন বা নিরয়গামী হতে দিবে না। কেন না, আত্মাই আত্মার বন্ধু ; আত্মাই আত্মার শত্রু। যে আত্মার দ্বারা আত্মা বশীভূত হয়েছে সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু, অবশীভূত আত্মাই শত্রুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হয়॥ ৫।৬

আত্মজয় বা আত্মোদ্ধারের প্রকৃত উপায়

উপরোক্ত শ্লোক দুটিতে 'আত্মা' বলতে সূচিত হচ্ছে—জীবের অন্তরস্থ দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের উপাধিবিশিষ্ট আত্মা বা জীবাত্মা। এই জীবাত্মার দু'টি ব্যবহারিক সত্তা আছে, যাকে সহজ ভাষায় বলা হয়—'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি'।

এখানে যখন বলা হচ্ছে—আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধার সাধন করবে, তখন তার তাৎপর্য্য হচ্ছে—ঊর্দ্ধ্বমুখী 'পাকা আমি'র সাহায্যে অধোমুখী 'কাঁচা আমি'কে উচ্চ পর্য্যায়ে উন্নীত করবে। তাকে আর অবসন্ন বা নিম্নগামী হতে দেবে না। অর্থাৎ, সাধককে পুরুষকারের বলে মনের গতিকে নিরন্তর ঊর্দ্ধ্বমুখী রাখার জন্য চেষ্টিত হতে হবে। উপনিষদেও আত্মোপলব্ধির জন্য ইত্যাকার পুরুষকারের সঙ্কেত দিয়ে বলা হয়েছে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।—পুরুষকারহীন নির্ব্বল সাধকের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না।

বস্তুতঃ, মানুষের অন্তরস্থ যে জীবাত্মা তা অনন্ত শক্তির আধার। ব্যবহারের গুণে বা বৈগুণ্যে সেই শক্তি কখনও ঊর্দ্ধ্বমুখী আবার কখনও নিম্নগামী হয়। আত্মকল্যাণকামী বা আত্মোদ্ধারের সংকল্পে যিনি উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত, তিনি স্বীয় অন্তর্নিহিত সেই আত্মিক শক্তির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার পূর্ব্বক পরম পুরুষকার সহায়ে আত্মদৌর্ব্বল্যকর যাবতীয় চিন্তা ও কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সংযত ক'রে নিরন্তর উন্নততম মানসিক স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করবেন। এ বিষয়ে তিনি বিন্দুমাত্র আত্মদৈন্য, অবসাদ বা দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেবেন না। তাঁর ধারণা থাকা চাই—শত্রু-মিত্র দুই-ই তাঁর অন্তরে বিদ্যমান। বশীভূত আত্মাই তাঁর পরম বন্ধু এবং সেই বন্ধুর সহায়তা লাভের জন্য তিনি সর্ব্বদা, উদ্গ্রীব ও উৎকণ্ঠিত থাকবেন। পক্ষান্তরে, তাঁর অন্তরস্থ অবশীভূত আত্মাই তাঁর ভীষণ শত্রু এবং যাবতীয় অনর্থ ও সর্ব্বনাশের মূল কারণ। তিনি তাই তার মোহকর প্রভাব হতে সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করবেন।

এখানে প্রশ্ন আসে—ইত্যাকার আত্মকৃপা বা আত্মজয়ের সুদৃঢ় সংকল্পই যদি মানুষের সাধনপথের পরম সম্বল ব'লে বিবেচিত হয় তবে শাস্ত্রে গুরুকৃপার মহত্ত্ব ঘোষণা ক'রে কেন বলা হয়েছে—'মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা'? উত্তরে বলা যায়—আত্মকল্যাণকামী এরূপ পুরুষার্থী সাধকের নিকট

'গুরুকৃপা' বা প্রভুকৃপা স্বতঃই আবির্ভূত হয়। এ জন্যই ইংরেজী প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে—God helps those who help themselves. অর্থাৎ, প্রযত্নশীল সাধকের নিকট ভগবৎশক্তি আপনা হতেই এসে উপনীত হয়। কোন শিশু সন্তান যখন হাঁটবার বা চলবার জন্য বিশেষ উৎসাহশীল হ'য়ে যাত্রা আরম্ভ করে তখন তার পিতা মাতা বা অভিভাবক স্বতঃই তার সেই উদ্যমে সহায়তা দানের জন্য ছুটে আসেন নাকি? বস্তুতঃ সশ্রদ্ধ আত্মকৃপার সহিত গুরুকৃপা বা ভগবৎ কৃপার সম্বন্ধ-সম্পর্ক চির-বিজড়িত।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭

অন্বয়—জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ॥ ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮

অন্বয়—জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে॥ ৮

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৯

অন্বয়—সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্য বন্ধুষু সাধুষু অপি পাপেষু চ সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে॥ ৯

অনুবাদ—জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্ত, সাধকের আত্মা শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, মান-অপমানেও স্থির ও সমাহিত থাকে; যাঁর, চিত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানে (প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে) পরিতৃপ্ত, যিনি নির্ব্বিকার ও সম্পূর্ণ বশীভূতচিত্ত, মৃত্তিকা-প্রস্তর ও সুবর্ণখণ্ডে যাঁর সমদৃষ্টি, তাদৃশ সাধককে সিদ্ধ যোগী বলে। সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, বিবদমান উভয় পক্ষের হিতৈষী দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু, অসাধু—এই সকলের প্রতি যাঁর তুল্যবুদ্ধি তিনিই প্রশংসার পাত্র॥ ৭-৮-৯

গীতামৃত—আত্মিক পুরুষকারের বলে ভগবদনুগ্রহ লাভ করে সাধক যখন যোগসিদ্ধির সর্ব্বোচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হন তখন তাঁর স্বরূপলক্ষণ কীরূপ হয়—উপরোক্ত তিনটি শ্লোকে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। গীতার মতে যিনি সিদ্ধ যোগী বা জীবন্মুক্ত, তিনি জিতেন্দ্রিয়, দ্বন্দ্বাতীত, সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ও প্রশান্তচিত্ত এবং শত্রুমিত্র, শুভাশুভ, মানাপমান, মৃত্তিকা, প্রস্তর, সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন। বস্তুতঃ, গীতাধর্ম্মের সাধনায় সমত্বের স্থান সর্ব্বোচ্চে। গীতার মতে সমত্বের অবস্থাই—সত্যকার যোগ। সাধকের মনে যতদিন বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য বা বৈষম্যের ভাব বিদ্যমান থাকে ততদিন তার সেই সুউচ্চ স্থিতি লাভ হয় না।

সাধারণ অবস্থায় মানুষ সামান্য সুখে উৎফুল্ল ও সামান্য দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। পরন্তু, অধ্যায় পথের যিনি সত্যকার পথিক বা সাধক তিনি সর্ব্বপ্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাচক্রের মধ্যে নিজের মানসিক সাম্য বা সমতার ভাব রক্ষা করার জন্য প্রাণপাতী প্রচেষ্টা করেন এবং এই প্রচেষ্টার ফলে তিনি পরিশেষে এমন অবস্থায় উন্নীত হন যখন শত প্রকার প্রলোভন ও চিত্তচাঞ্চল্যকর বিষয়বস্তুর মধ্যে অবস্থিত থেকেও তিনি মুহূর্ত্তের তরে বিন্দুমাত্র অশান্ত, উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হন না। তুচ্ছ মৃত্তিকা বা প্রস্তরখণ্ড ও বহুমূল্য সুবর্ণপিণ্ড তখন তাঁর দৃষ্টিতে তুল্যরূপে প্রতীয়মান হয়।

এই পরম শান্তিময় যোগসিদ্ধির অবস্থা কিন্তু আদৌ সহজলভ্য নয়। এজন্য সাধককে কীরূপ সাধন-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়—তারই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পরবর্ত্তী কতিপয় শ্লোকে বিবৃত হয়েছে।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০

অন্বয়—যোগী রহসি স্থিতঃ একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ সততম্ আত্মানং যুঞ্জীত॥ ১০

অনুবাদ—যোগী একাকী নির্জ্জন স্থানে থেকে সংযতচিত্ত, আশঙ্কা ও পরিগ্রহশূন্য হয়ে নিরন্তর চিত্তকে সমাহিত করবেন। ১০

যোগাভ্যাসের জন্য নির্জ্জনবাসের প্রয়োজনীয়তা

প্রবর্ত্তক অবস্থায় যোগসাধনা বা মনের একাগ্রতা অভ্যাসের জন্য একান্ত বা নির্জ্জনবাসের প্রয়োজনীয়তা গীতা স্বীকার করেন। চিত্তবিক্ষেপকারী 'হৈ-হল্লা' মনঃসংযমের পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল। তবে সকলের পক্ষে একান্ত নির্জ্জনবাসের সুযোগ না হলে গৃহকোণে একটি নিরালা স্থান স্থির ক'রে সেখানে নিয়মিত ভাবে আসনে আসীন হয়ে গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে মন্ত্রজপ বা ধ্যানসাধনার সাহায্যে মনকে শান্ত, সংযত ও ইষ্টমুখী রাখার জন্য প্রযত্নশীল হওয়া আবশ্যক। ইত্যাকার সাধনকালে মানসিক স্থৈর্য্য রক্ষার জন্য সাধনার প্রতিবন্ধক যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রীর সংগ্রহাদির ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি ত্যাগ করাও প্রয়োজন। কর্ম্মযোগের সাধনার নামে মানসিক একাগ্রতার অভ্যাসের দিকে দৃষ্টি না রেখে যাঁরা বাহ্য কর্ম্ম নিয়ে দিবারাত্র প্রমত্ত থাকতে চান—তাঁদের জানা উচিত—কর্ম্মযোগের সহিত ধ্যানযোগের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ সাধিত না হলে কর্ম্মযোগ 'কর্ম্মভোগে' রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা পদে পদে। আর এজন্য গীতা সাধনার ক্ষেত্রে একপক্ষীয় বিচারের বা আদর্শের সমর্থন না দিয়ে সমন্বয়মূলক সাধনার উপর পুনঃ পুনঃ জোর দিয়েছেন। নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমন্বয়াচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীও স্বীয় সাধক-সন্তানগণকে লক্ষ্য ক'রে নির্দ্দেশ দিয়েছেন—"কর্ম্মও যেমন করিবে, জপ-ধ্যানও তেমনি করিবে।" অর্থাৎ, জপ-ধ্যান ব্যতীত কেবলমাত্র বাহ্য কাজ-কর্ম্ম কদাপি চিত্তশুদ্ধির সহায়ক হয় না।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২

অন্বয়—শুচৌ দেশে ন অত্যুচ্ছ্রিতং ন অতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ আত্মনঃ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র আসনে উপবিশ্য যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ মনঃ একাগ্রং কৃত্বা আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুঞ্জ্যাৎ॥ ১১।১২

অনুবাদ—পবিত্র স্থানে নাতি উচ্চ, নাতি নীচ কুশোপরি, হরিণচর্ম্ম ও

তদুপরি বস্ত্রদ্বারা বিরচিত আসন স্থাপন করবে। সেই আসনে উপবিষ্ট হয়ে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযমপূর্ব্বক মনকে একাগ্র করে, আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ (ধ্যান) অভ্যাস করবে॥ ১১।১২

যোগাভ্যাসের উপযোগী আসন কীরূপ

ধ্যানাভ্যাসের নিমিত্ত প্রাথমিক প্রয়োজন—একটি আসন। সে আসন কোথায়, কীরূপ ভাবে প্রস্তুত করতে হবে—এখানে তারই সূচনা দেওয়া হয়েছে। সর্ব্বাগ্রে আসন-প্রতিষ্ঠার উপযোগী স্থানটি পবিত্র ও নির্জ্জন হওয়া চাই। কোলাহলময়, অপবিত্র স্থানে কদাপি মন শান্ত, সংযত ও একাগ্র হয় না। কেন না, প্রবর্ত্তক অবস্থায় বাহ্য স্থান-কালের প্রভাবে সাধকের মনোবুদ্ধি প্রভাবিত হতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, যে আসনে উপবিষ্ট হয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হবে, তা যেন অতি উঁচু বা অতি নীচু না হয়। কারণ, আসন বেশী উঁচু হলে মনে নিরন্তর পড়ে যাবার একটা আশঙ্কা থাকতে পারে। আর অত্যন্ত নীচু হলে ভূমির আর্দ্রতা ও কৃমিকীটের উপদ্রবের ভয় থাকা স্বাভাবিক। এই সমস্ত ত্রুটিগুলি অনেক সময় মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ ঘটায়। তাই এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। অতঃপর আসন নির্ম্মাণের কার্য্যকরী সূচনা দিয়ে বলা হয়েছে—কুশের উপর ব্যাঘ্র বা মৃগাদির চর্ম্ম স্থাপন ক'রে, তার উপর রেশম বস্ত্র আচ্ছাদিত ক'রে আসন প্রস্তুত করা সমীচীন। কেন না, কুশ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম বা মৃগচর্ম্ম ও রেশমবস্ত্র—এই তিনটি দ্রব্যই অপরিবাহী (non-conductor)। সুতরাং, ঐরূপ উপাদানে প্রস্তুত আসন যে কেবল উপবেশনের পক্ষে সুখপ্রদ তা-ই নয়, এতে চতুষ্পার্শ্বের আবিল প্রভাবের প্রকোপ হতেও রক্ষা পাওয়া যায়। এরূপ সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনির্ম্মিত আসনে স্থির ভাবে আসীন হয়ে সাধক দেহেন্দ্রিয়ের বাহ্য ও অন্তর প্রবৃত্তিকে সংযত করে ধ্যেয় বস্তুতে মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করবেন।

এখানে জানা আবশ্যক—কেবল মাত্র উপরোক্ত বিধিপদ্ধতিমত সুন্দর আসন প্রস্তুত করলেই হবে না। আসনে বসে নিত্য নিয়মিত গুরুনির্দ্দিষ্ট সাধন-প্রণালী অনুসরণ ক'রে ধ্যান অভ্যাস করা প্রয়োজন। নচেৎ ইত্যাকার বাহ্যাড়ম্বর হবে শুধু অভিমানের পরিপোষক—যা ধ্যানের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তাই এ সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিয়ে পরবর্ত্তী শ্লোক দু'টিতে বলা হচ্ছে—

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪

অন্বয়—কায়শিরোগ্রীবং সমম্ অচলং ধারয়ন্ স্থিরঃ (সন্) স্বয়ং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ যুক্তঃ আসীত॥ ১৩।১৪

অনুবাদ—শরীর (মেরুদণ্ড), মস্তক, গ্রীবা সরল নিশ্চল রেখে, স্থির হয়ে নিজ নাসাগ্রবর্ত্তী আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। অন্য কোন দিকে তাকাবে না। (এরূপ ভাবে উপবিষ্ট হয়ে) প্রশান্তচিত্ত, ভয়বর্জিত, ব্রহ্মচর্য্যশীল হয়ে মনসংযমপূর্ব্বক মদগতচিত্ত, মৎপরায়ণ হয়ে ধ্যান অভ্যাস করবে॥ ১৩।১৪

ধ্যানযোগের উপযোগী দৈহিক ও মানসিক বিধি-বিধান

ধ্যান অভ্যাস কালে মেরুদণ্ডের সরলতা ও স্থিরতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। মেরুদণ্ড বক্রাবস্থায় বা হেলতে-দুলতে থাকলে একদিকে যেমন আলস্য, ঔদাস্য প্রশ্রয় পেয়ে যোগবিঘ্ন সৃষ্ট হয়, অন্যদিকে ইহার দ্বারা মনের ঊর্দ্ধ্বগতি অবরুদ্ধ হয়। তার কারণ, মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে যে তিনটি নাড়ী দেহ মধ্যে বিদ্যমান, মেরুদণ্ড সরল, ঋজু ও স্থির অবস্থায় থাকলে তাদের গতি-প্রবাহ স্থির থাকে। আর তার ফলে সাধকের মনে প্রবাহিত হয় উন্নততর চিন্তাধারা। পক্ষান্তরে, এরূপ না হলে তাদের গতি হয় নিম্নমুখী।

যোগশাস্ত্র মতে মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্নাংশে মূলাধারচক্রে অবস্থিত থাকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। সাধারণ অবস্থায় ঐ চক্রের মুখ বন্ধ থাকায় ঐ মহাশক্তি ঊর্দ্ধ্বগামিনী হতে পারে না। এই কালে মানুষ তার দেহ-মন-বুদ্ধির সামান্য বা আংশিক শক্তির অধিকারী থেকে সাধারণ কাজকর্ম্ম ও চিন্তা চেষ্টায় নিরত থাকে। পরন্তু, সাধক যখন উন্নত চিন্তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হয়ে মহত্ত্বের

পথে অগ্রসর হবার প্রচেষ্টা করেন তখন তাঁর সেই অবরুদ্ধ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ধীরে ধীরে জাগ্রত ও উত্থিত হয়ে তাঁর সেই শুভ প্রয়াসে সহায়তা করতে থাকে। ঐ শক্তি যতদিন নাভিচক্রের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত উঠা নামা করতে থাকে ততদিন তার দেহমনে জৈবস্তরের হীন বিষয়-ভোগেচ্ছা প্রবল থাকে। মেরুদণ্ড বক্রাবস্থায় থাকলে সেই শক্তির গতি ঊর্দ্ধমুখী হতে পারে না। মেরুদণ্ড সোজা ও স্থির রাখলে উপরোক্ত দোষের অনেকখানি প্রতিকার হয়। ধ্যানযোগীরা তাই সর্ব্বপ্রযত্নে মেরুদণ্ডকে সরল ও সুস্থির রাখার জন্য একান্ত প্রযত্নশীল।

জৈব বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও বিষয়টি অনেকখানি সহজে উপলব্ধিগম্য হয়। প্রাণিজগতের মধ্যে মানুষই শুধু শির উন্নত করে দাঁড়াতে ও থাকতে অভ্যস্ত। মানুষের মনন-শক্তি তাই সর্ব্বাধিক। পক্ষান্তরে, অন্যান্য জীবকুলের মেরুদণ্ড ঊর্দ্ধমুখী নয় ; তাই তাদের দৃষ্টি অবনত ও বিষয়াবদ্ধ। সদ্গুরু-নির্দ্দিষ্ট সাধনপদ্ধতি অনুসরণ করে সাধক যখন নিয়মিত ধ্যানাভ্যাস করেন তখন ধীরে ধীরে তাঁর প্রসুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিভিন্ন চক্রগুলি ভেদ করে সর্ব্বশেষ চক্র সেই সহস্রারে উন্নীত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই অবস্থায় উন্নীত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, চেষ্টা করলেও সাধকের মনে আর কুচিন্তা উদিত হয় না। ইহাই যোগীদের সুউচ্চ অবস্থা।

এই সুদুর্লভ স্থিতি লাভ করতে হলে দীর্ঘকালব্যাপী নিরন্তর অভ্যাস ও প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োজন। গীতা এখানে নাসিকার অগ্রবর্ত্তী যে আকাশ, তাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সূচনা দিয়েছেন। তবে ধ্যানাভ্যাসের ইহা অন্যতম পন্থামাত্র। অধিকারী বিশেষে সাধক ভ্রূযুগলের মধ্যে বা হৃদয়কন্দরেও তাঁর ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যান করে থাকেন। ধ্যানকালে সাধকের মন সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ও উদ্বেগ হ'তে পরিমুক্ত থাকা প্রয়োজন। তা না হলে এই সব বাহ্য ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। এই প্রণালীর অনুসরণ কালে তাই গীতাকার আরও দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন এবং তা হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী ও ভগবন্মুখী হওয়া।

সাধারণ অর্থে 'ব্রহ্মচর্য্য' বলতে বোঝায় রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়সংযম। ধর্ম্মসাধনার ইহাই যে মূল কথা গীতা তা বহুস্থানে বহুভাবে উল্লেখ করেছেন। এই ব্রহ্মচর্য্য বা সংযমসাধনা সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়ের পক্ষেই একান্ত

প্রয়োজন। স্মরণ রাখতে হবে—গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন গৃহী এবং গীতার উপদেশও প্রদত্ত হয়েছে গৃহী অর্জ্জুনের প্রতি। তা ছাড়া, ইঁহারা উভয়েই ছিলেন বহুপত্নীক। এমতাবস্থাতেও তাঁরা ছিলেন ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ। সুতরাং, গৃহী বন্ধুদের জানা উচিত, বিবাহ করলেই তাঁরা অবাধ বিষয়ভোগের অধিকার লাভ করেন না।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে—ধ্যানযোগী সাধক কেবল যে আকাশের ধ্যান করে নিরবলম্ব হবেন—তা নয়। এই ভাবে একাগ্রতা অভ্যাস করে তিনি ধীরে ধীরে হবেন প্রভুপরায়ণ ও প্রভুগতপ্রাণ। ভগবানই হবেন তাঁর ধ্যেয় ও আরাধ্য এবং তাঁর কৃপাশিস্ই হবে—তাঁর সাধনপথের পরম সম্বল।

পাতঞ্জল যোগীর ধ্যেয় হচ্ছে—জ্যোতির্ম্ময় আত্মা ; পক্ষান্তরে গীতোক্ত ধ্যানযোগীর ধ্যেয়—পরম পুরুষোত্তম। পাতঞ্জলোক্ত ধ্যান ও গীতোক্ত ধ্যানযোগের এই যে পার্থক্য—তা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অর্থাৎ, গীতা কেবল আত্মবাদী নন্—ঈশ্বরবাদী। গীতাধর্ম্মের সাধক যেন নিরন্তর এই বিষয়টি স্মৃতিপথে রেখে যোগাভ্যাসে ব্রতী হন। এইজন্যই উক্ত শ্লোক দু'টির অন্তিমভাগে বলা হয়েছে "মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥" অর্থাৎ, ধ্যানাভ্যাসকালে উপরোক্ত পন্থাবলম্বনপূর্ব্বক সাধক মনকে সংযত ক'রে 'মৎপরায়ণ' ও 'মদগতচিত্ত' হবেন।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ১৫

অন্বয়—যোগী এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ নিয়ত মানসঃ মৎসংস্থাম্ নির্ব্বাণপরমাং শান্তিম্ অধিগচ্ছতি॥ ১৫

অনুবাদ—এই ভাবে সর্ব্বদা মন সংযোগ করতে করতে সাধকের মন একাগ্র হয়ে নিশ্চল হয় ; এরূপ স্থিরচিত্ত যোগী আমাতে অধিষ্ঠিত নির্ব্বাণরূপ পরম শান্তি লাভ করেন॥

গীতামৃত—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যে সাধনপ্রণালী সূচিত হয়েছে তদ্রূপ বিধি ও প্রণালীমত দীর্ঘকাল নিরন্তর মনঃসংযম অভ্যাস করলে মন ক্রমশঃ একাগ্র হয়। আর এরূপ একাগ্রতার ফলে সাধকের মন যখন ভগবানে নিশ্চল ও

সমাহিত হয় তখন তা পরম শান্তির কারণ হয়। ভগবান্ স্বয়ং রসস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ; তাঁতে চিত্ত সমাহিত হলে মন যে স্বতঃই আনন্দরসে আপ্লুত হবে তাতে আশ্চর্য্য কি?

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ ১৬

অন্বয়—অর্জ্জুন! তু অত্যশ্নতঃ যোগঃ ন অস্তি ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ। অতি স্বপ্নশীলস্য চ ন। জাগ্রতঃ এব চ ন। ১৬

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭

অন্বয়—যুক্তাহারবিহারস্য কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগঃ দুঃখহা ভবতি॥ ১৭

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! যিনি অত্যধিক আহার করেন বা অত্যধিক উপবাস করেন তাঁর যোগ হয় না। অতিশয় নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না। যিনি পরিমিত আহার-বিহারপরায়ণ, যিনি পরিমিত চেষ্টাশীল, যিনি পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন তাঁর যোগ দুঃখনিবারক হয়॥ ১৬।১৭

মিতাচারী যোগীই দুঃখজয়ে সমর্থ

ধ্যানযোগী সাধকের পক্ষে আহার, বিহার, নিদ্রা, কাজকর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে মিতাচারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। এর ব্যত্যয় বা অন্যথা হলে যোগসাধনা আদৌ ফলবতী হয় না। কেহ কেহ আকণ্ঠ বিষয়ভোগে নিমজ্জিত থেকে ধর্ম্মলাভের আশা পোষণ করেন। এঁরা নিজেদের আরাম-বিরাম, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এতটুকু ত্যাগ না ক'রে দেখাতে চান যে তাঁরা অন্তরে অন্তরে পরম অনাসক্ত যোগী ও ভক্ত। গীতার মতে এরা কিন্তু ধর্ম্মধ্বজী প্রতারক মাত্র। পক্ষান্তরে, আর একশ্রেণীর সাধক আছেন—যারা যোগাভ্যাসের নামে আহার-বিহার-নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে অত্যধিক কৃচ্ছ্র অবলম্বন ক'রে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে থাকেন; গীতা এরূপ ঘোর কৃচ্ছ্রতপাঃ সাধকদের

তামসিক বলে নিন্দা করেন। বস্তুতঃ এরাও যোগসাধনার অযোগ্য ও অনধিকারী। এ বিষয়ে গীতার নির্দ্দেশ হচ্ছে—মধ্যপন্থার আশ্রয় করা। পরবর্ত্তী যুগে শ্রীবুদ্ধও স্বীয় জীবনের কটু-তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই পরম সত্যটি উপলব্ধি ক'রে এই মধ্যপন্থার প্রচারে উদ্যোগী হন।

এবিষয়ে শ্রীবুদ্ধ স্বীয় পার্ষদবৃন্দকে নির্দ্দেশ দিয়ে বলতেন—

"একটি বাদ্যযন্ত্রের তারগুলি যদি অত্যধিক শিথিল বা অত্যন্ত শক্ত করে বাঁধা হয় তবে তাতে যেমন আশানুরূপ সুন্দর সুর ঝঙ্কৃত হয় না, তেমনি সাধকের দেহ-মনকে যদি অত্যধিক ভোগপরায়ণ বা তপঃক্লিষ্ট করা হয় তবে তা কদাপি যোগসাধনার অনুকূল ও উপযোগী হয় না।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের প্রতি গীতা সাধককে নির্দ্দেশ দিয়ে বলেছেন—আহার-বিহার-নিদ্রা-জাগরণের ন্যায় যোগীর যে কর্ম্মচেষ্টা তাও পরিমিত হওয়া প্রয়োজন। কেন না, অত্যধিক কর্ম্মপ্রবণতা যেমন দেহ-মনের চঞ্চলতা আনয়ন করে, অত্যধিক কর্ম্মবিরতি বা কর্ম্মহীনতাও তেমনি আলস্য ঔদাস্যের পরিবর্দ্ধক হয়। গীতোপদিষ্ট এই যে মধ্যপন্থা—তা-ই সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য।

এ বিষয়ে নবযুগের সাধক-শিরোমণি আচার্য্য প্রণবানন্দও স্বীয় আশ্রিত সন্তানগণকে সতর্ক করে দিয়েছেন। "চার ঘণ্টার অধিক নিদ্রা বীর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়।" আরো বলেছেন—"আহারে, বিহারে, উৎসবে এবং প্রতিটি কার্য্যকলাপে তোমরা নিরন্তর সংযম রক্ষা করিয়া চলিবে। সর্ব্ব বিষয়ে এরূপ পরিমিত আচার-ব্যবহারই সাধক সন্তানগণের আত্মিক কল্যাণের বিশেষ উপযোগী।"

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮

অন্বয়—যদা বিনিয়তং চিত্তং আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে। তদা সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ যুক্ত ইতি উচ্যতে॥ ১৮

অনুবাদ—যখন চিত্ত বিশেষ ভাবে নিরুদ্ধ হয়ে আত্মাতেই স্থিত হয়, তখন যোগী সর্ব্বপ্রকার কামনাশূন্য হন; এরূপ যোগী পুরুষ যোগসিদ্ধ বলে কথিত হন॥ ১৮

গীতামৃত—আত্মা বা ভগবান্ এবং রূপরসাদি বিষয়সমূহ পরস্পর বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন। এজন্য বলা হয়—"যঁহা রাম তঁহা নহী কাম।" অর্থাৎ, যেখানে আত্মা বা ভগবানের প্রতি প্রেম বা অনুরাগ, সেখানে বিষয়ের আকর্ষণ বা আসক্তি থাকতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—তুলসীদাস যতদিন তাঁর স্ত্রীর রূপ ও গুণে মোহাসক্ত ছিলেন ততদিন তিনি ভগবৎ প্রেমের মর্ম্ম বুঝেন নি, কিন্তু পরবর্তী কালে যখন তিনি ভগবৎপ্রেমে বিভোর হন, তখন সেই মোহ ও বিষয়াসক্তি আর তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি। বস্তুতঃ সকল ভগবদ্ভক্ত সম্বন্ধেই এই কথা। এই প্রকার আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই সিদ্ধপুরুষরূপে প্রখ্যাত। মানবজীবনের চরম লক্ষ্য এবং আদর্শও ইহাই।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯

অন্বয়—যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ ন ইঙ্গতে আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা॥ ১৯

অনুবাদ—বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না, আত্মবিষয়ে যোগাভ্যাসকারী সংযতমনা যোগীর চিত্ত তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ॥ ১৯

গীতামৃত—যোগসিদ্ধ পুরুষের মন যখন আত্মতত্ত্বে সম্পূর্ণ লীন বা সমাহিত হয়ে যায় তখন তা কীরূপ শান্ত ও নিশ্চল স্বরূপ ধারণ করে একটি উপমার মাধ্যমে তা-ই বোঝান হচ্ছে। বায়ুহীন স্থানে প্রজ্বলিত দীপশিখা যেমন একান্ত নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকে, আত্মনিষ্ঠ যোগীর চিত্তবৃত্তিও তেমনি আত্মবস্তুতে সম্পূর্ণ একাগ্র ও সমাহিত হয়ে যায়। তাঁর দেহমনে তখন আর বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্যের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না। আর এরূপ অবস্থায় উন্নীত হলেই সাধক সিদ্ধপুরুষ বলে স্বীকৃতি লাভ করেন।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ২০

অন্বয়—যত্র যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তম্ উপরমতে যত্র আত্মনা এব আত্মনি আত্মানং পশ্যন্ তুষ্যতি॥ ২০

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১

অন্বয়—যত্র অয়ং বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্ আত্যন্তিকং যৎ সুখং তৎ বেত্তি (যত্র চ) স্থিতঃ (সন্) তত্ত্বতঃ ন চলতি॥ ২১

অনুবাদ—যে অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধচিত্ত সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিশূন্য হয় এবং আত্মার দ্বারা আত্মাতে আত্মদর্শন ক'রে পরিতোষ লাভ করা যায়, যে অবস্থায় যোগী ইন্দ্রিয়াতীত নির্ম্মল বুদ্ধিগ্রাহ্য যে আত্যন্তিক সুখ তা অনুভব করেন এবং যে অবস্থায় স্থিত হলে তাঁর সে আত্মনিষ্ঠা আর বিচলিত হয় না (তাই যথার্থ যোগপদবাচ্য)॥ ২০-২১

গীতামৃত—সত্যকার যোগস্থিতি কীরূপ—উপরোক্ত দুটি শ্লোকে তারই যথাযথ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত হয়েছে, সাধক যখন যোগারূঢ় অবস্থায় স্থিত হন তখন তিনি সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্যের ঊর্দ্ধ্বে উত্থিত হন এবং আত্মার দ্বারা স্বীয় আত্মাকে দর্শন ক'রে অতুল ও অক্ষয় পরমানন্দের অধিকারী হন। দুঃখ-ক্লেশ তখন তাঁকে আর বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে না।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২

অন্বয়—যং লব্ধ্বা অপরং লাভং ততঃ অধিকং ন মন্যতে যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে॥ ২২

অনুবাদ—যে অবস্থা লাভ করলে অন্য কোন লাভ তদপেক্ষা অধিক লাভ বলে মনে হয় না এবং যে অবস্থায় স্থিত হলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করতে পারে না (তা-ই প্রকৃত যোগপদবাচ্য)॥ ২২

গীতামৃত—যোগসাধনালব্ধ অন্তিম সমাধিস্থিতি অতুল ও অক্ষয় আনন্দপ্রদ। এই আনন্দের অধিকারী হতে পারলে অন্য যাবতীয় বিষয়সুখ একান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। শুধু তা-ই নয়, এই অপার আনন্দের অধিকারী হলে নিদারুণ দুঃখ-ভয়ও আর সাধককে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না। তখন তিনি নিত্যানন্দে বিভোর।

তবে এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় জানা আবশ্যক যে, এই সিদ্ধাবস্থা লাভের পরে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ যদি জগৎকল্যাণে ব্রতী হ'য়ে কখনও কোন কারণে প্রতিকূল অবস্থাচক্রের সম্মুখীন হন তখন বাহ্যতঃ তা তাঁদিগকে সাময়িক ভাবে একটু চঞ্চল করে তুললেও তার দ্বারা তাঁরা বিশেষ উদ্বিগ্ন বা বিচলিত হন না। একটুখানি আত্মস্থ হলেই তাঁরা সেই দুঃখ-ক্লেশকে উপেক্ষা করে পুনরায় শান্তস্বরূপে অবস্থিত হন। ইহা দ্বারা তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত সেই প্রশান্তি সাম্যভাব বিনষ্ট হয় না।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা।। ২৩

অন্বয়- তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ। অনির্বিণ্ণচেতসা নিশ্চয়েন সঃ যোগঃ যোক্তব্যঃ।। ২৩

অনুবাদ—এইরূপ যোগের স্থিতিতে দুঃখসংযোগের বিয়োগ হয়। এই দুঃখবিয়োগই যোগশব্দবাচ্য। এই যোগ নির্ব্বেদশূন্য চিত্তে বা হতাশাশূন্য হয়ে নিরন্তর অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।। ২৩

যার দ্বারা দুঃখের বিয়োগ হয় তা-ই যোগ

যোগী পুরুষ যখন যোগসাধনার বলে আত্মস্থ হন তখন তাঁর দুঃখ-ক্লেশের বিয়োগ ঘটে। কেন না, যোগলব্ধ আত্মানন্দ এবং বিষয়-সংস্পর্শজনিত ভোগানন্দ কদাপি একত্র থাকতে পারে না। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায় আত্মানন্দ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়সংস্পর্শজনিত দুঃখ-ক্লেশও তেমনি মুহূর্ত্তে বিলীন হয়ে যায়। এই জন্য দুঃখ-বিয়োগকে যোগ বলা হয়। অর্থাৎ, যোগসাধনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হচ্ছে—চরম দুঃখনিবৃত্তি।

বিংশ শতাব্দীর এই বিচিত্র ও বহুমুখী জ্ঞানবিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বিকাশ-প্রকাশ সত্ত্বেও অধুনা মনুষ্যসমাজের দুঃখ-ক্লেশ, অভাব-অভিযোগ হ্রাস পাওয়া দূরে থাক, ক্রমশঃ তা যে আরও শত গুণ বেড়ে চলেছে, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে—এই আত্মনিষ্ঠামূলক যোগসাধনার প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর। বর্ত্তমান ভোগমূলক শিক্ষা-দীক্ষা তাই শান্তি ও মুক্তির কারণ না হ'য়ে বন্ধন

ও সর্ব্বনাশের হেতু হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমান যুগে গীতাধর্ম্মোক্ত যোগসাধনার ঐকান্তিক ও ব্যাপক প্রচারের আবশ্যকতা তাই অনস্বীকার্য্য।

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।। ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।। ২৫

অন্বয়—সংকল্প প্রভবান্ সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ ত্যক্ত্বা মনসা এব ইন্দ্রিয়গ্রামং সমন্ততঃ বিনিয়ম্য ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ। মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ।। ২৪-২৫

অনুবাদ—সংকল্পজাত কামনাসমূহকে নিঃশেষে পরিহার করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়সকল হতে নিবৃত্ত করে ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করবে এবং এরূপ নিরুদ্ধ মনকে আত্মাতে নিহিত করে কিছুই চিন্তা করবে না।। ২৪-২৫

সমাধি-অভ্যাসের ক্রমিক পর্য্যায়

গীতোক্ত ধ্যানযোগের মাধ্যমে সমাধি-অভ্যাস কীরূপে সম্ভবপর—উপরোক্ত দুটি শ্লোকে তা-ই অলোচিত হয়েছে। এখানে এ সম্বন্ধে যে কয়েকটি ক্রমিক পর্য্যায়ের সূচনা দেওয়া হয়েছে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ, এ জন্য প্রয়োজন—মনঃকল্পিত যাবতীয় কামনা-বাসনাকে নিঃশেষে পরিহার করা। অর্থাৎ, একদিকে মনে আর কোন প্রকার নূতন কামনা-বাসনার স্থান না দেওয়া এবং অন্যদিকে মনের পুরাতন কামনা-বাসনাগুলিকেও সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করে একান্ত নিষ্কাম বা বাসনামুক্ত হয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, এজন্য প্রয়োজন—রূপরসাদি বিষয়বস্তুর প্রতি চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের যে স্বাভাবিক অনুরাগ বা আকর্ষণ, নিরন্তর বিবেক-বিচারের সহায়তায় তার অসারতা ও ভীষণ পরিণামের বিষয় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি ক'রে তা হতে মনকে সরিয়ে নেওয়া। অর্থাৎ, প্রত্যাহারের অনুশীলন দ্বারা মনকে বিষয়বিমুখ করে তোলা।

তৃতীয়তঃ প্রয়োজন—ধৃতিযুক্ত সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা এরূপ প্রত্যাহৃত বা বিষয়বিমুখ মনকে ধীরে ধীরে একাগ্র করে তাকে শান্ত ও সংযত করা।

চতুর্থতঃ প্রয়োজন—সেই সংযত ও নিরুদ্ধ মনকে ক্রমশঃ আত্মাতে সমাহিত ক'রে আর কোন কিছুর চিন্তা না করা এবং তাতেই তন্ময় হয়ে যাওয়া।

সমাধি-অভ্যাসের উপরোক্ত ক্রমিক পর্য্যায়গুলি কিন্তু দীর্ঘকালীন অভ্যাস সাপেক্ষ। সদ্‌গুরুর উপদেশ ও নির্দ্দেশের অপেক্ষা না ক'রে যাঁরা কেবলমাত্র পুরুষকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে যোগসিদ্ধি অর্জ্জনের আশা পোষণ করেন তাঁরা শুধু যে ভ্রান্ত তাই নয়, অনেক সময় ইত্যাকার হঠকারিতার জন্য তাদিগকে বিশেষ দুর্ভোগ ভুগতে হয়। এজন্য বলা হয়েছে—মনকে ধীরে ধীরে বিষয়বস্তু হতে প্রত্যাহৃত করে ধ্যেয় বস্তুতে নিবদ্ধ করতে হবে।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬

অন্বয়—চঞ্চলম্ অস্থিরং মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি ততঃ ততঃ এতৎ নিয়ম্য আত্মনি এব বশং নয়েৎ।। ২৬

অনুবাদ—মন স্বভাবতঃ চঞ্চল; এরূপ অস্থিরাবস্থায় উহা যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় সেই সেই বিষয় হতে তাকে প্রত্যাহৃত করে আত্মাতে স্থির করতে হবে॥ ২৬

প্রত্যাহারের পদ্ধতি

'প্রত্যাহার' বস্তুটি কি এবং কীরূপে তা অভ্যাস করতে হয় উপরোক্ত শ্লোকটিতে তারই সুস্পষ্ট সূচনা দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক—বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গণের আকর্ষণ অতি স্বাভাবিক ও দুর্ব্বার। কেন না, রূপরসাদি বিষয়বস্তুর সহিত চক্ষুঃ-জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলির সহজাত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। সুতরাং, সেই বিষয়বস্তু হতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করতে হলে মনের দ্বারা সেই সব বিষয়ের দোষদর্শন একান্ত প্রয়োজন। পতঙ্গ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাতে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ

করে। কেন না, পতঙ্গের এই বিচারশক্তি নাই যে প্রোজ্জ্বল দীপশিখার মধ্যে কেবল উজ্জ্বল রূপই বিদ্যমান নাই, তার মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি। মানুষের সেই বিচারশক্তি আছে বলেই সে অগ্নির সেই দাহিকা শক্তি এড়িয়ে আত্মরক্ষা করে। ঠিক এই ভাবে মানুষ যদি অন্যান্য ভোগ্য বিষয়গুলির নশ্বরত্ব ও ভীষণ পরিণামের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ক'রে সজাগ ও সচেতন হয়, তবে তা হতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করা তার পক্ষে সরল ও সহজসাধ্য হয়। এইরূপ না ক'রে জোরপূর্ব্বক তাদিগকে প্রত্যাহৃত করার চেষ্টা করলে তার পরিণাম প্রতিক্রিয়া হয় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও হানিকর।

দ্বিতীয়তঃ, বিষয়ের দোষ-দর্শনের ন্যায় প্রয়োজন—আত্মার গুণ ও মহত্ত্বের বিচার। এইরূপ নিত্যানিত্য বিচারের ফলেই বিষয়নিবৃত্ত মন আত্মার মহত্ত্বের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে এই জন্যই বলা হয়েছে—ইন্দ্রিয়গণকে স্বীয় স্বীয় বিষয়বস্তু হতে হঠিয়ে নিয়ে আত্মাতে নিবিষ্ট করাই যোগসাধনার চরম লক্ষ্য।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭

অন্বয়—প্রশান্তমনসং শান্তরজসম্ অকল্মষং ব্রহ্মভূতম্ এনং যোগিনম্ উত্তমং সুখম্ উপৈতি হি॥ ২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮

অন্বয়—এবম্ আত্মানং সদা যুঞ্জন্ বিগতকল্মষঃ যোগী সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে॥ ২৮

অনুবাদ—এরূপ যোগসিদ্ধ পুরুষ চিত্তচাঞ্চল্যকর রজোগুণ এবং চিত্তলয়কারী তমোগুণবর্জ্জিত হয়ে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, এবং এরূপ প্রশান্তচিত্ত যোগী পুরুষকেই নির্ম্মল সমাধিসুখ আশ্রয় করে। এরূপে নিরন্তর মনকে সমাহিত করে নিষ্পাপ হওয়ায় যোগী ব্রহ্মানুভবরূপ নিরতিশয় সুখ লাভ করেন॥ ২৭।২৮

নিয়মিত যোগাভ্যাসে রজঃ ও তমোগুণ স্তিমিত হয়ে ব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তি হয়

যোগ-সাধনার পক্ষে সব চেয়ে বড় বিঘ্ন হচ্ছে—রজঃ ও তমোগুণ। রজোগুণ প্রবল হলে সাধকের মন হয় চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত এবং তমোগুণ বর্দ্ধিত হলে তা হয় জড়ভাবাপন্ন ও নিষ্ক্রিয়। বলা বাহুল্য, এই উভয় প্রকার অবস্থা মানসিক একাগ্রতা ও শান্তির বিরোধী। নিত্য নিয়মিত ভাবে ধ্যানযোগের অনুশীলন করলে এই রজঃ ও তমোগুণ ধীরে ধীরে স্তিমিত ও প্রশান্ত হয়ে যায়। তখন যোগীর হৃদয়ে স্বতঃই প্রতিভাত হতে থাকে ব্রহ্মভাব এবং এই ব্রহ্ম-সংস্পর্শের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয়—সাত্ত্বিক পরমানন্দের প্রাপ্তি।

এই প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক—পাতঞ্জল যোগদর্শনের মতে সমাধিসিদ্ধি ইত্যাকার আত্মানন্দে বিভোর থাকাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ; পক্ষান্তরে গীতোক্ত ধ্যানযোগের লক্ষ্য এরূপ নয়। এই মতে ধ্যানযোগ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের পরিপূরক মাত্র। অর্থাৎ, গীতার ধ্যানযোগী ধ্যান সাধন দ্বারা যে মানসিক একাগ্রতা ও শক্তি আহরণ করেন তা জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিযোগের মাধ্যমে বিশ্বহিতে প্রযুক্ত হয়, লোকসংগ্রহই তার মুখ্য লক্ষ্য।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।। ২৯

অন্বয়—যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ আত্মানং সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি ঈক্ষতে।। ২৯

অনুবাদ—এরূপ যোগযুক্ত পুরুষ সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়ে আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করে থাকেন।। ২৯

গীতামৃত—দীর্ঘকালীন সাধনার দ্বারা যাঁরা নিত্য যোগযুক্ত স্থিতি লাভ করেন তাঁরা সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তুতে সমদর্শী হন। এই যোগারূঢ় অবস্থায় একদিকে তাঁরা যেমন সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, অন্য দিকে তেমনি তাঁরা নিজেদের আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতকে দর্শন করে থাকেন। বস্তুতঃ, এই অবস্থায় তাঁদের দৃষ্টিতে আর অনাত্ম বিষয়ের দর্শন হয় না। তাঁদের দৃষ্টি তখন হয়ে যায়—শুদ্ধ, নিষ্কলুষ ও নির্ব্বিষয়।

শ্রীভগবান্ পরবর্ত্তী শ্লোকে এই অবস্থার উপর আরও সুস্পষ্ট আলোক সম্পাত করে বলেছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।। ৩০

অন্বয়—যঃ মাং সর্ব্বত্র পশ্যতি সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি, অহং তস্য ন প্রণশ্যামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি।। ৩০

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বভূতে আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত দেখেন, আমি তাঁর অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না।। ৩০

আত্মদর্শন ও ভগবদ্দর্শনের পার্থক্য

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতের দর্শনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আর বর্ত্তমান শ্লোকে বিবৃত হচ্ছে—সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন এবং ভগবানে সর্ব্বভূতের দর্শনের বিষয়। শ্রীভগবান্ এখানে স্বয়ং বলছেন—যে ব্যক্তি আমাতে সব কিছু এবং সব কিছুতে আমাকে দর্শন করেন তাদৃশ ব্যক্তি যথার্থই ভাগ্যবান্ সুকৃতিশালী। কারণ, তাঁর নিকট আমি কখনও অদৃশ্য হই না ; তিনিও ক্ষণেকের তরে আমার অদৃশ্য হন না। অর্থাৎ, আমি তখন তাঁর নিকট সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান থাকি এবং তিনিও সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ আমার শুভদৃষ্টির মধ্যে অবস্থিত থাকেন।

এইরূপ সুউচ্চ সোপানে আরূঢ় হয়েই বৈদিক ঋষি উপলব্ধি করেছিলেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের সব কিছুই ব্রহ্মময়। বলা বাহুল্য, আত্মানুভূতি বা ভগবদনুভূতির ইহাই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা।

এখানে প্রশ্ন আসে, আত্মদর্শন ও ভগবদ্দর্শনের মধ্যে কোন ভাবগত পার্থক্য আছে কি? উত্তরে বলা যায়—আছেও বটে, আবার নাইও বটে। ভগবানকে যখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা বলে অনুভব করা যায়, তখন সেই আত্মা বা পরমাত্মা এবং ভগবানে কোন ভাবগত পার্থক্য অনুভূত হয় না। পরন্তু, যেখানে ভগবান্ বলতে সগুণ ঈশ্বর বা ক্ষর ও

অক্ষরের অতীত পুরুষোত্তমকে বোঝায় সেখানে আত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্বের মধ্যে ভাব ও গুণগত পার্থক্য অবশ্যই বিদ্যমান। উপরোক্ত দুটি শ্লোকের মধ্যে এই পার্থক্যের বিচার করা হয়েছে। প্রথম শ্লোকটিতে বলা হয়েছে —যোগারূঢ় অবস্থায় যোগসিদ্ধ পুরুষ সর্ব্বভূতকে স্বীয় আত্মাতে এবং সর্ব্বভূতে নিজের আত্মাকে দর্শন করেন। বলা বাহুল্য, সমদর্শিতার ইহাই চরম অনুভূতি।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে—যিনি আমাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতেও আমাকে দর্শন করেন আমি তাঁর অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। এখানে "আমি" বলতে বোঝান হচ্ছে গীতাকার স্বয়ং পুরুষোত্তমরূপী শ্রীভগবানকে। এই অবস্থায় তিনি স্বীয় বিভূতি প্রকাশ করে বলছেন—আমাকে দেবকী-নন্দনরূপে না দেখে যিনি সর্ব্বভূতাত্মারূপে দর্শন করেন তিনি আমাকে ঠিক ঠিক উপলব্ধি করেন। তাঁর সেই ভাবময় দৃষ্টিতে আমি সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে ধরা পড়ি। এইরূপ অবস্থায় তিনিও সর্ব্বাবস্থায় আমার দৃষ্টিগোচর হন।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১

অন্বয়—যঃ সর্ব্বভূতস্থিতং মাম্ একত্বম্ আস্থিতঃ ভজতি, সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১

অনুবাদ—যে যোগী সমত্ববুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিহার ক'রে সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন আমাতেই অবস্থান করেন॥ ৩১

সর্ব্বভূতে ভগবানের ভজনাকারী সাধক ভগবানে নিত্য অবস্থিত

সাধারণ নর-নারীর ধারণা-ঈশ্বর মন্দির-বিগ্রহের মধ্যেই নিত্য বিদ্যমান এবং স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, প্রভৃতি তাঁর চিরন্তন বাসভূমি। তাই তারা মন্দির, বিগ্রহে তাঁকে নিত্য নিয়মিত পূজা ক'রে দেহান্তে স্বর্গলাভের কামনা করে। জীবে শিবে ভেদজ্ঞান থাকায় তারা জীবসেবায় মহত্ত্ব অনুভব করে না। যদি

বা তাদের মধ্যে কেহ কেহ জীবসেবায় অগ্রসর হয় তথাপি তাদের সেই সেবাভাবের মধ্যে সুউচ্চ শিববুদ্ধি বিদ্যমান থাকে না—থাকে খানিকটা দয়া বা অনুগ্রহের ভাব এবং পুণ্যার্জ্জনই থাকে তখন তার প্রধান লক্ষ্য। এরই ফলে দেখা যায়—ভারতের তথা সমগ্র জগতের লক্ষ লক্ষ তথাকথিত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর আনুষ্ঠানিক পূজা-প্রার্থনা সত্ত্বেও আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আজও এত ভেদ-বৈষম্য, এত শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত তথা জাতিগত বিরোধ-বিতণ্ডা, মারামারি ও হানাহানি।

উক্তপ্রকার ধর্ম্মাচরণ ও জীবসেবার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি কোথায় তার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়ে শ্রীভগবান্ উপরোক্ত শ্লোকে বলছেন—আমি সর্ব্বভূতের মধ্যে সমভাবে নিত্য অবস্থিত, এই ভাবে জেনে যারা আমাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে সেবা করেন, তাঁরা যখন যেখানে যেরূপ অবস্থায় থাকুন না কেন তাঁরা নিত্য আমাতে অবস্থিত থাকেন। ক্ষণেকের তরেও তাঁরা আমা হতে বিচ্যুত হন না।

এ বিষয়টি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের উনত্রিংশ অধ্যায়ে নির্গুণ ভক্তিতত্ত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে অতি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে :

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥ ২১
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ ২২
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥ ২৪
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥ ২৭

"আমি সর্ব্বভূতে ভূতাত্মারূপে অবস্থিত আছি। অথচ সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে অবজ্ঞা করে লোকে প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বনা করে থাকে। সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে উপেক্ষা করে যে প্রতিমাদি পূজা করে সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়। যে প্রাণিগণকে অবজ্ঞা ক'রে বিবিধ দ্রব্যসম্ভার ও নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা প্রতিমাতে আমার পূজা করে আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হই

না। সুতরাং, মানুষের কর্ত্তব্য—আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জেনে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি ও মিত্রতার ভাব পোষণ করা এবং দান, মানাদির দ্বারা সকলকে অর্চ্চনা করা।"

বলা বাহুল্য, এই তত্ত্বটি দীর্ঘকাল পরে নবযুগের মহান্ কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বমানবের পুরোভাগে উপস্থাপিত করে বলেছেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

এর অব্যবহিত পরে সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দ এই সেবাধর্ম্মকে আরও সক্রিয়ভাবে উদ্‌যাপন করে দেখিয়ে দিলেন, সর্ব্বজীবের সেবাই ঈশ্বরের সত্যকার অর্চ্চনা। তবে এই কথার এরূপ অর্থ নয় যে মূর্ত্তিবিগ্রহের মধ্যে ভগবানের পূজার্চ্চনা মিথ্যা ও বর্জ্জনীয়। বস্তুতঃ, এই প্রসঙ্গে শুধু স্মরণযোগ্য যে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের সেবাকে উপেক্ষা ক'রে যারা শুধু মন্দিরবিগ্রহের সেবার্চ্চনা করে, শ্রীভগবান্ তাদের সেই সেবাকে স্বীকার করেন না। অধুনা বিদেশাগত খ্রীষ্টান পাদ্রীগণের সেবার দৃষ্টান্ত এদিক দিয়ে হিন্দু-সমাজের পক্ষে কিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রদ। যদিও একথা সত্য যে যীশুখৃষ্ট স্বয়ং এই সেবাধর্ম্মের আদর্শ ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের নিকট শিক্ষা ক'রে স্বীয় শিষ্যপার্ষদবৃন্দকে উপদেশ দেন। দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি ভারতবর্ষের অগণিত মঠ, মন্দির ও দেবালয়ের অতুল বিষয়-সম্পত্তির অধিকাংশ অর্জিত ও ব্যয়িত হচ্ছে মূর্ত্তি-বিগ্রহের সেবাপূজায় ও উৎসব-পার্ব্বণের বিপুল বাহ্যাড়ম্বরে। পরন্তু, তার বৃহদংশ যদি নিয়োজিত হ'ত সমাজ ও জাতির কল্যাণমূলক সেবাকার্য্যে তবে তদ্দ্বারা কতই না তার সদুপযোগ এবং সমাজের কল্যাণ সাধিত হত! এবিষয়ে আচার্য্য প্রণবানন্দের শিক্ষার মর্ম্ম এই যে, আত্মানুশীলনের নিমিত্ত জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা, পূজার্চ্চনার সহিত দুর্গত নর-নারীর সেবা-পরিচর্য্যা আবশ্যক। বস্তুতঃ, এই দুইয়ের সমন্বিত সাধনাই বর্তমান যুগের সত্যকার যুগধর্ম্ম।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২

অন্বয়—অর্জ্জুন! আত্মৌপম্যেন যঃ সর্ব্বত্র সুখং বা যদি বা দুঃখং সমং পশ্যতি সঃ যোগী পরমঃ মতঃ॥ ৩২

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! সুখই হোক বা দুঃখই হোক, যিনি আত্মসাদৃশ্যে সর্ব্বত্র সমদর্শী সে-ই যোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত॥ ৩২

যিনি সর্ব্বজীবে সমদর্শী ও সহানুভূতিশীল তিনি যোগসাধনার শ্রেষ্ঠ অধিকারী

যিনি অন্যের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে ঠিক ঠিক অনুভব করেন, গীতার মতে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী। অনেকের ধারণা—আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণার সমধিক অনুশীলনই সত্যকার যোগসাধনা; পরন্তু এই ধারণা যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, এই শ্লোকে তাই-ই সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। যার হৃদয় সমবেদনা ও সহানুভূতিহীন, যে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক, নিজের ষোল আনা সুখ সুবিধা ছাড়া অন্যের সুখ-সুবিধা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যার বিন্দু মাত্র চিন্তা ও চেষ্টা নাই, তদ্রূপ হৃদয়হীন ব্যক্তি কখনও যোগসাধনার অধিকারী হতে পারে না। বস্তুতঃ, প্রকৃত যোগী হবেন—দরদী ব্যথার ব্যথী। যিনি অন্যের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ মনে ক'রে সমপ্রাণতা অনুভব করেন, তিনিই সত্যকার যোগসাধনার অধিকারী। এজন্যই লক্ষ্য করা যায়, এ জগতের যথার্থ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষেরা সর্ব্বাপেক্ষা পরহিতব্রতী। বস্তুতঃ, সমগ্র বিশ্বই তাঁদের ঘর এবং জগতের সমস্ত প্রাণী-চরাচর তাঁদের একান্ত আপনার ও আত্মবৎ প্রিয়।

প্রশ্ন আসে, যাঁরা যোগসাধনার সত্যকার সাধক তাঁদের অন্তঃকরণে এরূপ সমত্ববুদ্ধি থাকবে কেন? তাঁরা তো দ্বন্দ্বাতীত, জগতের কোন কিছুতে তো তাঁদের প্রেম বা অনুরাগের ভাব থাকা উচিত নয়।

উত্তরে বলা যায়—সঙ্কীর্ণ প্রেমই মোহাসক্তির জনক এবং এই কারণে তা যোগসাধনার প্রতিকূল। কিন্তু ভগবদ্বুদ্ধিতে যে উদারতম বিশ্বপ্রেমের সেবা-পরিচর্য্যা, তাতে কোন প্রকার আসক্তির ভয়-ভীতি থাকে না। পক্ষান্তরে, সর্ব্বত্র এরূপ আত্মবুদ্ধি জাগ্রত হলে মানুষ দেবত্বের স্তরে উন্নীত হন এবং তখন তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন ও ভগবদ্বুদ্ধিতে সকলের সেবা করে ধন্য হন। গীতাকার শ্রীভগবানের মতে এরূপ যোগীই সর্ব্বোত্তম।

এ ছাড়া, যাবতীয় নীতিবাদের যে মহত্তম আদর্শ তার মৌলিক ভিত্তিও এই ভগবদ্বাক্যের মধ্যে নিহিত। এক ব্যক্তি যে অপর এক ব্যক্তিকে ভালবাসে এবং তার জন্য নিজের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়, তার মৌলিক হেতুর নির্দ্দেশ দিয়ে গীতাদি বেদান্ত-শাস্ত্র বলেন—মানুষ অপরের মধ্যে নিজের আত্মাকে দর্শন করে বলেই তার সুখ-দুঃখে নিজে এতটা অভিভূত বা বিচলিত হয়। আর্য্যেতর ধর্ম্মমতগুলির মধ্যে নীতিবাদের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তার মৌলিক ভিত্তি এতখানি গভীরে অনুপ্রবিষ্ট নয়। "Love thy neighbour as thyself"—'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাস ;' খ্রীষ্টান ধর্ম্মের এই যে নৈতিক নির্দ্দেশ তার পশ্চাতে গীতোক্ত এই সর্ব্বভূতাত্মবাদের সুগভীর ও সুউচ্চ প্রেরণা বিদ্যমান নাই। তার কারণ, সেই ধর্ম্মমতের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এই আত্মতত্ত্বের কোন বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না। আর্য্যেতর ধর্ম্মগুলি তাই এতটা গোঁড়া ও সাম্প্রদায়িক। বাহ্যতঃ তারা যত উদার বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের গালভরা বুলি উদগীরণ করুক না কেন, কার্যতঃ তারা মনে করে—তাদের নিজস্ব ধর্ম্মমত ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মমতগুলি ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। উপরোক্ত আত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারতীয় সাধক বিশ্বকল্যাণের মহাভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উদাত্তকণ্ঠে বলেছিলেন—

"যো ময়ি স্নিহ্যতি তস্য শিবমস্তু সদা ভুবি।
যশ্চ মাং দ্বেষ্টি লোকেঽস্মিন্ সোঽপি ভদ্রাণি পশ্যতু॥"

যে আমাকে স্নেহ করে তার কল্যাণ হোক এবং যে আমার প্রতি দ্বেষভাব পোষণ করে তারও কল্যাণ হোক।

শত্রু ও মিত্রের প্রতি এই যে সমভাব এবং তাদের উভয়ের কল্যাণকামনার এই যে উদার ও উদাত্ত ভাবাদর্শ তাহাই হিন্দুধর্ম্মের মহান্ বৈশিষ্ট্য এবং এই মহাভাবের উৎস হচ্ছে—গীতাদি শাস্ত্রপ্রচারিত সর্ব্বভূতে আত্মবুদ্ধির এই মহতী শিক্ষা।

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩

অন্বয়—মধুসূদন! ত্বয়া সাম্যেন অয়ং যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ এতস্য স্থিরাং স্থিতিং চঞ্চলত্বাৎ অহং ন পশ্যামি॥ ৩৩

অনুবাদ—(অর্জ্জুন বললেন) হে মধুসূদন, তুমি এই যে সমত্বযোগের ব্যাখ্যা করলে, (আমার) মন যেরূপ চঞ্চল, তাতে সেই সমত্বের ভাব স্থায়ী হবে মনে হয় না।। ৩৩

গীতামৃত—শ্রীভগবান্ এতক্ষণ অর্জ্জুনকে সর্ব্বভূতে সমত্ব-দর্শনের উপদেশ দিলেন। এই যোগে সিদ্ধ হতে পারলে সাধকের আর আত্ম-পর বা শত্রু-মিত্রে ভেদভাব থাকে না। তখন তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে আত্মা অথবা ভগবানকে দর্শন ক'রে সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব-বৈষম্যের অতীত হন। পরন্তু, অর্জ্জুনের মন এখনও সংশয়শূন্য ও আত্মপর ভেদভাববর্জ্জিত হয় নি। তিনি যে স্বীয় স্বজনগণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হচ্ছেন না, তার পশ্চাতেও কোন উন্নত অধ্যাত্মচেতনা বিদ্যমান নাই। বস্তুতঃ জাগতিক মায়িক ভাবের বশবর্ত্তী হয়েই তিনি যুদ্ধবিমুখ হয়েছেন। তাঁর হৃদয়-মনে এখনও সেই আত্ম-পর ভেদ-ভাবের প্রভাব বিদ্যমান। সেজন্য তিনি তাঁর সেই মানসিক দৌর্ব্বল্য সখার নিকটে নিঃসঙ্কোচে উপস্থাপিত করে বললেন—হে সখে, তুমি আমাকে এতক্ষণ যে সব উচ্চ আত্মতত্ত্ব বা সমত্ব-দর্শন-যোগের কথা বললে, আমার মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য আমি এখনও তার রহস্য উদঘাটন করতে অক্ষম। সুতরাং, আমি তোমার নিকট আমার মানসিক দৈন্যের বিষয়টি খুলে বলছি। তুমি সর্ব্বাগ্রে এর একটা বিধি-ব্যবস্থা কর এবং তারপর ঐরূপ উচ্চ তত্ত্বকথার উপদেশ কর।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪

অন্বয়—কৃষ্ণ! মনঃ হি চঞ্চলং প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্ ; অহং তস্য নিগ্রহং বায়োঃ ইব সুদুষ্করং মন্যে॥ ৩৪

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, মন যেরূপ চঞ্চল, ইন্দ্রিয়-উত্তেজনাকর, বলবান্, অনমনীয়, তাতে বায়ুকে বশে আনা যেরূপ দুঃসাধ্য মনকে বশে আনাও আমি তদ্রূপ দুঃসাধ্য বলে মনে করি॥ ৩৪

মন বায়ুর ন্যায় চঞ্চল ও দুর্ব্বার

উপরোক্ত দুইটি শ্লোকের মাধ্যমে অর্জ্জুন স্বীয় সদ্‌গুরু শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন, তা' মানব-মনের একটি শাশ্বত প্রশ্নের অবিকল প্রতিধ্বনি। আমরা এ জগতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অনুভব করি—জীবনযুদ্ধে আমরা কতখানি অসহায় ও দুর্ব্বল। আমরা আমাদের দেহ-মন-বুদ্ধির শক্তি-সামর্থ্য বিষয়ে যতই গর্ব অনুভব করি না কেন, জীবনের দৈনন্দিন যাত্রাপথে মধ্যে মধ্যে আমরা এমন সমস্যা ও বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হই যখন মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের সকল অহঙ্কার ও গর্ব খর্ব হয়ে যায় এবং সেই রূঢ় বাস্তবের সম্মুখে আমাদের সকল অস্মিতা ও অভিমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ায় আমরা একেবারে অসাড় অবশ হয়ে ভেঙ্গে পড়ি। মনের সকল উদ্যম উৎসাহ যেন তখন কোথায় কর্পূরের ন্যায় উবে যায়। বলা বাহুল্য, মানসিক চাঞ্চল্য ও দৌর্ব্বল্যই এইরূপ অবসাদ, বিষাদ ও উৎসাহ-ভঙ্গের প্রধানতম কারণ ; আর এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কোন শাস্ত্রোপদেশ এবং সদ্‌গুরুর কোন অভয়-আশ্বাসও যেন কার্য্যকর হয় না। তখন মনের সমস্ত বিচার-বুদ্ধি যেন স্তিমিত হয়ে আসে, যার ফলে সব কিছু দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য বলে মনে হয়। অর্জ্জুনের মানসিক দৈন্য ও দুর্ব্বলতা এক্ষণে ঠিক এরূপ। এই চিত্তদৌর্ব্বল্য নিয়েই তিনি স্বীয় সদ্‌গুরুরূপী শ্রীভগবানকে বলছেন—হে সখে, আমি এখন সর্ব্বহারার ন্যায় একান্ত অসহায়। আমার মন এতদূর চঞ্চল ও প্রমত্ত যে প্রবল প্রভঞ্জনকে বশে আনা যেমন দুঃসাধ্য আমার মনকে বশীভূত রাখাও আমার পক্ষে তদ্রূপ দুঃসাধ্য ও দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় আমার করণীয় কি—তাই আমাকে নিশ্চয় করে বল।

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫

অন্বয়—মহাবাহো! মনঃ দুর্নিগ্রহং চলম (এতৎ) অসংশয়ং কৌন্তেয়! তু অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন, হে মহাবাহো, মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, তাকে নিরোধ করা দুষ্কর—নিঃসন্দেহ। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাকে বশীভূত করা যায়॥ ৩৫

মনকে বশীভূত করার উপায়—অভ্যাস ও বৈরাগ্য

শ্রীভগবান্ উপরোক্ত শ্লোকে অর্জ্জুনকে প্রোৎসাহিত করার জন্য তাঁকে দু'টি উৎসাহব্যঞ্জক বিশেষণে বিশেষিত করলেন। প্রথমে তিনি অর্জ্জুনকে সম্বোধন করলেন "মহাবাহো" বলে এবং পরে তাঁকে আহ্বান করলেন "কৌন্তেয়" বলে। সখাকে এভাবে সম্বোধন করার উদ্দেশ্য—তাঁর প্রাণে আত্মস্মৃতি জাগ্রত ক'রে তাঁকে উৎসাহী ও উদ্যমী করে তোলা। আত্মবিস্মৃতির মহাঘোরে পতিত হওয়ায় অর্জ্জুন এখন নির্জীব, নিস্তেজ এবং হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন এবং সেই ছিদ্রপথে তাঁর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়েছে শতপ্রকার ক্লৈব্য-দৌর্ব্বল্য ও সন্দেহ-সংশয়। তাঁকে এই মহামোহের কবল হতে পরিমুক্ত করবার জন্যই শ্রীভগবান্ সর্ব্বাগ্রে বলছেন—হে সখে, তুমি এতবড় বিশ্বপ্রখ্যাত মহাবীর ; তা ছাড়া, তুমি হচ্ছ বীরাঙ্গনা কুন্তীদেবীর পুত্র। তুমি কেন এতখানি হতাশ ও নিরুদ্যম হয়ে পড়েছ? তোমার জানা উচিত —পবন যত প্রবল ও দুর্নিবার হোক না কেন, তা চিরকাল ঐরূপ ক্ষিপ্ত ও দুর্ব্বার থাকে না। কিছুক্ষণ পরে তা পুনরায় প্রশান্ত স্বরূপ ধারণ করে। তেমনি মন যতই চঞ্চল ও অশান্ত হোক না কেন তাও চিরকাল ঐ অবস্থায় থাকে না ; আর তাকে শান্ত ও বশীভূত করার উপায় যে একেবারে নাই, তাও নয়। তুমি ধীর চিত্তে শোন—মনোজয়ের প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অনুশীলন।

এই প্রসঙ্গে আমাদেরও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—আমরাও দীন, হীন, দুর্ব্বল নই। আমরাও অমৃতের সন্তান, ব্রহ্মকুমার—আমরাও নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, সেই অনন্ত শক্তিশালী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার অংশস্বরূপ। আমরাও যদি অর্জ্জুনের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হই এবং তাঁর নিকট হতে অনুরূপ অভয়, আশ্বাস ও প্রেরণা লাভ করি, তবে আমাদের পক্ষেও আমাদের চঞ্চল ও দুর্নিবার মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা অবশ্যই সম্ভবপর হবে। তা'ছাড়া, আমাদের জানা উচিত—এই মনোজয় ব্যাপারটি

একটি নূতন জিনিস নয়। আদিতন কাল হতে সহস্র সহস্র সাধক-সাধিকা সদ্গুরুর আশীর্ব্বাদ ও নিজেদের পুরুষার্থের বলে এই দুরূহ কার্য্যে সাফল্য অর্জ্জন করেছেন। সুতরাং, আমরাই বা কেন এই সাধনায় ব্যর্থ-মনোরথ হব?

এ বিষয়ে নবযুগের সদ্গুরুরূপে আচার্য্য প্রণবানন্দ স্বীয় পার্ষদগণকে উপলক্ষ্য করে বলেছেন—**"সতত স্মরণ রাখিও যে এই বিশ্ব-সংসারে যদি একজন লোকও আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে তবে তোমরাও নিশ্চয়ই তাহা পারিবে।"**

"বৈরাগ্যই বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করে। বৈরাগ্যই নানারূপ বাসনাকে নাশ করিয়া মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যায়।

বিবেক-বৈরাগ্যই বিষয়বুদ্ধিকে নাশ করিয়া দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনাকে দূর করিয়া দুর্ব্বল মনকে সবল করে, বিবেক-বৈরাগ্যই কামনা-বাসনার জালকে ছিন্ন করিয়া মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভোগবিলাসের মূল একেবারে নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। যাবতীয় দুঃখ-দৈন্য, দুর্ব্বলতা-ভীরুতা-কাপুরুষতা বিদূরিত করিয়া এই বিবেক-বৈরাগ্যই মানুষের ভিতর অমিত তেজোবীর্য্য বিক্রম-পরাক্রম আনিয়া দেয়। সুতরাং, বিবেকীর একমাত্র সহায়, সম্বল ও সর্ব্বস্বই হইল—এই বিবেক-বৈরাগ্য।"

মনঃসংযমের জন্য গীতাকার শ্রীভগবান্ এখানে অভ্যাস ও বৈরাগ্যরূপী যে দুটি কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশ দিয়েছেন সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—"Habit is the second nature"। অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ প্রয়াসের দ্বারাই মানুষের স্বভাব গঠিত হয়। অর্থাৎ, মানুষের যা বর্ত্তমান স্বভাব বা প্রকৃতি তা তার পূর্ব্বেকার প্রচেষ্টারই পরিণতি এবং তার ভবিষ্যৎ প্রকৃতিও গড়ে উঠবে—তার বর্ত্তমান অভ্যাস বা প্রচেষ্টার দ্বারাই। এই বিষয়টির প্রতি মনন করলে মানুষের ভাল-মন্দ চরিত্রগঠনের ব্যাপারে অভ্যাসের শক্তি কতখানি প্রবল ও প্রভাবশালী তা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়।

আজকালকার বিদ্বৎসমাজে মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বহু চর্চ্চা ও গবেষণার দ্বারা এই সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, মানুষের মতি-গতি ও প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে পূর্ব্বার্জ্জিত শুভাশুভ সংস্কারই সমধিক কার্য্যকর। ইহাও প্রমাণিত হয়েছে

যে তার প্রাক্তন সংস্কারের প্রভাবে তার বর্ত্তমান জীবন এবং বর্ত্তমান সংস্কারের প্রভাবে তার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসে—মানুষের চরিত্র গঠনের নির্ম্মাতা—এই সংস্কার-বস্তুটি কি? এর উত্তরে মনস্তত্ত্ববিদ্গণ বলেন—মানুষের অন্তঃকরণে বিভিন্ন কারণে ও বিচিত্র পরিবেশের প্রভাবে যে সমস্ত ভাল-মন্দ চিন্তাতরঙ্গ উত্থিত হয়, সেগুলি ক্রমশঃ তার অবচেতন মনে সঞ্চিত হয়ে মস্তিষ্কের উপর গভীর রেখাপাত করে। পরবর্ত্তী কালে অনুকূল পরিবেশে ও অনুরূপ ঘটনাচক্রের সংস্পর্শে তার মনে সেগুলি পুনরায় উদিত হয়ে পূর্ব্বকার সংস্কারের অনুরূপ চিন্তাতরঙ্গ সৃষ্টি করে। এইরূপে মানুষের মানস-চেতনায় যে চিন্তাগুলি পুনঃ পুনঃ উদিত হয়, সেইগুলি ধীরে ধীরে তার চরিত্রে দৃঢ় সংস্কারস্তূপে পরিণত হয়, আর এই সমস্ত সংস্কারকে আশ্রয় বা অবলম্বন করেই মানুষের অভ্যাসের শক্তি ক্রমশঃ প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে উঠে। আর এই সমস্ত অভ্যাসেরই পরিণতি হচ্ছে—স্বভাব বা প্রকৃতি।

উপরোক্ত আলোচনায় সপ্রমাণ হল যে মানুষের মানসিক চঞ্চলতার মূলে কারণরূপে বিদ্যমান রয়েছে তার পূর্ব্বতন কতকগুলি কু-অভ্যাস। অর্থাৎ, বহু জন্ম ধরে বিষয়ের সেবা করতে করতে মানুষ যে সমস্ত ভোগলালসার প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, তাই ধীরে ধীরে তার ভোগপ্রবৃত্তিকে করছে উত্তেজিত ও উন্মার্গগামী। আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামে তার রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ ক্রমশঃ শক্তিশালী হওয়ায় দুর্নিবার মানসিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছে। আর তাকে প্রশমিত করতে হলে প্রয়োজন—দীর্ঘকালীন বিপরীত অভ্যাসমূলক নিরন্তর প্রচেষ্টা। কেন না, অভ্যাসের দ্বারা যার সৃষ্টি, অভ্যাসের দ্বারাই তার নিবৃত্তি সম্ভপর।

এক্ষণে গীতাকারের বৈরাগ্যরূপী দ্বিতীয় নির্দ্দেশটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। 'বৈরাগ্য' শব্দটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে—বিষয়-বিতৃষ্ণা। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে ভোগাসক্তি মানসিক চঞ্চলতার অন্যতম প্রধান কারণ। মানুষের এই ভোগাসক্তি জন্মে তার বিষয়বাসনা হতে। সুতরাং, মনোজয়ের জন্য প্রয়োজন—বিষয়ের প্রতি হৃদয়-মনে নিদারুণ বিতৃষ্ণার ভাব উৎপন্ন করা। কেন না, যতদিন মনে ভোগলালসা বিদ্যমান থাকবে, ততদিন তাকে শান্ত ও সংযত করা অসম্ভব। মনোজয়কামী সাধক তাই বিবেক-বিচারের

সহায়তায় একদিকে মনে যেমন বিষয়বিতৃষ্ণার ভাব উৎপন্ন করবেন, অন্যদিকে তেমনই নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা তিনি মনকে বশীভূত করার চেষ্টা করবেন। এইরূপ সমন্বিত প্রয়াসের ফলেই দুর্ব্বার মন ধীরে ধীরে আয়ত্তাধীন হয়ে আসবে।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬

অন্বয়—অসংযতাত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ। উপায়তঃ তু যততা বশ্যাত্মনা (যোগঃ) অবাপ্তুং শক্যঃ॥ ৩৬

অনুবাদ—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যার মন সংযত হয় নি তার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য—ইহাই আমার অভিমত। পরন্তু, যথারীতি প্রয়াস করলে মনকে বশীভূত করা যায় এবং যোগস্থিতি লাভ করা সম্ভব॥ ৩৬

গীতামৃত—চঞ্চল মনকে বশে আনার উপায় কি—তার যথাযথ নির্দ্দেশ দেওয়ার পরে অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ বললেন, এইরূপ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অনুশীলন দ্বারা যার মনকে বশীভূত করার চেষ্টা না করে তাদের পক্ষে যোগফল লাভ করা অসম্ভব। তবে একথা সত্য যে, যারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাসহকারে উপরোক্ত পদ্ধতিমত মনোজয়ে ব্রতী হয়, তাদের সে প্রয়াস কদাপি ব্যর্থ হবার নয়। তাদের সেই যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ হ'বেই।

শ্রীভগবানের এই আশ্বাস আমাদের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত মানুষের পক্ষে কতই না আশা ও সান্ত্বনাপ্রদ! তাই আসুন, আমরা সর্ব্বপ্রকার হতাশা নিরাশা পরিহার পূর্ব্বক মনোজয়-ব্রতে ব্রতী হই।

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭

অন্বয়—কৃষ্ণ, শ্রদ্ধয়া উপেতঃ অযতিঃ যোগাৎ চলিতমানসঃ যোগসংসিদ্ধিম্ অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি॥ ৩৭

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ, যিনি প্রথমে শ্রদ্ধা সহকারে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু শিথিলতা বশতঃ যোগসাধনা হতে বিচলিত

বা ভ্রষ্ট হওয়ায় সিদ্ধিলাভে অসমর্থ হন, তিনি কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হন? ৩৭

গীতামৃত—সংশয়রূপ নিদারুণ ব্যাধিতে অর্জ্জুনের মনোবুদ্ধি ভীষণ আক্রান্ত। এই সংশয়ব্যাধির জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়ে তিনি স্বীয় প্রাণপ্রিয় সখার শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি তো যোগসাধনা বিষয়ে এতক্ষণ আমাকে অনেক উপদেশ, নির্দ্দেশ ও তত্ত্বকথা শোনালে। কিন্তু আমার মনে তথাপি নিদারুণ সংশয়মেঘ সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, তুমি বল—যাঁরা যোগসাধনায় একবার প্রবৃত্ত হয়ে মানসিক ধৈর্য্যের অভাবে অথবা আলস্য বা শিথিলতাবশতঃ সেই সাধনা পরিহার ক'রে যোগভ্রষ্ট হয়ে পড়েন, তাঁদের কি গতি হয়? অর্থাৎ, যাঁরা চরম সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে সাধনমার্গ হতে স্খলিত হয়ে পড়েন তাঁদের পরিণতি কীরূপ ঘটে?

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮

অন্বয়—মহাবাহো! ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ অপ্রতিষ্ঠঃ উভয়বিভ্রষ্টঃ (সন্) ছিন্নাভ্রম্ ইব ন কচ্চিৎ নশ্যতি।। ৩৮

অনুবাদ—হে মহাবাহো! ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ হতে বিচলিত হওয়ার ফলে তিনি কি মোক্ষ ও স্বর্গ এই উভয় প্রকার গতি হতে ভ্রষ্ট হয়ে ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় বিলীন হয়ে যান? ৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯

অন্বয়—কৃষ্ণ! মে এতৎ সংশয়ম্ অশেষতঃ ছেত্তুমর্হসি। ত্বদন্যঃ হি অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ন উপপদ্যতে॥ ৩৯

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, তুমি আমার এই সংশয় নিঃশেষে ছেদন করে দাও, কারণ তুমি ভিন্ন আমার এ সংশয়ের ছেদনকর্ত্তা আর কেহ নাই॥ ৩৯

সাধনভ্রষ্ট ব্যক্তি কি মুক্তি ও স্বর্গ—এই উভয় প্রকার গতি হতে বঞ্চিত হন?

আকাশে সঞ্চরমান মেঘমালা যতক্ষণ একত্র সন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকে ততক্ষণ তা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় এক সঙ্গে আকাশে উড়ে বেড়ায়। পরন্তু, এই মেঘমালা হতে যদি একখণ্ড মেঘ পৃথক্ হয়ে যায় তবে পবনবেগে তা ক্ষণকাল মধ্যে দূর দূরান্তরে ভেসে গিয়ে বিলীন হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির আশায় সাধক যখন সাধনাকাশে উড্ডীন হতে থাকেন, তখন যদি নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের অভাবে বা স্বীয় শৈথিল্যবশতঃ সেই সাধনমার্গ হতে তিনি ভ্রষ্ট হয়ে যান তখন তার কি গতি হয়? তখন কি তিনি তাঁর সাধনোচিত মোক্ষ ও স্বর্গ—এই উভয় প্রকার স্থিতি হতে বিচ্যুত হয়ে একেবারে নিরয়গামী হন?

হিন্দু শাস্ত্রমতে সকাম ও নিষ্কাম এই দুই প্রকার সাধনার ফল হয় বিভিন্ন। যাঁরা সকাম ভাবে সাধনা করেন, তাঁরা লাভ করেন স্বর্গ। পক্ষান্তরে, নিষ্কাম সাধনার চরম পরিণতিতে ঘটে মোক্ষপ্রাপ্তি। অর্জ্জুনের প্রাণে এক্ষণে এই সংশয় জাগ্রত হয়েছে—গুরূপদিষ্ট বা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাধনমার্গে অগ্রসর হতে হতে যাঁরা মধ্য পথে সাধনভ্রষ্ট হয়ে যান, তাঁদের অদৃষ্টে যে মোক্ষপ্রাপ্তি হবে না—ইহা তো স্বাভাবিক; পরন্তু, তাঁরা কি স্বর্গলাভেও বঞ্চিত হবেন? তা হলে কি তাঁদের সেই দীর্ঘকালীন সাধনার ফল ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় একেবারে শূন্যে মিলিয়ে যাবে? সহজ কথায় অর্জ্জুনের প্রশ্ন হচ্ছে—যোগভ্রষ্ট সাধকের দীর্ঘ কালের তপস্যা কি সামান্য ত্রুটি-চ্যুতির জন্য একেবারে ব্যর্থ ও বিনষ্ট হয়ে যায়?

এরূপ প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুন স্বীয় সখার নিকট অন্তরের ব্যথা-বেদনা নিবেদন করে বললেন—হে কৃষ্ণ, তুমি ছাড়া আমার এ সংশয়ের নিবারণকর্ত্তা আর কেহ নাই। তুমি তাই কৃপাপূর্ব্বক আমার এই সংশয়গ্রন্থি ছেদন করে দাও।

আমাদের সংসারযাত্রা-পথে আমরাও তো প্রতিনিয়ত সংশয়-জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। পরন্তু, সেই সন্ধিক্ষণে মুমুক্ষু অর্জ্জুনের ন্যায় আমরা কি সদ্গুরুর শরণাপন্ন হয়ে এইরূপ কাতর ভাবে আমাদের অন্তরের ব্যথা-বেদনা নিবেদন করতে প্রবৃত্ত হই?

মুণ্ডকোপনিষদে সংশয় নিবারণের চরম পন্থার নির্দ্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

সেই পরমাত্মার দর্শন হলেই সাধকের হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং তার সকল কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

তবে সেই পরমাত্মার দর্শনের জন্য প্রয়োজন—সদ্গুরুর সাক্ষাৎ কৃপা ও আশীর্ব্বাদ। এজন্যই ভক্ত শিষ্য কাতর প্রাণে শ্রীগুরুচরণে নিত্য প্রার্থনা নিবেদন করেন—

গুরু নারায়ণ আশিস্ বর্ষণ
কর তব দীন দুর্ব্বল সন্তানে।
মোদের তুমি বিনে কে আছে ভুবনে
নাশিতে অজ্ঞানে যোগজ্ঞান দানে॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০

অন্বয়—পার্থ, তস্য ইহ এব বিনাশঃ ন বিদ্যতে অমুত্র ন, তাত হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি॥ ৪০

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—হে পার্থ, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও বিনাশ নাই; কারণ হে বৎস, কল্যাণকামী ব্যক্তি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না॥ ৪০

আত্মকল্যাণকামী ব্যক্তির কদাপি দুর্গতি হয় না।

যোগসাধনা হতে মধ্যপথে যে সাধক ভ্রষ্ট হন তাঁর কি ইহলোক ও পরলোকের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয়? অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ তাঁকে অভয়-আশ্বাস দিয়ে যে কথাগুলি বললেন তা কতই না মর্ম্মস্পর্শী ও সান্ত্বনাপ্রদ! তিনি বললেন—হে পার্থ, এ বিষয়ে তোমার কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাসহকারে আত্মকল্যাণের জন্য যাঁরা সাধনা করেন—তাঁদের পূর্ব্বার্জিত সাধনার ফল বিনষ্ট হবার নয়। সাময়িক ভাবে

সাধনমার্গ হতে স্খলিত হলেও তাঁরা কদাপি নিরয়গামী হন না। কেন না, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" ধর্ম্মের স্বল্পমাত্র আচরণও সাধককে মহাভয় হতে ত্রাণ করে।

শুভ কর্ম্মের ফল আজ হোক কাল হোক—একদিন ফলবেই। ব্যবহার-বিজ্ঞানের ইহাই শাশ্বত-নীতি। ইংরাজী প্রবাদ বাক্যেও কথিত হয়—'As you sow, so you reap'—'যেমন বীজ বপন করবে ফসলও তেমনি পাবে।' কর্ম্মবাদের এই অটল সিদ্ধান্ত স্মৃতিপথে থাকলে সাধক কখনও তার পূর্ব্বকৃত তপস্যার ফল সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হতে পারেন না।

মানসিক চাঞ্চল্য ও দুর্ব্বলতার জন্য অর্জ্জুনের মনে যে মিথ্যা সংশয়ের উদয় হয়েছে তার নিরসনের জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে শ্রীভগবান্ এ বিষয়ে আরও আলোক সম্পাত করে বললেন—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১

অন্বয়—যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে।। ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২

অন্বয়—অথবা ধীমতাং যোগিনামেব কুলে ভবতি ঈদৃশং যৎ জন্ম, লোকে এতৎ হি দুর্লভতরম্॥ ৪২

অনুবাদ—যোগভ্রষ্ট সাধক পুণ্য কর্ম্মকারীদের প্রাপ্য স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হয়ে তথায় দীর্ঘকাল বাস করার পরে সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে অথবা জ্ঞানবান্ যোগীর কুলে জন্মগ্রহণ করেন। জগতে এরূপ জন্ম অতি দুর্লভ॥ ৪১।৪২

গীতামৃত—যাঁরা সাধনভ্রষ্ট যোগী—তাঁরা মৃত্যুর পরে তাঁদের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত শুভকর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি উন্নততর লোকে গমন করেন। তবে সেখানে তাঁদের বাস চিরস্থায়ী হয় না। তাঁদের পুণ্যকর্ম্মের অনুরূপ ফল তাঁরা সেখানে ভোগ করেন। পরে যখন তাঁদের সেই পুণ্য ক্ষীণ হয় তখন তাদিগকে

পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করতে হয়। কিন্তু এই সময়ে তাঁদের জন্ম হয় সদাচারী ধনী পরিবারের অথবা জ্ঞানবান্ গৃহী যোগীর কুলে —যেমন সাধকশিরোমণি শুকদেবের জন্ম হয়েছিল জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ব্যাসদেবের গৃহে। ভগবান্ বুদ্ধ, মহাবীর স্বামী ও ভক্ত মীরাবাঈ-এর রাজকুলে জন্মও এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩

অন্বয়—কুরুনন্দন! তত্র পৌর্ব্বদেহিকং তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে। ততঃ চ ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ যততে।। ৪৩

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥ ৪৪

অন্বয়—সঃ তেন এব পূর্ব্বাভ্যাসেন অবশঃ অপি হ্রিয়তে। যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি শব্দব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে॥ ৪৪

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই জন্মে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভবুদ্ধি লাভ করে পুনরায় চরম সিদ্ধির জন্য প্রযত্নশীল হন। পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ তিনি অবশ ভাবে পুনরায় যোগমার্গে আকৃষ্ট হন। যিনি কেবল যোগের স্বরূপজিজ্ঞাসু, তিনিই বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মাদির ফল অপেক্ষা উচ্চতর গতি প্রাপ্ত হন॥ ৪৩।৪৪

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রাক্তন শুভ সংস্কার তাঁকে পুনরায় সাধনপথে প্রবৃত্ত করে

অভ্যাসের শক্তি যে অপরিসীম সেকথা পূর্ব্বে বহু প্রসঙ্গে বহু বার আলোচিত হয়েছে। এখানে পুনরায় তারই দৃষ্টান্ত উত্থাপিত করে বলা হচ্ছে —পূর্ব্বজন্মে যে সকল সাধক আত্মোদ্ধার বা আত্মকল্যাণের জন্য প্রাণপাতী তপস্যা করার পরে সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেছেন তাঁদের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সেই অভ্যাসের শক্তি কদাপি নষ্ট হবার নয়। সেই অভ্যাসের শক্তি পরবর্ত্তী জন্মে তাদিগকে অবশ ভাবে পুনরায় যোগসাধনায় প্রবর্ত্তিত করে।

ধর্ম্মপথ ভিন্ন অন্য পথে তখন আর তাদের রুচি প্রবৃত্তি হয় না।

ভারতীয় ক্রমবিকাশবাদ বা উৎক্রান্তিবাদের মতে জীবদেহে অনুপ্রবিষ্ট আত্মা জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ উন্নততর সংস্কার ও প্রবৃত্তি লাভ করতে করতে আত্মোন্নতির অন্তিম সীমায় উপনীত হয়। এই সিদ্ধান্তমতে প্রত্যেক জীবাত্মা চরমে মোক্ষলাভ করবেই। এদিক দিয়ে বিচার করলেও সাধনভ্রষ্ট ব্যক্তির হতাশ বা নিরাশ হওয়ায় কিছুই নাই। কেন না, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক প্রাকৃতিক নিয়মেই জীবের ক্রমোন্নতি বা ঊর্দ্ধগতি স্বাভাবিক; মধ্যপথে তার গতি চিরতরে রুদ্ধ বা অধোমুখী হবার নয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন—আত্মনিষ্ঠ মুক্তিকামী সাধক, স্বর্গভোগেচ্ছু সকাম সাধক অপেক্ষা উন্নত ও উৎকৃষ্ট। কেন না, হিন্দুধর্ম্মমতে স্বর্গভূমিও ভোগভূমি। মানুষ ইহসংসারেই স্বীয় ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে বিষয়সুখ সম্ভোগ করে তাহাই স্বর্গলোকে আরও অধিক কাল ও অধিক পরিমাণে ভোগ করার সুযোগ লাভ করে। এইরূপ স্থূল বা সূক্ষ্ম বিষয়ভোগে কিন্তু তাকে অনন্ত শান্তি দান করতে পারে না। কারণ, এই ভোগকালেরও সীমা আছে। পক্ষান্তরে, নিষ্কাম সাধনার দ্বারা সাধক সে চরম মোক্ষস্থিতি লাভ করেন, তাহা সত্য সত্যই অতুল ও অক্ষয় শান্তির উৎস।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ৪৫

অন্বয়—প্রযত্নাৎ যতমানঃ সংশুদ্ধকিল্বিষঃ যোগী অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ ততঃ পরাং গতিং যাতি॥ ৪৫

অনুবাদ—সেই যোগী পূর্ব্বাপেক্ষাও এখন অধিকতর যত্ন করেন ক্রমে যোগাভ্যাস দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হয়ে বহু জন্মের চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করে তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন॥ ৪৫

গীতামৃত—অভ্যাসের শক্তি ক্রমবর্দ্ধমান। এই কারণে গত জন্মের তপস্যামূলক যোগসাধনার শক্তি বর্ত্তমান জন্মে আরও প্রবলতর স্বরূপ ধারণ করে এইরূপে জন্মে জন্মে সেই সাধনশক্তি প্রবলতর হতে হতে সাধককে চরম সিদ্ধির অন্তিম স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। সুতরাং, অধ্যাত্ম পথের যিনি পথিক

তাঁর জানা আবশ্যক—যদি কোন কারণবশতঃ সাময়িক ভাবে তাঁর অনুষ্ঠিত যোগসাধনা শিথিল হয়ে যায় অথবা তা হতে তিনি ভ্রষ্ট বা পতিত হন, তথাপি তা চিরতরে বিনষ্ট হবার নয়। ক্রমিক অভ্যাসের বলে একদিন না একদিন তাঁর সেই শুভ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবেই।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা আবশ্যক—আর্য্যেতর জাতিগুলির (যারা পুনর্জন্মে অবিশ্বাসী) হৃদয়-মনে এরূপ অভয় আশ্বাসের স্থান নাই। এক দিকে তারা জীবন্মুক্তির সিদ্ধান্তে অবিশ্বাসী, অন্যদিকে মৃত্যুর পরে পুনর্জ্জন্ম লাভ ক'রে পুনরায় মুক্তিসাধনায় ব্রতী হওয়া যায়—এ কথাও তারা স্বীকার করে না। এমন কি চরম নিবৃত্তিমূলক মুক্তি বা মোক্ষের কল্পনাও তাদের ধর্ম্মে স্বীকৃত হয় নি। Salvation বা বেহেস্ত বলতে তারা যা বোঝেন তার অর্থ হচ্ছে—অনন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করা।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬

অন্বয়—যোগী তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ, জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ, কর্ম্মিভ্যঃ চ অধিকঃ মতঃ। তস্মাৎ অর্জ্জুন যোগী ভব॥ ৪৬

অনুবাদ—যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার অভিমত। অতএব অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও॥ ৪৬

আত্মনিষ্ঠ যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ কেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এখানে তপস্বী বলতে সেই শ্রেণীর কঠোরতপাঃ সাধকদের বোঝান হয়েছে যাঁরা ঊর্দ্ধবাহু, হেটমুণ্ড হয়ে বা অন্য বহুবিধ উপায়ে কৃচ্ছ্র ও উগ্র ধরনের তপশ্চর্য্যা করেন এবং যার উদ্দেশ্য—মোক্ষ, মুক্তি, আত্মজ্ঞান বা ভগবদুপলব্ধি নয়; পক্ষান্তরে, তার লক্ষ্য হচ্ছে—শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠা বা এক ধরনের সিদ্ধাই লাভ ক'রে অর্থ-বিত্ত ও যশোমান অর্জ্জন করা। এরূপ তপস্বী অপেক্ষা সত্যকার আত্মনিষ্ঠ যোগী যে শ্রেষ্ঠ হবেন—তাতে সন্দেহ কি? বলা বাহুল্য, বেদবাদী কর্ম্মকাণ্ডী সাধকগণও এই পর্য্যায়ভুক্ত। কেন

না, তাঁরা সকাম ভাবে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভের জন্য। এই শ্রেণীর সাধকরাও মুক্তি-মোক্ষ ও আত্মজ্ঞানের পথিক নন। তাই এরাও ভগবন্নিষ্ঠ যোগীর চেয়ে নিম্ন পর্য্যায়ের।

অতঃপর বলা হচ্ছে—যোগী জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এখানে জ্ঞানী বলতে বোঝান হচ্ছে—অনুভূতিহীন শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞানীকে। এরূপ পরোক্ষ জ্ঞানবাদীরা কেবলমাত্র তাদের পাণ্ডিত্যাভিমান চরিতার্থ করার জন্য শাস্ত্রচর্চা করে থাকেন। এরা শর্করাবাহী গর্দ্দভতুল্য। এদের এই জ্ঞান যে শুধু নিরর্থক, তাই নয়—অনেক ক্ষেত্রে ইহা হানিকরও বটে। যোগযুক্ত আত্মনিষ্ঠ যোগীর তুলনায় তাই এরাও নিকৃষ্ট।

এইরূপে যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে স্বীয় সখাকে সম্বোধন করে শ্রীভগবান্ বললেন—হে অর্জ্জুন! এরূপ কঠোরতপাঃ তপস্বী, সকাম কর্ম্মী ও শুষ্ক জ্ঞানী না হয়ে তুমি আত্মনিষ্ঠ যোগী হও। এরূপ যোগীরাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭

অন্বয়—যঃ শ্রদ্ধাবান্ মদ্‌গতেন অন্তরাত্মনা মাং ভজতে সঃ সর্ব্বেষাং যোগিনাম্ অপি যুক্ততমঃ মে মতঃ॥ ৪৭

অনুবাদ—যিনি শ্রদ্ধালু ও মদ্‌গতচিত্ত হয়ে আমার ভজনা করেন, সকল যোগীর মধ্যে তিনি আমার সহিত অধিকতর যুক্ত—ইহাই আমার অভিমত॥ ৪৭

প্রেম-ভক্তিমিশ্র যোগসাধনাই ভগবানের সর্ব্বাধিক প্রিয়

এ যাবৎ বিবিধ অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগের বিষয়ে বহুবিধ উপদেশ ও নির্দ্দেশ এবং ঐ সকল সাধনপদ্ধতি সহায়ে কী ভাবে সিদ্ধি লাভ করা যায়—তার সূচনা দেওয়া হয়েছে। পরন্তু, লক্ষ্য করার বিষয় —বক্ষ্যমান্ এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে সর্ব্ব প্রথম ঘোষিত হয়েছে —ভক্তিযোগের মহত্ত্ব। এখানে বলা হয়েছে—কর্ম্ম বল, জ্ঞান বল, ধ্যান বল

—তা যদি প্রেম-ভক্তি মিশ্রিত না হয়, তবে সর্ব্বোত্তম স্বরূপ ধারণ করে না এবং তা শ্রীভগবানেরও বিশেষ প্রীতিপ্রদ হয় না।

একটি লৌকিক দৃষ্টান্তের সহায়ে বিষয়টির মর্ম্মার্থ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা যাক। একটি পরিবারের একটি সন্তান বহু প্রকার জ্ঞানে-গুণে ভূষিত এবং পারিবারিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সে সিদ্ধহস্ত ; বাহ্য আচার-ব্যবহারেও সে অতি ভদ্র ও বিনয়ী। বস্তুতঃ, সকল দিকে ছেলেটি নিপুণ ও সুদক্ষ পরন্তু, তার দোষ-ত্রুটির মধ্যে যেটি সর্ব্বাধিক লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে এই যে, সে তার পিতামাতার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ ও অনুরক্ত নয়। প্রশ্ন আসে এমতাবস্থায় সে কি তার জনক-জননীর পরিপূর্ণ স্নেহ ও কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হবে? নিশ্চয়ই নয়। এক্ষেত্রেও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সেই রহস্যটি নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সত্য বলতে, শ্রীভগবান্ হচ্ছেন প্রেম-ভক্তির ভিখারী। ভক্তের প্রেম-বন্ধনেই তিনি চিরদিনের জন্য আবদ্ধ হয়ে থাকেন। প্রেম-ভক্তিহীন অন্য কোন শক্তি-সামর্থ্য ও গুণ-জ্ঞান তাই তাঁর প্রিয় নয়।

বস্তুতঃ, প্রেমভক্তিমিশ্র সমন্বয়মূলক যে যোগসাধনা—তাই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। গীতার পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে এই ভাবেই বিশেষ সূচনা দেওয়া হয়েছে। নরদেহে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীভগবান্ স্বীয় সখা অর্জ্জুনের মাধ্যমে বিশ্বমানবকে বোঝাতে চেয়েছেন—আমি অপার প্রেমঘনমূর্ত্তি নিয়ে তোমাদের পুরোভাগে আবির্ভূত। আমার উদ্দেশ্যে বা আমার প্রসন্নতা বিধানের জন্য যে কর্ম্ম তা-ই তোমাদের কর্ম্মযোগ। আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের রহস্য অবগত হয়ে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াই—তোমাদের জ্ঞানযোগ। আমার দিব্যমূর্ত্তির ধ্যানে তন্ময় হয়ে আমাতে সমাহিত হওয়াই —তোমাদের ধ্যানযোগ এবং আমাকে পিতা-মাতা, প্রভু-সখা, পতি-পুত্র প্রভৃতি জ্ঞান করে আমার সহিত ঐকান্তিক প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হয়ে আমার যথাযোগ্য সেবার্চ্চনা করাই—তোমাদের ভক্তিযোগ। অর্থাৎ, আমিই তোমাদের কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তির মর্ম্মকেন্দ্র। এই ভাবে যিনি আমাকে উপলব্ধি ক'রে উপরোক্ত যোগসমূহের অনুশীলন করেন, তিনিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ—জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগঃ

এই অধ্যায়ে ভগবানের স্বরূপ বিষয়ক যে জ্ঞান এবং তার অনুভূতি বিষয়ক যে বিজ্ঞান তাই বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এই অধ্যায়টির নাম হয়েছে —'জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ'।

আমরা লক্ষ্য করেছি—শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে ভক্তিপ্রসঙ্গ তেমন উত্থাপিত হয় নি। কেবলমাত্র ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তিম দুটি শ্লোকে সূচনা দেওয়া হয়েছে—যাঁরা শ্রীভগবানে বিশেষ ভাবে অনুরক্ত ও ভক্তিযুক্ত—তাঁরাই তাঁর নিকট সর্ব্বাধিক প্রিয়।

এক্ষণে সেই বিষয়টির পুনরুক্তি ক'রে শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ের প্রথমেই বললেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১

অন্বয়—শ্রীভগবানুবাচ। পার্থ, ময়ি আসক্তমনাঃ মদাশ্রয়ঃ যোগং যুঞ্জন্ সমগ্রং মাং যথা অসংশয়ং জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু॥ ১

অনুবাদ—ভগবান্ বললেন—হে পার্থ, তুমি আমাতে অনুরক্ত এবং একমাত্র আমার শরণাপন্ন হয়ে আমাতে যুক্ত হলে কীরূপে আমার সমগ্র স্বরূপ নিঃসংশয়ে জানতে পারবে তা শুন॥ ১

অনন্য ভক্তের নিকট ভগবান্ স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন

যাঁরা অনন্যশরণ হয়ে শ্রীভগবানের প্রতি একান্ত আসক্ত ও অনুরক্ত হন, শ্রীভগবান্ তাঁদের প্রতি তাঁর অপার করুণা ও আশিসধারা বর্ষণ করেন। তাঁদের নিকট তিনি তখন নিঃসঙ্কোচে স্বীয় সমগ্র রূপ, গুণ, মহত্ত্ব ও বিভূতি

প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে, যারা অশ্রদ্ধালু, অবিশ্বাসী ও বিষয়াসক্ত—যারা সুখ, শান্তি, অভয়, আশ্বাস লাভের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হয়, ভগবান্ তাদের প্রতি উদাসীন ও উপেক্ষাপরায়ণ হন। কেন না, তখন তাদের মনোবুদ্ধি থাকে ভগবদ্বিমুখ অথবা ভগবৎ বিষয়ে উপেক্ষাপরায়ণ।

অর্জ্জুনের অদৃষ্ট আজ সুপ্রসন্ন। তাই তাঁর প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণ আজ তাঁকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলছেন—আমাতে একান্তভাবে শরণাপন্ন হয়ে আমার প্রতি আসক্ত ও ভক্তিযুক্ত হলে কীরূপে আমার সমগ্র স্বরূপের জ্ঞানলাভ করা যায়—তা তোমাকে বলছি, তুমি মনোযোগ দিয়ে তা শুন।

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২

অন্বয়—অহং তে সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানম্ অশেষতঃ বক্ষ্যামি। যৎ জ্ঞাত্বা ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে॥ ২

অনুবাদ—আমি তোমাকে বিজ্ঞানের সহিত আমার স্বরূপের জ্ঞান দান করছি—যা অবগত হলে পুনরায় তোমার আর কিছু জানবার অবশিষ্ট থাকবে না॥ ২

পরিপূর্ণ ভগবদুপলব্ধির জন্য প্রয়োজন— জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বিত অনুভূতি

ভগবৎ স্বরূপের পরম জ্ঞান অতি দুরূহ। সাধারণ বিচারবুদ্ধি বা পরোক্ষ শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা তা আয়ত্ত করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন—সাধনোপলব্ধ অপরোক্ষানুভূতি। আর এই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষানুভূতি অতি দুর্লভ ও কঠোর তপঃসাধ্য। শুধু তাই নয়; এজন্য চাই ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর অপার অনুগ্রহ। সাধক যখন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোকে ভগবৎস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন—তখনি তিনি তাঁকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

এই প্রসঙ্গে জানা উচিত—মাত্র আস্তিক্যবুদ্ধি ও সামান্য শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সহায়তায় ভগবান্ সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তা হচ্ছে আংশিক জ্ঞান। এই আংশিক জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবৎ তত্ত্বকে উপলব্ধি করার চেষ্টার ফলেই হিন্দুধর্ম্মে শত শত দেব-দেবীর রূপ কল্পিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, হিন্দুধর্ম্মের

মধ্যে অসংখ্য দেব-দেবীর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে ভগবৎ সত্তার আংশিক প্রকাশ-বিকাশ বিদ্যমান। গীতার মতে এই সকল দেবদেবীর উপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন এবং যাঁরা মুক্তি-কামনায় ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত ভগবানের উপাসনা করেন, ভগবদনুগ্রহে তাঁরা তাঁকেই প্রাপ্ত হন। ভগবান্ চান—তাঁর অনন্য ভক্ত তাঁকে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে অনন্ত ও অক্ষয় শান্তিলাভ ক'রে ধন্য হন ; তাঁর খণ্ডিত জ্ঞান বা আংশিক উপলব্ধিতে যেন তাঁরা সন্তুষ্ট না হন। লৌকিক জগতেও আমরা দেখি—প্রত্যেক মানুষ চায়—তাকে তার পরিচিত ব্যক্তিরা ভালভাবে বুঝে তার প্রতি যথাযথ ব্যবহার করুক। অর্থাৎ, কেহ যেন তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ক্ষুদ্র, ভ্রান্ত বা বিকৃত ধারণা পোষণ ক'রে তার প্রতি অন্যায়, অবিচার বা অমর্য্যাদা না করে। বস্তুতঃ, কারও সম্বন্ধে এরূপ তুচ্ছ ও খণ্ডিত ধারণাই তার দুঃখ ও অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ। এমন কি আমি, তুমি ও তিনি' এরূপ যে পার্থক্য-জ্ঞান তাও লৌকিক জগতে কম-অনৈক্য, অপ্রীতি ও সংঘর্ষের কারণ হয় না। অধ্যাত্মক্ষেত্রে এরূপ ভেদজ্ঞান আরও অনিভিপ্রেত। এজন্য গীতাদি বেদান্ত-গ্রন্থ সমত্বদর্শনের উপর এতখানি গুরুত্ব দেন। আর এই সমত্বদর্শন তখনই সফল ও সম্ভবপর হয়, যখন সাধক স্বীয় প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ভগবান্‌কে পূর্ণরূপে অনুভব ক'রে নিজের মধ্যে এবং বিশ্বচরাচরের সর্ব্বভূতের মধ্যে তাঁকে অনুভব করেন। এজন্যই শ্রীভগবান্ এখানে বলছেন—অর্জ্জুন, তুমি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সহিত আমাকে পরিপূর্ণরূপে জান।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ব্যাখ্যা

বক্ষ্যমাণ শ্লোকটিতে ব্যবহৃত জ্ঞান' ও বিজ্ঞান' শব্দ দুটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। একদলের মতে জ্ঞান হচ্ছে —ভগবদ্বিষয়ের প্রত্যক্ষানুভূতি এবং বিজ্ঞান হচ্ছে—সৃষ্টিতত্ত্ব বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবিষয়ক আধিভৌতিক জ্ঞান। পক্ষান্তরে, অন্যদলের মতে জ্ঞান' হচ্ছে পরোক্ষ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান' হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষানুভূতি। অপর একশ্রেণীর পণ্ডিতের মতে জ্ঞান হচ্ছে—নরদেহে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মরহস্যের জ্ঞান এবং বিজ্ঞান হচ্ছে—গীতাবর্ণিত গুহ্যাতিগুহ্য পুরুষোত্তমতত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি। এখানে জানা কর্ত্তব্য,—উক্ত শব্দ দুটির

ব্যাখ্যার এবম্প্রকার পার্থক্যবোধ যতই থাকুক না কেন—তার যথার্থ তাৎপর্য্য হচ্ছে—ভগবান্‌কে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন—পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সমন্বয়। পরন্তু, এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন আসতে পারে—ভগবান্‌কে জানবার জন্য সৃষ্টিতত্ত্বমূলক আধিভৌতিক বা বৈষয়িক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে কি? তা ছাড়া কি পরিপূর্ণ ভগবদুপলব্ধি সম্ভবপর হয় না?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—হিন্দুদর্শনের মতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি—দুটি পৃথক্ তত্ত্ব নয়। অর্থাৎ, হিন্দুধর্ম্মের মতে যিনি বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর তিনি জগদতিরিক্ত কোন পৃথক্ সত্তা বা শক্তি "Extra-cosmic Power" নন। এই মতে—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম। ভগবান্ হতে আবির্ভূত এই বিশ্বসংসারের সব কিছুই ব্রহ্মসত্তার দ্বারা অনুস্যূত। অর্থাৎ, তিনি নিজেই বহুরূপে সৃষ্ট বা প্রকাশিত হয়েছেন। তাই এই মতে স্রষ্টাকে সম্যক্‌রূপে জানতে হলে তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বটির রহস্যও অবগত হওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্মের মতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান। ধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানকে ধার্মিক দৃষ্টিতে উপলব্ধি করাই তাই ভারতীয় দর্শনের মূল কথা। এজন্যই এদেশের প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থে ভগবৎতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ matter বা জড়বস্তুকে energy বা চেতন শক্তি হতে সম্পূর্ণ পৃথক্ তত্ত্ব রূপে ভাবতেন। পক্ষান্তরে, জড়-বস্তুর অন্তিম পরিণাম যে পরমাণু (atom) তাকেও বিভক্ত করা যায় এবং বিভক্ত হলেই তা চেতন শক্তিতে (energy) রূপান্তরিত হয়। ভারতীয় দর্শন সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই তত্ত্বটি অবগত হয়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পার্থক্যবোধ পরিহার করেছিলেন। উপনিষদে তাই বলা হয়েছে—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চ অপরা চ।" অর্থাৎ, পরা বিদ্যা (অধ্যাত্মজ্ঞান) এবং অপরা বিদ্যা (লৌকিক বা ব্যবহারিক জ্ঞান)—একই সঙ্গে অর্জ্জন করতে হবে।

বস্তুতঃ সখা অর্জ্জুনের হৃদয়ে ভক্তি-বিশ্বাসের উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবান্ তাঁর নিকট এক্ষণে স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে অগ্রসর। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩

অন্বয়—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি। যততাং সিদ্ধানাম্ অপি কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি॥ ৩

অনুবাদ—সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ আমাকে জানতে চেষ্টা করে এবং এরূপ চেষ্টা দ্বারা যাঁরা সাফল্য অর্জ্জন করেন—তাঁদের মধ্যেও ক্বচিৎ কেহ ঠিক ঠিক আমাকে উপলব্ধি করে থাকেন॥ ৩

প্রকৃত ভগবদ্‌বেত্তার সংখ্যা অতি বিরল

এ সংসারে এমন হাজার হাজার নরনারী আছে, যারা ধর্ম্ম ও ভগবদ্বিষয়ে একান্ত উদাসীন ও উপেক্ষাপরায়ণ—যারা এই জগতের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের ভোগ-সুখ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনরূপী সাধারণ জৈব জীবন নিয়েই যাদের আনন্দ ও তৃপ্তি—এরূপ সহস্র সহস্র বিষয়ী নর-নারীর মধ্যে ক্বচিৎ কোন কোন ব্যক্তি বিষয়ভোগের অসারতা ও ভীষণ পরিণাম উপলব্ধি ক'রে ধর্ম্মপথের পথিক হন। তবে যাঁরা এই ভাবে ধর্ম্মসাধনায় ব্রতী হন তাঁদের সকলেই যে সিদ্ধিলাভ করেন—তা নয়। বহু কালের ও বহু জন্মের সাধনার ফলেই এঁদের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ কেহ তাঁদের সেই অবলম্বিত সাধনমার্গে সাফল্য লাভ করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে আরও জানা আবশ্যক—সিদ্ধপুরুষেরাও সকলে পূর্ণরূপে ভগবদুপলব্ধি করেন না—একথার তাৎপর্য্য এই যে সাধারণ স্তরের যাঁরা সাধক, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ কল্পনানুযায়ী বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করে থাকেন এবং তাঁদের সেই সাধনার উদ্দেশ্যও থাকে কোন বিশেষ লৌকিক কামনার পরিপূর্ত্তি। অর্থাৎ, তাঁদের মধ্যে কেহ ধনপ্রাপ্তি, কেহ বিদ্যাপ্রাপ্তি, অপর কেহ যশঃ, মান, প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় সাধনা করে থাকেন। এরূপ সাধকদের সে সাধনা যদি আন্তরিক ও নিষ্ঠাযুক্ত হয়, তবে তা অবশ্য নিষ্ফল হয় না। কিন্তু এঁরা যেহেতু আত্মজ্ঞান বা ভদবদুপলব্ধির জন্য আদৌ আতুর নন, সেই হেতু তাঁরা তাঁদের অভীপ্সিত সেই কামনায় সিদ্ধিলাভ করলেও ভগবৎতত্ত্বের যে পরিপূর্ণ অনুভূতি তা তারা লাভ করেন না। তা'ছাড়া, অধ্যাত্মপথের সাধকদের মধ্যে কেহ কেহ হঠযোগাদির অনুশীলন ক'রে অণিমা-লঘিমাদি কিছু কিছু সিদ্ধাই লাভ ক'রে মনে করেন—তাঁরা সিদ্ধমনোরথ হয়েছেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের সেই অর্জ্জিত সিদ্ধাই বিদ্যা'

ও সত্যকার যোগসিদ্ধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। প্রত্যুতঃ, যাঁরা যথার্থ ভগবদ্বেত্তা তাঁরা ভগবানের পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি ক'রে তাতে ডুবে মজে, তাঁদের সেই উপলব্ধ সত্যের প্রচার-প্রচেষ্টায় তন্ময় হয়ে যান। আর গীতার মতে এঁরাই হচ্ছেন—যথার্থ জ্ঞানী ভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণাবতারে তাঁর লীলাপার্ষদ ছিলেন অনেকে। পরন্তু, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, বিদুর, উদ্ধব এবং গোপীদের মধ্যে দু এক জনই মাত্র তাঁর সত্যকার ভাবগ্রাহী ও পরম প্রিয় চিহ্নিত ভক্তরূপে পরিচিত ও প্রখ্যাত। শ্রীরামাবতারে লক্ষ্মণ, ভরত, সুগ্রীব, বিভীষণ ও পবননন্দন হনুমানই তাঁর ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত। বস্তুতঃ প্রত্যেক যুগাবতারের চিহ্নিত শিষ্য পার্ষদ সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। এতেই বোঝা যায়, শ্রীভগবান্‌কে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা আদৌ সহজসাধ্য নয়।

স্বীয় অপার ভাগবত মহিমার বর্ণনাপ্রসঙ্গে গীতাকার শ্রীভগবান্ এক্ষণে সৃষ্টিতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বললেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪

অন্বয়—ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খং মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ এব চ ইতি ইয়ং মে অষ্টধা ভিন্ন প্রকৃতিঃ॥ ৪

অনুবাদ—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট ভাগে আমার প্রকৃতি বিভক্ত॥ ৪

ভগবানের অপরা প্রকৃতির অষ্টবিধ তত্ত্ব

গীতার মতে শ্রীভগবানের প্রকৃতি অপরা ও পরাভেদে দু'প্রকার। উপরোক্ত শ্লোকে অপরা প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে শ্রীভগবান্ বললেন—আমার এই অপরা প্রকৃতি আট ভাগে বিভক্ত। সাংখ্যশাস্ত্রমতে কিন্তু সৃষ্টির মূল উপাদানরূপে যে প্রকৃতি—তার মূলে রয়েছে চব্বিশটি তত্ত্ব এবং সেগুলি হচ্ছে—মূল প্রকৃতি, মহৎ-তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব, অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত। গীতাতে এখানে সেই চব্বিশটি তত্ত্বকে সংক্ষেপে উপরোক্ত আট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

এক্ষণে এই মূল প্রকৃতি হতে কী ভাবে ক্রমিক পর্য্যায়ে বিশ্ব-চরাচরের আবির্ভাব ঘটেছে—তারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতির অপর একটি নাম হচ্ছে অব্যক্ত। অর্থাৎ, যে আদি কারণ হতে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি হয়েছে তার মূল স্বরূপ একান্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও ধারণার অতীত। প্রকৃতির সেই আসল স্বরূপ অচেতন ও জড় ; তবে তা প্রসবধর্ম্মী। চেতন পুরুষের সংস্পর্শে আসার ফলে তার মধ্যে চেতনার আভাস সঞ্চারিত হওয়ায় তা সচেতন ও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তখন তার সেই অব্যক্ত অবস্থার ভঙ্গ হয় এবং ক্রমশঃ তা পরিণামধর্ম্মী হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় তার প্রথম পরিণাম হয়—মহৎ-তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বে। একথা সহজে অনুমেয় যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা বিচারশক্তি ব্যতীত কাহারো মধ্যে কোন কিছু করার সংকল্প জাগ্রত হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে তাই প্রকৃতির মধ্যে জাগ্রত হয় সর্ব্বপ্রথমে এই বুদ্ধিতত্ত্ব। আর এই বুদ্ধিতত্ত্বের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে প্রকাশিত হয়—অহংকার বা অহংবুদ্ধি। এই অহংবুদ্ধির স্বভাব হচ্ছে —আমি, তুমি, তিনি' ইত্যাদি ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি। সাধারণতঃ দেখা যায়—যখনি কোন লোক আত্মাভিমানী বা অহঙ্কারী হয়ে উঠে তখন সে নিজকে অন্য হতে পৃথক্ ও প্রধান বলে মনে করে। মূল প্রকৃতির মধ্যেও যখনি অহঙ্কারের সৃষ্টি হল তখন তা'হতে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হল—বহু প্রকার ভেদবিকার। অহংকারের প্রাথমিক পরিণাম হল তাই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় —বিভাগ। এরই পরে অহঙ্কারের সৃষ্টিচাতুর্য্য দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে বহু বিচিত্র গুণ ও পদার্থের সৃষ্টিতে ব্যাপৃত হল। একদিকে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে সৃষ্টি হল পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—(বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ), অন্যদিকে সৃষ্টি হল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—(চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) এবং মনরূপী এই একাদশ ইন্দ্রিয়। অন্যদিকে তমোগুণের উৎকর্ষের দ্বারা সৃষ্টি হল—পঞ্চ তন্মাত্র বা পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত—(রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ) এবং সেই পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত হতে ক্রমশঃ আবির্ভূত হ'ল পঞ্চ স্থূল মহাভূত—(ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্)। উপরোক্ত শ্লোকটিতে সাংখ্যোক্ত এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে অষ্টধা প্রকৃতিরূপে।

এক্ষণে এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সৃষ্টিবিজ্ঞানের (Cosmology) পুরাতন ও আধুনিক মতবাদ কি—তাও সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে সৃষ্টির মূলে ছিল ৬০-৭০টি মৌলিক উপাদান (elements)। এক্ষণে সেই মতের ঘটেছে আমূল পরিবর্ত্তন। এখন তাঁরা বলছেন—সৃষ্ট জগতের অসংখ্য পদার্থসমূহ আবির্ভূত হয়েছে একটি মাত্র মৌলিক উপাদান হতে এবং সেটী হচ্ছে প্রোটাইল (Protyle)। তবে এই প্রোটাইল ও আমাদের হিন্দু দর্শনবর্ণিত মূল প্রকৃতি ঠিক এক বস্তু নয়। কারণ, পাশ্চাত্যের ভৌতিক বিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণা স্থূল জাগতিক স্তরেই নিবদ্ধ। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে কারণতত্ত্ব (causal state) তার সন্ধান তাতে নাই। পক্ষান্তরে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় দার্শনিক সাংখ্যকার কপিল এই গূঢ়তম রহস্যের উদ্ভেদ বা আবিষ্কার করেছিলেন—তাঁর প্রবর্তিত প্রকৃতিবাদের মাধ্যমে।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫

অন্বয়—মহাবাহো! ইয়ং তু অপরা ; ইতঃ মে অন্যাং জীবভূতাং পরাং প্রকৃতিং বিদ্ধি যয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে॥ ৫

অনুবাদ—মহাবাহো! ইহা আমার অপরা প্রকৃতি। ইহা ছাড়াও জীবরূপ আমার অন্য একটি পরা প্রকৃতি আছে জানিও। আমার সেই পরা প্রকৃতির দ্বারা বিশ্ব চরাচর বিধৃত হয়ে আছে॥ ৫

ভগবানের পরা প্রকৃতিই জীব-জগতের ধারক

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বললেন—হে মহাবাহো, আমার অপরা প্রকৃতির স্বরূপ পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, এক্ষণে আমার পরা প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমাকে যা বলছি তা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। আমার এই পরা প্রকৃতি হচ্ছে—জীবের অন্তর্নিহিত চৈতন্যশক্তি। ইহাই বিশ্বচরাচরের আধার ও অবলম্বন। আমার এই চৈতন্যরূপিণী পরা প্রকৃতির দ্বারাই বিশ্বচরাচর বিধৃত। প্রাণবায়ু যেমন দেহের আধার এবং তাকে আশ্রয় করেই দেহ চৈতন্যময় ও সক্রিয়, তেমনি আমার চৈতন্যশক্তির আশ্রয়ে এই জীবজগৎ বিধৃত হয়ে আছে। আর এই জীবচৈতন্য সর্ব্বভূতের অন্তরে অধিষ্ঠিত থেকে তাদের

পরিচালনা করছে ; তবে এই চৈতন্যশক্তি সর্ব্বভূতে সমভাবে পরিস্ফুট নয়। কোথাও এই শক্তি অধিক প্রকট, কোথাও তা অপ্রকট। যে বস্তুর মধ্যে এই শক্তির বাহ্য প্রকাশ স্থূল দৃষ্টিতে ধরা না পড়ে, তা জড় বলে অভিহিত হয়। তবে সেই জড় বস্তুর অন্তঃস্থলেও এই চৈতন্যশক্তি অতি সূক্ষ্মভাবে বিরাজমান থাকে এবং তা থাকে বলেই তার অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় না। আধারের আশ্রয়ে যেমন আধেয়ের অস্তিত্ব, ঠিক তেমনি শ্রীভগবানের পরা প্রকৃতিরূপিণী চৈতন্যশক্তির আশ্রয়ে জীব জগৎরূপ আধেয় প্রাণবন্ত ও ক্রিয়াশীল। বস্তুতঃ, এই দৃষ্টিতে এই জগতে জড় বলে কোন বস্তু নাই। এই অধ্যাত্ম দৃষ্টি নিয়েই কবি গেয়েছেন—

"আছ অনলে অনিলে চির নভোনীলে
ভূধরে সলিলে গহনে।
আছ বিটপী-লতায় জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে।।"

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।। ৬

অন্বয়—সর্ব্বাণি ভূতানি এতৎ যোনীনি ইতি উপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ।। ৬

অনুবাদ—সমস্ত ভূত এই দুটি প্রকৃতি হতে জাত ইহা জানিও। সুতরাং, আমি নিখিল জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ।। ৬

গীতামৃত—হে অর্জ্জুন, আমার অপরা ও পরা প্রকৃতির স্বরূপ কি—তা এতক্ষণ শুনলে। এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলছি—শুন। আমার যে জড়া অপরা প্রকৃতি তা হচ্ছে জীবদেহের উপাদান কারণ এবং আমার যে চৈতন্যরূপিণী পরা প্রকৃতি তাই জীবদেহের আধারভূতা ধারণাশক্তি। আর যেহেতু এ দুই প্রকৃতি কর্ত্তা আমি—সেই কারণে আমি বিশ্বজীবের স্রষ্টা ও প্রলয়কর্ত্তা। আমিই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—সমস্ত কিছুর মূল।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।। ৭

অন্বয়—ধনঞ্জয়! মত্তঃ পরতরং অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি। সূত্রে মণিগণাঃ ইব ইদং সর্ব্বং ময়ি প্রোতম্।। ৭

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! আমা হতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আর কিছুই নাই। সূত্রে গাঁথা মণিসমূহের ন্যায় সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠানস্বরূপ আমাতে এই সমস্ত জগৎ বিদ্যমান রয়েছে।। ৭

গীতামৃত—হে অর্জ্জুন, আমার তত্ত্ব ও মহত্ত্ব-গৌরব অতুলনীয়। আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কি আছে এবং কি বা হতে পারে? সূত্রে যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে তেমনি আমাতেই সব কিছু গ্রথিত। আমিই সব কিছুর একমাত্র আধার ও অবলম্বন। আমার মহিমা গরিমা তাই অশেষ ও অপার।

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।। ৮

অন্বয়—কৌন্তেয়! অহম্ অপ্সু রসঃ, শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা, সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ, খে শব্দঃ, নৃষু পৌরুষম্ অস্মি।। ৮

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! জলে আমি রস, শশিসূর্য্যে আমি প্রভা, সর্ব্ববেদে আমি প্রণব বা ওঁকার, আকাশে আমি শব্দ, মনুষ্য মধ্যে আমি পৌরুষরূপে বিদ্যমান।। ৮

গীতামৃত—শ্রীভগবানের অস্তিত্ব ও অধিষ্ঠানের জন্যই এই জগতের সব কিছুর মহত্ত্ব-গৌরব। তাঁর অস্তিত্ব আছে বলেই জল রসযুক্ত, চন্দ্র-সূর্য্য প্রভাসম্পন্ন। প্রণবরূপে বেদে তিনি বিদ্যমান আছেন বলেই বেদের এত মহিমা গরিমা, তাঁর অস্তিত্ব আছে বলেই আকাশ শব্দযুক্ত ও মনুষ্য পৌরুষশালী ; অর্থাৎ ভগবানই সব কিছুর সার ও প্রাণস্বরূপ।

এই প্রসঙ্গে পৌরুষং নৃষু"—এই ভগবদ্বাক্যের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই সংসারে দুই শ্রেণীর মনুষ্য পরিদৃষ্ট হয়। একদল আছে যারা একান্ত আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদাহীন, অন্য দল আছে যারা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদাজনিত অহংকার অভিমানে স্ফীতবক্ষঃ। বলাবাহুল্য, এ উভয় প্রকার মনুষ্যই ঐহিক ও পারত্রিক জীবনে একান্ত অসুখী ও অশান্ত। ইহাদের দুঃখ-ক্লেশ ও অসুখ-অশান্তির কারণ ভিন্ন প্রকারের

সন্দেহ নাই। পরন্তু, উপরোক্ত ভগবদ্-বাক্যের মর্ম্মার্থ উদ্ঘাটন করলে ইহাদের সুস্পষ্ট সমাধান পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদার অভাবে একান্ত নিস্তেজ ও হতমান হওয়ায় যাঁরা জীবনসংগ্রামে পদে পদে পরাজিত ও পরাভূত, তাঁরা যদি উপলব্ধি করতে পারেন—শ্রীভগবান্ পৌরুষ-মূর্ত্তিরূপে তাঁদের হৃদয়ে বিদ্যমান,—তাঁরা ব্রহ্মকুমার ও অমৃতের সন্তান, অনন্ত শক্তিশালী পরমাত্মরাই তাঁরা অংশস্বরূপ—সুতরাং, তাঁরাও নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা—তখন সেই নিরাশা নিরুদ্যম হতে পরিমুক্ত হয়ে বিপুল বিক্রমে জীবনযুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্য প্রযত্নশীল হতে পারেন।

পক্ষান্তরে, যারা অতিমাত্র আত্মবিশ্বাসের দরুণ অভিমানগর্ব্বে স্ফীত হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং এরূপ আত্যন্তিক গর্ব্বই যাদের পতনের কারণ—তারা যদি ধীর স্থির হয়ে বিচার করে—শ্রীভগবান্ই একমাত্র সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁর শক্তিতে সব কিছু শক্তিমান, তাঁর প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য ব্যতীত জীবের পক্ষে ক্ষণেকের তরেও জীবন ধারণ অসম্ভব, তাঁর ইচ্ছাতেই চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র স্ব স্ব কক্ষে ভ্রাম্যমাণ, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত বৃক্ষের একটি পত্রও পতিত হয় না, এককণা ধূলিও উত্থিত হয় না, তিনিই আমাদের একমাত্র প্রাণ ও যথাসর্ব্বস্ব, তবে তাদের সমস্ত গর্ব্বাভিমান মুহূর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে যায়। তখন তাদের মধ্যে এই বুদ্ধি জাগ্রত হয় যে শ্রীভগবান্ই তাদের দেহরথের একমাত্র সারথি ও পরিচালক।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ভগবদ্বাক্যের এই উভয়বিধ অর্থই প্রকৃতিভেদে জীবের অশেষ কল্যাণপ্রদ।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯

অন্বয়—পৃথিব্যাং চ পুণ্যঃ গন্ধঃ বিভাবসৌ চ তেজঃ অস্মি। সর্ব্বভূতেষু জীবনং তপস্বিষু চ তপঃ অস্মি॥ ৯

অনুবাদ—আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজঃ, সর্ব্বভূতে জীবন এবং তপস্বিগণের তপঃ স্বরূপ॥ ৯

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০

অন্বয়—পার্থ! মাং সর্ব্বভূতানাং সনাতনং বীজং বিদ্ধি। অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ তেজস্বিনাং চ তেজঃ অস্মি॥ ১০

অনুবাদ—হে পার্থ, আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলে জেনো। আমি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি ও তেজস্বিগণের তেজঃস্বরূপ॥ ১০

গীতামৃত—বীজ হতে যেমন বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তেমনি ঈশ্বর হতে যাবতীয় ভূতগণের উৎপত্তি ঘটে। অর্থাৎ, তিনিই সবকিছুর আদিকারণ ও আদিতন উৎস। এই সংসারে সুতীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন মনুষ্যগণের যে অতুল বুদ্ধিমত্তা এবং তেজস্বিগণের যে অসামান্য তেজোবীর্য্য, তাঁর মূলেও তিনি বিদ্যমান। অর্থাৎ, ঈশ্বর ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব ও মহত্ত্ব গৌরব কিছুই নাই। হে সখে! তুমি আমাকে এই রূপে সব কিছুর মূল বলে জান।

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১

অন্বয়—ভরতর্ষভ! অহং বলবতাং কামরাগবিবর্জ্জিতং বলং চ। ভূতেষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামঃ অস্মি॥ ১১

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ, আমি বলবানদের কামাসক্তিরহিত বল এবং প্রাণিগণের মধ্যে ধর্ম্মের অপ্রতিকূল কাম॥ ১১

গীতামৃত—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, বলশালী ব্যক্তিদের মধ্যে যে সৎসাহস ও সাত্ত্বিক বল পরিদৃষ্ট হয় তাও আমি। তা ছাড়া, জীবগণের হৃদয়ে যে ধর্ম্মানুকূল পবিত্র কামনা, তাও আমি। অর্থাৎ, যে বিশুদ্ধ বলবীর্য্যের দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধিত হয় এবং যে পবিত্র কামপ্রবৃত্তির দ্বারা সংসারে মহান্ ও আদর্শনিষ্ঠ পুত্র-কন্যার আবির্ভাব হয়, তার মধ্যেও আমার অস্তিত্ব বিদ্যমান্। অর্থাৎ, জীবের যে শুভবুদ্ধি, সাত্ত্বিক ও লোকহিতমূলক বীর্য্যবত্তা তাও আমার অবদান ব্যতীত আর কিছু নয়।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২

অন্বয়—যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ রাজসাঃ তামসাঃ ভাবাঃ তান্ সর্ব্বান্ মত্তঃ এব ইতি বিদ্ধি তেষু অহং ন তু তে ময়ি॥ ১২

অনুবাদ—জীবের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবমূহ আমা হতে জাত। সে সকলে আমি অবস্থিত নই, কিন্তু সে সকল আমাতে অবস্থিত॥ ১২

রজঃতমোগুণ-প্রসূত দুর্গুণের উৎপত্তি

ভগবান্‌কে আমরা সাধারণতঃ কল্যাণময়, দয়াময়, ন্যায়বান্, আনন্দময় ও সত্যস্বরূপ ব'লে জানি ও মানি। ভগবানের এই গুণ ও বিশেষণগুলি সাত্ত্বিক ভাবের দ্যোতক। সুতরাং, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা যে সত্ত্বগুণের প্রতিমূর্ত্তি এবং জগতের যাবতীয় মঙ্গল ও শান্তিপ্রদ গুণগুলি যে তা হতে নির্গত তা আমরা অনায়াসেই ধারণা করতে পারি। পরন্তু, দম্ভ, ক্রূরতা, অসূয়া, ক্রোধাদি দুষ্প্রবৃত্তিমূলক রজোগুণ এবং দুঃখ, শোক, মোহ, অজ্ঞানতামূলক তমোগুণসমূহ কীরূপে ভগবান্ হতে প্রসূত হতে পারে? কেমন করে সাত্ত্বিক ভাবের সঙ্গে রাজসিক ও তামসিক ভাব বা প্রবৃত্তিগুলিও সর্ব্বগুণাধার মঙ্গলময় পরমাত্মা হতে আবির্ভূত হতে পারে? অর্থাৎ, ভগবান্ কেন এবং কীরূপে সুখের সঙ্গে দুঃখ, পুণ্যের সঙ্গে পাপ, মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গল, দয়া ও ক্ষমার সঙ্গে নির্দ্দয়তা ও প্রতিহিংসা প্রভৃতি দোষগুলি সৃষ্টি করতে পারেন? আর এমন হলে তাঁকে কেমন করে কল্যাণয়, করুণাময় ও ক্ষমাসুন্দর ব'লে গ্রহণ ও বরণ করা যায়? সু ও কু, সৎ ও অসৎ এই পরস্পরবিরোধী গুণগুলি কীভাবে ভগবানে একত্র সমাবিষ্ট হতে পারে?—আদিতন যুগ হতে জিজ্ঞাসু মনের এটি একটি চিরন্তন নিগূঢ় প্রশ্ন।

জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলি উপরোক্ত প্রশ্নটির উত্তর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিতে চেষ্টা করেছেন। পারসিক, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মমতগুলি এই প্রশ্নটির সমাধান দিতে চেষ্টা করেছেন—শয়তান-তত্ত্বের মাধ্যমে। তাঁরা বলেন, এই পরিদৃশ্য-মান জগতে যা কিছু সত্য, শিব ও সুন্দর, তাঁর কর্ত্তা বা স্রষ্টা হচ্ছেন মঙ্গলময় ঈশ্বর এবং যা কিছু অসত্য, অমঙ্গল ও কদর্য্য —তার মূলে হচ্ছে শয়তান। অর্থাৎ, ভগবানের সমান্তরাল শক্তি শয়তানের প্ররোচনাতেই এই সংসারে পাপ-তাপ, অসুখ-অশান্তি, অনাচার-অবিচারের

সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা আরও বলেন—মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছা ছিল, তাঁর সন্তানগণ তাঁর সৃষ্ট এই জগতে তাঁর নির্দ্দেশমত চ'লে সুখে শান্তিতে কাল যাপন করুক। পরন্তু, শয়তানের দুর্বুদ্ধির প্রেরণায় যখন তারা বিপথগামী ও ভ্রষ্টচারী হয়ে পাপের পথে প্রবৃত্ত হল তখনই তাদের জীবন হয়ে উঠল দুঃসহ ও দুর্বহ। আর বস্তুতঃ, সেই সময় হতে মানুষের জীবনে যে পাপতাপের সৃষ্টি হয়েছে তাতেই মানব সমাজ চিরকাল অমঙ্গল ও অশান্তির অগ্নিতে জ্বলে পুড়ে অহরহঃ ক্লিষ্ট ও সন্তপ্ত হচ্ছে। এদের উদ্ধারের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন জরথুষ্ট্র, মুসা, ঈশা ও মহম্মদ। এদের মতে তাঁদের আশ্রয়-অনুগ্রহ লাভ না করা পর্য্যন্ত মানব সমাজের উদ্ধার বা পরিত্রাণ নাই। পরন্তু, যুক্তিবাদের দিক দিয়ে বিচার করলে এরূপ সমাধান টিকে কি? সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সৃষ্ট সংসারে শয়তান নামক এক শক্তির এতখানি অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য ও দৌরাত্ম্য কী করে সম্ভবপর? এরূপ শক্তিকে শায়েস্তা করার শক্তি-সামর্থ্য যদি ভগবানের না থাকে তবে তার দ্বারা তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তার গৌরব মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাকি? এই কারণে আজ পাশ্চাত্ত্য জগতে এমন একশ্রেণী যুক্তিবাদীর আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা বাইবেল-বর্ণিত এই শয়তানবাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন। বস্তুতঃ, বিবেক-বিচারের দৃষ্টিতে জগতের দুঃখ, কষ্ট ও অমঙ্গলের কারণরূপী এই শয়তান-তত্ত্ব একান্তই অযৌক্তিক, ভ্রান্ত ও অলীক।

আর একশ্রেণীর পণ্ডিত বলেন—কর্ম্মবাদই জগতের সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য ও মঙ্গল-অমঙ্গলের মুখ্য কারণ। এই সিদ্ধান্তের মতে কর্মনীতি হচ্ছে অটল ও অপরিবর্ত্তনীয়। অর্থাৎ, মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তি বশে ভাল-মন্দ যে সমস্ত কর্ম্ম করে তার ফলেই তাকে এ জগতে সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য ভোগ করতে হয়। চলিত কথায়ও বলা হয়—"যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।" সুতরাং, জগতের এই অমঙ্গল ও দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য ভগবানকে দায়ী করা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। পরন্তু, উচ্চতম বিচারের দৃষ্টিতে এই কর্ম্মবাদও একান্ত নির্ভুল ও অকাট্য নয়। কেন না, যুক্তিবাদীরা এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন করেন—কর্ম্মই যদি জগতের পাপ-পুণ্য ও সুখ-দুঃখের স্রষ্টা বা নিয়ন্তা তবে এই সংসারে ভগবানের স্থান কোথায় এবং তাঁর প্রয়োজনই বা কি? তবে সুখ-শান্তি লাভের জন্য 'ভগবান্ ভগবান্' ক'রে এত হৈ-চৈ করা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে এত পূজা-প্রার্থনা করা কেন? এমতাবস্থায় ভগবানকে পূজা না ক'রে কর্ম্মকেই

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা মনে করে তারই পূজা করা উচিত নয় কি? বস্তুতঃ, কর্ম্মবাদকে এই ভাবে স্বীকৃতি দান করলে বিশ্বস্রষ্টারূপী ভগবানের স্বীকৃতির তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

বলা বাহুল্য, কর্ম্মবাদকে এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার ফলেই চার্ব্বাক-পন্থী, সাংখ্যবাদী, বৌদ্ধ ও জৈনপন্থীরা স্রষ্টারূপী ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকারে প্রস্তুত হন নি। কর্ম্মকেই তাঁরা অনাদি, অনন্ত ও সর্ব্বনিয়ন্তা বলে মেনে নিয়েছেন। বস্তুতঃ এইরূপ নাস্তিক্যমূলক কর্ম্মবাদের প্রচারের ফলে তদানীন্তন সমাজজীবনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়, তার পরিণাম হয় অত্যন্ত ভয়াবহ ও হানিকর এবং এই কারণেই ঐরূপ নাস্তিক্যবাদ-মূলক কর্ম্মবাদ ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে তেমন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

উপনিষদ, গীতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ উক্ত মতবাদের একান্ত বিরোধী। এঁদের মতে ভগবান্ হতে সত্ত্ব, রজঃ, তম এই গুণত্রয়ের আবির্ভাব এবং তিনিই ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, মঙ্গল-অমঙ্গলের স্রষ্টা। পরস্পরবিরোধী হলেও এই গুণ ও ভাবগুলি তাঁর মধ্যেই নিহিত এবং সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার জন্য এরূপ বিরুদ্ধ গুণের সন্নিবেশ একান্ত প্রয়োজন ও অনিবার্য্য। কেন না, সু ও কু, সৎ ও অসৎরূপী দ্বন্দ্ব ব্যতীত সৃষ্টির কর্ম্মপ্রবাহ চলে না। মনে কর, জগতে যদি অব্যাহত ভাবে নিরন্তর জন্ম হতে থাকে এবং সেই সমস্ত জাত জীবকুলের মৃত্যু বা বিনাশের কোনও ব্যবস্থা না থাকে তবে এই সংসারে এইরূপ সৃষ্টিপ্রবাহের পরিণাম কি হয়? অথবা, এ জগতে যদি কেবলমাত্র সুখের বিধান প্রবর্ত্তিত থাকে এবং তাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখের স্থান না থাকে তবে সেই সুখ প্রীতিপ্রদ বলে মনে হয় কি? অর্থাৎ, মৃত্যু আছে ব'লেই জন্মের মহত্ত্ব এবং দুঃখ আছে ব'লেই সুখের কদর অনুভূত হয়। সর্ব্বনিয়ন্তার সৃষ্ট বিশ্বনাট্যে এজন্য এই বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের লীলা-খেলা। তবে এই প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক—পরমাত্মার সগুণ ঈশ্বরভাবের মধ্যেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপী এই ত্রিগুণের খেলা বিদ্যমান, তার নির্গুণ, নিরুপাধি ও নির্ব্বিকার যে রূপ —তার মধ্যে এর স্থান নাই। শ্রীভগবান্ তাই এই শ্লোকের অন্তিমভাগে অর্জ্জুনকে এই ভাবটি স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণগুলি আমা হতে জাত এবং তারা আমাতেই বিদ্যমান বটে কিন্তু আমি যেখানে নির্গুণ ও অক্ষররূপে অবস্থিত সেখানে এসব কিছুই

নাই। অহিন্দুর দৃষ্টিতে এই তত্ত্বটি যে একান্তই জটিল, দুর্ব্বোধ্য ও রহস্যপূর্ণ ব'লে বিবেচিত হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

হিন্দুধর্ম্মের আর একশ্রেণীর দার্শনিক আছেন যাদের মতে এই সংসারে দুঃখ বলে কোন বস্তুই নাই। উপনিষদের শ্লোক উদ্ধৃত করে তারা প্রমাণ করতে চান—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।।" জীব সেই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা হতেই এসেছে। আনন্দের দ্বারাই সে বেঁচে আছে এবং সেই আনন্দ-স্বরূপেই আবার সে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ, এই বিশ্ব-সংসার হচ্ছে ভগবানেরই লীলাবিলাস। জীবের দুঃখ, অশান্তি ও মানসিক বিকারগুলি শুধু অজ্ঞানের স্তরেই নিহিত। মানুষ যখন সাধনার দ্বারা তার দিব্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিরন্তর অন্তঃসুখ ও অন্তরারাম অনুভব করে, তখন তার দৃষ্টিতে পাপ-তাপ, অসুখ-অশান্তি ব'লে আর কিছুই থাকে না। তবে এক্ষেত্রেও একটি প্রশ্ন আসে —মানুষ কি সাধনার এই সুউচ্চ আনন্দময় ভূমিতে চির প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—সুদুর্লভ এই আনন্দময় দিব্য অনুভূতি কেবলমাত্র সমাধিগম্য। সমাধির স্থিতি হতে ব্যুত্থিত হয়ে সাধক যখন লৌকিক স্তরে অবতরণ করেন তখন তিনি আবার জগতের সুখ-দুঃখ ও শুভাশুভের প্রতিক্রিয়ায় অল্পবিস্তর বিচলিত না হয়ে পারেন না এবং এই স্তরেই তাঁরা লোকসংগ্রহে ব্রতী হয়ে ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীর উদ্ধারে বদ্ধপরিকর হন।

এদিক দিয়ে বিচার করলে বেদান্তের আত্যন্তিক আনন্দবাদ ও বৌদ্ধদর্শনের আত্যন্তিক দুঃখবাদ—এই উভয় মতবাদই অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী। এদের কোনটির মধ্যে উপরোক্ত প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা পাওয়া যায় না।

শ্রীভগবান্ নিজেই পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে এবিষয়ে স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়ে বলছেন—

'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।' আমার এই সৃষ্ট জগৎ অনিত্য ও অসুখকর। এখানে এসে আমার ভজনা কর। অর্থাৎ, আমার সৃষ্ট জগতে দুঃখ-ক্লেশ আছে, তবে তা হতে মুক্তির উপায় যে নাই তা নয়। আর সে উপায় হচ্ছে—আমাতে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আমার প্রসন্নতার জন্য আমার নির্দ্দেশিত পথে সাধনব্রতী হওয়া।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌॥ ১৩

অন্বয়—এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ ইদং সর্ব্বং জগৎ মোহিতম্‌। এভ্যঃ পরম্‌ অব্যয়ম্‌ মাং ন অভিজানাতি॥ ১৩

অনুবাদ—এই ত্রিবিধ গুণের দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হয়ে আছে। এই জন্য জীব আমার অব্যয় আনন্দস্বরূপ অবগত হতে পারে না॥ ১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪

অন্বয়—মম এষা গুণময়ী দৈবী মায়া হি দুরত্যয়া। যে মাম্‌ এব প্রপদ্যন্তে তে এতাং মায়াং তরন্তি॥ ১৪

অনুবাদ—আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া একান্ত বিচিত্র ও দুস্তর। একমাত্র যারা আমার শরণাপন্ন হয়ে আমার ভজনা করে তারাই তা (মায়া) হতে উদ্ধার পায়॥ ১৪

ভগবানই বন্ধনকর্ত্তা ও মুক্তিদাতা

জীবের বন্ধনকর্ত্তা ও মুক্তিদাতা—দুইই আমি। 'আমি সাপ হয়ে কাটি এবং ওঝা হয়ে ঝাড়ি।' ভগবানের এই মোহিনী মায়াকে শাস্ত্রে বলা হয়েছে —অনির্ব্বচনীয়'। এই মায়াতত্ত্ব সত্য সত্যই একান্ত দুর্বোধ্য। কাদা দিয়ে যেমন কাদা ধোয়া যায় না, তেমনি মায়ার মধ্যে থেকে মায়ার স্বরূপকে উপলব্ধি ও বর্ণনা করা যায় না।

বেদান্ত শাস্ত্রমতে মায়ার শক্তি আবার দ্বিবিধ—আবরণ ও বিক্ষেপ। অর্থাৎ, মায়া স্বীয় অজ্ঞানরূপ আবরণ-সহায়ে এক ভাবে এবং বিক্ষেপ-শক্তি সহায়ে অন্যভাবে জীবের অন্তঃকরণে জীব-ব্রহ্মের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করে এবং তারই ফলে জীব অভিমানে স্ফীত হয়ে নিজেকে আমি কর্ত্তা', আমি ভোক্তা', আমি অনুমন্তা' এরূপ কল্পনা করে মোহগ্রস্ত হয়।

বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মতে মায়ার ব্যাখ্যা

'মায়া' শব্দটির সাধারণ অর্থ অজ্ঞান বা অবিদ্যা হলেও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ এই শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা ও ব্যবহার করেছেন। আচার্য্য শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে মায়া হচ্ছে অলীক, অবাস্তব ও স্বপ্নবৎ মিথ্যা। স্বপ্নকালে মানুষ যেমন কত কি দেখে এবং স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যসমূহ মুহূর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে যায় —এও কতকটা তদ্রূপ। তবে শঙ্করের এই মায়াবাদের মতে এই নামরূপাত্মক জগতের কোন পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকলেও তার ব্যবহারিক অস্তিত্ব অবশ্যই আছে ; তাই এই সিদ্ধান্তের মতে বলা হয়—ইহা সৎও নয়, অসৎও নয়। জ্ঞান হলে যেমন অজ্ঞান থাকে না, ব্রহ্মজ্ঞান হলে তেমন জগৎভ্রম বিদূরিত হয়। জ্ঞানী তখন বাস্তব জগৎ বা দৃশ্যপ্রপঞ্চের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন। অন্ধকারে পরিদৃষ্ট রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রকাশকালে চিরতরে মিটে যায়। তখন রজ্জুকে নিরন্তর রজ্জুরূপে দেখা ও অনুভব করা সম্ভব হয়। সত্যকার জ্ঞানদৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা বা অসৎ। পক্ষান্তরে, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা নয়, একটা কিছু আছে বলে সকলেই তাকে অনুভব করে—তাই বলা হয়, ইহা সৎও নয়, অসৎও নয়।

অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মের লক্ষণও দ্বিবিধ—স্বরূপ ও তটস্থ। স্বরূপ-লক্ষণে ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, নির্গুণ, অব্যয়, অচিন্ত্য ইত্যাদি। আর তটস্থ-লক্ষণে তিনি সগুণ, সবিশেষ ও উপলব্ধিগম্য। অদ্বৈতবাদের মতে ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণ—গৌণ ও অসত্য এবং স্বরূপ-লক্ষণ—মুখ্য ও সত্য।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ উপরোক্ত মত স্বীকার করেন না। এই মতে ব্রহ্মের সবিশেষ-লক্ষণ মিথ্যা নয়—সত্য। তাঁরা আরও বলেন—এই দৃশ্য জগৎ ব্রহ্ম হতে আবির্ভূত—ইহা তাঁর শরীর। সুবর্ণ হতে যেমন বলয়-কুণ্ডলাদি বিবিধ অলঙ্কার সমূহ নির্ম্মিত হয় তেমনি এই ব্রহ্মই নামরূপাত্মক জগৎরূপে রূপায়িত হয়েছেন। ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েছেন ব'লে এই মতবাদকে পরিণামবাদ' বলা হয়। পক্ষান্তরে, অদ্বৈত মতে নির্গুণ ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব এবং জীবজগৎ মায়া-বিজৃম্ভিত ব'লে তা স্বপ্নবৎ মিথ্যা। এই মতে ব্রহ্মই একমাত্র ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। সাধনার দ্বারা ও গুরুকৃপায় এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে জগদ্‌ভ্রম যখন চিরতরে বিদূরিত হয়ে যায় তখন

শুধু অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তাই নিরন্তর উপলব্ধ হয়। জীব ও জগৎ মায়াবিজৃম্ভিত ব'লেই এই মতবাদকে বলা হয়—বিবর্ত্তবাদ'।

দ্বৈতবাদের মতে মায়া হচ্ছে—ভগবানের শক্তি। তা মিথ্যা নয়; এই মতে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ নিত্য সত্য।

পক্ষান্তরে, সাংখ্য মতে মায়া হচ্ছে—প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, তিনি জড়া হয়েও প্রসবধর্ম্মিণী; চেতন পুরুষের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী অপারা ক্রিয়াশক্তি। প্রকৃতির মোহিনী শক্তির প্রভাবে নির্ব্বিকার পুরুষের ঘটে বন্ধনদশা; সাংখ্য মতে তাই প্রকৃতির বশ্যতাই জীবের বন্ধনের কারণ।

আবার তন্ত্রশাস্ত্রমতে মায়া হচ্ছেন আদ্যাশক্তি। তিনি শুধু ব্রহ্মের শক্তি নন—তিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপিণী, তিনিই ঈশ্বরী; সুতরাং, তান্ত্রিকের উপাস্যা দেবী হচ্ছেন—জগজ্জননী মহামায়া।

উপরোক্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মতে মায়ার প্রভাব হতে মুক্তির উপায়

পূর্ব্বে বলা হয়েছে, অদ্বৈতবাদীর মতে মায়ারূপ অজ্ঞানের মোহ হতে মুক্তির উপায় হচ্ছে—সত্যকার জ্ঞানের সাধনা আর এজন্য প্রয়োজন—নিত্যানিত্য বিবেক-বিচার। এই সাধনায় পুরুষকারের স্থান সর্ব্বোচ্চ। এই সাধনায় সদ্‌গুরুর সাহায্য সহায়তার আবশ্যকতা আছে সত্য, তবে এই জ্ঞানলাভে গুরুর কৃপাশিসের চেয়ে অধিক প্রয়োজন—পুরুষকারের।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীর মতে দুস্তর মায়ার বন্ধন হতে নিস্তার পাওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে—ভগবৎ শরণাগতি। উপরোক্ত শ্লোকে এই উপদেশ দিয়ে এখানে শ্রীভগবান্ স্বীয় শরণাগত শিষ্য অর্জ্জুনকে বলছেন—আমাকে একান্ত ভাবে আশ্রয় করলেই আমার অনুগ্রহে জীব মায়ার বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করে ধন্য হয়।

সাংখ্যবাদীর মতে মায়া বা প্রকৃতির বশ্যতা হতে মুক্তির উপায় হচ্ছে—পুরুষ-প্রকৃতির বিভেদবিচার। অর্থাৎ, পুরুষের সত্যকার স্বরূপ হচ্ছে—নির্ব্বিকার ও আনন্দময়। চঞ্চলা প্রকৃতির বশ্যতা তাকে মোহগ্রস্ত করেছে ব'লেই তিনি বন্ধনগ্রস্ত। বিবেক-বিচারের সাহায্যে সেই বশ্যতার প্রভাবমুক্ত

হওয়াই তার পরম পুরুষার্থ। এই সাধনমার্গে তাই পুরুষকারের স্থান সর্ব্বাধিক। শরণাগতি বা কৃপাবাদের স্থান এখানে নাই।

তান্ত্রিক সাধনায় মহামায়াই সাধকের উপাস্যা দেবী। সুতরাং, তাঁর কৃপাশিসই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। দ্বৈতবাদী ভক্ত ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে তাঁর শক্তিরূপিণী মায়াকে জয় করেন; পক্ষান্তরে, তান্ত্রিক সাধক মায়াকেই তাঁর ইষ্টদেবী মনে করে তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য সর্ব্বপ্রকারে প্রযত্নশীল হন। মাতৃচরণে প্রার্থনা নিবেদন করে তাঁরা তাই বলেন—

> শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণে
> সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

গীতা মুখ্যতঃ দ্বৈতবাদের সমর্থক

গীতায় নির্গুণ ব্রহ্ম ও অদ্বৈতবাদের সাধনার বিশেষ ইঙ্গিত থাকলেও গীতা মুখ্যতঃ দ্বৈতবাদমূলক ভক্তিগ্রন্থ। তাই উপরে বর্ণিত শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করে মুমুক্ষু সাধকগণকে নির্দ্দেশ দিয়ে বলছেন—স্বল্পশক্তি অজ্ঞান জীবের সাধ্য কি আমার দৈবী মায়াকে সে নিজের পুরুষার্থের দ্বারা জয় করতে সমর্থ হবে? একমাত্র আমিই জীবের উদ্ধারকর্ত্তা। সুতরাং, তার পরম ও একমাত্র কর্ত্তব্য—আমার দয়ার উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে আমার শরণাগত হওয়া।

> **ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।**
> **মায়য়াঽপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫**

অন্বয়—দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ নরাধমাঃ আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে॥ ১৫

অনুবাদ—পাপ-কর্ম্মপরায়ণ মূঢ় নরাধম ব্যক্তিগণ মায়াভিভূত হয়ে আসুর স্বভাবপ্রাপ্ত হওয়ায় আমাকে ভজনা করে না॥ ১৫

ভক্তিপথের প্রধানতম অন্তরায় হচ্ছে—পাপপ্রবৃত্তি

জগতের অধিকাংশ নরনারী সংসারমোহে মুগ্ধ। অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে তারা নিরন্তর অনাচার ও পাপকর্ম্মে নিরত। তাদের সংস্কার একান্ত তামসিক ও

রাজসিক। এই প্রকারের তামসিক ও আসুরিক ভাব ও প্রবৃত্তি তাই তাদিগকে একান্ত ভগবদ্বিমুখ করে রাখে। সৎকথা, সৎসঙ্গ, সদালোচনায় রুচি না থাকায় ধর্ম্মবিষয়ে সহজে তাদের অন্তরে জিজ্ঞাসার ভাব উদিত হয় না। এরূপ ইহসর্ব্বস্ব নরনারীকে লক্ষ্য করেই শ্রীভগবান্ এখানে বলছেন—এরূপ পাপমতি ব্যক্তিরা কদাপি আমার ভজনা করে না।

সঙ্ঘগুরু আচার্য্য প্রণবানন্দ স্বীয় সাধক সন্তানগণকে লক্ষ্য ক'রে এ বিষয়ে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—বহু জন্মের সুকৃতি ও সৌভাগ্যবশে আজ তোমরা এই সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসিয়া পড়িয়াছ। সুতরাং, তোমাদের বিশেষ ভয় করিবার বা ভাবিবার কিছুই নাই। বহু জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি সৌভাগ্য ভিন্ন মানুষের জীবনে এরূপ ভগবৎ কৃপা লাভের সুযোগ সুবিধা ঘটে না।"

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬

অন্বয়—ভরতর্ষভ! আর্ত্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী জ্ঞানী চ চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ মাং ভজন্তে॥ ১৬

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন, যে সমস্ত সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন তাঁরা চতুর্ব্বিধ—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী॥ ১৬

গীতামৃত—ভক্তিশাস্ত্রে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ভক্তের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়—সকাম ও নিষ্কাম। গীতায় কিন্তু এখানে শ্রীভগবান্ ঘোষণা করলেন তাঁর ভক্ত চতুর্ব্বিধ—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। এখানে অন্যান্য ভক্তের তুলনায় শ্রীভগবান্ জ্ঞানী ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন। এক্ষণে আসুন, আমরা গীতার দৃষ্টিতে উক্ত চারপ্রকার ভক্তের স্বরূপ কি সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

আর্ত্ত—

আর্ত্তভক্ত তাকেই বলা হয়—যিনি তাঁর সমগ্র জীবন ধর্ম্ম-কর্ম্ম, পূজোপাসনার তেমন ধার ধারেন না, কিন্তু ভীষণ সঙ্কটে পতিত হয়ে 'ত্রাহি ত্রাহি' করতে করতে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হন। এই আর্ত্ত ভক্তকে আবার

দুই ভাগে ভাগ করা চলে—অকৃতজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ, এমন একশ্রেণীর মানুষ দেখা যায়—যারা বিশেষ বিপন্ন হয়ে আত্মরক্ষার নিমিত্ত শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয় এবং যখন তারা বিপন্মুক্ত হয় তখন তারা ভগবানের প্রতি তাদের সেই শরণাগতির ভাব পরিহার করে পুনরায় অবিশ্বাসী হয়ে উঠে। তারা তখন মনে করে—আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়ার ফলেই আমি সঙ্কটমুক্ত হয়েছি। এর মধ্যে ভগবানের দয়ার স্থান কিছুই নাই। এদের অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কি বলা চলে? পক্ষান্তরে, অন্য একশ্রেণীর মানুষ ভগবৎ কৃপায় বিপজ্জাল হতে পরিমুক্ত হয়ে মনে করেন জীবনে কতই না অকাজ কুকাজ করেছি। কিন্তু আমার ন্যায় এই মহাপাতকীর উপর শ্রীভগবানের কতই না অহৈতুকী করুণা! সঙ্কটমুহূর্ত্তে তাঁকে স্মরণ করতেই তিনি আমাকে এই মহাবিপত্তি হতে রক্ষা করলেন! আমি জীবনে তাঁকে আর বিস্মৃত হব না। এখন হতে তিনিই হবেন আমার নিত্যকার স্মরণ-মনন, ধ্যান ও উপাসনার পাত্র ; এখন হতে তিনিই হবেন আমার ত্রাতা, পাতা, সখা, সুহৃদ্। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর ভক্ত ক্রমশঃ পরম ভক্তে পরিণত হন। দ্রৌপদীকে এইরূপ ভক্তের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব'লে মনে করা চলে। দ্রৌপদীর সহিত শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় ছিল দীর্ঘকালের। স্বীয় পঞ্চপতির একান্ত হিতৈষী মনে করে তিনি তাঁর সেবা-পরিচর্য্যা করতেন বহুকাল হতে। কিন্তু তিনি তাঁকে নিজ জীবনের পরম আধার ও আশ্রয়স্থল ব'লে সেই দিন হতে মনে করলেন যেদিন তিনি কৌরবসভায় চরম অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা হয়ে অন্য কারুর নিকট হতে সাহায্য সহায়তা লাভে বঞ্চিতা হয়ে 'ত্রাহি ত্রাহি' করতে করতে একান্তভাবে গোবিন্দকে স্মরণ করলেন এবং তাঁর অহৈতুকী কৃপায় তিনি লজ্জা নিবারণে সমর্থ হলেন।

এখানে আরো দু'প্রকার আর্ত্ত ভক্তের উল্লেখ করা চলে। এদের একশ্রেণী কেবলমাত্র নিজের সঙ্কটমুক্তির জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হন। অন্য শ্রেণী কেবলমাত্র নিজের জন্যই নয়, বিশ্বজীবের সঙ্কটমুক্তির জন্য শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হন। শেষোক্ত শ্রেণীর ভক্তগণ প্রার্থনা করেন—হে ঠাকুর, তুমি এ সংসারে আমার ন্যায় যারা বিপন্ন ও সঙ্কটগ্রস্ত তাদিগকে তোমার অশেষ কৃপাশিসে উদ্ধার ও ধন্য কর। বলা বাহুল্য, গুণ ও মহত্ত্বের বিচারে এই শ্রেণীর উদার প্রকৃতির আর্ত্ত ভক্তগণই শ্রীভগবানের অধিকতর প্রিয়।

জিজ্ঞাসু—

জিজ্ঞাসু ভক্তও দ্বিবিধ—তার্কিক ও শ্রদ্ধালু। প্রথম শ্রেণীর ভক্ত মহাপুরুষদের নিকট আগমন করেন তাঁদের বিদ্যা ও শক্তি পরীক্ষার জন্য। বলা বাহুল্য, তত্ত্বমীমাংসা অপেক্ষা তর্কযুদ্ধে জয়লাভের মনোভাব নিয়ে এঁরা যাতায়াত করেন সাধু-মহাত্মার নিকট। পক্ষান্তরে, অন্য এক শ্রেণীর জিজ্ঞাসু ভক্ত একান্ত বিনয়ী ও শ্রদ্ধালু। তাঁদের সাধুসঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে জীবনসমস্যার সমাধানের উপযোগী জ্ঞান ও ভক্তির আহরণ। তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে স্বীকার না করে উপায় নাই যে এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভক্তগণ অধিকতর উন্নত। তবে প্রসঙ্গক্রমে, স্মরণ রাখা কর্তব্য—প্রথম শ্রেণীর তার্কিক জিজ্ঞাসুরাও যদি সৌভাগ্যবশে কোন সত্যকার মহাপুরুষের সংস্পর্শে উপনীত হন তবে তাঁদের সেই তর্কপ্রবণ মনোভাবও সেই মহাপুরুষের অনুকম্পায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, —প্রখ্যাত অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত শিরোমণি প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও কর্ম্মবাদী মহান্ পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্রের পরাভব ও আত্মসমর্পণের ইতিহাস, যা তাঁদিগকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত করে দেয়।

রাজা পরীক্ষিতের দৃষ্টান্ত অনুধ্যান করলে শ্রদ্ধালু ও জিজ্ঞাসু ভক্তের জীবনগতির আমূল পরিবর্তনের আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। সপ্তাহকাল পরে সর্পাঘাতে মৃত্যু অবধারিত জেনে মহারাজ পরীক্ষিত যখন পরম শান্তিলাভের জন্য আকুল ব্যাকুল হন, তখন তিনি ঋষি-মহর্ষিগণের পরামর্শে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভক্তি ও নিষ্ঠাসহকারে অভিনিবিষ্ট হন ভাগবত শ্রবণে এবং তার ফলেই তিনি সাতদিনের মধ্যেই কলুষ-কালিমা হতে পরিমুক্ত হ'য়ে অভীষ্টলাভে সক্ষম হন। এইরূপ ভক্তের প্রতি সূচনা দিয়ে গীতাকার শ্রীভগবান্ বলেছেন—তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"

অর্থার্থী—

অর্থার্থী বা সকাম ভক্ত গুণ ও অধিকার ভেদে আবার দ্বিবিধ। একশ্রেণীর নরনারী পরিদৃষ্ট হন যাঁরা সারা জীবন সকাম ভাবে ভগবৎ চরণে প্রার্থনা করেন—হে ঠাকুর, আমাকে ধন দাও, জন দাও, বিদ্যা-বুদ্ধি দাও, যশঃ দাও, আমার পুত্র-পরিবারকে সুখী ও সম্পন্ন কর। অর্থাৎ, এঁদের মুখ

শুধু 'দেহি দেহি' রব। এঁদের জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত চাওয়ার অন্ত থাকে না। পক্ষান্তরে, অন্য একশ্রেণীর সকাম ভক্তের মনোভাব অনেকখানি স্বতন্ত্র। সাংসারিক বা লৌকিক সুখ-শান্তি বা কল্যাণ লাভের জন্য কিছুকাল প্রার্থনা করার পরে তাঁরা মনে করেন—ঠাকুরের দয়ায় আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমি আর সাংসারিক সুখ-সমৃদ্ধির কল্যাণ চিন্তা ক'রে জীবনের পরমকাম্য সেই মোক্ষ-মুক্তির ধ্যান-জ্ঞান বিসর্জন দেব না। বলা বাহুল্য, প্রথম শ্রেণীর তুলনায় এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সকাম ভক্তদের মনোভাব অধিক মহত্ত্বপূর্ণ। ভক্তপ্রবর ধ্রুব ছিলেন এই শ্রেণীর সকাম ভক্ত। রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় স্বীয় জননীর নির্দ্দেশে তিনি গভীর অরণ্যে প্রবিষ্ট হন এবং সেখানে তিনি অনাহারে অনিদ্রায় পরমারাধ্য ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর চরণে সকাতর প্রার্থনা নিবেদন করতে থাকেন। সেই কৃচ্ছ্র তপস্যায় প্রীত হয়ে তাঁর সমক্ষে শ্রীবিষ্ণু চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়ে তাঁর অভীষ্ট পূরণ করেন। ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর রাজত্বের পর তিনি ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানী—

গীতার মতে জ্ঞানী ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান্ স্বয়ং এ বিষয়ে বললেন—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭

অন্বয়—তেষাং নিত্যযুক্তঃ একভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে। অহং হি জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭

অনুবাদ—তাঁদের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। তিনি নিরন্তর আমাতেই যুক্ত এবং আমাতেই ভক্তিনিষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়॥ ১৭

গীতামৃত—জ্ঞানীভক্ত তাঁকেই বলা হয় যিনি জন্ম হতেই আত্মজ্ঞান বা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আকুল, ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব ছিলেন এইরূপ জ্ঞানী ভক্ত—যিনি আবাল্য মোক্ষ বা ভগবদুপলব্ধির জন্য ছিলেন একান্ত উন্মুখ। বলা বাহুল্য, এরূপ ভক্তের সংখ্যা সব যুগেই বিরল।

তবে পুণ্যভূমি দেবভূমি—ভারতভূমিতে এই কলিকালেও অভাব হয় নি তার। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য্য প্রণবানন্দ এবং তাঁদের পার্ষদবৃন্দ এযুগে আবির্ভূত হয়ে সপ্রমাণ করেছেন—ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে মধ্যে মধ্যে অন্ন-বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ ঘটলেও, এই পুণ্যভূমিতে আদর্শ ভক্ত ও মহাপুরুষের অভাব ঘটে নি কোন দিন।

গীতাবর্ণিত চার প্রকার ভক্তের লক্ষণ এতক্ষণ আপনারা শুনলেন। এক্ষণে চিন্তা করুন—আপনারা কোন্ শ্রেণীর ভক্ত এবং আপনাদের ভক্তি কোন্ পর্য্যায়ের।

জ্ঞানী-ভক্তের মহত্ত্ব-গৌরব

উপরোক্ত শ্লোকে চারপ্রকার ভক্তের বর্ণনা দেবার পরে শ্রীভগবান্ বল্‌লেন—হে সখে, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী ভক্তের স্বরূপ তোমাকে বলেছি ; আমার মতে এই সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই সর্ব্বোত্তম। কেন না, তাঁরা কেবলমাত্র আমাতেই সম্পূর্ণ আসক্ত ও অনুরক্ত, জাগতিক অন্য কোন ভোগ্য বিষয়ের প্রতি তাঁদের বিন্দুমাত্র লালসার দৃষ্টি নাই। পক্ষান্তরে, অন্য যে তিন প্রকার ভক্তের কথা শুনলে তারা আমাকে ভজনা করলেও অন্তরে অন্তরে তারা বিষয়ানুরাগী ; তাই তাদের ভাব-ভক্তির মধ্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার অভাব। তারা আমাকেও চায় আবার বিষয়কেও চায়। অর্থাৎ তারা আমাকে যে ভালবাসে ও ভক্তি করে তার উদ্দেশ্য আমার পরিতৃপ্তি-সাধন নয়, আত্মতৃপ্তিই হচ্ছে তাদের ভাব-ভক্তির আসল লক্ষ্য। সুতরাং, তাদের প্রেম নিষ্কাম নয়, সকাম। এজন্য জ্ঞানী ভক্তই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং তাঁরা আমাকে তাঁদের একান্ত প্রিয়জন বলে মনে-প্রাণে ধারণা করেন।

বস্তুতঃ, সত্যকার যে প্রেম তার মধ্যে দোকানদারীর স্থান নেই। প্রেমিক তাঁর প্রেমাস্পদকে নিজের যথাসর্ব্বস্ব মনে করে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্যই তাঁর সেবা করে থাকেন। আর যখনই প্রেমিকের মনে স্বীয় প্রেমাস্পদের প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ বা প্রীতির অভাব হয় তখনই সেই প্রেমের শুচিতা ও নিষ্ঠা বিনষ্ট হয়। কেন না, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ উভয়েই চান—তাঁদের পরস্পরের প্রেমের মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র প্রবঞ্চনার ভাব প্রবিষ্ট না হয়। ভক্তিশাস্ত্রের মতে প্রেমিকের এরূপ যে ভক্তি-নিষ্ঠা তা-ই পরা ভক্তি

নামে আখ্যাত। শ্রীভগবান্ এরূপ একনিষ্ঠ ও অবিচলিত প্রেম-ভক্তির একান্ত অধীন। সত্যকার প্রেমিক ভক্তও তাঁর প্রেমাস্পদ ভগবানকে এরূপ ভাবে পেতে একান্ত উন্মুখ। প্রহ্লাদ, মীরাবাঈ প্রভৃতির ভক্তি ছিল—এই পর্য্যায়ের।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮

অন্বয়—এতে সর্ব্বে এব উদারাঃ তু জ্ঞানী মে আত্মা এব মতম্। হি যুক্তাত্মা সঃ অনুত্তমাং গতিং মাম্ এব আস্থিতঃ॥ ১৮

অনুবাদ—ইহারা সকলেই মহান্, কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ, ইহাই আমার অভিমত। কেন না, মদগতচিত্ত সেই জ্ঞানী ভক্ত জীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি যে আমি, সেই আমাকেই আশ্রয় করে থাকেন॥ ১৮

নিষ্কাম ভক্ত সর্ব্বোত্তম হলেও সকাম ভক্ত ভগবানের অপ্রিয় নন

গীতার মতে নাস্তিক অপেক্ষা আস্তিক, অভক্ত ভক্ত মহান্। অর্থাৎ, মোহিনী মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য যাঁরা শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণে উন্মুখ, গীতার মতে তাঁরাই সৌভাগ্যবান্ ও সুকৃতিশালী এবং তাঁরাই ভগবানের প্রিয়। তবে একথা ঠিক যে, এরূপ ভক্তগণের মধ্যে অনেকে প্রথম অবস্থায় বিষয়-ভোগাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পরিহার ক'রে একান্ত ভগবন্নিষ্ঠ হতে পারেন না। প্রাক্তন সংস্কার বশে এই অবস্থাতেও তাঁদের মধ্যে অল্প-বিস্তর বিষয়বাসনা বিদ্যমান থাকে, তবে শ্রীভগবান্ এতাদৃশ সকাম ভক্তগণকেও উপেক্ষা ও অনাদরের দৃষ্টিতে দেখেন না। তাঁদের ভাব-ভক্তির অনুপাতে তিনি তাঁদিগকেও নিজের প্রিয়জন বলে স্বীকার করেন এবং তাঁদের সেই আংশিক ভাব-ভক্তির সূত্রে তাঁদিগকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে তাঁদের বিষয়বাসনা বিনষ্ট করে দেন। গীতার মতে ভগবদ্ভক্ত মাত্রই মহান্। তবে সকাম ভক্তি অপেক্ষা নিষ্কাম ভক্তি ভগবানের নিকট অধিকতর প্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, নিষ্কাম জ্ঞানী ভক্তগণ ভগবান্‌কেই পরম গতি বা আশ্রয়স্থল মনে করে প্রথম হতেই তাঁতে একান্ত ভাবে অনুরক্ত হন। এজন্যই শ্রীভগবান্ বলছেন—এরূপ ভক্তরা আমার একান্ত আপনার জন।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯

অন্বয়—বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে সর্ব্বং বাসুদেবঃ ইতি জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। সঃ মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯

অনুবাদ—জ্ঞানীভক্ত অনেক জন্মের পর 'বাসুদেবই সমস্ত কিছু' এরূপ জ্ঞান লাভ করে আমাকে প্রাপ্ত হন। এরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ॥ ১৯

বহুজন্মসিদ্ধ জ্ঞানী ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবানই সমস্ত কিছু

বহু জন্মের সুকৃতি ও সৌভাগ্যের ফলে সাধক জ্ঞানী ভক্তের দুর্লভ স্থিতি লাভ করেন। এরূপ ভক্ত প্রথম হতেই ভগবৎপ্রাপ্তিকেই জীবনের চরম লক্ষ্য মনে ক'রে তপস্যায় ব্রতী হন। তাঁদের সেই ভগবন্নিষ্ঠা আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক ব্যাপার বলে মনে হলেও পুনর্জন্মবাদী আর্য্যহিন্দুগণ বিশ্বাস করেন এরূপ সর্ব্বোচ্চ সংস্কার সহজে লাভ হয় না। ইত্যাকার দুষ্প্রাপ্য অবস্থা লাভের জন্য চাই—বহু জন্মের তপস্যা। শ্রীভগবান্ উক্ত শ্লোকে সেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বললেন, 'বাসুদেবই সব কিছু'—জ্ঞানী ভক্তগণের এই যে অচল অটল বিশ্বাস ও ধারণা তা আদৌ সহজলভ্য নয়। এর জন্য প্রয়োজন জন্ম-জন্মান্তরের সাধনাজনিত চিত্তশুদ্ধি।

বস্তুতঃ, 'বাসুদেব' বলতে এখানে যে-কেবলমাত্র বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বোঝান হয়েছে তা নয়। 'বাসুদেব' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে যিনি সর্ব্বব্যাপী অন্তরাত্মারূপে সর্ব্বত্র, সর্ব্বক্ষণ, সব কিছুতে নিত্য বিদ্যমান। এই তাৎপর্য্য অনুসারে যিনি সত্যকার জ্ঞানী ভক্ত তাঁকে সর্ব্বত্র ইষ্টদর্শনে অভ্যস্ত হতে হয়। এই মতে কেবলমাত্র মূর্ত্তিবিশেষের মধ্যে ধ্যাননেত্রে স্বীয় ইষ্টদেবের দর্শন করাই সর্ব্বোচ্চ ভগবদ্দর্শন নয়। সর্ব্বব্যাপী চিন্ময় ব্রহ্মসত্তাকে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে সম ভাবে উপলব্ধি করাই হচ্ছে—সত্যকার বাসুদেব-দর্শন। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে জ্ঞানী যখন এই ভাবে ভগবদ্দর্শন করেন তখনই তাঁর দর্শন হয় সত্যকার দর্শন। বস্তুতঃ, সর্ব্ববস্তুতে পরমাত্মার অনুভূতি না হলে ভেদ-দর্শনের মালিন্য ও ত্রুটি নিঃশেষে দূরীভূত হয় না। আর এই সর্ব্বোচ্চ

দর্শন তখনই সম্ভবপর হয় যখন ভক্ত-সাধকের হৃদয়ে অনন্য প্রেম-ভক্তির সহিত 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-রূপী তত্ত্বজ্ঞানের সমন্বয় ও সমাবেশ ঘটে।

গীতা এখানে জ্ঞানী ভক্তের যে লক্ষণের বর্ণনা দিয়েছেন তার স্বরূপ বিচার করলে এই শেষোক্ত জ্ঞানমূলক ভগবদুপলব্ধির বিষয়টি স্পষ্টতর বলে মনে হয়। তবে গীতাকে যাঁরা কেবল ভক্তিশাস্ত্র বলে মনে করেন তাঁদের দৃষ্টিতে দ্বৈতবাদমূলক যে ভগবদনুভূতি তা-ই অধিকতর সত্য বলে বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০

অন্বয়—তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ তং তং নিয়মম্ আস্থায় স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে॥ ২০

অনুবাদ—বাসনা কামনার দ্বারা যাদের বিবেক অপহৃত হয়েছে তারা নিজেদের সেই বাসনাপঙ্কিল স্বভাবের বশীভূত হয়ে ব্রতোপবাসাদির বিধিবিধান অনুসরণ করে অন্যান্য দেবতার পূজা করে থাকে॥ ২০

গীতামৃত—সকাম ভক্তোপাসকগণের মধ্যে যারা অত্যন্ত অজ্ঞান ও বিষয়-মোহান্ধ তারা তাদের মনস্কামনা পরিপূরণের জন্য নিজেদের মনোমত কোন দেবদেবীর উপাসনায় ব্রতী হয় এবং সেই পূজার উপযোগী ব্রতোপবাসাদির বিধি-বিধান অনুসরণ করে। বলা বাহুল্য, এদের ব্রতনিষ্ঠা বা পূজোপাসনার মধ্যে কোন উচ্চ আদর্শ বা লক্ষ্যের স্থান থাকে না। নিজেদের অজ্ঞানের জন্য তারা বুঝতে অক্ষম যে তারা যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ইত্যাকার দেবোপাসনায় ব্রতী হয়েছে তা আদৌ মানব-জীবনের চরম সিদ্ধির অনুকূল নয়। কেন না, সর্ব্বশক্তি ও পরিপূর্ণ শান্তির আধার যে ভগবান্ তাঁর সহিত এই সেবাপূজার সম্বন্ধ-সম্পর্ক অতি অল্প।

শোনা যায়—গোকুল ও বৃন্দাবনে অবস্থানকালে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞ গোপ-গোপীদের মধ্যে প্রচলিত ইত্যাকার উচ্চাদর্শহীন পূজার অগ্রভাগ সুকৌশলে নিজে গ্রহণ ক'রে তাদের বুঝিয়ে দিতেন—পুরুষোত্তমরূপে আবির্ভূত তিনিই স্বয়ং তাদের পূজারাধনার একমাত্র যোগ্যতম পাত্র, অপর কেহ নয়।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১

অন্বয়—যঃ যঃ ভক্তঃ শ্রদ্ধয়া যাং যাং তনুম্ অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি তস্য তস্য এব অচলাং শ্রদ্ধাম্ অহং বিদধামি॥ ২১

অনুবাদ—সকাম দেবোপাসকগণ ভক্তিযুক্ত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে যে যে দেবমূর্ত্তির অর্চ্চনা করতে ইচ্ছা করেন, আমি সেই সকল ভক্তের সেই সেই দেবমূর্ত্তিতে অচলা ভক্তি দান করি॥ ২১

শ্রীভগবান্ স্বয়ং দেবোপাসকগণের ভক্তিনিষ্ঠার বিধায়ক

পূর্ব্বে বলা হয়েছে—দেবোপাসকগণ নিজেদের মনস্কামনা পূরণের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর শরণাপন্ন হন। এক্ষণে ভগবান্ বলছেন—ভ্রান্তিবশে যদিও আমার অনন্ত শক্তি, বিভূতি ও কৃপার বিষয় অবগত না হয়ে তারা অন্যান্য দেবদেবীর পূজারাধনায় রত হয়, তথাপি আমি তাদের কদাপি উপেক্ষা করি না। পক্ষান্তরে, আমি তাদের সেই অভিপ্রেত দেবদেবীর প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস আরও বর্ধিত ও অবিচলিত করে দিই—যাতে তাদের সেই মনোবাসনা শীঘ্র পূর্ণ হতে পারে। হে সখে, অজ্ঞানতাবশতঃ ঐ সমস্ত সাধকগণ অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করলেও তাদের সেই ভাব-ভক্তির বিধাতা বা ফলদাতা আমি স্বয়ং।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২

অন্বয়—সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ তস্যাঃ আরাধনম্ ঈহতে। ততঃ চ ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ হি লভতে॥ ২২

অনুবাদ—সেই দেবোপাসক ভক্ত আমার বিধানমত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবমূর্ত্তির অর্চ্চনা করে থাকেন এবং সেই দেবতার নিকট হতে যে সকল কাম্যবস্তু লাভ করে থাকেন তাও আমা কর্ত্তৃক বিহিত হয়॥ ২২

গীতামৃত—বস্তুতঃ দেবোপাসকগণের আরাধিত সেই দেবদেবীগণ

ভগবচ্ছক্তির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র। ভগবানের শক্তিতেই তাঁরা শক্তিমান্ এবং ভগবৎ বিধানেই তাঁরা বিভিন্ন কর্ম্মসাধনে নিরত। সাধারণ অজ্ঞ সাধকগণ এই রহস্য অবগত নয়। তাই তারা তাদের উপাস্য দেবদেবিগণকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা ও বিধাতা বলে মনে করে। শ্রীভগবান্ এখানে তাদের সেই ভ্রান্তি নিরসনের জন্য সুস্পষ্টরূপে বলছেন যে সেই সমস্ত দেবদেবিগণ স্বল্পশক্তিবিশিষ্ট। তবে তাঁরা তাঁদের উপাসকগণকে তাঁদের আরাধনায় যে ফল দান করেন তা আমার বিধানেই সম্পন্ন হয়।

ধর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্ত-সাধকগণের রুচি ও প্রকৃতি বিচিত্র। যাঁদের সংস্কার উন্নত এবং অবিকৃত তাঁরা প্রথম হতেই ভগবানকেই সর্ব্বোচ্চ আধার স্বরূপ মনে ক'রে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সেবাপূজায় রত হন। পরন্তু, যারা নিম্নাধিকারী এবং জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে যাদের রুচি ও আদর্শ বিকৃত ও অনুন্নত তারা ধর্ম্মের উচ্চতম তত্ত্ব অবধারণে অসমর্থ। তারা তাই নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়-কামনার পরিতৃপ্তির জন্য নিজেদের খেয়াল-খুশীমত কোন একটি দেবমূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে তাঁর পূজার্চ্চনার দ্বারা অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য তৎপর হয়। বলা বাহুল্য, এই কারণেই জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবী এবং ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, প্রভৃতি অপদেবতার এত আধিক্য। এই সমস্ত মনঃকল্পিত দৈবশক্তির যারা উপাসক তারা তাদের এই অজ্ঞানোচিত উপাসনা ও সাধনার জন্য সুদীর্ঘকাল যাবৎ সাধনার নিম্নস্তরে অবস্থিত থাকে।

জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক দেবোপাসকগণের সংস্কার সাধন

অজ্ঞ ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত দেবোপাসনা কীরূপ ভয়াবহ, অশ্লীল ও মারাত্মক স্বরূপ ধারণ করে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়—'শঙ্কর-দিগ্বিজয়' গ্রন্থে। ঐ কালে বহু শতাব্দীব্যাপী সংস্কারপ্রচেষ্টার অভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আবির্ভূত হয় অগণতি ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং তাদের অনুসৃত ধর্ম্মোপাসনার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় বিবিধ ও বিভিন্ন আচার-প্রথা, এবং তা যে কেবল ধর্ম্মবিরোধী তা-ই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ স্বরূপও ছিল অত্যন্ত কুৎসিত ও জঘন্য। আচার্য্যপ্রবর তাঁর

মহান্ সংস্কার-ব্রতে উদ্যোগী হয়ে এই সমস্ত ধর্ম্মমতের আচার্য্যগণকে কখনও বিচারযুদ্ধে, কখনও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়ে তাদের পরাভূত ক'রে স্বমতে আনয়নপূর্ব্বক তাদিগকে বিশুদ্ধ বৈদিক সংস্কার দান করেন এবং তৎকালীন প্রচলিত অসংখ্য দেবদেবীর স্থলে তিনি পঞ্চ দেবদেবীর পূজাপদ্ধতিকে শুদ্ধ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নবযুগে দেবপূজার সংস্কার

বর্ত্তমান যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মসংস্থাপক আচার্য্য প্রণবানন্দ উপরোক্ত দেবোপাসনার সংস্কার সাধন করেন অন্য একটি অভিনব পন্থায়। সনাতন ধর্ম্মের যুগোপযোগী রূপদানের নিমিত্ত তিনি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন—বর্ত্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত বিবিধ দেবদেবীর উপাসনা আদৌ নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয় নয়। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—সাধকগণের হিতের জন্য একই ব্রহ্মের বিবিধ রূপ। সুতরাং, উচ্চাবচ, সকাম ও নিষ্কাম ভক্তোপাসকগণের মধ্যে যাঁর যেমন সংস্কার ও অধিকার তিনি সেই রূপে ও সেই ভাবে তাঁর উপাস্য দেবদেবীর পূজায় ব্রতী হলেও তার দ্বারা মূল সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। তবে কালবশে দীর্ঘকালীন সংস্কারাভাবে সেই সমস্ত পূজাপদ্ধতির মধ্যে যদি কোথাও কোন ভ্রম-ভ্রান্তি বা আবিলতা প্রবিষ্ট হয়ে থাকে, তবে প্রয়োজন—আদর্শ শিক্ষা-দীক্ষা ও যোগ্য শাস্ত্র-ব্যাখ্যার দ্বারা তার সংস্কার সাধন। তিনি এজন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মঠ, আশ্রম ও মন্দিরে স্বীয় সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে বার মাসে তের পার্ব্বণের আয়োজন ক'রে আপনার অভিলষিত সংস্কারব্রত উদ্‌যাপন করেন এবং এই প্রসঙ্গে স্বীয় তপঃপূত ভাগবত ব্যক্তিত্বকে উপাসকগণের পুরোভাগে আদর্শরূপে উপস্থাপিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও বলেন—এই সব দেবদেবীর মধ্যেও গুরুর শক্তি ও বিভূতি প্রকট। সুতরাং এ'দের পূজ্জার্চ্চনার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের ইষ্টগুরুর প্রসন্নতা বিধান করে তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হও।

দেবোপাসনার পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর বললেন—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।। ২৩

অন্বয়—অল্পমেধসাং তু তেষাং তৎফলম্ অন্তবৎ ভবতি। দেবযজঃ দেবান্ যান্তি মদ্ভক্তাঃ অপি মাং যান্তি।। ২৩

অনুবাদ—কিন্তু অল্পবুদ্ধি সেই দেবোপাসকগণের সাধনালব্ধ ফল বিনাশশীল; দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন এবং আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করে থাকেন।। ২৩

দেবোপাসক ও ভগবদুপাসকের সাধনফলের পার্থক্য

এই শ্লোকে ভগবান্ সুস্পষ্টরূপে ইঙ্গিত দিয়ে বললেন—ভগবদুপাসনার তুলনায় দেবোপাসনার ফল নিকৃষ্ট। যারা অল্পজ্ঞ বা অজ্ঞান তারাই কেবলমাত্র ভগবৎ-সেবা পরিহার করে দেবোপাসনায় আসক্ত হয় এবং এই উপাসনার দ্বারা তারা যে ফল লাভ করে তা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কেবলমাত্র ইহলোকে নয়, মৃত্যুর পরেও তারা যে দেবলোক প্রাপ্ত হয় সেখানেও তাদের স্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

এই প্রসঙ্গে দেবলোক বস্তুটি কি—সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। হিন্দুধর্ম্মে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য নামক সপ্তলোকের বর্ণনা ছাড়াও ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, গোলোক, দেবলোক প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, এই সমস্ত লোক বলতে বোঝা যায়—সাধকের অধ্যাত্ম অনুভূতির বিভিন্ন স্তর বা স্থিতি। মোক্ষলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরে স্বীয় উচ্চাবচ কর্ম্মের ফলভোগের জন্য প্রাক্তন কর্ম্মের অনুরূপ উপরোক্ত লোকসমূহের কোন একটি লাভ করে থাকেন। পরন্তু, মানুষের সাধনালব্ধ এই-লোক বা স্থিতি স্থায়ী নয়। কর্ম্মফল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবের আত্মাকে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকের অবতরণ করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক—চরম মোক্ষ বা ব্রাহ্মীস্থিতি ব্যতীত উপরোক্ত সমস্ত লোকই ভোগলোক। অর্থাৎ, এই সমস্ত লোকে অবস্থান

কালে জীবাত্মা সূক্ষ্ম শরীরে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ভোগসুখ লাভ করে। একটি দৃষ্টান্ত সহায়ে বিষয়টি উপলব্ধি করার চেষ্টা করা যাক্। মানুষ কখনও কখনও স্বপ্নাবস্থায় দীর্ঘকাল যাবৎ নানা প্রকার সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করে থাকে। ঐরূপ ভোগকালে তার স্থূল শরীর তার বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির সহিত নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থিত থাকে। স্বপ্নদ্রষ্টা জীবাত্মা তখন তার সূক্ষ্ম মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় সমূহের ভোগব্যাপারে লিপ্ত থাকে। স্বপ্ন শেষে সেই ব্যক্তি যখন আবার লৌকিক বা ব্যবহারিক জগতে প্রত্যাবৃত্ত হয় তখন তার সেই স্বপ্নকালীন ভোগসুখ আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। দেবোপাসকগণও ঠিক তেমনি তাদের মৃত্যুর পরে সূক্ষ্ম শরীরে তাদের প্রাক্তন বাসনার অনুরূপ ফলভোগে নিরত হয় এবং সেই ভোগকাল পূর্ণ হলে তারা পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। দেবলোকে উপলব্ধ ভোগসুখ তাই বিনানশীল। পক্ষান্তরে, যারা ঐকান্তিক ভাবভক্তি সহকারে ভগবৎসেবায় নিরত হয়ে তাঁর কৃপায় ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন, তাঁদের আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে স্পষ্ট করে বললেন--এই সমস্ত দেবলোকের ভোগকাল যত অধিক ও দীর্ঘস্থায়ী হোক না কেন--তা বিনাশশীল। পরন্তু, যাঁরা ভগবদ্ভক্ত তাঁরা ভাগবতী স্থিতি লাভ করে চিরতরে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে বিমুক্ত হয়ে চিরশান্তির অধিকারী হন। বলা বাহুল্য, ইহাই জীবের চরম লক্ষ্য ও পরমগতি।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪

অন্বয়—অবুদ্ধয়ঃ মম অব্যয়ম্ অনুত্তমং পরং ভাবম্ অজানন্তঃ অব্যক্তং মাম্ ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্যন্তে॥ ২৪

অনুবাদ—অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার শাশ্বত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ অবগত না হওয়ায় আমার অব্যক্ত রূপকে ব্যক্তিভাবাপন্ন বলে মনে করে॥ ২৪

অল্পজ্ঞ ব্যক্তির ভগবত্তত্ত্বের ধারণা ভ্রান্ত ও অস্পষ্ট

শ্রীভগবানের স্বরূপ দুটি—অব্যক্ত ও ব্যক্ত। অব্যক্তস্বরূপে তিনি

সর্ব্বব্যাপী, চৈতন্যময় সাক্ষীরূপে নিত্য বিদ্যমান। পরন্তু, জীবোদ্ধারের জন্য যখন সেই অব্যক্ত চৈতন্য-সত্তা সাকার রূপ পরিগ্রহ করেন তখন তিনি ব্যক্তরূপে প্রকট হন। ভগবানের এই অব্যক্ত ও ব্যক্তরূপের মধ্যে অব্যক্ত রূপটি অধিকতর দুর্ব্বোধ্য। দীর্ঘকালীন ধ্যান-ধারণার ফলে যখন সাধকের সত্যকার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, তখন তাঁর সহায়ে তিনি এই অব্যক্ত রূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন; তার পূর্ব্বে নয়। তবে পরমাত্মার সাকার ব্যক্তরূপটিও যে একেবারে সহজবোধ্য—তাও নয়। ভগবান্ যখন লীলাবিলাসের জন্য নরশরীর ধারণ করেন তখন তাঁর সেই শরীরও হয় ভাগবত শরীর। তাছাড়া, মানুষের ন্যায় আচার-ব্যবহার করলেও তাঁকে প্রাকৃত মানুষের সহিত তুলনা করা চলে না। কেন না, সাধারণ মনুষ্য বাসনাবদ্ধ এবং সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণের দ্বারা নিত্য প্রভাবিত। পক্ষান্তরে, অবতার পুরুষগণ স্বেচ্ছায় মায়াশরীর ধারণ করে জগল্লীলার অনুবর্ত্তন করলেও ত্রিগুণের প্রভাব তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে না। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ থাকায় অবতার-তত্ত্বের এই গূঢ় লীলারহস্য অবধারণ করতে অক্ষম হয়। তাই তারা সেই অব্যক্ত পরমাত্মার ব্যক্ত অবতার-স্বরূপকে ব্যক্তিভাবাপন্ন বলে মনে করে।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫

অন্বয়—অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ সর্ব্বস্য প্রকাশঃ ন। অয়ং মূঢ়ঃ লোকঃ মাম্ অজম্ অব্যয়ং ন অভিজানাতি॥ ২৫

অনুবাদ—আমি যোগমায়াসমাচ্ছন্ন থাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। সুতরাং, এই সকল মূঢ় ব্যক্তি আমাকে জন্ম-মরণরহিত পরমেশ্বররূপে জানতে পারে না॥ ২৫

যোগমায়া কি এবং তার দ্বারা তিনি স্বীয় স্বরূপ আচ্ছন্ন করেন কেন?

প্রশ্ন আসে—শ্রীভগবান্ যখন চান—তাঁর সন্তানগণ তাঁকে পূর্ণরূপে অবগত হোক্ এবং সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই যখন তিনি নরশরীর ধারণ

ক'রে জগতে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি যোগমায়ার দ্বারা নিজের স্বরূপকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখেন কেন? উত্তরে বলা যায়—প্রাক্তন শুভকর্ম্মের দ্বারা যে সমস্ত নর-নারীর অন্তঃকরণ নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হয় নি তারা ভগবৎস্বরূপ অবধারণ করবে কী প্রকারে? তা ছাড়া, এরূপ অজ্ঞান, জড় ও তমোভাবাপন্ন নরনারীর নিকট ভগবান্ যদি স্ব-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন তবে তার ফলও বিশেষ কল্যাণপ্রদ হয় না। শ্রীভগবান্ এই জন্যই পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে সূচনা দিয়ে বলেছেন—জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও অজ্ঞান অনধিকারী ব্যক্তির নিকট বড় বড় তত্ত্বকথা প্রচার ক'রে তাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাবেন না। কারণ, যার যেরূপ যোগ্যতা ও অধিকার তার নিকট ততটুকু জ্ঞানের পরিবেশন করাই শ্রেয়ঃ। পাঠশালার ছাত্রের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান পরিবেশন করা সমীচীন কি? এবং এরূপ করলে সেই নিম্নাধিকারী ছাত্র ছাত্রীর কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণের সম্ভাবনা ঘটে না কি? অধ্যাত্মক্ষেত্রেও এরূপ চেষ্টার ফলে "হিতে বিপরীত" ঘটারই সম্ভাবনা সমধিক। শ্রীভগবান্ লোকসংগ্রহের কার্য্যে অবতীর্ণ হয়ে তাই গুণ ও যোগ্যতার বিচার ক'রে নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করেন। স্বীয় সখা অর্জ্জুনের নিকটও তিনি এই কারণে সর্ব্বপ্রথম স্বীয় সত্যকার স্বরূপ প্রকাশ করেন নি। পরবর্ত্তী কালে সখার যোগ্যতা ও অধিকার অর্জ্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর নিকট ধীরে ধীরে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

এখানে আরও জানা আবশ্যক—শ্রীভগবানের জীব-শরীর ধারণ ক'রে জগতে অবতীর্ণ হওয়াও—তাঁর এক অপূর্ব্ব যোগমায়ার নিদর্শন। কেন না, অনন্ত অসীম ভগবৎ শক্তি সামান্য জীবদেহের আধারে প্রকাশিত হবার ব্যাপারটা কম দুর্ব্বোধ্য ও রহস্যজনক নয়। বিশেষ সৌভাগ্যবান্ সুকৃতিশালী ব্যক্তি ছাড়া এজন্য অবতার পুরুষকে অতি অল্প লোকই ভগবৎ স্বরূপে অবধারণ করতে সমর্থ।

এই প্রসঙ্গে আরও জানা প্রয়োজন—শ্রীভগবানের এই সৃষ্টিজালও তাঁর যোগমায়ার আর একটি নিদর্শন। কেন না, এই সৃষ্টির আবরণেই তিনি নিজেকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। এক দিকে এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিলীলার মধ্য দিয়ে যেমন তাঁর অপার শক্তি ও মহিমা প্রকটিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সেই অপার অসীম ভূমা-সত্তা এই সসীম সৃষ্টিচক্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে

নানাভাবে খণ্ডিত হয়ে পড়েছে। ইহাও ভগবানের অত্যদ্ভুত যোগবিভূতি। স্বেচ্ছায় "একোঽহং বহুস্যাম্" বলে সেই অদ্বয়, অরূপ, অসীম ব্রহ্ম এই মায়িক ভববন্ধন স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই একাধারে তিনি অব্যক্ত ও ব্যক্ত। সত্যকার বিবেকী সাধকগণই ভগবৎ তত্ত্বকে এই উভয়রূপে উপলব্ধি করে ধন্য হন। অজ্ঞান ও অল্পজ্ঞের দ্বারা তা কদাপি সম্ভবপর হয় না।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬

অন্বয়—অর্জ্জুন, অহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদ। তু কশ্চন মাং বেদ॥ ২৬

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, আমি ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ত্রিকালের সমস্ত কিছুই জানি ; কিন্তু আমাকে কেহ জানে না॥ ২৬

ভগবান্ ও জীবের ধারণাশক্তির পার্থক্য

ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। সুতরাং, এ জগতে কোন কিছুই তার অজ্ঞাত ও অবিদিত নয়। পক্ষান্তরে, জীব হচ্ছে অজ্ঞ, অল্পজ্ঞ ও স্বল্পশক্তিসম্পন্ন। তাই সে ভগবানের অনন্ত বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করতে অক্ষম।

তবে উপরোক্ত শ্লোকে বর্ণিত 'মান্তু বেদ ন কশ্চন' বাক্যটির তাৎপর্য্য এরূপ নয় যে ভগবানকে কেহ কখনও জানতে পারে না। জগতের সকল ধর্ম্মেতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়—প্রাচীনতম কাল হতে আজ পর্য্যন্ত এমন বহু সাধক-সাধিকা ছিলেন ও আছেন যাঁরা ভগবদ্দর্শনে কৃতার্থ হয়েছেন। তবে ভগবৎ তত্ত্বের চরম উপলব্ধি যে আদৌ সরল ও সহজ নয় সেই বিষয়টি এই বাক্যাংশের দ্বারা প্রকারান্তরে বিবৃত হয়েছে।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ২৭

অন্বয়—ভারত! পরন্তপ! সর্গে ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তি॥ ২৭

অনুবাদ—হে ভারত, হে পরন্তপ, সৃষ্টিকালে বা স্থূল দেহ ধারণ কালে প্রাণিগণ রাগ-দ্বেষজনিত সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বকর্ত্তৃক মোহ প্রাপ্ত হয়ে হতজ্ঞান হয়॥ ২৭

অনুবাদ—হে ভারত, হে পরন্তপ, সৃষ্টিকালে বা স্থূল ধারণ কালে প্রাণিগণ রাগ-দ্বেষজনিত সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বকর্ত্তৃক মোহ প্রাপ্ত হয়ে হতজ্ঞান হয়॥ ২৭

দেহধারণই দ্বন্দ্ব-মোহের কারণ

দেহধারণ বা জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জীব বিনাশশীল পঞ্চভূত ও দ্বন্দ্বমোহোৎপাদক ত্রিগুণের প্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়। তখন হতেই তার মধ্যে জাগ্রত হয়—দৈহিক ও মানসিক নানা প্রকার ভোগসুখের কামনা-বাসনা এবং সেই ভোগেচ্ছার পথে যে বাধা-বিঘ্ন উৎপন্ন হয় তার বিরুদ্ধে তখন তার মনে জাগ্রত হয়—নিদারুণ ক্রোধ ও বিরূপ ভাব।

এই ভাবে দেহ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে জীব অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে নিপতিত হয় দ্বন্দ্ব-দ্বেষের আবর্ত্তে। অর্জ্জুন এক্ষণে এইরূপ মানসিক চাঞ্চল্যে অধীর ও অস্থির। তাঁর সেই দ্বন্দ্ব-মোহের কারণ বিশ্লেষণ করে শ্রীভগবান্ এক্ষণে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলছেন—হে সখে, যদিও ইহাই জীবের দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ, তথাপি তুমি হচ্ছ পরন্তপ বা শত্রুমর্দ্দনকারী। তোমার জীবনপথে যত প্রতিকূল বাধা-বিপত্তিই আবির্ভূত হোক না কেন তুমি স্বীয় শক্তি-সামর্থ্যের বলে তা দূর করতে সমর্থ হবে। কেন না, তুমি কেবল যে প্রখ্যাত ভরতকুলোদ্ভব তা-ই নয়, তুমি শত্রু-নিপীড়নকারী মহান্ বীর।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮

অন্বয়—যেষাং তু পুণ্যকর্ম্মণাং জনানাং পাপম্ অন্তগতং দ্বন্দ্ব-মোহনির্ম্মুক্তাঃ তে দৃঢ়ব্রতাঃ মাং ভজন্তে॥ ২৮

অনুবাদ—কিন্তু পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা যাঁদের পাপ বিনষ্ট হয়েছে সেই সমস্ত দ্বন্দ্বমোহবিমুক্ত দৃঢ়ব্রতী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে থাকেন॥ ২৮

পুণ্যকর্ম্মা ও দৃঢ়ব্রতী সাধকই ভগবৎ সেবায় অনুরক্ত

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে জীবের দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ যে তার দেহধারণ—সেই বিষয়টির উল্লেখ করে এক্ষণে সেই দুঃখজয়ের উপায় কি তার সূচনা দিয়ে শ্রীভগবান্ বলছেন—মানুষ যখন শুভকর্ম্মে ব্রতী হয় এবং সেই ব্রতসাধনায় তার সঙ্কল্প সুদৃঢ় হয় তখন ধীরে ধীরে তার চিত্ত শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়ে যায়। দ্বন্দ্ব-মোহ হতে বিযুক্ত হবার ইহাই ভাগবত বিধান। এই ভাবে যখন সাধকের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ও সাত্ত্বিক ভাব ধারণ করে তখন তার মধ্যে জাগ্রত হয় ভগবদ্ ভজনের আশা-আকাঙ্ক্ষা।

এই প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক—মানুষের অন্তঃকরণে ভগবদ্ভক্তির বীজ পূর্ব্ব হতেই নিহিত। কারণ, স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নয়। জন্ম-জন্মান্তরের মলিন বিষয় বাসনা ও অপকর্ম্মের ফলে মানুষের সেই আত্মিক রূপ বা ভগবদ্ভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়ে বটে, তবে সদ্গুরু-প্রদর্শিত শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যখন সাধক দৃঢ়ব্রতী হয় তখন ক্রমশঃ তার সেই চিত্তমালিন্য বিদূরিত হয়ে যায়।

এখানে 'দৃঢ়ব্রতী' শব্দটির দ্বারা বোঝান হয়েছে যে সাধকের পুণ্যপ্রবৃত্তি যখন সঙ্কল্পনিষ্ঠ হয় তখনই তার সেই সাধনা সিদ্ধ হয়, তার পূর্ব্বে নয়। এ বিষয়ে নবযুগের আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী স্বীয় আশ্রিত সন্তানগণকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন—"সংকল্পে যে দৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত। **সঙ্কল্প ছাড়িব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব না, ইহাই যাহার মূলনীতি—একমাত্র সেই বিশ্ববিজয়ী হইতে পারে।**"

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ২৯

অন্বয়—যে জরামরণমোক্ষায় মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি তে তৎ ব্রহ্ম কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্ অখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ॥ ২৯

অনুবাদ—যাঁরা আমাতে চিত্ত সমাহিত করে জরা-মরণ হতে মুক্তি লাভের জন্য প্রযত্নশীল হন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র আধ্যাত্মিক বিষয় এবং সমগ্র কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হন॥ ২৯

ঐকান্তিকী অধ্যাত্মনিষ্ঠার ফল

যাঁরা একান্ত ভাবে ভগবন্নিষ্ঠ হয়ে তাঁকে লাভ করার জন্য বদ্ধপরিকর, তাঁরা তাঁদের সেই সুকঠোর সাধনার ফলে, সেই সনাতন ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং যাবতীয় কর্ম্মরহস্য অবগত হন। বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন—তদ্‌গতচিত্ত হয়ে শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ এবং তাঁকে লাভ করার জন্য ঐকান্তিকী সাধনা করাই মনুষ্যজন্মের চরম কাম্য ও লক্ষ্য। যাঁরা কামনা-বাসনার যাবতীয় মোহ পরিহার করে এই ভাবে ভগবৎ-পরায়ণ হন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্মতত্ত্ব কি, অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং কর্ম্মতত্ত্বের রহস্যই বা কি—তা ঠিক ঠিক অবগত হন।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৩০

অন্বয়—যে চ সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং চ মাং বিদুঃ তে যুক্তচেতসঃ প্রয়াণকালে অপি মাং বিদুঃ।। ৩০

অনুবাদ—যাঁরা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানেন সেই সকল ব্যক্তি আমাতে আসক্তচিত্ত হওয়ায় মৃত্যুকালে আমাকে জানতে পারেন॥ ৩০

গীতামৃত—বর্ত্তমান শ্লোকে যে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হয়েছে তার তাৎপর্য্য জানা আবশ্যক। এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন অ ান্য কতিপয় বিষয়ের সহিত উক্ত তিনটি বিষয়ের তাৎপর্য্য কি—তা জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সেই প্রসঙ্গ নিয়েই ঐ অধ্যায়ের শুভ সূত্রপাত হয়।

অধিভূত বলতে বোঝা যায়—ভগবৎসৃষ্ট এই বিনাশশীল বিশ্বচরাচর এবং অধিদৈব হচ্ছেন—সেই ভূতপ্রপঞ্চে অধিষ্ঠিত যে চৈতন্যশক্তি তিনি

এবং সৃষ্টি রক্ষার্থে জীবের যে কর্ম্মপ্রবাহ তাই হচ্ছে অধিযজ্ঞ। এক্ষণে শ্রীভগবান্ বলছেন—আমাকে যাঁরা অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞের সহিত জানেন, তাঁরাই আমার প্রতি আসক্ত হয়ে মৃত্যুশেষে চরমগতি লাভ করেন। এই ভাগবত নির্দ্দেশের অর্থ হচ্ছে ভগবানকে ঠিক ঠিক জানতে হলে এই জ্ঞান প্রয়োজন যে তাঁর উপাস্য শ্রীভগবানই এই বিশ্বসংসারের সমস্ত কিছু। অর্থাৎ, এই বিনাশশীল বিশ্বপ্রপঞ্চরূপ যে অধিভূত তাও হতেই উৎপন্ন; এবং সেই বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরের অন্তঃস্থলে অধিদৈবরূপে যে চৈতন্যশক্তি বিদ্যমান তাও তিনি এবং সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার জন্য জীবের যে কর্ম্মলীলা বা অধিযজ্ঞ—তাও তা হতেই প্রসৃত। বস্তুতঃ এইরূপ সামগ্রিকভাবে যাঁরা ভগবানকে অবগত হন তাঁরা কোন কালে মোহপ্রাপ্ত হন না। জীবিত অবস্থায় তাঁরা যেমন ভগবৎ-স্মৃতি নিয়ে তাঁর লীলাস্বাদনের জন্য সাধন-ভজনে নিরত হন, মৃত্যুকালেও তেমনি শ্রীভগবানের সেই পুণ্যস্মৃতি নিয়েই তাঁরা দেহত্যাগ করেন। সুতরাং, তাঁদের আর পুনর্জন্ম বা বন্ধনের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

ইতি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ—অক্ষরব্রহ্মযোগঃ

এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—ব্রহ্মানুভূতির উপযোগী সাধনা এবং মৃত্যুকালেও হৃদয়-মনে ব্রহ্মস্মৃতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা। বস্তুতঃ, এজন্য এই অধ্যায়ের নাম হয়েছে—অক্ষর ব্রহ্মযোগ।

এই মায়িক সংসারে অধিকাংশ আস্তিক্যবাদী নর-নারীর নিকট ভগবদুপাসনা হচ্ছে আত্মসন্তোষ লাভের একটা উপায় মাত্র। অর্থাৎ, তাঁরা যে ধর্ম্মাচরণ করেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে—এই জ্বালামালাময় সংসার-জীবনে কিঞ্চিৎ মানসিক আশ্বাস বা সান্ত্বনা লাভ করা। এঁদের মধ্যে কেহ কেহ কৈশোর জীবনের পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা বা অনুশাসন-প্রভাবে দেবদর্শন, কথা-কীর্ত্তন শ্রবণ ও স্তব-স্তুতি পাঠে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে নিয়মিত কিছু কিছু ধর্ম্মাচরণ করে থাকেন। অপর কেহ কেহ তাঁদের দৈনন্দিন পাপ-তাপের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হতে আত্মরক্ষার দায়ে প্রায়শ্চিত্তমূলক নানাবিধ ব্রতোপবাস, তীর্থসেবা, কথাকীর্ত্তনাদিতে যোগদান করে থাকেন। এঁদের ইত্যাকার ধর্ম্মসাধনার মূলে অনেক ক্ষেত্রে প্রেরণা যোগায়—কুলাচার, দেশাচার, প্রায়শ্চিত্ত-বোধ, পৌরোহিত্য-প্রভাব, যশোমান বা ঐহিক ও পারত্রিক সুখৈশ্বর্য্য লাভের আশাকাঙ্ক্ষা। বলা বাহুল্য, চরম নিবৃত্তি, মোক্ষ বা ভগবদনুভূতি—এঁদের ধর্ম্মচর্য্যার মূল লক্ষ্য নয়। জগতের সকল মত পথ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ ধর্ম্মার্থীর সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। গীতোপদেশের প্রথম শ্রোতা অর্জ্জুনের মনোভাব যে তদ্রূপ নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায়, এই অধ্যায়ের প্রথম দুটি শ্লোকে বর্ণিত তাঁর গহন প্রশ্নাবলী হতে। গীতাপ্রেমী প্রত্যেক সাধক-সাধিকার প্রাথমিক কর্ত্তব্য হচ্ছে—এই বিষয়টির প্রতি অভিনিবিষ্ট হওয়া। অন্যথা, তাদের পক্ষে গীতার মর্ম্মার্থ অনুধাবন করা এক প্রকার দুঃসাধ্য।

অর্জ্জুন স্বীয় সখা সকাশে প্রথমেই প্রশ্ন করছেন—

অর্জ্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে।। ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ।। ২

অন্বয়—পুরুষোত্তম! তৎ ব্রহ্ম কিম্? অধ্যাত্মং কিম্? কর্ম্ম কিম্? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্? কং চ অধিদৈবম্ উচ্যতে? মধুসূদন! অত্র অধিযজ্ঞঃ কঃ? অস্মিন্ দেহে কথং প্রয়াণকালে চ নিয়তাত্মভিঃ কথং জ্ঞেয়ঃ অসি?।। ১।২

অনুবাদ—হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত এবং অধিদৈব কাকে বলে? হে মধুসূদন! এখানে অধিযজ্ঞ কি? এই দেহে তিনি কি প্রকারে চিন্তনীয়? এবং মৃত্যুকালে সংযত-চিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক কীরূপে (তুমি) জ্ঞাত হও।। ১।২

অর্জ্জুনের নির্ব্বেদমূলক জিজ্ঞাসা

পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলেছেন—যাঁরা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে অবগত হন, মৃত্যুকালেও তাঁরা আমাকে কদাপি বিস্মৃত হন না। অর্জ্জুন উক্ত ভগবদুক্তির মর্ম্মার্থ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে না পেরে এক্ষণে প্রশ্ন করছেন—হে পুরুষোত্তম, তুমি যে ব্রহ্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ প্রভৃতি বিষয়গুলির উল্লেখ করলে সেগুলি আমার নিকট একান্ত দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। এগুলির রহস্য উপলব্ধি করতে পারলে নাকি আর পুনর্জন্ম হয় না। আমিও তো তোমার নিকট আমার প্রাণের দুঃসহ ব্যথা-বেদনা নিবেদন করে পূর্ব্বেই বলেছি যে আমি আমার মানসিক উদ্বেগ-অশান্তিতে একান্ত কাতর ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং আমি এই সংসার-দাবদাহ হতে চিরতরে বিমুক্ত হবার জন্য অতীব আকুল-ব্যাকুল। সুতরাং, উপরোক্ত বিষয়গুলির জ্ঞানের সহিত সম্যক্‌রূপে তোমাকে কী ভাবে লাভ করা যায়—তা আমাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও।

বস্তুতঃ, চরম মুক্তি লাভের জন্য প্রয়োজন—অনুরূপ বিষয়বিতৃষ্ণা ও

নিরন্তর ভগবৎস্মৃতি রক্ষার উপযোগী ব্যাকুল উৎকণ্ঠা। এ বিষয়ে নব যুগের পরম দরদী সদ্গুরু আচার্য্য প্রণবানন্দ স্বীয় আত্মোন্নতিকামী সাধক সন্তানগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন—"দৈনিক কত ঘণ্টা ধ্যান-জপ, বিবেক-বিচার, মৃত্যুচিন্তা করিতেছ? যাহা করিতেছ গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট কি না —তা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিবে।" "যতদিন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ বিস্মৃতি-সাগরের অতল তলে নিমজ্জিত না হইবে ততদিন বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হইবে না।" "যে টান, যে আকাঙ্ক্ষা, যে ইচ্ছা প্রাণে জাগিতেছে তাহা তো তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়—খুব ভাব, খুব চিন্তা কর।" "পুনঃ পুনঃ তাঁহার স্মৃতি প্রতি শ্বাসে শ্বাসে প্রতি পলকে পলকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর।" তাঁহার নির্দেশ—সামান্য দু-এক ঘণ্টা ধ্যান-জপ, আত্মবিচারণা তো ছেলেখেলা মাত্র। চরম সিদ্ধি লাভের জন্য চাই—আকুল উৎকণ্ঠা। চাই—মনের সহিত বিরামবিহীন সংগ্রাম ঐকান্তিক শরণাগতির ভাব।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে শ্রীভগবান্ অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ—এই তিনটি বিষয়েরই উল্লেখ করেছিলেন। পরন্তু, অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসু মন এই সূত্রে যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত করেছে—তা আরও ব্যাপক। তিনি উক্ত তিনটি বিষয় ছাড়া আরও জানতে চাইলেন —ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? জীবদেহে শ্রীভগবান্ কী ভাবে চিন্তনীয়? বস্তুতঃ, উপরোক্ত প্রশ্নগুলি অধ্যাত্ম জগতের অনুসন্ধিৎসু সমস্ত সাধকগণের অন্তরের চিরন্তন জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি মাত্র। অর্থাৎ, উক্ত প্রশ্নগুলির চরম সমাধানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে—সাধন-জীবনের পরম সিদ্ধির বিজয়গৌরব। সুতরাং আসুন, আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করি—শ্রীভগবান্ স্বীয় প্রাণপ্রিয় সখার উক্ত ব্যাকুল জিজ্ঞাসার উত্তরে কি বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ—

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৪

অন্বয়—পরমং অক্ষরং ব্রহ্ম স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে। ভূত-ভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। দেহভৃতাং বর ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতং পুরুষঃ অধিদৈবতং চ অহমেব অত্র দেহে অধিযজ্ঞঃ॥ ৩।৪

অনুবাদ—পরম অক্ষর (যে) বস্তু—তাহাই ব্রহ্ম। স্বভাবই অধ্যাত্ম বলে উক্ত হয়। আর ভূতগণের উৎপত্তিকারক যে ত্যাগানুষ্ঠান—তাহাই কর্ম্ম। হে নরশ্রেষ্ঠ, বিনাশশীল দেহাদি বস্তুই অধিভূত, পুরুষই অধিদৈবত এবং এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ॥ ৩।৪

ভগবানের সর্ব্বময়ত্ব

সংক্ষেপে শ্লোক দুইটির তাৎপর্য্য হচ্ছে—যাঁর ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই অর্থাৎ যিনি অক্ষয়, অব্যয়—তিনিই ব্রহ্ম, প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুর অন্তর্নিহিত যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মিক শক্তি তিনি স্বভাব বা অধ্যাত্ম; সহজ অর্থে ব্রহ্ম হচ্ছেন—পরমাত্মা আর অধ্যাত্ম হচ্ছেন—জীবাত্মা। বিশ্ব চরাচরের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের যে ত্যাগমূলক আচরণ তাই হচ্ছে কর্ম্ম। দেহাদি যে নশ্বর বস্তুকে আশ্রয় করে প্রাণিগণ অবস্থান করে—তাই অধিভূত, যিনি সমগ্র প্রাণিকুলের নিয়ন্তা—তিনিই অধিদৈবত বা হিরণ্যগর্ভ এবং যিনি জীবদেহে সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও ফলভোক্তা—তিনিই অধিযজ্ঞ বা ভগবান্ স্বয়ং। অর্থাৎ, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বোঝাচ্ছেন—এই সংসারের সমস্ত কিছুই আমি। আমিই অক্ষর ব্রহ্ম, আমি বিশ্বের আদি কারণ হিরণ্যগর্ভ, জীবের অন্তর্নিহিত যে চেতন আত্মিক সত্তা তাও আমি, এই বিশ্বপ্রপঞ্চের আদি ও উপাদান কারণও আমি। অর্থাৎ, চৈতন্যের আধারস্বরূপ এই যে দেহ তা নশ্বর ও বিনাশশীল হলেও—তাও আমি। হে অর্জ্জুন, আমি ব্যতীত এই জগতে আর কিছুই নাই।

বস্তুতঃ, সাধকের মনে যদি এই ধারণা থাকে যে এই জগতে ভগবান্ ছাড়া অন্য কিছু আছে তবে তার প্রাণে ভগবানের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জাগ্রত হয় না। বস্তুতঃ যারা মনে করে ভগবানকে বাদ দিয়েও সৃষ্টি সম্ভবপর এবং সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার জন্য ভগবানের প্রয়োজন হয় না—তারাই নাস্তিক, তারাই জড়বাদী ও অবিশ্বাসী। যদিও নব্য বিজ্ঞান সপ্রমাণ করেছে যে এই জগতে প্রাণহীন জড় বলে কোন বস্তুই নাই। তথাপি, আধুনিক

ভৌতিক বিজ্ঞানের অত্যদ্ভুত উদ্ভাবনী ও কার্য্যকারিণী শক্তি লক্ষ্য ক'রে একশ্রেণীর নরনারী আজ ভগবানকে বাদ দিয়েও সৃষ্টিরহস্যের মীমাংসায় উদ্যোগী। এঁরা মনে করেন—মনুষ্য-জীবনকে সুখী ও সম্পন্ন করার পক্ষে বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উৎকর্ষই যথেষ্ট।

বলা বাহুল্য, এরূপ মিথ্যা জ্ঞানাভিমানই অধ্যাত্ম সাধন-মার্গের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। এই মোহপাশ ছিন্ন করার নিমিত্ত গীতার এই অধ্যায়ে ভাগবত স্বরূপের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। এখানে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে পুরোভাগে করে বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে বলছেন—'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ'—আমা ব্যতীত আর কিছুই নাই।

অর্জ্জুনের প্রাণে স্বীয় সর্ব্বময়ত্বের ভাবটি এই ভাবে মুদ্রিত ক'রে দিয়ে তাঁর অন্তিম প্রশ্নের উত্তর দানপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ এক্ষণে বললেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

অন্বয়—অন্তকালে চ মাম্ এব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা যঃ প্রয়াতি সঃ মদ্ভাবং যাতি অত্র সংশয়ঃ নাস্তি॥ ৫

অনুবাদ—অন্তকালেও আমাকেই স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগ ক'রে যে প্রয়াণ করে সে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়;—ইহাতে সংশয় নাই॥ ৫

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬

অন্বয়—কৌন্তেয় অন্তে যং যং বা অপি ভাবং স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি, সদা তদ্ভাবভাবিতঃ তং তম্ এব এতি॥ ৬

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! মৃত্যুকালে সে যেই ভাব স্মরণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করে (সে) সর্ব্বদা সেই ভাবে তন্ময়চিত্ত (থাকায়) সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়॥ ৬

মৃত্যুকালীন চিন্তাই দেহধারণের নিয়ামক

জন্মান্তরবাদী হিন্দুধর্ম্মের একটি অটল সিদ্ধান্ত এই যে মৃত্যুকালে

মানুষের মনে যে চিন্তা ও বিচার প্রবল হয় এবং যে চিন্তা নিয়ে তার দেহত্যাগ হয়, মৃত্যুর পরে সে সেই চিন্তা ও বিচারের অনুরূপ দেহধারণ করে। জীবের উচ্চাবচ দেহধারণের মূল কারণ এখানে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত সমস্ত সম্প্রদায়গুলির জন্মান্তরসংক্রান্ত ধারণা এক প্রকার নয়। হিন্দুসমাজের একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের ধারণা—জীব পশুস্তর হতে ক্রমোন্নত হতে হতে মনুষ্যস্তরে উন্নীত হয়েছে—এই ক্রমবিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। এদের মতে মনুষ্য ভগবানের সাক্ষাৎ সৃষ্টি; যেমন সনক-সনন্দাদি আদি মনুষ্যগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস পুত্র। বলা বাহুল্য, আদম ও ইভের জন্মসংক্রান্ত 'সেমেটিক' সম্প্রদায়গুলির বিশ্বাসও উক্ত ধারণার অনুরূপ। হিন্দুসমাজের অপর এক সম্প্রদায় মনে করেন—পশুস্তর হতে মনুষ্যের আবির্ভাব ঘটলেও জীব একবার মনুষ্যদেহ ধারণ করলে তার আর নিম্নগতি হয় না। অর্থাৎ, মানুষ যত অপকর্ম্মই করুক না কেন তার আর পশুযোনিতে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভবপর নয়। পরন্তু, অধিকাংশ হিন্দু বিশ্বাস করে—চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর জীব মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করার সামর্থ্য লাভ করে এবং এই কারণে মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। তারা এ কথাও বিশ্বাস করে—মনুষ্যদেহ লাভ করার পরেও মানুষ যদি পশুবৎ আচরণ করে এবং পাশব চিন্তা নিয়েই যদি সে দেহ ত্যাগ করে তবে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তার অবতরণ ঘটে পশুযোনিতে। রাজা ভরতের দৃষ্টান্তটি তাদের এই উক্তির পূর্ণ সমর্থন করে। আর শুধু ভরত নয়, পুরাণে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে সপ্রমাণ হয়—সৎকর্ম্মের ফলে জীবের যেরূপ উৎক্রান্তি ঘটে, অসৎ কর্ম্মের ফলে তেমনি তার হয় অধোগতি। বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত ধারণাই অধিক যুক্তিযুক্ত ও সমর্থনযোগ্য।

বলা বাহুল্য, এই সংসারে গতাগতির দুঃখ অতি ভয়ঙ্কর ও দুর্নিবার। এই গতাগতির ভয়ে একান্ত সন্ত্রস্ত হয়ে রাজকুমার সিদ্ধার্থ খিন্নকণ্ঠে বলেছিলেন—"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই—কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই, ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি—কোথা যাই সদা ভাবি গো

তাই।" বস্তুতঃ, পরমাত্মা পরমেশ্বরই স্বেচ্ছায় মায়ার বন্ধন স্বীকার ক'রে জীব সেজে নিরন্তর ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করছেন এবং পুনরায় স্বীয় পরমানন্দস্বরূপ ব্রাহ্মীস্থিতিতে প্রত্যাবৃত্ত হবার জন্য আকুল-ব্যাকুল হচ্ছেন। শ্রীভগবানের এই সৃষ্টিলীলা কতই না বিচিত্র ও রহস্যময়! জীবের দুঃখদাতা যিনি, সেই দুঃখের পরিত্রাতাও আবার তিনি। জীবরূপী অর্জ্জুনের দুঃখে বিগলিতচিত্ত হয়ে তার উদ্ধারের পথের নির্দ্দেশ দিয়ে তিনি বলছেন—

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥ ৭

অন্বয়—তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর চ যুধ্য। ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ অসংশয়ং মাম্ এব এষ্যসি॥ ৭

অনুবাদ—সর্ব্বদা আমাকে স্মৃতিপথে রেখে স্বধর্ম্ম আচরণ কর। আমাতে মনোবুদ্ধি অর্পণ করলে যে আমাকে প্রাপ্ত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই॥ ৭

গীতার সার শিক্ষা

'তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'—এই শ্লোকার্দ্ধের মধ্যে সমগ্র গীতার সার শিক্ষা বিদ্যমান। বস্তুতঃ, গীতার সমস্ত অধ্যায়গুলিতে নানাভাবে যত উপদেশ দেওয়া হয়েছে—তার প্রধান তাৎপর্য্য হচ্ছে—আমাতে যোগযুক্ত হলে আমার কৃপাশিসে তুমি আমাকে লাভ করে ধন্য হবে। সর্ব্বপ্রকার সাধকগণের মধ্যে এরূপ ভক্তই আমার প্রিয়তম এবং এই সাধনমার্গেই আমি সবচেয়ে সহজলভ্য।

যাঁরা গীতাপ্রেমী বা গীতাধর্ম্মের সাধক তাঁরা যদি গীতার এই বাক্যাংশটুকু স্মৃতিপটে রেখে এবং তার মর্ম্মার্থ অনুধাবন ক'রে কর্ত্তব্য পালন করতে থাকেন তবে তাতেই তাদের চরম গতি লাভ হবে। গীতার এই অভয় আশ্বাস কতই না মর্ম্মস্পর্শী—কতই না শান্তিপ্রদ!

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮

অন্বয়—পার্থ অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা অনুচিন্তয়ন্ দিব্যং পরমং পুরুষং যাতি॥ ৮

অনুবাদ—হে পার্থ, চিত্তকে অন্য বিষয়ে যেতে না দিয়ে নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা তাকে স্থির করে সেই দিব্য পরমপুরুষের ধ্যান করতে থাকলে সাধক তাঁকেই প্রাপ্ত হন॥ ৮

ভক্তিযুক্ত অভ্যাসযোগ ভগবদ্‌প্রাপ্তির সহজ উপায়

মানুষের মন যে কীরূপ চঞ্চল গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকে 'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ' ইত্যাদি বাক্যে তা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অগ্রসর হয়ে তখন শ্রীভগবান্ মনোজয়ের উপযোগী অভ্যাস ও বৈরাগ্যরূপী যে দুটি সাধনমার্গের উল্লেখ করেছিলেন এখানে তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে বলা হয়েছে—হে অর্জ্জুন, মনোজয়ের শ্রেষ্ঠ উপায় যে অভ্যাসযোগ তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই এবং এই সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে নিরন্তর সেই দিব্য ভগবৎ স্বরূপের ধ্যান করতে পারলে অন্তিমে যে তাঁকে লাভ করে ধন্য হওয়া যায় তা নিঃসন্দেহ। তবে এই সাধনপথও কম বিঘ্নসঙ্কুল নয়। কেন না, প্রাক্তন সংস্কার বশে মনের গতিপ্রবাহ একান্তই বহির্মুখী এবং এজন্যই মন অনুক্ষণ স্বীয় রুচি ও প্রবৃত্তির অনুরূপ বিষয়ে ধাবিত। এরূপ অবস্থায় মনের সেই বহির্গতিকে সংযত করার উপায় হচ্ছে—প্রত্যাহারের সাধনা। অর্থাৎ, মন যখনই কোন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেই দিকে ধাবিত হয় তখন বিবেক-বিচারের সাহায্যে তা হতে তাকে প্রত্যাহৃত করে ধ্যেয় বস্তুতে পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত করতে হয়। নিরন্তর এরূপ প্রত্যাহারের প্রচেষ্টা ব্যতীত অভ্যাসযোগের সাধনা হয় নিষ্ফল ও নিরর্থক।

বস্তুতঃ, নিত্যানিত্য বিবেক-বিচারের সাহায্যে সাধক যখন সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করেন যে ধনৈষণা, পুত্রৈষণা, যশ-এষণা প্রভৃতি সমস্ত এষণাগুলিই হচ্ছে জীবের যাবতীয় বন্ধন ও দুঃখের মূল কারণ, তখনই তাঁর মনে সুদৃঢ় ধারণা জন্মে—ভগবানই একমাত্র বস্তু, আর সব অবস্তু, তিনিই কেবল সৎ আর সব কিছুই অসৎ। সুতরাং, তিনিই হচ্ছেন—তাঁর একমাত্র কাম্য।

এইরূপ বিচারপ্রবাহের দ্বারা অভ্যাসযোগী সাধকের মন যখন রূপ-রসাদি বাহ্য বিষয়সমূহকে কাকবিষ্ঠাবৎ অতি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বলে ভাবতে

অভ্যস্ত হয় তখনই তাঁর মন সহজে ভগবন্নিষ্ঠ হয়ে তাঁতেই লীন হয়ে যায়। প্রত্যাহারযুক্ত অভ্যাসযোগের সাধনায় সিদ্ধির মূল রহস্য ইহাই।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ১০

অন্বয়—কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ অণোঃ অণীয়াংসং সর্ব্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ প্রয়াণকালে ভক্ত্যা যুক্তঃ চ এব যোগবলেন ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য যঃ অনুস্মরেৎ সঃ তং দিব্যং পরং পুরুষম্ উপৈতি॥ ৯।১০

অনুবাদ—সেই পরমপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ অনাদি, সর্ব্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্তনীয়, আদিত্যবৎ স্বরূপপ্রকাশক ও প্রকৃতির অতীত; যিনি মৃত্যুকালে মনকে একাগ্র করে ভক্তিযুক্ত চিত্তে যোগবলের সাহায্যে প্রাণকে ভ্রূযুগলের মধ্যে ধারণ পূর্ব্বক তাঁকে স্মরণ করেন তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন॥ ৯।১০

গীতামৃত—উপরোক্ত শ্লোক দু'টিতে সেই দিব্য পরম পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা করে ভক্তিযুক্ত চিত্তে কিভাবে ভগবদ্ধ্যানে নিরত হ'লে তিনি সহজলভ্য হন তারই সূচনা দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভগবৎ স্বরূপের এই বিস্তৃত বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে—সাধকের প্রাণে ভগবৎ প্রেমের উদ্রেক ও উৎকর্ষ-সাধন।

বস্তুতঃ, কোন বস্তু বা ব্যক্তির রূপ, গুণ, শক্তি ও বিভূতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত তার প্রতি মনে কোনও প্রকার আকর্ষণ বা অনুরাগের ভাব জাগ্রত হয় না। এজন্যই দেখা যায়—দেবপূজার একটা বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে

উপাস্য দেবদেবীর রূপ, গুণ ও মহিমার বর্ণনামূলক স্তব-স্তুতি পাঠ। উপরোক্ত শ্লোকে ভগবান্ নিজেই নিজের রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা ক'রে স্বীয় অনুগামী সাধকগণের প্রাণে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাব উদ্রিক্ত করার জন্য উদ্যোগী। তিনি যেন তাদিগকে বুঝিয়ে বলছেন—জীবের চরম কাম্য আমিই সেই দিব্য পরম পুরুষ, আমি হচ্ছি অনন্ত রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য্যের আধার। ত্রিলোকে আমাপেক্ষা সুন্দর, মহৎ ও ঐশ্বর্য্যশালী আর কে আছে? বেদোপনিষদাদি সমস্ত গ্রন্থ আমার এই রূপ-গুণের অশেষ বর্ণনায় ভরপুর।

যাঁরা মৃত্যুকালে পরমগতি লাভের জন্য আকুল-ব্যাকুল, তাঁদের কর্ত্তব্য হচ্ছে—ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে সংহত ক'রে ভক্তিযুক্ত চিত্তে একাগ্রমনে আমার এই পরম ভাগবত স্বরূপের ধ্যান করা। এরূপ ভাবে যাঁরা আমার ধ্যানে তন্ময় হতে পারেন মৃত্যুকালে আমি তাঁদের সহজলভ্য হই।

পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে এ বিষয়ে আরও সূচনা দিয়ে শ্রীভগবান্ বলছেন—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১

অন্বয়—বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং বদন্তি বীতরাগাঃ যতয়ঃ যৎ বিশন্তি যৎ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১

অনুবাদ—বেদবাদিগণ যাকে অক্ষর বলে নির্দ্দেশ করেন, বিরক্ত যোগিগণ যাঁতে প্রবেশ করেন, যাঁকে লাভ করার জন্য সাধকগণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন সেই পরম পদের প্রাপ্তির উপায় সংক্ষেপে তোমাকে বলছি॥ ১১

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩

অন্বয়—সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য চ মনঃ হৃদি নিরুধ্য মূর্দ্ধি প্রাণম্ আধায় আত্মনঃ যোগধারণাম্ আস্থিতঃ ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রয়াতি সঃ পরমাং গতিং যাতি॥ ১২।১৩

অনুবাদ—সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে প্রাণকে ভ্রূযুগলের মধ্যে সম্যক্‌রূপে ধারণ করে "ওঁ" এই পরম পবিত্র একাক্ষর প্রণব মন্ত্র জপ করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি সেই পরমগতি প্রাপ্ত হন॥ ১২।১৩

অন্তিমকালে পরমগতি লাভের নিমিত্ত প্রয়োজন যোগযুক্ত চিত্তে প্রণবমন্ত্রের সাধনা

যে কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন করতে হলে তার জন্য প্রয়োজন সম্যক্ পূর্ব্বপ্রস্তুতি। এরূপ পূর্ব্বপ্রস্তুতি ব্যতীত কোন কাজ সুসিদ্ধ হবার নয়। যাঁরা মৃত্যুকালে ভগবৎ স্মৃতি অচল রাখতে চান তাঁদেরও চাই—ইত্যাকার বিশেষ আয়োজনমূলক ব্যবস্থা। উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে সেই প্রস্তুতি ও অভ্যাসক্রমের বিষয়গুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

মনুষ্যদেহে ধ্যান করবার মুখ্য স্থান হচ্ছে দুটি—হৃদয় ও ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থান। সাধারণতঃ ভক্তিবাদী সাধকগণ তাঁদের হৃদয়কমলে উপাস্য দেবতার ধ্যান করেন এবং জ্ঞান ও ধ্যানবাদিগণ ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী দ্বিদলপদ্মে ওঁ বা প্রণবমূর্ত্তির ধ্যান করেন। উপরোক্ত শ্লোকে মনকে হৃদয়পদ্মে একাগ্র ক'রে দ্বিদলে প্রাণবায়ুকে সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ ক'রে ওঁকার বা প্রণবমন্ত্র জপের সাহায্যে পরমাত্মার ধ্যান করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যোগশাস্ত্র মতে হৃদয়ের নিম্নাংশ হচ্ছে ভোগভূমি। এজন্য ঐ অংশকে বস্ত্রাচ্ছাদিত রাখার সুব্যবস্থা। হৃদয় হচ্ছে—ভাবকেন্দ্র—Centre of impulse and emotion। তাই এই কেন্দ্রে ভাবাবিষ্ট চিত্তে পরম প্রেমময় শ্রীভগবানের ধ্যান করার বিধান দেওয়া হয়েছে—ভক্তিশাস্ত্রে। দ্বিতীয়তঃ, আজ্ঞাচক্রটি সর্ব্বোচ্চ সহস্রার পদ্মটির অতি সন্নিকট। এখানে তাই মানুষের প্রজ্ঞানেত্র বিদ্যমান। দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে হলে এখানেই মনকে একাগ্র ও নিশ্চল করার বিধান। কেমন করে তা সম্ভবপর—গীতা এখানেই তার নির্দ্দেশ দিচ্ছেন।

এই সূচনা মতে সেই মহান্ ব্রতসিদ্ধির জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—প্রাণবায়ুর ঐকান্তিক সংযম ও সহযোগিতা।

জীবদেহে 'প্রাণ-অপান-উদান-ব্যান-সমান' রূপী যে পাঁচটি মুখ্য প্রাণবায়ু বিদ্যমান তাদের সাহায্যেই দেহযন্ত্রের সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পন্ন হয়। উদান বায়ুর দ্বারা দেহ-মনের গতি হয় ঊর্দ্ধমুখী। অপানের দ্বারা সেই গতি হয় নিম্নমুখী। ব্যানের দ্বারা ঘটে প্রাণবায়ুর সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্তি এবং সমানের দ্বারা হয় দেহমনের সাম্যভাব রক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত। এখানে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে—মনকে ঊর্দ্ধমুখী ক'রে তাকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ রেখে প্রাণবায়ুকে দ্বিদলকমলে স্থির ও নিশ্চল করে রাখা। যাঁরা পৃথক্ ভাবে নিত্য নিয়মিত প্রাণায়াম অভ্যাস করেন তাঁদের পক্ষে এই ক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত সহজ। তবে এ প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক—প্রাণায়ামসিদ্ধ যোগিগণও যদি প্রকৃত জিতেন্দ্রিয় ও ভগবৎপ্রেমী না হন তবে তাঁদের পক্ষে মনকে নিরন্তর ঊর্দ্ধমুখী রাখা আদৌ সহজসাধ্য নয়। সুতরাং, কেবলমাত্র প্রাণায়ামসাধনা ব্রহ্মপ্রাপ্তির সর্ব্বোচ্চ সাধনা বলে বিবেচিত হয় না। এজন্য উপরোক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে, সেই পরম পুরুষকে লাভের জন্য সাধকগণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করেন এবং তাঁরা তাঁর প্রতি একান্ত ভক্তিযুক্ত হন। ভক্তশিরোমণি মীরাবাঈ তাই তাঁর এক প্রখ্যাত ভজনে এই বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন—"বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।"। অর্থাৎ, প্রাণায়াম-পুরশ্চরণই কর, ত্রিসন্ধ্যা স্নান-শৌচাদি পালন কর আর যত ব্রত-নিয়মের অনুষ্ঠানই কর না কেন প্রেম-ভক্তি ব্যতীত ভগবৎ প্রাপ্তি অসম্ভব।

পক্ষান্তরে, ভক্তিশাস্ত্র বলেন—ভগবদ্‌প্রাপ্তির জন্য যাঁরা ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে পরা ভক্তির সাধনা করেন এবং পরম শরণাগতির ভাব নিয়ে যাঁরা ভগবৎ সেবায় সর্ব্বস্ব পণ করেন তাঁদের মন ও ইন্দ্রিয় স্বভাবতই সংযত, শুদ্ধ ও একাগ্র হয়ে ভগবন্মুখী হয়ে যায় এবং তাঁদের প্রাণবায়ু স্বতঃ ভ্রূযুগলের মধ্যে শান্ত ও নিরুদ্ধ হয়ে ভগবৎ প্রাপ্তির অনুকূল হয়ে উঠে। এজন্য এখানেও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে—সেই পরমপদ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন—ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম ব্রহ্মবাচক 'প্রণব' মন্ত্রের নিরন্তর জপ ও ধ্যান। যুগাবতার আচার্য্য প্রণবানন্দজীও তদীয় আশ্রিত সন্তান-সন্ততিগণকে প্রথমতঃ অনুরূপ নির্দ্দেশ দিয়ে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রণবমূর্ত্তির

ধ্যান ও প্রণবমন্ত্রের জপ করার সূচনা দিতেন এবং অতঃপর তাদের ভাবভক্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন তিনি নিজেই সেই দিব্য পরম পুরুষের স্বরূপ ধারণ ক'রে সাক্ষাৎ প্রণবমূর্ত্তি বা প্রণবানন্দরূপে পূজার আসনে আসীন হন তখন তদীয় শিষ্যভক্তগণ তাঁকেই সাক্ষাৎ প্রণবস্বরূপ জ্ঞান করে তাঁর দর্শন, মনন, পূজা, ধ্যান ও সেবা করে ধন্য ও কৃতার্থ হন।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

অন্বয়—পার্থ, অনন্যচেতাঃ যঃ মাং নিত্যশঃ সততং স্মরতি তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ॥ ১৪

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! অনন্যচিত্ত হয়ে যিনি অনুক্ষণ আমাকে স্মরণ করেন সেই নিত্য যুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সহজলভ্য॥ ১৪

নিত্য স্মরণ ভগবৎ প্রাপ্তির সহজতম সাধন

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকে প্রাণায়ামাদি যোগসাধনার দ্বারা মনকে নিশ্চল করে, ভ্রূযুগলমধ্যে ভগবৎ ধ্যানের সহায়তায় কীরূপে ভগবৎ স্মৃতি লাভ করা যায় তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরন্তু, যোগমূলক এরূপ সাধনা সকলের পক্ষে উপযোগী ও অনুকূল নাও হতে পারে। তাই শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকে স্বীয় সখাকে বলছেন—হে সখে, আমাকে লাভ করার আর একটি সরল ও সহজ পথ আছে এবং তা' হচ্ছে—'নিত্য স্মরণের' পথ। যারা সারাদিনের সর্ব্ববিধ কাজকর্ম্মের মধ্যেও আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ রাখতে অভ্যস্ত হয়, তারা আমাকে অতি সহজেই লাভ করে ধন্য হয়। এরূপ না করে সমগ্র জীবন আমার প্রতি উদাসীন ও বিমুখ থেকে যারা স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত হয়ে নিজ নিজ খেয়াল খুশীমত বিষয়সেবা করতে থাকে তারা শত চেষ্টাতেও মৃত্যুকালে আমার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না। তাদের আত্মীয়-পরিজনও যদি মৃত্যুকালে তাদের কর্ণে আমার ভুবন-পাবন নামের অমৃতধারা বর্ষণ করতে থাকে তাহলেও তাদের মন আদৌ আমার অভিমুখী হয় না। পূর্ব্ব সংস্কার বশে বিষয়-চিন্তাই তখন তাদের মন-প্রাণকে অধিকার করে বসে।

এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদৃষ্ট দুটি উদাহরণ এস্থলে উপস্থাপিত করলে পাঠকবৃন্দের ধারণা অধিকতর স্পষ্ট হবে।

প্রথম দৃষ্টান্তটি হচ্ছে জনৈক ঘোর বিষয়ী ব্যক্তির সম্পর্কে। উক্ত ব্যক্তি শুধু যে বিষয়াসক্ত ছিলেন তা-ই নয়, তিনি ছিলেন ভীষণ মামলাবাজ। সমগ্র জীবন তিনি বিষয়সেবা ও মামলা-মোকদ্দমার চিন্তায় এত নিমজ্জিত থাকতেন যে মৃত্যুকালে বিকারদশাতেও তিনি তাঁর সেই মামলা-মোকদ্দমার কথাই বলতে থাকলেন। আত্মীয়-পরিজনেরা তখন তাঁকে বিষয়চিন্তা হতে বিমুক্ত করে ভগবানের স্মরণ-মননে নিযুক্ত করার জন্য আয়োজন করলেন নামসঙ্কীর্ত্তন ও গীতাদি শাস্ত্রগ্রন্থের পঠন-পাঠন। পরন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এত চেষ্টা-যত্ন সত্ত্বেও তিনি তাঁর মামলা-মোকদ্দমার স্মৃতি পরিহার করতে অক্ষম হলেন। তখন আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে তাঁর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করতে করতে বললেন—'আপনি এখন বিষয়চিন্তা পরিহার করে আমাদের সঙ্গে একটু হরিবোল বলুন।' ভদ্রলোক কিন্তু তাঁর সেই বিকার দশাতেও বলে উঠলেন—'আমি অত কথা বলতে পারি না'। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তখনো তিনি তাঁর সেই মামলা-মোকদ্দমার কথাই অস্ফুট স্বরে অবিরাম অবিশ্রাম বলতে থাকলেন। আর সেই অবস্থাতেই ঘটল তাঁর মৃত্যু। এই ঘটনা হতে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়—সারা জীবন যারা বিষয়চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, মৃত্যুকালে শত চেষ্টাতেও তাদের মনকে ভগবন্মুখী করা সম্ভবপর হয় না।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হচ্ছে আমাদের সঙ্ঘের জনৈক একনিষ্ঠ সঙ্ঘভ্রাতাকে আশ্রয় করে। ভ্রাতাটি ছিলেন সঙ্ঘনেতা ও সঙ্ঘাশ্রিত অন্যান্য শিষ্যভক্তগণের একান্ত স্নেহের পাত্র। হায়দ্রাবাদ সহরে প্রচারবাহিনীর সঙ্গে কর্ম্মরত অবস্থায় সে হল কালবসন্ত রোগে আক্রান্ত। দিবারাত্র চলল তার সেবা-শুশ্রূষার সর্ব্ববিধ বিধিব্যবস্থা। পরন্তু, সকল চেষ্টাই হল ব্যর্থ। রোগীর যখন অন্তিম মুহূর্ত্ত তখন সঙ্ঘের সেই একনিষ্ঠ ভক্তসন্তানটির কণ্ঠে স্বীয় পূর্ব্বাশ্রমের পরিজনবর্গের সম্পর্কে দু একটি কথা শুনে শুশ্রূষাকারী ভ্রাতৃগণ স্তম্ভিত। তখন আচার্য্যদেব-সূচিত মৃত্যুকালীন সেই অন্তিম ভজনটি—

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাঽক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা গতিঃ॥

শুরু করা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠ হল স্তব্ধ। এর পরেই যখন সঙ্ঘের নিত্যপাঠ্য গুরুপ্রণাম স্তবটি আরম্ভ করা হল তখন সে স্থির শান্ত হয়ে তাতেই মনোনিবেশ করল এবং স্তোত্র পাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নির্গত হল তার শেষ নিঃশ্বাস। এক্ষণে আমাদের স্থির বিশ্বাস হল—গুরুস্মৃতি নিয়ে দেহত্যাগ করার ফলে তার আত্মা শ্রীগুরুচরণে বিলীন হয়ে গেল।

বস্তুতঃ উপরোক্ত দুটি দৃষ্টান্তই একান্ত শিক্ষাপ্রদ। প্রথমটি হতে এই জ্ঞান লাভ করা যায়—সমগ্র জীবন যারা বিষয়-ভোগে নিমগ্ন থাকে, মৃত্যুকালে শত চেষ্টাতেও তাদের মন-প্রাণকে ভগবন্মুখী করা সম্ভবপর হয় না। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি আমাদের শিক্ষা দেয়—যারা সমগ্র জীবন ভগবৎ সেবা ও ভগবৎ চিন্তায় ব্যাপৃত হয় জীবনের শেষ সায়াহ্নে প্রাক্তন সংস্কারের বশে তাদের হৃদয়-মনে ক্ষণিক চাঞ্চল্য দেখা দিলেও এই অবস্থায় তাদের কর্ণে ভগবানের নাম সংকীর্ত্তিত হলে তারা ভগবৎ স্মৃতি নিয়েই দেহত্যাগ ক'রে পরম গতির অধিকারী হয়।

জগতের সকল ধর্ম্মাবলম্বী সাধকগণই এই দুঃখ-সন্তাপমগ্ন সংসারে পুনরাবর্ত্তনকে ভীতির চক্ষে দেখে থাকেন। তবে আর্য্যহিন্দু ব্যতীত অন্য বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বীরা মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে গিয়ে ভগবৎ বিচারে পুনরায় অনন্ত কালের জন্য ভোগসুখে প্রমত্ত হওয়াটাকেই অন্তিম কাম্য বলে মনে করেন। হিন্দুধর্ম্মেও মৃত্যুশেষে স্বর্গাদি লোকের প্রাপ্তির কথাও বর্ণিত হয়েছে। পরন্তু, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে—ব্রাহ্মী স্থিতি ছাড়া অন্য সমস্ত লোকের ভোগ-সুখ অতি তুচ্ছ ও বন্ধনকারক। পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীভগবান্ এই বিষয়টি পরিষ্কার রূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫

অন্বয়—মহাত্মানঃ মাম্ উপেত্য দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতং চ পুনর্জন্ম ন আপ্নুবন্তি পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ॥ ১৫

অনুবাদ—মহাত্মগণ আমাকে লাভ করে দুঃখালয়রূপ অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ; কেন না তাঁরা (আমার প্রাপ্তিস্বরূপ) পরম সিদ্ধি লাভ করেন॥ ১৫

গীতামৃত—বস্তুতঃ, বিষয়তৃষ্ণাই জীবের জন্মান্তর গ্রহণের একমাত্র হেতু। ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ চরম সিদ্ধিলাভের ফলে যখন সেই বিষয়বাসনা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায় তখন আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা কোথায়?

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

অন্বয়—অর্জ্জুন! আব্রহ্ম ভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ তু কৌন্তেয় মাম্ উপেত্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অন্য সমস্ত লোক হতেই মনুষ্য পুনরাগমন করে, (পরন্তু) হে কৌন্তেয়, আমাকে একবার লাভ করলে তার আর পুনর্জন্ম হয় না॥ ১৬

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অন্য সমস্ত লোক অনিত্য

'ব্রহ্মলোক' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হলেও সে লোক প্রাপ্ত হয়েও সাধকের পুনরাগমনের সম্ভাবনা থাকে। পরন্তু, সাধক যদি আমাতে অভিনিবিষ্ট হয়ে আমাকে পরম আশ্রয় মনে ক'রে আমাতে যুক্ত হন তবে তাঁর আর গতাগতির ভয় থাকে না। কেন না, আমিই জীবের পরম গতি, অন্তিম অবলম্বন। এই পরম সত্য তত্ত্বটি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই চারণগণ ভ্রান্ত জীবের দ্বারে দ্বারে প্রভাতী কীর্ত্তনের সূত্রে শিক্ষা দেন—

"কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হইনু॥"

এখানে জানা আবশ্যক—গীতায় অন্যত্র যে ব্রাহ্মী স্থিতিকে সর্ব্বোত্তম স্থিতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেই ব্রাহ্মী স্থিতি ও 'ব্রহ্মলোক' এক বস্তু নয়। বস্তুতঃ, 'ব্রাহ্মী স্থিতি' হচ্ছে সুদুর্লভ ভগবৎ প্রাপ্তির চরম ও পরম অবস্থা। আর 'ব্রহ্মলোক' হচ্ছে বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠলোকের ন্যায় একটি উচ্চ সাধনভূমি মাত্র। সুতরাং, ব্রাহ্মী স্থিতির তুলনায় ইহাও নিম্নাবস্থা। এই কারণে শ্রীভগবান্ স্বীয় সখাকে বলছেন—হে কৌন্তেয়, তুমি আমাকে লাভ করার জন্য কৃতনিশ্চয় হও।

এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক—অর্জ্জুন তো তখনও শ্রীভগবানের

সান্নিধ্যেই বিদ্যমান, তবে তাঁকে লাভ করার কথা উঠে কেন? উত্তরে বলব —অর্জ্জুন তখনও মোহমুক্ত নন; তখনও তিনি স্বীয় সখাকে মানবীয় দৃষ্টিতে দর্শন ও মানবীয় সম্পর্কে সম্পর্কিত বলে ভাবতে অভ্যস্ত। তাই বাহ্যতঃ তাঁর সন্নিকটে অবস্থিত হয়ে তাঁর সেবা-পরিচর্য্যা করলেও, তিনি তখন তাঁকে ভগবৎ জ্ঞানে স্বীকার ও গ্রহণ করেন নি। আর তাঁর এই অজ্ঞানাপরাধের অপনোদনের জন্যই বিশ্বরূপ দর্শন কালে অর্জ্জুন পুনঃ পুনঃ ভগবচ্চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭

অন্বয়—সহস্রযুগ পর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ (তথা) যুগসহস্রান্তাং রাত্রিং (যে) বিদুঃ তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ॥ ১৭

অনুবাদ—চতুর্যুগ সহস্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি দিন ও এরূপ চতুর্যুগ সহস্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি রাত্রি—ইহা যাঁরা জানেন, তাঁরাই প্রকৃত অহোরাত্রির জ্ঞাতা॥ ১৭

ব্রহ্মার দিবারাত্রের রহস্য যাঁরা অবগত তাঁরাই প্রকৃত জ্ঞানী

সাধারণ মনুষ্যের গণনার মতে ১২ ঘণ্টায় দিন এবং ১২ ঘণ্টায় রাত্রি। দেবগণের গণনায় উত্তরায়ণের ৬ মাসে একটি দিন ও দক্ষিণায়নের ৬ মাসে একটি রাত্রি। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মার দিন রাত্রির গণনা অন্যরূপ। এই মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চার যুগ নিয়ে এক মহাযুগ এবং এরূপ এক সহস্র মহাযুগে ব্রহ্মার একটি দিন এবং ঐরূপ এক সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একটি রাত্রি।

"প্রাচ্য জ্যোতির্বিদগণের মতে সত্যযুগ—১৭২৮০০০ বৎসর, ত্রেতাযুগ—১২৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপর যুগ—৮৬৪০০০ বৎসর এবং কলিযুগ—৪৩২০০০ বৎসর। এই হিসাবে এক মহাযুগ বা চতুর্যুগের সময় হয়—৪৩২০০০০ বৎসর। এইরূপ সহস্র চতুর্যুগ অর্থাৎ ৪৩২০০০০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন এবং অনুরূপ ৪৩২০০০০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার

এক রাত্র। ব্রহ্মার এক দিনে হয় এক কল্প। এক কল্পে অর্থাৎ ১০০০ চতুর্যুগে —১৪ মন্বন্তর, সুতরাং, এক মন্বন্তরে ৭১ ৩/৭ চতুর্যুগ। অর্থাৎ, প্রত্যেক মন্বন্তরে ৭১ বার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারযুগ ঘুরে আসে। এইরূপে ১৪ মন্বন্তর শেষ হলে কল্পক্ষয় হয়, তখন হয়—প্রলয়ের সূচনা। এখন শ্বেতবরাহ কল্পের ৭ম মন্বন্তর চলছে, এই ৭ম মনুর নাম—বৈবস্বত মনু। এই মন্বন্তরের ২৭তম মহাযুগ অতীত হয়েছে, এখন ২৮তম মহাযুগের কলিযুগ চলছে। কলির পরিমাণ—৪৩২০০০ বৎসর। বর্ত্তমান সনে (১৩৮৩) উহার ৫০৭৭ বৎসর হয়েছে। সুতরাং, কলি শেষ হতে ঢের বাকী, কল্পক্ষয় তো বহু দূরে।"

(জগদীশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা হতে গৃহীত)

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮

অন্বয়—অহরাগমে অব্যক্তাৎ সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি। রাত্র্যাগমে তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে প্রলীয়ন্তে॥ ১৮

অনুবাদ—ব্রহ্মার দিনের আগমনে অব্যক্ত প্রকৃতি হতে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উদগত হয়। পুনরায় তাঁর রাত্রির আগমনে সেই কারণেই সমস্ত লীন হয়ে যায়॥ ১৮

ব্রহ্মার দিবাগমে সৃষ্টি এবং রাত্র্যাগমে প্রলয়

উপরোক্ত শ্লোকে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ও প্রলয়ের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্মার দিবাভাগের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে অব্যক্ত প্রলীন অবস্থা হতে বিশ্বসৃষ্টির সূত্রপাত হয় এবং তাঁর সমস্ত দিন ব্যাপিয়া তাঁর সেই সৃষ্টিচক্র অব্যাহত গতিতে প্রবহমান থাকে। পরন্তু, দিবাশেষে যখন ব্রহ্মার রাত্রিকাল সমুপস্থিত হয় তখন আরম্ভ হয় তাঁর নিদ্রা বা প্রলয়ের কাল। ব্রহ্মার সারারাত্রি পরিব্যাপ্ত থাকে সেই প্রলয়ের অবস্থা। ব্রহ্মার একদিনে হয় এক কল্প। সেই কল্পারম্ভে সৃষ্টি ও কল্পক্ষয়ে হয় প্রলয়।

হিন্দু শাস্ত্রমতে প্রলয় দুই প্রকার—খণ্ড প্রলয় ও মহাপ্রলয়। যুগবিশেষের ঘটনাবৈগুণ্যে যখন বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহ, নৈসর্গিক দুর্বিপাক প্রভৃতি কারণে আত্যন্তিক লোকক্ষয় ও আংশিক ধ্বংস সাধিত হয়,

তখন তাকে বলা হয় খণ্ডপ্রলয় এবং কল্পশেষে যখন সাধিত হয় বাহ্য বিশ্বজগতের সামগ্রিক বিনাশ—যখন কোনও কিছুর আর অস্তিত্ব থাকে না, তখন ঘটে মহাপ্রলয়।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ১৯

অন্বয়—পার্থ সঃ এব অয়ং ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে অহরাগমে অবশঃ প্রভবতি॥ ১৯

অনুবাদ—হে পার্থ, সেই ভূতগণই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয়প্রাপ্ত হয়, দিবা সমাগমে আবার তারা অবশ ভাবে প্রাদুর্ভূত হয়॥ ১৯

মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবগণের কল্পে কল্পে পুনর্জন্ম অব্যাহত

পূর্ব্ব কল্পে যে সমস্ত ভূতগণ বিদ্যমান ছিল এবং কল্পক্ষয়ের সময়ে যারা সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত ছিল, তারাই পুনরায় কল্পারম্ভে প্রারব্ধ বশে আবির্ভূত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, কর্ম্মবাসনা যতদিন চিরতরে বিনষ্ট না হয়, ততদিন জীবের এই গতাগতি কল্প হতে কল্পান্তরে অব্যাহত থাকে। কর্ম্মনীতির এইটি এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম। নিরন্তর বিবেক-বিচার ও গুরুকৃপার ফলে সাধকের মনোবুদ্ধি যখন নিদারুণ বিষয়বিতৃষ্ণ হয়ে মুক্তির জন্য আকুল-ব্যাকুল হয়ে উঠে কেবল মাত্র তখনই তার পুনর্জন্মের সংস্কার বিনষ্ট হয়, অন্যথা নয়।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০

অন্বয়—তু তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ অন্যঃ সনাতনঃ অব্যক্তঃ যঃ ভাবঃ সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০

অনুবাদ—কিন্তু সেই অব্যক্তেও অতীত যে নিত্য অব্যক্ত (আত্মা) আছেন, তিনি সকল ভূতের বিনাশ হলেও বিনষ্ট হন না॥ ২০

অব্যক্ত প্রকৃতি বিনাশশীল, পরন্তু অব্যক্ত পরমাত্মা অবিনশ্বর

উপরোক্ত শ্লোকে যে দুটি 'অব্যক্ত শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তার প্রথমটি হচ্ছে মূলা প্রকৃতি বা হিরণ্যগর্ভ এবং তা বিনাশশীল। পক্ষান্তরে, পরবর্তী 'অব্যক্ত' হচ্ছে তা হতে শ্রেষ্ঠ ; আর এই অব্যক্ত হচ্ছেন পরতত্ত্ব বা পরমাত্মা। ভূত চরাচর বিনষ্ট হলেও তিনি কদাপি বিনষ্ট হন না। এই শেষোক্ত অব্যক্তের প্রকৃত স্বরূপ কি—তাই নিম্নোক্ত শ্লোকে বিবৃত হয়েছে।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১

অন্বয়—(যঃ) অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ তং পরমাং গতিম্ আহুঃ যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম॥ ২১

অনুবাদ—যা অব্যক্ত অক্ষর নামে কথিত, যাকে পরমা গতি বলে বর্ণনা করা হয় এবং যাকে লাভ করলে আর প্রত্যাবৃত্ত হতে হয় না, তা-ই আমার পরম স্থান॥ ২১

গীতামৃত—এই অব্যক্ত অক্ষরই পরমাত্মা ; ইনি জীবের পরমা গতি বা পরম আশ্রয়। এই চরম আশ্রয় লাভ করলে সাধকের পুনরাগমন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং তখন তিনি সর্ব্বোচ্চ শান্তির অধিকারী হন। পুনর্জন্মের গতিপ্রবাহ হতে মুক্তিলাভের ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। শ্রীভগবান্ একে লক্ষ্য করে বলছেন—হে পার্থ, ইহাই আমার পরম ধাম। জীবনযাত্রাকে আজ হোক্ বা শত জন্ম পরে হোক্ এই পরম ধামে উপনীত হতেই হবে।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ২২

অন্বয়—পার্থ, ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি যেন ইদং সর্ব্বং ততং সঃ পরঃ পুরুষঃ তু অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ॥ ২২

অনুবাদ—হে পার্থ, সকল ভূত যাতে অবস্থিত, যার দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত সেই পরম পুরুষকে একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়॥ ২২

গীতোক্ত অক্ষর পুরুষ ভক্তিদ্বারা লভ্য

উপরোক্ত দুটি শ্লোকে যে অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরম পুরুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, পঞ্চদশী প্রভৃতি জ্ঞানমূলক শাস্ত্রগুলির মতে তার উপলব্ধির উপায় হচ্ছে—আত্মানাত্ম বা নিত্যানিত্য বিবেক-বিচার এবং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের সহায়তায় সেই অদ্বয় তত্ত্বের অনুধ্যান। পরন্তু, গীতায় শ্রীভগবান্ এখানে বললেন—তাঁকে কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়। এখানে জানা আবশ্যক—গীতাও অন্যতম উপনিষদ্। তবে অন্যান্য উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে—নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম অথবা নিরাকার সগুণ ব্রহ্ম। পক্ষান্তরে, সেই অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব গীতায় সাকার সগুণ রূপে রূপায়িত হয়েছেন ভগবৎ স্বরূপে।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তমরূপে আবির্ভূত হয়ে সেখানে বলছেন—নিরাকার নির্গুণ এবং সাকার সগুণ এই উভয় স্বরূপই—আমার দুটি বিভাব। তবে আমার নিরাকার নির্গুণ রূপের উপাসনা দেহধারী মানুষের পক্ষে একান্ত ক্লেশসাধ্য। সুতরাং, আমার সাকার সগুণ স্বরূপের যারা উপাসক, আমার মতে তারাই যুক্ততম। বস্তুতঃ, উপনিষদের বিচারমূলক জ্ঞানবাদ গীতায় সুমধুর ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে ভক্ত সাধকের নিকট পরম উপাদেয় ও সুখসাধ্য হয়ে উঠেছে। গীতোক্ত সাধনার ইহাই পরম বৈশিষ্ট্য।

মায়াবাদী অদ্বৈততত্ত্বের সাধকগণ সাকার সগুণ উপাসনাকে নিম্নস্তরের সাধনা বলে উপেক্ষা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন এবং কঠোর দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব ভক্তগণের দৃষ্টিতে নির্গুণ উপাসনা নিকৃষ্ট ও হেয়প্রদবাচ্য। পরন্তু, গীতার মধ্যে নিরাকার-সাকার, নির্গুণ সগুণের মধ্যে এরূপ কোনও বৈষম্যমূলক ভেদরেখা রচিত হয় নি। গীতার সাধনাকে তাই সমন্বয়মূলক সাধনা বলা চলে।

যুগাবতার আচার্য্য প্রণবানন্দের মতবাদও তদনুরূপ। তিনি তত্ত্ব হিসাবে অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও কর্ম্ম-জ্ঞান-ধ্যান-মিশ্র ভক্তি সাধনার প্রচার প্রতিষ্ঠায় কটিবদ্ধ ছিলেন। তাঁর মতাদর্শ লক্ষ্য করলে মনে হয়, সহস্র সহস্র বৎসর পরে তাঁর ভাগবত ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে গীতোক্ত সেই সমন্বয়মূলক সাধনাই পুনরায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩

অন্বয়—ভরতর্ষভ, যত্র কালে তু প্রয়াতাঃ যোগিনঃ অনাবৃত্তিং চ আবৃত্তিম্ এব যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি॥ ২৩

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ, যে কালে গমন করলে যোগিগণ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না এবং যে কালে গমন করলে তাঁরা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন, তা তোমাকে বলছি॥ ২৩

গীতামৃত—সাধারণতঃ 'কাল' বলতে বোঝায় সময়। কিন্তু এখানে 'কাল' শব্দটির অর্থ কেবল সময় নয়, সাধনমার্গও বটে। অর্থাৎ, সাধকগণ তাঁদের পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলে কোন্ পথে কীরূপ সময়ে দেহত্যাগ করলে মোক্ষ-মুক্তির অধিকারী হয়ে জন্ম-মৃত্যুর গোলক ধাঁধাঁ হতে চিরতরে মুক্ত হয়ে যান এবং কোন্ সময়ে কোন্ পথে গমন করলে তাঁরা সে অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হন পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪

অন্বয়—অগ্নির্জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ তত্র প্রয়াতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি॥ ২৪

অনুবাদ—অগ্নির্জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণের ছয় মাস—এই সময়ে গমনকারী ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন॥ ২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫

অন্বয়—ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ তথা ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নং তত্র যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫

অনুবাদ—ধূম, রাত্রিঃ, কৃষ্ণপক্ষ আর দক্ষিণায়নের ছয় মাস ; এই সময়ে যোগী চন্দ্রমার জ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন॥ ২৫

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬

অন্বয়—জগতঃ শুক্লকৃষ্ণে এতে গতী শাশ্বতে হি মতে একয়া অনাবৃত্তিং যাতি অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে॥ ২৬

অনুবাদ—জগতের জ্যোতির্ম্ময় ও অন্ধকারময় এই দুই পথ অনাদি ব'লে কথিত। একের দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হয় ; অন্যের দ্বারা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়॥ ২৬

দেবযান ও পিতৃযান মার্গ

উপরোক্ত শ্লোকে শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই যে দুটি পথের উল্লেখ করা হয়েছে—হিন্দুশাস্ত্রে তা দেবযান ও পিতৃযান নামে পরিচিত। দেবযানের অন্য নাম হচ্ছে—অর্চ্চিরাদি মার্গ, শুক্ল মার্গ ও উত্তরায়ণ মার্গ। পিতৃযানের অপর নাম—ধূম্রাদি মার্গ, কৃষ্ণ মার্গ এবং দক্ষিণায়ন মার্গ।

সাধকগণের আত্মা স্বীয় স্বীয় উচ্চাবচ কর্ম্মের অনুসারে এদের প্রথমটি বা দ্বিতীয়টিকে আশ্রয় করে ঊর্দ্ধলোকে গমন করে। যাঁরা নিষ্কাম ভাবে কেবলমাত্র অধ্যাত্মসিদ্ধি বা ভগবৎ প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা করেন তাঁরা দেবযান মার্গের অধিকারী হয়ে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। তবে তাঁদের এই মুক্তি আবার অধিকার-ভেদে হয় দু'প্রকার—ক্রমমুক্তি বা বিদেহ-মুক্তি সদ্যোমুক্তি বা জীবন্মুক্তি। দেবযানমার্গী যে সমস্ত সাধক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন —তাঁদিগকে তথা হতে পুনরায় তপঃ প্রভাবে চরম মুক্তির সামর্থ্য অর্জ্জন করতে হয়। পক্ষান্তরে, ইহজীবনে কঠোর তপঃসাধনার দ্বারা যাঁদের কর্ম্মবাসনার বীজ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় তাঁরা জীবৎকালেই মুক্ত হয়ে বাকী জীবন ভগবন্নির্দ্দেশে লোকসংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হন। এঁদের বলা হয়—জীবন্মুক্ত।

অপর একশ্রেণীর সাধক যাঁরা সকাম ভাবে যাগ-যজ্ঞ, দান-পুণ্যাদির অনুষ্ঠান করেন তাঁরা পিতৃযান মার্গের আশ্রয় ক'রে স্বর্গাদিলোকে গমনপূর্ব্বক কিছুকাল তাঁদের সেই শুভকর্ম্মের ফল ভোগ করেন। পরন্তু, সেই পুণ্যক্ষয়ের শেষে তাঁদের পুনরায় সংসারে অবতরণ করতে হয়।

পক্ষান্তরে, যারা ঘোর বিষয়াসক্ত নিম্নস্তরের জীব—তারা তাদের মলিন

ভোগবাসনার সেবা ক'রে মৃত্যুর পরে পশু, কীট প্রভৃতি নীচ যোনিতে অবতরণপূর্ব্বক দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।

এই প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক—জ্যোতিঃ সত্ত্বগুণের এবং অন্ধকার তমোগুণের লক্ষণ। এই কারণে দিবাভাগ, শুক্লপক্ষ বা উত্তরায়ণের ছয় মাস —সত্ত্বগুণের অনুকূল। এই সময়ে দেহত্যাগ হলে তাই তা কল্যাণপ্রদ বলে বিবেচিত হয়। লোকমান্য তিলক প্রমুখ একশ্রেণীর পণ্ডিতগণের ধারণা—উত্তর মেরু-অঞ্চল ছিল আর্য্যদের আদি বাসভূমি। সেখানে উত্তরায়ণের ছয় মাস দিন এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাস রাত্রি। সুতরাং, আর্য্যগণের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে উত্তরায়ণে দেহত্যাগ শুভ এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু অশুভ।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥ ২৭

অন্বয়—পার্থ, এতে সৃতী জানন্‌ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি। তস্মাৎ অর্জ্জুন সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব॥ ২৭

অনুবাদ—হে পার্থ, এই মার্গদ্বয়ের রহস্য অবগত হয়ে যোগী পুরুষ মোহগ্রস্ত হন না। সুতরাং, হে অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্বদা যোগযুক্ত হও॥ ২৭

দেবযান ও পিতৃযান মার্গের জ্ঞাতা মোহগ্রস্ত হন না

উপরে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে—দেবযান মার্গে আরূঢ় সাধকের মোক্ষলাভ হয় এবং পিতৃযান মার্গে গমনকারী সাধকের সংসারে পুনরাবর্ত্তন ঘটে। এই রহস্য অবগত হয়ে সত্যকার সাধকগণ কদাপি কাম্য কর্ম্মের সেবায় আগ্রহশীল হন না ; তাঁরা ভগবৎ চরণে নিরন্তর যোগযুক্ত হয়ে থাকেন।

এখানে 'যোগী' বলতে কেবলমাত্র ধ্যানযোগী, কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী বা ভক্তিযোগীকেই বোঝানো হচ্ছে না। পূর্ব্বে বলা হয়েছে—গীতোক্ত সাধনা হচ্ছে—কর্ম্ম-জ্ঞান-ধ্যানমিশ্র ভক্তিযোগের সাধনা। অর্থাৎ, কর্ম্মী হও, জ্ঞানী হও, অথবা ধ্যানী হও, তোমার মন যদি ভগবন্নিষ্ঠ না হয় তবে তোমার সেই যোগ-সাধনা নিষ্ফল ও নিরর্থক।

পরম পুরুষোত্তম রূপে আবির্ভূত হয়ে শ্রীভগবান্‌ এজন্য সকল সাধককে আহ্বান করে বলছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"

অর্থাৎ, আমাতে মন স্থির রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর এবং আমাকে প্রণিপাত কর।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

অন্বয়—বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চ দানেষু এব যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ইদং বিদিত্বা যোগী তৎ সর্ব্বম্ অত্যেতি, পরম্ আদ্যং স্থানং চ উপৈতি॥ ২৮

অনুবাদ—বেদাভ্যাসে, যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানাদিতে যে সমস্ত পুণ্যফল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই পরম তত্ত্ব জেনে যোগী পুরুষ সে সকল অতিক্রম করেন এবং উৎকৃষ্ট পরম স্থান প্রাপ্ত হন॥ ২৮

গীতামৃত—গীতাপ্রেমী আদর্শ যোগী নিরন্তর নিষ্কাম ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। চরম মোক্ষ ব্যতীত অন্য কোনও নিম্নতর গতি ও স্থিতি লাভে তিনি একান্ত অনাগ্রহী। তিনি নিরন্তর স্মরণ মনন করেন যে মোক্ষ ব্যতীত আর সমস্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। তাই গতাগতির চক্রে নিপতিত হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাঁর থাকে না। দিব্যদৃষ্টিতে শুষ্ক শাস্ত্রচর্চ্চা, সকাম যাগ-যজ্ঞ-তপস্যা ও দান-পুণ্যাদি কর্ম্মফলের নশ্বরত্ব লক্ষ্য ক'রে তিনি তাতে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ হন এবং শ্রীভগবানকে জীবনের চরম লক্ষ্য ও যথাসর্ব্বস্ব মনে ক'রে তিনি তাঁকে অনন্যভাবে আশ্রয় করে থাকেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে অক্ষর-ব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ—রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগঃ

গীতার নবম অধ্যায়ের নাম—রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগ। অর্থাৎ, এই অধ্যায়ে যে বিদ্যা বা সাধনপ্রণালী বর্ণিত হয়েছে তা অতি মহান্ ও গুহ্যতম। তবে এখানে জানা আবশ্যক—এই রাজবিদ্যা পাতঞ্জল যোগদর্শনের প্রতিপাদ্য রাজযোগ বা নির্গুণবাদীদের প্রতিপাদ্য গহন জ্ঞানযোগ নয়। এই অধ্যায়ের প্রথম কতিপয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ অপূর্ব্ব দার্শনিক ভঙ্গীতে স্বীয় অপার ও দুর্ব্বোধ্য যোগবিভূতির বর্ণনা করার পরে তাঁকে লাভ করার উপযোগী যে সরল সাধনমার্গের বর্ণনা করেছেন তা বহুলাংশে ভক্তিযোগেরই অনুকূল। বস্তুতঃ, গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রত্যক্ষরূপে যে ভক্তিযোগের উপদেশ দেওয়া হয়েছে এখানে তারই হয়েছে শুভ সূত্রপাত।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—ইদং তু গুহ্যতমং বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানম্ অনসূয়বে তে প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে॥ ১

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—তুমি অসূয়াশূন্য, (দোষদর্শী নও)। তোমাকে বিজ্ঞানের সহিত এই অতিগুহ্য ঈশ্বরীয় জ্ঞানের উপদেশ করছি -ইহা অবগত হলে তুমি সর্ব্বপ্রকার অশুভ হতে মুক্ত হবে॥ ১

অসূয়াশূন্য ব্যক্তিই ভক্তিযোগের সর্ব্বোত্তম অধিকারী

এই সংসারে এমন একশ্রেণীর নর-নারী পরিদৃষ্ট হয়—যারা অপরের দোষ ত্রুটি ও ছিদ্রান্বেষণে অতিমাত্র উদ্‌গ্রীব ও তৎপর।

বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তিরা সহজে কারও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হতে

পারে না এবং এই কারণে কোন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এদের নিকট প্রাণ খুলে অন্তরের কোন গোপন তত্ত্ব প্রকাশ করতে প্রস্তুত হন না।

অর্জ্জুনের উদার ও শ্রদ্ধালু হৃদয়ে এরূপ ছিদ্রান্বেষণের হীন প্রবৃত্তির একান্ত অভাব। এজন্য তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রতিম সখা। তবে এই প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক—অর্জ্জুন তখনও বিশুদ্ধ অধ্যাত্মজ্ঞান ও সুউচ্চ বিবেক-বিচার-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ও স্থিরবিশ্বাসী হতে পারেন নি। তাই দেখা যায়—তিনি স্বীয় মনের সন্দেহ-সংশয়ের নিরাকরণের জন্য সখা শ্রীকৃষ্ণের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করতে আদৌ সঙ্কোচ অনুভব করেন নি। তাঁর এই শ্রদ্ধালু ও জিজ্ঞাসু মনোভাব সপ্রমাণ করে—তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও মহত্ত্বের প্রতি অতিমাত্র বিশ্বাসী ও আস্থাবান।

গীতাপ্রেমী পাঠক ও শ্রোতৃবৃন্দেরও পরম কর্ত্তব্য—তাঁদের উপদেষ্টা সদ্‌গুরুর প্রতি অনুরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভাগবত ধর্ম্মের শ্রবণ ও অনুসরণে ব্রতী হওয়া এবং এরূপ হলেই তাঁরা সর্ব্বপ্রকার অকল্যাণ, পাপতাপ ও জ্বালামালা হতে পরিমুক্ত হতে সক্ষম হবেন।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২

অন্বয়—ইদং রাজগুহ্যং রাজবিদ্যা উত্তমং পবিত্রং প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং কর্ত্তুং সুসুখম্ অব্যয়ম্॥ ২

অনুবাদ—ইহা রাজবিদ্যা রাজগুহ্য (অর্থাৎ সকল বিদ্যা ও গুহ্য সাধন প্রণালীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ), ইহা উৎকৃষ্ট, পরম পবিত্র, প্রত্যক্ষ বোধগম্য, সুখসাধ্য ও অক্ষয় ফলপ্রদ॥ ২

ভক্তিযোগের এত মহত্ত্ব-গৌরব কেন?

বস্তুতঃ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ এই চতুর্বিধ সাধনপন্থা অধিকারী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের পক্ষে অনুকূল ও উপযোগী। অর্থাৎ, যাদের সংস্কার কর্ম্মপ্রধান তাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ, যাদের সংস্কার বিচারপ্রধান তাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ, যাদের প্রকৃতি ধ্যানশীল তাদের পক্ষে

ধ্যানযোগ এবং যাদের স্বভাব-সংস্কার প্রেমপ্রবণ তাদের পক্ষে ভক্তিযোগ অধিক উপযোগী। পরন্তু, শ্রীভগবান্ উপরোক্ত সাধনমার্গগুলির মধ্যে রাজবিদ্যা বা ভক্তিযোগকে কেন সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা সুগম, সবচেয়ে পবিত্র সুখসাধ্য, সহজে বোধগম্য ও অক্ষয় ফলপ্রদ বলে ঘোষণা করলেন —তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ দেখা যায়—এই জগতে অধিকাংশ নরনারী প্রবৃত্তিপন্থী ও উন্নত বোধশক্তিবিহীন। এরূপ সাধারণ জনগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগের উচ্চাঙ্গ সাধন-প্রণালীগুলি অনেক ক্ষেত্রে বোধগম্য ও অনুকরণযোগ্য হতে পারে না। প্রবৃত্তিমার্গী নরনারীর পক্ষে কর্ম্মযোগ বহুলাংশে অনুকূল ও উপযোগী হলেও সেখানে সাধককে কয়েকটি জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। সেখানে সাধকের সমক্ষে প্রশ্ন আসে—কর্ম্ম কি? অকর্ম্ম কি? বিকর্ম্ম কি? এবং কী ভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিহার করে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করা যায়? এবিষয়ে গীতাকারও স্বয়ং বলেছেন—কর্ম্মের গতি অতি গহন।

দ্বিতীয়তঃ, নির্গুণবাদী জ্ঞানযোগী ও আত্মবাদী ধ্যানযোগীর ইষ্টসম্বন্ধীয় কল্পনাও সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের পক্ষে অনুভবগম্য নয়। তা ছাড়া, তাঁদের নেতিবাদমূলক সূক্ষ্ম বিবেক-বিচার ও ধ্যান-ধারণার পদ্ধতিও বেশ জটিল, দুর্ব্বোধ্য ও দুঃসাধ্য।

পক্ষান্তরে, ভক্তিযোগের পথ এই হিসাবে অপেক্ষাকৃত সরল ও সুগম। ভক্তিযোগীর ইষ্ট সাকার ও সগুণ; তিনি কোন দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি বা ঈশ্বরাবতাররূপে সাধকের নয়নসমক্ষে বিদ্যমান। যেকালে গীতোক্ত এই ভাগবত ধর্ম্ম প্রচারিত হয় সেকালে শ্রীভগবান্ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে সশরীরে অর্জ্জুনাদি ভক্তগণের পুরোভাগে আবির্ভূত। তাই এখানে বলা হয়েছে—এই ভক্তিধর্ম্ম প্রত্যক্ষ বোধগম্য ও তার আশ্রয় অবলম্বন অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখসাধ্য। তা ছাড়া, জ্ঞানযোগে যে ক্রমমুক্তির বিষয় বর্ণিত আছে, ভক্তিযোগে তার উল্লেখ নাই। গীতায় শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলেছেন—তিনিই জীবের পরমগতি, প্রেমানন্দময় প্রভু ও পরম গন্তব্যস্থল —যাঁকে লাভ করলে আর গতাগতির প্রশ্ন থাকে না। সুতরাং, এই দিক দিয়েও

ভক্তিপথের আশ্রয় ও অনুসরণ অনেকখানি সরল, সুসাধ্য ও অক্ষয় ফলপ্রদ।

ভক্তিযোগের মহত্ত্ব-গৌরব ও তার শ্রেষ্ঠত্ব কেন—তা বেশ বোঝা গেল। পরন্তু, যে মার্গ বা প্রণালী এত সহজ সরল, উদার ও উদাত্ত তাকে গুহ্যতম বা অতি গোপনীয় বলে কেন নির্দ্দেশ দেওয়া হল? যা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী, যার তত্ত্ব তেমন জটিল ও দুর্ব্বোধ্য নয়, তার বহুল প্রচার-প্রতিষ্ঠাই তো সর্ব্বাধিক বাঞ্ছনীয়।

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—সত্যকার প্রেম-ভক্তির ব্যাপারটি একটু গুহ্য ধরণের হওয়াই স্বাভাবিক। কেন না, এখানে জানা আবশ্যক—বৈধী ভক্তির যে পূজা-বন্দনা, জপ-কীর্ত্তনাদি বাহ্যানুষ্ঠান তার মধ্যে গোপনীয়তার কিছু নাই সত্য ; তবে রাগানুগা পরা ভক্তির যে অপার, অপ্রাকৃত ও অনুপম আবেশ, আকর্ষণ, প্রেম-সংলাপ—তা যে একান্ত গুহ্য ব্যাপার, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—বৃন্দাবনধামে গোপ-গোপিকাগণের সহিত শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে অত্যদ্ভুত ও অপ্রাকৃত প্রেমলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়—তা অতি নিগূঢ় ও গোপন আস্বাদন ও অনুভূতির বস্তু নয় কি? বস্তুতঃ, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ও অনুভূত যে উচ্চাঙ্গের প্রেমভক্তি, তা সত্য সত্যই গুহ্য, অপ্রাকৃত ও রহস্যময়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের অন্তরঙ্গ ভাবটিও ছিল অনেক খানি এই ধরণের।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩

অন্বয়—পরন্তপ অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে॥ ৩

অনুবাদ—হে পরন্তপ, এই ধর্ম্মের প্রতি যারা অশ্রদ্ধাবান্ তারা আমাকে পায় না, তারা মৃত্যুময় সংসার-পথে পরিভ্রমণ করে থাকে॥ ৩

ভক্তিমার্গে অশ্রদ্ধালু ব্যক্তির স্থান নাই

ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তার প্রেমময়ত্ব, তাঁর করুণা, মাধুর্য্য এবং তাঁর

অপার তারণশক্তির উপর যাদের পরিপূর্ণ আস্থা বা বিশ্বাস নাই, তারা ভক্তিপথের অনধিকারী। জ্ঞানযোগের প্রাথমিক স্তরে সাধকের প্রাণে যদি স্রষ্টা ও সৃষ্টির চরম তত্ত্ববিষয়ে কিছু কিছু সংশয়-সন্দেহের উদ্রেক হয় তবে নিত্যানিত্য বা আত্মানাত্মমূলক দার্শনিক বিচারের দ্বারা তার নিরাকরণ সম্ভবপর। ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান থেকেও সাংখ্যের মতবাদ অনুসরণ করে পুরুষ-প্রকৃতির বিভেদ বিচারের দ্বারাও মুক্তি লাভ সম্ভবপর। পাতঞ্জল সাধনাতেও প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের স্বীকৃতি ও তাঁর প্রতি অনন্য শরণাগতির প্রয়োজন হয় না সেস্থলে ধ্যান-ধারণা ও সমাধির অভ্যাসের দ্বারা চরম সিদ্ধির অধিকার লাভ করা যায়। পরন্তু, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও শরণাগতি ব্যতীত ভক্তিপথে এক পা-ও অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়। এই কারণেই ভক্তিমার্গের আচার্য্যগণ সাধকগণকে সাবধান করে বলেন—

"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।" বস্তুতঃ, ভক্তিশাস্ত্রের মতে অশ্রদ্ধালু ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। এই লৌকিক জগতে যারা কারুর আস্থা ও বিশ্বাসভাজন নয়—তারা যে শুধু জনসমাজে অপ্রিয় ও অনাদরণীয় হয়, তা-ই নয়, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনগণের সমবেদনা, সহানুভূতি ও সহায়তার অভাবে তাদের জীবন হয় দুঃসহ ও দুর্ব্বহ। জন্মান্তরেও তারা তাদের সেই ঐহিক অপকর্ম্মের ফলে পারলৌকিক সুখ-শান্তির অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। শ্রীভগবান্ এজন্যই এখানে এরূপ শ্রদ্ধাহীন নর-নারীকে লক্ষ্য করে বললেন—তারা পুনঃ পুনঃ মৃত্যুময় সংসার-পথে গতাগতি ক'রে অশেষ দুঃখ-যাতনা ভোগ করে।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪

অন্বয়—অব্যক্তমূর্ত্তিনা ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং ; সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি ; অহং চ তেষু ন অবস্থিতঃ॥ ৪

অনুবাদ—আমি আমার অব্যক্ত স্বরূপে এই জগৎ ব্যাপিয়া আছি ; সমস্ত ভূতচরাচর আমাতে অবস্থিত, আমি কিন্তু সেই সব বস্তুতে অবস্থিত নই॥ ৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫

অন্বয়—মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য ; ভূতানি চ মৎস্থানি ন ; মম আত্মা ভূতভৃৎ ভূতভাবনঃ চ, ভূতস্থঃ ন॥ ৫

অনুবাদ—এই ভূত সকল আমাতে স্থিত নয় ; আমি এদের ধারক ও পালক, কিন্তু আমি এই ভূতগণে অবস্থিত নই। তুমি আমার এই অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য দর্শন কর॥ ৫

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬

অন্বয়—যথা সর্ব্বত্রগঃ মহান্ বায়ুঃ নিত্যম্ আকাশস্থিতঃ, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয়॥ ৬

অনুবাদ—সর্ব্বত্রগামী মহান্ বায়ু যেমন আকাশে অবস্থিত তদ্রূপ সমস্ত ভূত আমাতে স্থিত, তুমি ইহাও অবগত হও॥ ৬

গীতোক্ত ভাগবত স্বরূপের বৈচিত্র্য

এখানে ভগবৎস্বরূপ সম্পর্কে যে বিচিত্র বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে—তা আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ। এখানে একবার বলা হচ্ছে—আমার সত্তা সর্ব্বব্যাপক। অর্থাৎ, এ জগতে এমন কিছু নাই যা আমার সত্তা দ্বারা পরিব্যাপ্ত নয় বা যাতে আমি অবস্থিত নই।

পুনরায় বলা হচ্ছে—আমি সর্ব্বভূতে অবস্থিত হলেও ভূত সকল আমাতে স্থিত নয়।

শ্রীভগবানের এইরূপ অদ্ভুত উক্তির তাৎপর্য্য এই যে তাঁর সত্তা কেবল জগতের মধ্যে বা ভূতচরাচরের মধ্যে সীমিত নয়। তিনি হচ্ছেন বিশ্বাতীত ; অর্থাৎ এই জগৎ সংসার শ্রীভগবানের সেই ভূমা সত্তার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। হিন্দুশাস্ত্রের মতে ব্রহ্ম চতুষ্পাদ এবং তাঁরই একপাদে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত। সুতরাং, এই ক্ষুদ্র জগৎ ও তার ভূতসমূহ ভগবানের সেই অনন্ত স্বরূপের একাংশ মাত্র। বিরাট সমুদ্রবক্ষে সমুত্থিত তরঙ্গসমূহ যেমন তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশমাত্র—ইহাও তদ্রূপ। এখানে

তরঙ্গসমূহকে সমুদ্রে অবস্থিত বলা চলে। পরন্তু, তাদের ধারক ঐ বিশাল অর্ণব তাদের মধ্যে সমাবিষ্ট হতে পারে কি? বিশাল বস্তু কীরূপে ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে স্থিত হতে পারে? অর্থাৎ, এখানে অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় ভগবানের শক্তি ও মহিমা যে কত বড় তা-ই বোঝান হচ্ছে।

পরক্ষণেই আবার বলা হচ্ছে, এই ভূত সকল আমাতে নাই। ভূতগণের ধারক ও পালক হয়েও আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পূর্ব্ব শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে ভগবান্ সর্ব্বভূতে অবস্থিত নন, অথচ তিনি তাদের ধারক ও পালক। শ্রীভগবানের এই বিরুদ্ধ উক্তি একান্তই দুর্ব্বোধ্য ও জটিল। অহিন্দুগণ এই কারণে আর্য্য হিন্দুর ঈশ্বরীয় কল্পনার বিরুদ্ধে কঠোর, বিরূপ ও বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করে থাকে। পরন্তু, জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হলেও অনুভবসিদ্ধ বিজ্ঞ সাধকগণের নিকট এই সিদ্ধান্ত মহত্তম বলে স্বীকৃত। তাঁদের মতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার না করলে ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও তাঁর সৃষ্টিরহস্য মীমাংসিত ও প্রমাণিত হয় না।

পূর্ব্বে আমরা বহু স্থলে অলোচনা করেছি—সাকার-সগুণ ও নিরাকার-নির্গুণ ভেদে ভগবানের আছে দুটি রূপ বা বিভাব। তিনি যখন নিরাকার, নিরবয়ব ও নির্গুণ তখন তিনি সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য সত্তারূপে বিদ্যমান ; তিনি তখন অসঙ্গ ও নির্লিপ্ত, এমতাবস্থায় ভূতসকল তাঁতে কীরূপে অবস্থান করতে পারে? বিষয়টির উপলব্ধির জন্য এখানে বিচরণশীল বায়ুর দৃষ্টান্ত উত্থাপিত হয়েছে। বায়ু আকাশে অবস্থিত থাকাকালে আকাশের সহিত তা যেমন কদাপি লিপ্ত ও স্পৃষ্ট হয় না, তেমনই আমার চৈতন্যময় সত্তায় ভূতসকল অবস্থিত থাকলেও আমার সহিত তাদের কোন সংশ্লেষ হয় না, সেই নির্গুণ স্বরূপে আমি তখন সম্পূর্ণ অসঙ্গ ও নির্লিপ্ত থাকি। সগুণরূপে আমি ভূতগণের ধারক ও পালক এবং নির্গুণরূপে আমি তাদের সহিত সম্পর্ক ও সংস্পর্শরহিত। ভগবানের নির্গুণ স্বরূপে ভূতসকল তাঁতে থেকেও যেন তাঁতে অবস্থিত নয় ; কেন না, তাদের সহিত তখন তাঁর কোন সংশ্রব থাকে না।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭

অন্বয়—কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূতানি মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি। পুনঃ কল্পাদৌ অহং তানি বিসৃজামি॥ ৭

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়, কল্পের শেষে ভূতসকল আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয় এবং কল্পের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আমি ঐ সকল পুনরায় সৃষ্টি করি॥ ৭

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮

অন্বয়—স্বাং প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশম্ ইমং কৃৎস্নং ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি॥ ৮

অনুবাদ—আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আত্মবশে রেখে স্বীয় স্বীয় প্রাক্তন কর্ম্মজনিত স্বভাববশে জন্মমৃত্যুপরবশ ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি॥ ৮

গীতামৃত—শ্রীভগবান্ এখানে বলছেন—আমার যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি তাকে আমি স্ববশে রেখে তার সহায়তায় সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্য সম্পন্ন করি। জীবের কর্ম্মফল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে স্বীয় প্রারব্ধ-বশে কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে হয়। প্রলয়কালে জীবসকল আমার প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। তারপর প্রলয় শেষে যখন পুনরায় নূতন কল্পারম্ভ হয় তখন তারা স্বীয় স্বীয় প্রাক্তন সংস্কারের অনুপাতে বিভিন্ন দেহে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥ ৯

অন্বয়—ধনঞ্জয়, তেষু কর্ম্মসু অসক্তম্ উদাসীনবৎ আসীনং মাং তানি কর্ম্মাণি ন চ নিবধ্নন্তি॥ ৯

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়, আমাকে কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম আবদ্ধ করতে পারে না। কারণ, আমি সেই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত ও উদাসীন॥ ৯

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনাঽনেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০

অন্বয়—অধ্যক্ষেণ ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে। কৌন্তেয়, অনেন হেতুনা, জগৎ বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়, আমার অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করে, এই কারণেই জগৎ বারংবার উৎপন্ন হয়ে থাকে॥ ১০

গীতামৃত—শ্রীভগবান্ বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা হলেও তাই তিনি তাঁর সেই কর্ম্মে নিরন্তর অনাসক্ত ও অসঙ্গ। কর্ম্ম করেও তাই তিনি অকর্ত্তা। বস্তুতঃ, ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতির দ্বারাই কর্ম্মসকল নিষ্পন্ন হয় এবং প্রকৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্মসকলে তিনি জড়ীভূত হন না। বাহ্যতঃ দেখলে মনে হয়, প্রকৃতিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয়কর্ত্রী। পরন্তু, ইহা সত্য নয়। কেন না, ভগবানের সান্নিধ্য ব্যতীত স্বাধীনভাবে প্রকৃতি কিছুই করতে পারে না। সুতরাং, বিশ্বচরাচরের সৃষ্টির মূলে শ্রীভগবানই অনুমন্তারূপে নিত্য বিদ্যমান ; সগুণস্বরূপে তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা ও জীবের কর্ম্মফলভোক্তা এবং নির্গুণস্বরূপে তিনি উদাসীন, দ্রষ্টা ও সাক্ষী। তাঁর মৌন প্রেরণাতেই প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা ও লীলানিপুণা।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১

অন্বয়—মূঢ়াঃ ভূতমহেশ্বরং মম পরং ভাবম্ অজানন্তঃ মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং মাম্ অবজানন্তি॥ ১১

অনুবাদ—মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বভূত-মহেশ্বররূপ পরম ভাব অবগত না হয়ে সামান্য দেহধারী মানব বলে আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে॥ ১১

অজ্ঞান দৃষ্টিতে নরদেহধারী অবতার উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্র হন

অজ্ঞান অবিবেকী ব্যক্তিগণের বুদ্ধি স্থূল ও অপরিপক্ক। এই কারণে

তারা ঈশ্বরের পরম ভাগবত স্বরূপ অবধারণ করতে অক্ষম। তাই তারা মনে করে—অবতার সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় একজন দেহধারী মানবমাত্র, অথবা তিনি বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বা নন্দ-যশোদার পালকপুত্র গোবিন্দ। তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এরূপ ক্ষুদ্র ধারণা থাকায় তারা শ্রীকৃষ্ণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে; এরা একান্তই হতভাগ্য। বস্তুতঃ, এরূপ ধারণার বশে কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হেয় জ্ঞান করতে সাহসী হয়েছিল।

যুগাবতার আচার্য্য প্রণবানন্দ তদীয় এক মূঢ় সন্তানকে তাঁর ভাগবত ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন—**"যে ব্যক্তির নিষেধ-বাণী উপেক্ষা করিয়া অকাতরে তুমি স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইয়াছ—যে কোন সিদ্ধ সমাহিত মহাপুরুষ সেই ব্যক্তির আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইত কিনা সন্দেহ। যদি কোনদিন প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব কোনো ব্যক্তির নিকট উদ্ভেদ হইয়া থাকে, তবে সে বুঝিবে—তোমাকে যে ব্যক্তি স্থানান্তরে যাইতে নিষেধ করিতেছে—সে অন্তশ্চক্ষুবিশিষ্ট বা ভূতভবিষ্যৎবেত্তা কি না, যাবতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব তাঁহার নিকট উদ্ভেদ হইয়াছে কি না?"**

এরূপ ভগবদ্‌বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের অজ্ঞতা ও অবিবেকের পরিণাম কীরূপ ভীষণ—তা বর্ণনা করে অতঃপর গীতাকার শ্রীভগবান্ বল্‌লেন—

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২

অন্বয়—মোঘাশাঃ, মোঘকর্ম্মাণঃ, মোঘজ্ঞানাঃ, বিচেতসঃ মোহিনীং রাক্ষসীম্ আসুরীং চ প্রকৃতিম্ এব শ্রিতাঃ॥ ১২

অনুবাদ—এইসকল ব্যক্তি বুদ্ধি-ধ্বংসকারী তামসী ও রাজসী প্রকৃতির বশে আমাকে অবজ্ঞা করে থাকে। তাদের আশা ব্যর্থ, কর্ম্ম নিষ্ফল, জ্ঞান নিরর্থক এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত॥ ১২

গীতামৃত—এই সমস্ত অবিবেকী ব্যক্তিগণের বিচার-বুদ্ধি রাজসিক ও তামসিক ভাবের দ্বারা প্রভাবিত এবং এজন্য তা একান্ত বিকৃত ও ভ্রমাত্মক। আর এই কারণে তাদের মন-বুদ্ধি কদাপি সুপথে পরিচালিত হয় না। তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মসকলও কদাপি শুভ ও সুফলপ্রসূ হবার নয়। এরূপ

ব্যক্তিদের আহৃত জ্ঞানও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। শুধু তাই নয়, তাদের চিত্তও নিরন্তর বিক্ষিপ্ত ও বিপথগামী।

বস্তুতঃ, এই জগতে এরূপ রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিসম্পন্ন জনগণের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। এই কারণে ভগবদবতারগণ সব যুগে তাঁদের জীবৎকালে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হন। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ ভগবদ্‌বিদ্বেষিগণ বর্ণিত হয়েছে পামর ও পাষণ্ডরূপে।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩

অন্বয়—পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ মহাত্মানঃ তু অনন্যমনসঃ মাং ভূতাদিম্ অব্যয়ম্ জ্ঞাত্বা ভজন্তি॥ ১৩

অনুবাদ—কিন্তু সাত্ত্বিক বৃত্তিসম্পন্ন মহাত্মগণ অনন্যচিত্ত হয়ে আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ ও অব্যয়স্বরূপ জেনে আমার ভজনা করে থাকেন॥ ১৩

সাত্ত্বিক লোকেরাই শ্রীভগবানের অনন্য ভক্ত

সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকদের স্বভাব কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্ত্বগুণের প্রভাবে তাঁদের স্বভাব-প্রকৃতি শুদ্ধ, বুদ্ধ ও উদার। এজন্য তাঁদের সেই স্বচ্ছ চিত্তদর্পণে অবতার পুরুষের গুণ, গৌরব, মাহাত্ম্য অতি সহজে ধরা পড়ে এবং তার ফলে তাঁরা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন—অবতার পুরুষগণ বাহ্যতঃ মানবদেহধারী হলেও তাঁরা সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও সর্ব্বভূতের পরিচালক ও পরিপোষক। আর এরূপ উন্নত ধারণার ফলে তাঁরা সেই ভাগবত স্বরূপের প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁর সেবা-পূজায় নিরত হন।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪

অন্বয়—সততং মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ যতন্তঃ দৃঢ়ব্রতাঃ চ ভক্ত্যা চ নমস্যন্তঃ নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪

অনুবাদ—তাঁরা যত্নশীল ও দৃঢ়ব্রতী হয়ে ভক্তিপূর্ব্বক নিরন্তর আমার ভজন-কীর্ত্তন করেন ও যুক্তচিত্ত হয়ে আমার উপাসনা করেন॥ ১৪

গীতামৃত—এরূপ অনন্য ভক্তগণ আমার প্রতি এতখানি প্রীতিসম্পন্ন যে তাঁরা দৃঢ়সংকল্প হয়ে নিরন্তর আমার নাম ও মহিমা কীর্ত্তনে বিভোর হন এবং সর্ব্বদা আমার পূজার্চ্চনায় নিমগ্ন থাকেন।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫

অন্বয়—অন্যে অপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ মাম্ উপাসতে ; একত্বেন পৃথক্ত্বেন বিশ্বতোমুখং বহুধা উপাসতে॥ ১৫

অনুবাদ—কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা আমার আরাধনা করেন। কেহ কেহ অভেদভাবে, আবার কেহ কেহ পৃথক্‌ভাবে আমার উপাসনা করেন॥ ১৫

ভক্তের উপাসনার বিবিধ রূপ

এখানে জ্ঞানযজ্ঞ বলতে উপনিষদ-প্রতিপাদ্য নেতিবিচারমূলক জ্ঞানমার্গের কথা বলা হচ্ছে না ; জ্ঞানযজ্ঞ বলতে এখানে যে পথের সূচনা দেওয়া হচ্ছে —তা জ্ঞানমূলক ভক্তিসাধনা।

অধ্যাত্মক্ষেত্রে সচরাচর দু'প্রকার ভক্তি পরিদৃষ্ট হয়—জ্ঞানমূলক ভক্তি ও অজ্ঞানমূলক ভক্তি। অর্থাৎ, এই সংসারে এমন একশ্রেণীর আস্তিক্যবাদী নর-নারী আছে—যাদের ঈশ্বর, পরকাল ও মানবজীবনের চরম লক্ষ্য ও আদর্শ বিষয়ক জ্ঞান অতি সামান্য ও অস্পষ্ট। তথাপি তারা যে দেবদর্শন, তীর্থযাত্রা, কথা-কীর্ত্তন ও পূজাযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করে তার পশ্চাতে প্রেরণা যোগায় কৌলিক প্রথা, দেশাচার প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এরূপ ভক্তকে অন্ধশ্রদ্ধালু বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর একথা সত্য যে জগতের অধিকাংশ তথাকথিত ধর্ম্মপ্রাণ নর-নারী এরূপ অজ্ঞানমূলক ভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের ধর্ম্মকর্ম্মের আচরণ করে থাকে। পক্ষান্তরে, অন্য এক শ্রেণীর ভক্ত আছেন যাঁদের ঈশ্বর ও ধর্ম্ম সম্পর্কিত জ্ঞান শাস্ত্রসিদ্ধ ও প্রজ্ঞানদীপ্ত। তাঁরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন—ভগবানই সৎ

এবং অন্য সব কিছু অসৎ। জ্ঞানদৃষ্টিতে তাঁরা তাই নিরন্তর অনুভব করেন—ভগবৎপ্রাপ্তিই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম কাম্য। এরূপ ভক্তকেই শ্রীভগবান্ গীতায় জ্ঞানী ভক্ত বলে নির্দ্দেশ করেছেন। এরূপ জ্ঞানী ভক্তরা আরও উপলব্ধি করেন—ঈশ্বর সর্ব্বময় সর্ব্বাত্মা।

কেহ কেহ ভগবানকে নিজাত্মার সহিত একীভূত মনে ক'রে উপাস্য উপাসকের পার্থক্যবোধ বিস্মৃত হয়ে অভেদ ভাবে তাঁর উপাসনা করেন। অর্থাৎ, তাঁরা সর্ব্বদা মনে করেন, জীবাত্মা, পরমাত্মা ও জীব স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। আবার অন্য কেহ কেহ দ্বৈত বুদ্ধি নিয়ে ভগবানকে আপনা হতে স্বরূপতঃ পৃথক্ জ্ঞান ক'রে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে তাঁর উপাসনা করে থাকেন। পক্ষান্তরে, অপর কেহ কেহ তাঁদের উপাস্য ভগবানকে আরাধনা করে থাকেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর নামে ও স্বরূপে। হিন্দুর ভক্তিসাধনা তাই বিবিধ ও বিচিত্র।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬

অন্বয়—অহং ক্রতুঃ, অহং যজ্ঞঃ, অহং স্বধা, অহং ঔষধং, অহং মন্ত্রঃ, অহম্ এব আজ্যম্, অহম্ অগ্নিঃ, অহং হুতম্॥ ১৬

অনুবাদ—আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বাহা, আমি ঔষধ ; আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমিই হোম॥ ১৬

ভগবানের সর্ব্বময় রূপ

পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলেছেন—তিনি বিশ্বতোমুখ বা সর্ব্বময় সর্ব্বাত্মা। এক্ষণে তারই পরিচয় দিয়ে তিনি বলছেন—আমি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত উভয়বিধ যজ্ঞ এবং সেই সকল যজ্ঞ-সম্পাদন কালে যত প্রকার উপাদান ও উপকরণের প্রয়োজন—তৎ সমুদয়ও আমি। বলা বাহুল্য, চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত—"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্"—ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য ইহারই অনুরূপ।

পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭

অন্বয়—অহম্ অস্য জগতঃ পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহঃ, বেদ্যং, পবিত্রম্ ওঙ্কারঃ, ঋক্, সাম, যজুঃ এব চ॥ ১৭

অনুবাদ—আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা, পিতামহ, যাহা কিছু জ্ঞেয় ও পবিত্র বস্তু তা আমি। আমিই ব্রহ্মবাচক ওঁকার ও আমি ঋক, সাম, যজুর্বেদ॥ ১৭

গীতামৃত—ভগবান্ এই জগতের পিতা বা স্রষ্টা এবং তিনিই এই জগতের মাতা বা উপাদান কারণ। ভগবানই এই বিশ্বচরাচরের পিতামহ অর্থাৎ তিনিই সব কিছুর আদি-কারণ। যা কিছু জ্ঞেয় বা জ্ঞাতব্য—তাও তিনি; অর্থাৎ তাঁকে জানলেই সব কিছু জানা হয়—"যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

আবার এই জগতের যা কিছু পবিত্র ও সুন্দর তাও তিনি। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদিতন প্রকাশস্বরূপ যে ব্রহ্মবাচক ওঁকার বা প্রণব তাও তিনি এবং তা হতে উদ্ভূত জ্ঞানের আধার স্বরূপ যে ঋক, সাম, যজুর্বেদ তাও তিনি।

এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক—বেদ চতুর্ব্বিধ, পরন্তু এখানে তিনখানি বেদের উল্লেখ কেন? উত্তরে বলা যায়, চতুর্বেদের মধ্যে উপরোক্ত তিনখানি বেদই মুখ্য। অথর্ব্ববেদ গৌণ। কারণ, যজ্ঞাদিতে অথর্ব্ববেদের মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় না।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮

অন্বয়—গতিঃ, ভর্ত্তা, প্রভুঃ, সাক্ষী, নিবাসঃ, শরণং, সুহৃৎ, প্রভবঃ, প্রলয়ঃ, স্থানং, নিধানম্, অব্যয়ং বীজম্॥ ১৮

অনুবাদ—আমি গতি, আমি ভর্ত্তা, আমি প্রভু, আমি দ্রষ্টা, আমি স্থিতি-স্থান, আমি আশ্রয়, আমি সুহৃদ, আমি স্রষ্টা, আমি সংহর্ত্তা, আমি আধার, আমি প্রলয় ও আমি অবিনাশী বীজস্বরূপ॥ ১৮

গীতামৃত—শ্রীভগবানই জীবের চরমগতি, তিনি জীবজগতের পালক ও পোষক। জীব যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম করে তিনি তার দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে বিদ্যমান। মৃত্যুশেষে জীব তাঁতেই লয় প্রাপ্ত হয়। ইহকালে পরকালে তিনিই তার একমাত্র আশ্রয়। তিনি তার পরম হিতৈষী বান্ধব; তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আধার ও বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ। অর্থাৎ, ভগবানই সব কিছু।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ ১৯

অন্বয়—অহং তপামি, অহং বর্ষং নিগৃহ্ণামি, উৎসৃজামি চ, অর্জ্জুন, অহম্ অমৃতং মৃত্যুঃ চ, সৎ, অসৎ॥ ১৯

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, আমি উত্তাপ দান করি, আমি ভূমি হতে জল আকর্ষণ করি। পুনরায় আমি সেই জল বর্ষণ করে থাকি। আমি জীবের জীবন, আমি জীবের মৃত্যু, আমি সৎ, আমিই অসৎ॥ ১৯

গীতামৃত—হে অর্জ্জুন, সূর্য্যরূপে আমি জগতে তাপ দান করি, আবার ইন্দ্ররূপে আমি মেঘ সৃষ্টি করি ও জল বর্ষণ করি। আমি যে শুধু জীবের জীবন তা-ই নয়, তার মৃত্যুও আমি। তা ছাড়া, আমি সৎ, অবিনাশী, অক্ষয় পরমাত্মা; আবার আমিই অসৎ বা এই নশ্বর ব্যক্ত জগৎ। অর্থাৎ, অব্যক্ত ও ব্যক্ত এই উভয় রূপই আমার স্বরূপ।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০

অন্বয়—ত্রৈবিদ্যাঃ যজ্ঞৈঃ মাম্ ইষ্ট্বা সোমপাঃ, পূতপাপাঃ স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে; তে পুণ্যং সুরেন্দ্রলোকম্ আসাদ্য দিবি দিব্যান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি॥ ২০

অনুবাদ—ত্রিবেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদি দ্বারা আমার পূজা ক'রে যজ্ঞ শেষে সোমরস পানে নিষ্পাপ হন এবং স্বর্গফল কামনা

করেন, তাঁরা পবিত্র স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়ে দিব্য দেবভোগসমূহ ভোগ করে থাকেন॥ ২০

সকাম যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞফল

যাঁরা ঋক, সাম, যজুঃ—এই তিন বেদে অভিজ্ঞ এবং যাঁরা সেই সমস্ত বেদের বিধি-বিধান মতে স্বর্গফলের কামনায় আমার উপাসনা করেন, তাঁদের সেই সাধনা ব্যর্থ হয় না। আন্তরিক বিশ্বাস ভক্তি সহকারে যজ্ঞ করার ফলে তাঁদের মনোবৃত্তি যে অনেকখানি নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হয় তাতে সন্দেহ নাই। তবে তাঁদের অনুষ্ঠিত সেই যাগ-যজ্ঞ কামনামূলক হওয়ায় তাঁরা স্বর্গলোকের দিব্য ভোগ-সুখ সমূহ প্রাপ্ত হন মাত্র ; মোক্ষ বা মুক্তিলাভ তাঁদের কাম্য না হওয়ায় তা তাঁরা পান না।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১

অন্বয়—তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা পুণ্যে ক্ষীণে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ; এবং ত্রয়ীধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ কামকামাঃ গতাগতং লভন্তে॥ ২১

অনুবাদ—তাঁরা তাঁদের প্রার্থিত বিপুল স্বর্গফল উপভোগ ক'রে পুণ্যক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে কামনাপরায়ণ এই ব্যক্তিগণ বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ক'রে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে থাকেন॥ ২১

গীতামৃত—এই সংসারে সাধকগণের আন্তরিক প্রার্থনা কদাপি নিরর্থক ও নিষ্ফল হয় না। আন্তরিক ভাবে যে যা চায়, সে তা অবশ্যই পেয়ে থাকে। উপরোক্ত অব্যর্থ কর্ম্মনীতির ফলে স্বর্গফলকামনায় অনুষ্ঠিত যাগ-যজ্ঞের যে ফল তা তাঁরা অবশ্যই লাভ করে থাকেন। তবে সেই ফল যতই বিপুল হোক না কেন, তা কখনই চিরস্থায়ী হয় না। তাঁদের সেই সৎ কর্ম্মার্জিত পুণ্যফল ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে হতে একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে তাঁরা পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবিষ্ট হতে বাধ্য হন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২

অন্বয়—অনন্যাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে, নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাং যোগক্ষেমম্ অহমং বহামি॥ ২২

অনুবাদ—অনন্যচিত্ত ও আমার চিন্তাপরায়ণ হয়ে যে ভক্তগণ আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই সমস্ত ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন করি॥ ২২

অনন্য ভক্তের যাবতীয় দায়িত্ব-ভার প্রভুই গ্রহণ করেন

সকাম ভক্তগণের কর্ম্মফল যে ক্ষণস্থায়ী তা উপরোক্ত দুটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে যাঁরা শ্রীভগবানের অনন্য ভক্ত তাঁদের সাধনার পরিণাম কীরূপ—তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীভগবান্ বলছেন—এরূপ ভক্তকে যে শুধু আমি দর্শনদানে ধন্য করি তা-ই নয় ; তাঁর জীবনের যাবতীয় দায়িত্ব-ভার আমি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে বহন করি। তাঁর সেই ভক্তিসাধনার পথে যদি কোন বিঘ্ন-বিপত্তি উপস্থিত হয় তাও আমি দূর করি। শুধু তাই নয়, তাঁর সাধন জীবনের পক্ষে অনুকূল ও প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থাও আমি করি। তা ছাড়া, তাঁর প্রাপ্ত যে সাধনফল বা সুখসুবিধা তাও আমি সযত্নে রক্ষা করি। অর্থাৎ, আমার অনন্য ভক্তের যাবতীয় ভার তখন ন্যস্ত হয় আমার উপর—যার ফলে তাঁর আর কোন ভয়, ভাবনা, দুশ্চিন্তা থাকে না।

ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থে এমন বহু ভক্তচরিত্র বর্ণিত আছে যাতে শ্রীভগবানের যোগক্ষেম বহনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উপরোক্ত শ্লোকে বর্ণিত শ্রীভগবানের এই অভয় আশ্বাস কতই না সান্ত্বনাপ্রদ। বস্তুতঃ, এই যোগক্ষেম বহনের দায়িত্ব পালনের জন্যই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনন্যভক্ত পঞ্চ পাণ্ডবের পশ্চাতে এতখানি সেবা ও সহায়তাপরায়ণ এবং স্বীয় প্রাণপ্রিয় সখা অর্জ্জুনকে পুরোভাগে ক'রে তিনি বিশ্বজীবকে এরূপ আশ্বাস দানে ব্রতী।

আশ্রিত সন্তানগণকে অনুরূপ অভয় আশ্বাস দিয়ে সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দ বলেছেন—"তোমরা যাঁর আশ্রিত তাঁর শুভ দৃষ্টিতে পলকের ভিতরে অনেক আঁধার কাটিয়া যাইতে পারে ; সুতরাং তোমাদের ভাবিবার বা ভয় করিবার কিছুই নাই। নিরানন্দ, নিরাশা ও নিরুৎসাহকে জন্মের মত ভুলিয়া যাও।"

"আমার এই সঙ্ঘের আশ্রিত, শরণাগত, শরণাপন্ন যাহারা আজ তাহারা খুবই সৌভাগ্যবান এবং তাহাদের জীবন খুবই নিরাপদ।"

"তোমরা যে বিরাট সঙ্ঘের শরণ লইয়াছ তাহাতে কোনক্রমেই তোমাদের ধর্ম্মজীবন নষ্ট হইতে পারে না—যে পর্য্যন্ত সঙ্ঘনেতার বাণীকে বেদবাণী বলিয়া ধরিয়া থাকিতে পারিবে।"

"পাপতাপ মায়ামোহ তোমাদের জন্য নহে, উহা বিষয়ের কীট, ভোগানুরক্ত ব্যক্তিদের জন্য। তোমরা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পুরুষের সন্তান, তোমরা তাঁহারই সংস্রবে সংশ্লিষ্ট, তাঁহারই জ্ঞানালোকে আলোকিত। সুতরাং, এমন কোন প্রলোভন আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই যা তোমাদিগকে প্রলোভিত করিতে পারে।"

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৩

অন্বয়—কৌন্তেয়, শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ যে অপি অন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে, তে অপি মাম্ এব যজন্তি অবিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৩

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়, যারা অন্য দেবতায় ভক্তিমান হয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে তাঁদের পূজা করে তারাও আমাকে পূজা করে, কিন্তু অবিধি পূর্ব্বক॥ ২৩

দেবপূজার পরিণাম

হিন্দুধর্ম্মে বহু দেবদেবীর স্থান। এমন কি আর্য্যহিন্দুর প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যেও ইন্দ্র, সোম, বায়ু, বরুণ, ঊষা প্রভৃতি বহু দেবদেবীর উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। বিধর্ম্মীর দৃষ্টিতে তাই হিন্দুজাতি বহু দেববাদী (polytheist) বলে নিন্দিত। কিন্তু তাদের এই ধারণা অমূলক ও ভিত্তিহীন। কেন না, তারা জানে

না যে হিন্দুগণ বহু দেবদেবীর মধ্য দিয়ে একই ভগবানের পূজা করে থাকেন। বেদ স্বয়ং এ বিষয়ে বলেছেন—"একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"—তিনি এক, পণ্ডিতেরা তাঁকে বহু বলেন।

বস্তুতঃ, হিন্দুজাতিই একমাত্র একেশ্বরবাদী। তার উপাস্য বিভিন্ন দেবদেবী সেই একই পরমাত্মার বিভিন্ন প্রকাশ বা শক্তিমাত্র। জ্ঞান, গুণ ও শক্তিভেদে যেমন একই ব্যক্তি বাবা, কাকা, মামা, দাদা, বন্ধু প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত ও সম্পর্কিত হয়, তেমনই একই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তি বিভিন্ন দেবদেবীর নামে সূচিত ও পূজিত হয়ে থাকেন।

গীতাকার শ্রীভগবান্ বলেন, এই দেবপূজা দু'প্রকারে সম্পন্ন হতে পারে—সকাম ও নিষ্কাম। যারা আমার শক্তিস্বরূপ বিভিন্ন দেবদেবীগণকে নিজেদের জাগতিক সুখ-সম্পদ প্রাপ্তির সাধন মনে করে আন্তরিকভাবে পূজার্চ্চনা করে তারা এক হিসাবে আমার পূজা করলেও তারা অজ্ঞান। কারণ, তারা জানে না যে আমার অংশস্বরূপ ঐ সব দেবদেবীগণ কখনও আমার পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ হতে পারে না এবং আমি সাংসারিক বাসনা ও প্রার্থনার যথার্থ সমর্থক নই। আর এই কারণে তাদের সেই পূজা অবৈধ। তাই এরূপ উপাসনা দ্বারা তাদের সাংসারিক মনস্কামনা পূর্ণ হলেও তারা আমাকে লাভ করে না।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাঽতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪

অন্বয়—অহং হি এব সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুঃ চ ; তে তু মাং তত্ত্বেন ন অভিজানন্তি ; অতঃ চ্যবন্তি॥ ২৪

অনুবাদ—আমি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা ; কিন্তু তারা আমাকে যথার্থরূপে জানে না বলে সংসারে পতিত হয়॥ ২৪

দেবোপাসকগণের পতনের কারণ

অন্যান্য দেবদেবীর উপাসকগণ জানে না যে ভগবানই সমস্ত পূজা ও যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ও ফলদাতা। অন্যান্য দেবদেবীগণের সে শক্তি ও

যোগ্যতা নাই। তাঁরা ভগবানের এক একটি গুণ বা শক্তির প্রতীক মাত্র। কোন ব্যক্তি যদি কোন সম্পন্ন জমিদারের গৃহে গমন ক'রে তার বাটিকার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান যে দ্বারপাল তার শরণাপন্ন হয়ে তার নিকট বিপুল ধন-সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদন জানায়, তবে তার সে আশা পূর্ণ হয় কি? অধ্যাত্মক্ষেত্রেও তেমনি কোন সাধক যদি সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বগুণ ও জ্ঞানের আধার ভগবানকে উপেক্ষা ক'রে তাঁর শক্তিতে শক্তিমান কোন সামান্য দেবদেবীর নিকট স্বীয় হৃদয়ের অশেষ কামনা বাসনা নিবেদন করে, তাহলে তার পরিমাণও তদ্রূপ ব্যর্থ হয়।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন গোকুল বৃন্দাবনে লীলারত তখন তথাকার অধিবাসিগণ ছিলেন ইন্দ্রাদি বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় অভ্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ তাদের সেই দেব-পূজার নিষ্ফলতা প্রতিপাদন ক'রে নিজেই সেই সমস্ত পূজার অগ্রভাগ গ্রহণে তৎপর হন। লোকপ্রবাদে আছে—মা যশোদা যখন গৃহে সত্যনারায়ণের পূজার আয়োজন ক'রে পুরোহিতের সন্ধানে অপেক্ষমানা, তখন তদীয় তনয় গোপাল ছিলেন তাঁর পূজার নৈবেদ্য গ্রহণে ব্যাপৃত। সন্তানের এই কীর্তি দেখে মাতা দৌড়ে এসে তাকে তিরস্কার করতে উদ্যত হলে গোপাল নিঃসঙ্কোচে জবাব দিলেন—"মা, তুমি আমাকে তিরস্কার করছো কেন? আমি তো কোনো অন্যায় করি নি। যাঁর উদ্দেশ্যে তোমার এই পূজার আয়োজন সে-ই তা গ্রহণ করেছে; তোমার গৃহে জাগ্রত নারায়ণ বিদ্যমান থাকতে আবার কল্পিত নারায়ণের পূজার প্রয়োজন কি?"

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ ২৫

অন্বয়—দেবব্রতাঃ দেবান্ যান্তি, পিতৃব্রতাঃ পিতৄন্ যান্তি, ভূতেজ্যাঃ ভূতানি যান্তি, মদ্‌যাজিনঃ অপি মাং যান্তি॥ ২৫

অনুবাদ—দেবগণের উপাসকরা দেবলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃউপাসকগণ পিতৃলোক লাভ করেন, যাঁরা ভূতগণের উপাসনা করেন তারা প্রাপ্ত হন ভূতলোক এবং যাঁরা আমার পূজা করেন তাঁরা আমাকে লাভ করেন॥ ২৫

উপাস্যানুরূপ সিদ্ধি

যাঁরা ইন্দ্র, সোম, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে পূজাহোম করেন, তাঁরা মৃত্যু শেষে সেই সেই দেবতার অনুরূপ যে লোক বা স্থিতি তাই লাভ করেন। মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যাঁরা তাঁদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য পিণ্ডদানাদি অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা পিতৃলোকের অধিকারী হন। আর যাঁরা যক্ষ-রক্ষাদি ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী এবং তাঁদের বরাশিস্ লাভের জন্য পূজার্চ্চনা করেন, তাঁরা তাঁদের সেই বাঞ্ছিত স্থিতি প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে, যাঁরা আমার (ভগবানের) গুণ, শক্তি ও মহত্ত্ব অবগত হয়ে আমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে আমার পূজাবন্দনায় নিরত হন তাঁরা আমাকে লাভ করে ধন্য হন। বস্তুতঃ, রুচি ও প্রকৃতি ভেদে জগতের সকল ধর্ম্মে পরিদৃষ্ট হয়—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির সাধক-সাধিকা এবং তাঁরা স্বীয় স্বীয় ভাবানুযায়ী তাঁদের অভীষ্টের সেবা-পূজায় অগ্রসর হন এবং তাঁদের সাধনফলও তাঁদের তপস্যার অনুরূপই হয়ে থাকে।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬

অন্বয়—যঃ মে ভক্ত্যা পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং প্রযচ্ছতি অহং প্রযতাত্মনঃ ভক্ত্যুপহৃতং তৎ অশ্নামি॥ ২৬

অনুবাদ—যিনি আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি—যা কিছু ভক্তি সহকারে অর্পণ করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত উপহার বা অর্ঘ্য গ্রহণ করে থাকি॥ ২৬

ভগবান্ ভক্তির কাঙ্গাল, মহার্ঘ দ্রব্য-সামগ্রীর নন

রাজসিক প্রকৃতির লোকেরা মনে করে—ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরই পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তারা অজস্র অর্থ বিত্ত ব্যয় ক'রে ষোড়শোপচারে তাদের আরাধ্য দেবদেবীর পূজা করে থাকে। তাদের ধারণা, এরূপ বিপুল আয়োজন ব্যতীত দেবতার প্রসন্নতা-ভাজন হওয়া যায় না। এরা কিন্তু ভ্রান্ত—এরা বোঝে না যে যিনি অনন্ত কোটি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পাতা তাঁর আবার এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যবৈভবের প্রয়োজন কি? তিনি ইচ্ছা করলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্য-সম্পদ সৃষ্টি করতে পারেন না কি?

বস্তুতঃ, ভগবান্ হ'চ্ছেন ভাবগ্রাহী, ঐশ্বর্য্যপ্রেমী নন। যেরূপ ভাবভক্তি নিয়ে ভক্ত তাঁর পূজা-বন্দনা করেন তিনি সানন্দে তা-ই স্বীকার করেন। এরূপ শুনা যায়, দুর্ব্বৃত্ত দুর্য্যোধনের অভিমান-প্রদত্ত অজস্র ভোগ্য সামগ্রী উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ বিদুরপত্নীর ভাব-ভক্তিপূত কদলী ভক্ষণে তৃপ্ত হন। এতেই সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয়—ভগবৎপূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপচার হচ্ছে শুদ্ধচিত্ত সাধকের অন্তরের ভাব ও অনুরাগ, বাহ্যিক উপকরণের স্থান সেখানে তুচ্ছ ও নগণ্য।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭

অন্বয়—কৌন্তেয়! যৎ করোষি, যদশ্নাসি, যৎ জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি, তৎ মদর্পণং কুরুষ্ব॥ ২৭

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়, তুমি যা কিছু কর, যা কিছু ভোজন কর, যা কিছু হোম কর, যা কিছু দান কর, যা কিছু তপস্যা কর তৎ সমুদয় আমাকে সমর্পণ কর॥ ২৭

সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে অর্পণই—সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনা

এক দৃষ্টিতে কর্ম্মই সংসারবন্ধনের হেতু। অথচ, মানুষ কর্ম্ম ব্যতীত এই জগতে এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারে না। এরূপ অবস্থায় সংসারাবদ্ধ জীবের মুক্তির উপায় কি—বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ তদীয় প্রিয় সখা অর্জ্জুনের মাধ্যমে বিশ্বজীবকে সেই রহস্যই শিক্ষা দিচ্ছেন।

কর্ম্ম সাধারণতঃ দুই প্রকার—ঐহিক ও পারত্রিক, অথবা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক। বর্ত্তমান শ্লোকে উক্ত উভয় প্রকারের কর্ম্মের সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ বলছেন—হে কৌন্তেয়, আহার-বিহারাদি তোমার যাবতীয় লৌকিক কর্ম্ম এবং যাগ-যজ্ঞ, দান-পুণ্য, তপস্যা প্রভৃতি তোমার সমস্ত অধ্যাত্ম কর্ম্ম আমাকে অর্পণ কর। এই ভাবে তোমার সমস্ত কর্ম্ম আমাতে

অর্পিত হলে, তাতে তোমার আর কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ও ফলাসক্তি থাকবে না এবং তার ফলে তোমার কর্ম্মজনিত বন্ধনের ভয় চিরতরে নিবারিত হয়ে যাবে।

কোন ধনী ব্যবসায়ীর ম্যানেজার যেমন সারাদিন তাঁর মালিকের প্রতিনিধিরূপে সমস্ত কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব উদ্‌যাপন ক'রে দিবাশেষে তাঁর প্রভুকে সমস্ত কর্ম্মের হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন, অধ্যাত্ম ক্ষেত্রেও তেমনই সত্যকার সাধক তাঁর অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের চরণে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক হয়ে যান।

এরূপ সমর্পিতচিত্ত সাধক নিরন্তর মনে করেন, তিনি তাঁর সর্ব্বনিয়ন্তা প্রভুর হস্তের যন্ত্রমাত্র এবং তখন তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হয়—

'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥'

হে হৃষীকেশ, তুমি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে যা নির্দ্দেশ করবে, আমি তা-ই করব।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮

অন্বয়—এবং শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ মোক্ষ্যসে ; সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তঃ মাম্ উপৈষ্যসি॥ ২৮

অনুবাদ—এইরূপে সর্ব্বকর্ম্ম আমাকে অর্পণ করলে তুমি শুভাশুভ যাবতীয় কর্ম্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে এবং আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ-রূপযোগে যুক্ত হয়ে তুমি কর্ম্মবন্ধন হতে পরিমুক্ত হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হবে॥ ২৮

ঈশ্বরার্পণের ফল কেবল বন্ধনমুক্তি নয়—ভগবৎ প্রাপ্তি

পরমেশ্বর সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করতে অভ্যস্ত হলে সাধক যে শুধু তাঁর অনুষ্ঠিত ভালমন্দ কর্ম্মের শুভাশুভ পরিণাম হতে পরিমুক্ত হন—তা-ই নয়, এর ফলে তিনি অন্তিমে ভগবানকে লাভ ক'রে পরমা শান্তির অধিকারী হন।

অর্থাৎ, ভক্তিযুক্ত কর্ম্মযোগী কেবলমাত্র মুক্তির অধিকারী হন না, তিনি ভগবানকে লাভ ক'রে পরম ভাগবত স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, গীতার শ্রীভগবান্ মুক্তি অপেক্ষা ভগবৎ প্রাপ্তিকে উচ্চতর গতি বলে নির্দ্দেশ করছেন। বস্তুতঃ, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সাধনার চরম লক্ষ্য হচ্ছে—কৈবল্যমুক্তি ; পরন্তু, ভক্তের দৃষ্টিতে জীবের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে—ভগবৎপ্রাপ্তি।

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যেভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।। ২৯

অন্বয়—অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ মে দ্বেষ্যঃ ন, প্রিয়ঃ চ ন অস্তি, তু যে মাং ভক্ত্যা ভজন্তি তে ময়ি অহম্ অপি চ তেষু।। ২৯

অনুবাদ—আমি সর্ব্বভূতের পক্ষেই সমান। আমার দ্বেষ্যও নাই, প্রিয়ও নাই। কিন্তু ভক্তিপূর্ব্বক যাঁরা আমার ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও সেই সকল ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করি।। ২৯

আর্য্যহিন্দুর ঐশী কল্পনা বিচিত্র

তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ভগবানের যে স্বরূপ তা হচ্ছে—নিরাকার, দ্বন্দ্বাতীত ও সমত্ব-গুণসম্পন্ন। এই দৃষ্টিতে তাঁর প্রিয়-অপ্রিয়, শত্রু-মিত্র কেহ নাই। তবে যে তাঁকে যে ভাবে চায়, সে তাঁকে সেই ভাবে লাভ করে।

একখণ্ড স্বচ্ছ স্ফটিকের সামনে লাল, নীল, পীত প্রভৃতি যে রঙের বস্ত্র রক্ষিত হয় স্ফটিকের মধ্যে যেমন অবিকল সেই রঙের বস্তুটি প্রতিফলিত হয়ে থাকে, তেমনই ভগবানের নিকট যে যে-ভাব নিয়ে ভজনা করে তার মধ্যে তখন সেই ভাবই পরিস্ফুরিত হয়।

ভক্ত প্রহ্লাদ যখন পরম প্রেমভাব নিয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয় প্রভুর ভজনা করলেন, তখন তাঁর সেই প্রার্থনা পূর্ণ করার জন্য শ্রীভগবান্ বরাভয়-মূর্ত্তিরূপে তাঁর সমক্ষে আবির্ভূত হলেন। আর ঠিক সেই সময়ে তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু বুকভরা বিদ্বেষ নিয়ে ভগবানের সম্মুখীন হলেন এবং তার ফলে তিনি তাঁর সমক্ষে প্রকটিত হলেন ভীষণ বিকরাল হিংস্রস্বরূপ নিয়ে।

একই ভগবানের মধ্যে এই যে পরস্পরবিরুদ্ধ স্বরূপের প্রকাশ তা সাধকের বিভিন্ন মনোভাবের প্রতিক্রিয়ার পরিণাম মাত্র, ভগবানের প্রকৃত স্বরূপের মধ্যে এই বিষম ভাবের স্থান নাই।

এখানে প্রশ্ন আসে—গীতাতে তো অন্যত্র শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলেছেন, আমাকে যারা দ্বেষ করে আমি সেই নরাধমদিগকে অসুরযোনিতে নিক্ষেপ করি। আবার কোথাও তিনি বলেছেন যারা আমার জ্ঞানী ভক্ত তারা আমার অতীব প্রিয়। পুনরায় এখানে তিনি বলছেন—আমার প্রিয়-অপ্রিয় কেহ নাই, আমার নিকট সকলেই সমান। গীতার মধ্যে এই যে পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের উক্তি—তাদের মধ্যে সমন্বয় বা সামঞ্জস্য কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, সাধারণ বিচারের মাপকাঠিতে ভগবৎতত্ত্বের দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে পরিমাপ করা যায় না। এইজন্যই বলা হয়—Mysterious are the ways of God. বস্তুতঃ এরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় নিয়েই ভাগবততত্ত্বের মহত্ত্ব-গৌরব।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।। ৩০

অন্বয়—চেৎ সুদুরাচারঃ অপি অনন্যভাক্ মাং ভজতে সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ, সঃ হি সম্যক্ ব্যবসিতঃ।। ৩০

অনুবাদ—অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হয়ে আমার ভজনা করে, তাকে সাধু মনে করবে, যেহেতু তার অধ্যবসায় উত্তম।। ৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।। ৩১

অন্বয়—ক্ষিপ্রং ধর্ম্মাত্মা ভবতি, শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয়! মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি প্রতিজানীহি।। ৩১

অনুবাদ—(এরূপ দুরাচার ব্যক্তিও) শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয় ও নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি আমার ভক্ত কদাপি বিনষ্ট হয় না।। ৩১

ভগবদ্ভক্তের বিনাশ নেই

কোন ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত বুদ্ধিবশতঃ কখন বিপথগামী ও কদাচারী হয়ে পড়ে তবে কি আর তার আত্মোদ্ধারের কোন উপায় নাই? তবে কি সে চিরকাল ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে থাকবে? এই প্রশ্নের উত্তর দান-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বলছেন—এরূপ ভীষণ দুরাচারী ব্যক্তিও যদি নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হৃদয়ে একান্ত মনে ভক্তিসাধনায় ব্রতী হয় তবে সে আর উপেক্ষা ও অনাদরের পাত্র নয়; তখন তাকে সাধু বলে মান্য করাই সমীচীন। কেন না, তখন তার মনোবুদ্ধি ভগবন্মুখী হওয়ার ফলে তার চরিত্রের রূপান্তর ঘটতে বাধ্য এবং তার ফলে সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মায় পরিণত হয়ে নিত্য শান্তির পথে প্রবর্ত্তিত হবে।

অতঃপর শ্রীভগবান্ এরূপ ভক্তের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করলেন, তা কতই না অভয় ও সান্ত্বনাপ্রদ! এদের উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন—"কৌন্তেয়, প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। হে কৌন্তেয়! ভালমত জেনে রেখ—আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমার শরণাগত ভক্তের কদাপি বিনাশ নাই। দুর্ব্বৃত্ত রত্নাকর, জগাই, মাধাই প্রভৃতি অগণিত ভক্তের জীবন এই ভগবৎ প্রতিশ্রুতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।। ৩২

অন্বয়—পার্থ! স্ত্রিয়ঃ, বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ যে অপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ, তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য হি পরাং গতিং যান্তি।। ৩২

অনুবাদ—হে পার্থ! স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র অথবা যারা পাপযোনিসম্ভূত অন্ত্যজ তারাও আমার আশ্রয় গ্রহণ করলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।। ৩২

ভক্তিমার্গে সকলের সমান অধিকার

জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি সাধনমার্গগুলিতে অধিকার ও যোগ্যতার প্রশ্ন আছে। অল্পবুদ্ধি ও নিম্নাধিকারীদের স্থান সেখানে নাই, পরন্তু ভক্তিমার্গে আদৌ সে প্রশ্ন উঠে না। ভক্তিপথ সকলের জন্য উন্মুক্ত।

প্রাচীনতম কালে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রের বেদাধ্যয়নে সমান অধিকার ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী মহাভারতীয় যুগে সে অধিকার যে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়েছিল গীতার বর্ত্তমান শ্লোকে তার অনেকখানি আভাস পাওয়া যায়। গীতাকার শ্রীকৃষ্ণপ্রচারিত গীতাধর্ম্ম এই প্রথাকে স্বীকার করে নি। গীতার বাণী জাতি, বর্ণ, শ্রেণী, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলকে মুক্তির সহজতম পন্থা প্রদর্শন করে। গীতোক্ত এই ভাগবত ধর্ম্ম নীচযোনিসম্ভূত অন্ত্যজকেও আশ্রয় দিতে উন্মুখ।

অত্যন্ত খেদের বিষয়, সেই উদারতম বাণীর উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণের দেশে পরবর্ত্তীকালে পুনরায় জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সম্প্রদায়ভেদ নিকৃষ্টতম পর্য্যায়ে উপনীত! এমন কি সেই গীতাকার শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েই আজ এ যুগে সৃষ্ট হয়েছে কত নূতন নূতন উদ্ভট সম্প্রদায়—যার ফলে 'বার রাজপুতের তের হাঁড়ি'র ন্যায় সম্প্রদায়গুলি মতাদর্শ নিয়ে পরস্পর বিবদমান।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।। ৩৩

অন্বয়—পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ কিং পুনঃ; অনিত্যম্ অসুখম্ ইমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব।। ৩৩

অনুবাদ—পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণগণ ও রাজর্ষিগণ যে পরমগতি লাভ করবেন—তাতে আবার কথা কি আছে? অতএব এই অনিত্য দুঃখময় সংসারে এসে তুমি আমার ভজনা কর।। ৩৩

গীতামৃত—নীচ কুলোদ্ভব ও অজ্ঞান পাপাচারী ব্যক্তিদের ভগবৎ কৃপায় যখন উদ্ধার সম্ভবপর তখন পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ ও উচ্চাধিকারী রাজর্ষিগণের এ বিষয়ে আর চিন্তার কারণ কি? হে সখে অর্জ্জুন, তুমি তো ক্ষত্রিয় সন্তান—কুলে শীলে এত উন্নত ও অভিজাত, তোমার আবার ভয় বা ভাবনা কিসের? তুমি এই নশ্বর ও দুর্দ্দশাময় সংসারে জন্মগ্রহণ করে ক্ষণেকের তরেও আর বিভ্রান্ত থেকো না। তুমি যখন আমার আশ্রয় লাভ করেছ তখন আর একটু সাধনব্রতী হয়ে আমার পরম ভাগবত স্বরূপ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে কৃতসংকল্প হও।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।। ৩৪

অন্বয়—মন্মনাঃ মদ্ভক্তঃ মদ্যাজী ভব, মাং নমস্কুরু ; মৎপরায়ণঃ আত্মানং যুক্ত্বা মাম্ এব এষ্যসি।। ৩৪

অনুবাদ—তুমি নিরন্তর তোমার মনকে আমাতে নিবিষ্ট কর, আমাতে ভক্তিমান হও, আমার পূজা কর, আমাকে প্রণাম কর। এইরূপে মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে তোমার মন সমাহিত করতে পারলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।। ৩৪

গীতোক্ত ভক্তি-ধর্ম্মের সারমর্ম্ম

এই অধ্যায়ের প্রথমেই 'রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগ' নামে যে সাধনমার্গের অবতারণা করা হয়েছে, এই অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে তারই পূর্ণস্বরূপ স্পষ্টীকৃত হয়েছে। ভগবানে এরূপ পরম শরণাগতি, অনন্যনিষ্ঠা, সর্ব্বতোভাবে তাঁতে তন্ময় হওয়া, তাঁর রাতুল চরণে প্রতিনিয়ত ভক্তিপ্রণত হওয়া এবং নিরন্তর তাঁর আদেশ-নির্দ্দেশ অনুসরণই করাই সাধনার শেষ কথা। বস্তুতঃ এরূপ সরল ও সুগম ভাগবত ধর্ম্মের শিক্ষাদানের নিমিত্তই শ্রীভগবানের মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।।

দশমোঽধ্যায়ঃ—বিভূতিযোগঃ

সংশয়চিত্ত সখা অর্জ্জুনের হৃদয়ে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাবুদ্ধির উদ্রেকের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সপ্তম অধ্যায় হতে নানা প্রসঙ্গে নিজেই নিজের গুণ, মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে সেই আলোচনা আরও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করায় এই অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে—বিভূতিযোগ।

ভগবন্মুখে আত্মপ্রশংসা কেন?

সাধারণ দৃষ্টিতে আত্মপ্রশংসা বা নিজ মুখে নিজের গুণবত্তার বর্ণনা—গুরুতর অন্যায় ও অশোভন। লোকসংগ্রহরূপ সুমহান্ কার্য্যে ব্রতী হয়ে শ্রীভগবান্ স্বয়ং এরূপ আত্মপ্রশংসা সূচক হীন ভাবের কেন প্রশ্রয় দিলেন—সংশয়ী মনে এমন প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। তিনি শ্রীমুখে ইতঃপূর্ব্বে বলেছেন—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, জনসাধারণ তারই অনুকরণ করে। হে পার্থ, সংসারে আমার কর্ত্তব্য বা করণীয় বলে কিছুই নাই। তথাপি আমি কর্ত্তব্যনিরত ; কারণ আমি যদি কর্ম্ম ত্যাগ করি, তবে অপরে আমার সেই আচরণের অনুবর্ত্তন করে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

উত্তরে বলা যায়—গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ভগবদবতার, তাই তাঁর সম্পর্কে এই নিয়ম চলে না। কেন না, ভগবান্ হচ্ছেন—সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত।

তবে এক্ষেত্রেও পুনরায় প্রশ্ন উঠে—শ্রীভগবান্ তো গীতাতে শুধু জনকাদি মহাপুরুষগণকেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে ইতি করেন নি। তিনি তো নিজেকেও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন—

"যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।।" ৩।২৩

বস্তুতঃ, ভগবদবতারগণ যদি সর্ব্বদা অমানবীয় ভগবদ্ভাবে অধিষ্ঠিত

থাকেন তবে তাঁদের দ্বারা অনুষ্ঠিত লোকোদ্ধারের ব্রত যথাযথ সিদ্ধ হয় না। তাই তাঁরা বিশেষ বিশেষ কারণ ও উপলক্ষ্য ব্যতীত আদর্শ মানবরূপেই নিজেদের আচরণের দ্বারা লোকশিক্ষা দান করে থাকেন। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেও তাই বহুলাংশে তদনুরূপ আচরণ করতে হয়েছে।

তা ছাড়া, এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ এখানে আদৌ আত্মপ্রশংসা করেন নি। তাঁর যা প্রকৃত স্বরূপ তিনি প্রসঙ্গক্রমে কেবলমাত্র তা-ই ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁর এরূপ আচরণের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও ছিল অতি মহান্। সেযুগে শ্রীকৃষ্ণের সুবিশাল ও বহুমুখী ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অধিকাংশ নর-নারী ছিল অজ্ঞ, অশ্রদ্ধালু এবং অবজ্ঞাপরায়ণ। স্বীয় প্রাণপ্রতিম সখা অর্জ্জুনের মনেও তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তাও একান্ত সাধারণ। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জ্জুনকে পুরোভাগে রেখে প্রসঙ্গক্রমে নিজেই নিজের গুণ, শক্তি ও মহত্ত্বের উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত। এরূপ না করে যদি তিনি আত্মগোপন করে থাকতেন তবে তাঁর এই অবতারলীলার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হত। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র অর্জ্জুন নয়, লক্ষ লক্ষ অজ্ঞানান্ধ নর-নারীর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হত না। ভগবৎ তত্ত্ব বিষয়ে তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে যেত।

বস্তুতঃ, উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম্মের গুণাগুণ বিচার হয়। যদি কোন ব্যক্তি অহমিকাবশে বা অন্য কোন হীন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নিজের গুণ, জ্ঞান ও প্রতিভার প্রচার প্রচেষ্টায় ব্যগ্র ও ব্যাকুল হয়, তবে তা দোষাবহ সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, যদি কোন সত্যকার গুণী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত সারল্য, বিনয় বা সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য আত্মগোপন ক'রে সমাজের এককোণে অজ্ঞাত অখ্যাতভাবে পড়ে থাকেন, তবে তাঁর সে প্রচেষ্টা লোকহিতের পরিপন্থী হয় না কি? গীতার দৃষ্টিতে শ্রেয়ঃ ব্যক্তির এরূপ আচরণও তাই সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, এর দ্বারা লোকসংগ্রহের প্রয়াস সফল সার্থক না হয়ে বরং ব্যর্থ ও বিঘ্নিত হয়।

বস্তুতঃ, নিম্নতর 'আমি'র (Lower ego) যে আমিত্ব বা অভিমান তা-ই অহঙ্কার এবং পতনের কারণও তা-ই। পক্ষান্তরে, উন্নততর 'আমি'র (Higher ego) আমিত্বের দ্বারা সাধিত হয় জগৎকল্যাণ। লোকহিতৈষী

মহাপুরুষদের মধ্যে এরূপ কিঞ্চিৎ 'আমিত্ব' থাকে বলে তাঁরা সমাজকল্যাণের দায়িত্বভার বরণ করতে পারেন। খাঁটি সোনার দ্বারা কোন অলঙ্কার প্রস্তুত করতে হলে যেমন প্রয়োজন তার সঙ্গে কিছুটা খাদের মিশ্রণ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরাও তেমনি তাঁদের লোকহিতব্রত উদ্‌যাপন ক'রে থাকেন কিছুটা সাত্ত্বিক অভিমান রেখেই।

এখানে আর একটি বিষয় জানা আবশ্যক—এই দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ স্বীয় রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য্যের যে বর্ণনায় উদ্যত তা একান্ত অপ্রাকৃত বা অমানবীয়। এতেই প্রমাণিত হয়—গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ নরলীলায় অবতীর্ণ হলেও প্রয়োজনবশে তিনি এখানে অপ্রাকৃত ভাগবত মহিমায় আরূঢ় হয়ে তাঁর অপার, অদ্ভুত ঈশ্বরীয় মহিমার বর্ণনায় প্রবৃত্ত।

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—মহাবাহো, ভূয়ঃ এব মে পরমং বচঃ শৃণু, যৎ প্রীয়মাণায় তে অহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি॥ ১

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—হে মহাবাহো! পুনরায় আমার উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ কর—যে কথায় তুমি প্রীত হবে আমি তোমার হিতকামনায় আবার সেই কথা বলছি॥ ১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২

অন্বয়—সুরগণাঃ মে প্রভবং ন বিদুঃ, মহর্ষয়ঃ চ ন ; অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ আদিঃ।। ২

অনুবাদ—কি দেবগণ, কি মহর্ষিগণ কেহই আমার প্রভাব বা উৎপত্তির বিষয় জানেন না। কারণ, আমি সর্ব্বতোভাবে সমস্ত দেব এবং মহর্ষিগণের আদি কারণ॥ ২

শক্তিমান্ ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই পরম ভাগবত মহিমা শ্রবণের অধিকারী

অর্জ্জুন একাধারে বীর, ধীর ও শ্রদ্ধালু ; এরূপ শক্তিমান্, ধৈর্য্যশীল ও ভক্তিমান্ সাধকের প্রতি উপদেষ্টা সদ্গুরু সর্ব্বাধিক প্রসন্ন হন এবং তার সেই সুউচ্চ আধার ও অধিকার লক্ষ্য ক'রে প্রাণ খুলে তিনি তাকে উন্নতর জ্ঞানের উপদেশ দান করেন। যার অন্তঃকরণে সত্যকার শ্রদ্ধার অভাব বা ভাবগত তত্ত্ব শ্রবণে যার আগ্রহ ও রুচি অপ্রতুল এবং উপদিষ্ট জ্ঞানকে জীবন রূপায়িত করার শক্তি-সামর্থ্য ও ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য যার নাই—এরূপ শ্রোতাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা নয় কি? অর্জ্জুন যথার্থ অধিকারী—তাই তাঁর সদ্গুরু অতি হৃষ্টচিত্তে তাঁর নিকট স্বীয় অপার মহিমার বর্ণনায় উন্মুখ।

এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম তিনি তাঁর আদিকারণত্ব বিষয় উত্থাপিত করে বলছেন—দেবতা, ঋষি ও মহর্ষি প্রভৃতি সকলে আমা হতে উৎপন্ন। আমার পূর্ব্বে ইঁহারা কেহই ছিলেন না। সুতরাং, আমার যে পরম ঈশ্বরীয় স্বরূপ ও মহিমা—তা তাঁরা অবগত নন। সর্ব্বপ্রকারে আমি সকলেরই আদি।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। ৩

অন্বয়—যঃ মাম্ অনাদিম্ অজং লোকমহেশ্বরং চ বেত্তি সঃ মর্ত্ত্যেষু অসংমূঢ়ঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। ৩

অনুবাদ—যিনি জানেন যে আমার আদি নাই, জন্ম নাই, আমি সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, মনুষ্য মধ্যে তিনি মোহশূন্য হয়ে সর্ব্বপাপ হতে পরিমুক্ত হন।। ৩

শ্রীভগবানের মহিমাজ্ঞানই সংসারমোহের বিনাশক

শ্রীভগবানকে অনাদি, অনন্ত ও সর্ব্বলোকের প্রভু বলে জানলে জ্ঞাতার হৃদয়-মনে তাঁর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির উদয় হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। আর তার ফলে তাঁর মন বিষয়মোহ হতে বিমুক্ত হতে বাধ্য।

বস্তুতঃ, মানুষের অন্তঃকরণে স্ত্রী, পুত্র, ধন, জনের প্রতি অনুরাগ আকর্ষণ ততক্ষণ বিদ্যমান থাকে, যতক্ষণ সে ভ্রমবশতঃ মনে করে—এরাই আমার জন্মজন্মান্তরের সঙ্গী-সাথী, এদের সহিত আমার এই সম্বন্ধ-সম্পর্ক কদাপি ছিন্ন বা বিনষ্ট হবার নয়। কিন্তু, যে মুহূর্ত্তে সে ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে ভগবানই একমাত্র সৎ ও অবিনাশী, তিনিই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা, পাতা সংহর্ত্তা, তিনিই জীবের চিরন্তন সাথী ও সুহৃদ, অন্য কেহ নয়, সেই মুহূর্ত্তে তার মনের যুগ-যুগ-সঞ্চিত মোহ ভ্রান্তি দূরীভূত হয়ে যায়।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ।। ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ।। ৫

অন্বয়—বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্, অসম্মোহঃ, ক্ষমা, সত্যং, দমঃ, শমঃ, সুখং, দুঃখং, ভবঃ, ভয়ং, অভাবঃ, অভয়ং চ, অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানং, যশঃ, অযশঃ, ভূতানাং পৃথগ্বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব ভবন্তি।। ৪-৫

অনুবাদ—বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্ত্তব্যবোধ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমচিত্ততা, সন্তোষ, তপঃ, দান, যশঃ, অযশঃ—প্রাণিগণের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হতেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।। ৪-৫

গীতামৃত—এখানে গীতাকার শ্রীভগবান্ স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়ে বলছেন—আমি ভাল-মন্দ, শুভাশুভ সমস্ত প্রবৃত্তি ও সংস্কারের স্রষ্টা। অর্থাৎ, আমা ব্যতীত অন্য কোন স্রষ্টা বা নিয়ন্তা নাই।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ।। ৬

অন্বয়—সপ্ত মহর্ষয়ঃ, পূর্ব্বে চত্বারঃ, তথা মনবঃ মদ্ভাবাঃ, মানসাঃ জাতাঃ লোকে ইমাঃ যেষাং প্রজাঃ।। ৬

অনুবাদ—সপ্ত মহর্ষি, তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী চারজন মহর্ষি এবং মনুগণ,

—এঁরা সকলেই আমার মানসজাত এবং আমার প্রভাবে প্রভাব-সম্পন্ন এবং জগতের সকল প্রজা তাঁদের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছে॥ ৬

মহর্ষি ও মনুগণের স্রষ্টা ও ভগবান্

মরীচি, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—একমতে এই সাতজন হচ্ছেন মহর্ষি। অর্থাৎ, অগণিত ঋষির মধ্যে এঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। এঁদের পূর্ব্বে চারজন মহর্ষি ছিলেন—তাঁরা হচ্ছেন সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। এঁরা সকলেই ছিলেন ভগবানের মানসপুত্র। তা ছাড়া, চতুর্দ্দশ মনু ছিলেন—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সার্বর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি এবং ইন্দ্রসাবর্ণি। উপরোক্ত সমস্ত মহর্ষি এবং মনুগণের আদিকারণও হচ্ছেন ভগবান্ এবং তাঁরা সকলেই তাঁর ভাব, গুণ ও ঐশ্বর্য্যেই এত প্রভাবসম্পন্ন। ভগবানের ইচ্ছা ও প্রেরণাবলেই তাঁরা জগতের সকল প্রজা সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ, এই সংসারে যাঁরা যত শক্তি, গুণ ও প্রভাবসম্পন্ন হোন না কেন—তাঁদের সকল মহত্ত্ব ও গৌরবের স্রষ্টা বা দাতা হচ্ছেন ভগবান্ স্বয়ং।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭

অন্বয়—যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ তত্ত্বতঃ বেত্তি সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে, অত্র ন সংশয়ঃ॥ ৭

অনুবাদ—যিনি আমার (এই) বিভূতি ও যোগৈশ্বর্য্য সম্যকরূপে জ্ঞাত হন, তিনি যে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত আমাতে নিবষ্টিচিত্ত হন—তাতে সংশয় নাই॥ ৭

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮

অন্বয়—অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ ; মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইতি মত্বা বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ মাং ভজন্তে॥ ৮

অনুবাদ—আমি সকলের উৎপত্তির কারণ। আমা হতেই সব কিছু প্রবর্ত্তিত ; বিবেকিগণ ইহা জেনে ভাবাবিষ্ট হয়ে আমার ভজনা করেন॥ ৮

গীতামৃত—ভগবানের শক্তি ও মহত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান যতই বর্দ্ধিত হয়, মনুষ্য ততই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়ে উঠে এবং তার সেই প্রেমভাব যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে ততই তার হৃদয়-মনে পর্য্যায়ক্রমে ভগবন্নিষ্ঠা ও তন্ময়তা গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠে।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯

অন্বয়—মচ্চিত্তাঃ, মদ্গতপ্রাণাঃ মাং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ, নিত্যং কথয়ন্তঃ চ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯

অনুবাদ—যাঁদের চিত্ত আমাতেই অর্পিত, যাঁদের প্রাণ মদ্গত—এরূপ ভক্তগণ পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝিয়ে এবং আমার গুণকীর্ত্তন ক'রে সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করে থাকেন॥ ৯

অনন্যভক্তের সন্তোষ ও আনন্দের উৎস—ভগবৎচর্চ্চা ও নামকীর্ত্তন

যে সমস্ত ভক্ত নিত্য ভগবৎ-সেবা ও ভজন-পূজনের দ্বারা একেবারে প্রভুময় হয়ে যান তাঁদের হৃদয়-মন হতে বিষয়াসক্তি চিরতরে তিরোহিত হয় এবং তখন তাঁদের একমাত্র রুচি হয়—ভগবৎ বিষয়ক চর্চ্চা ও ভগবৎ-গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে। প্রহ্লাদ নারদাদি ভক্তগণ এই ভাবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এরূপ ভক্তগণ বিষয়ীর সঙ্গ, বিষয়-চিন্তা ও বিষয়সেবাকে বিষবৎ পরিহার করেন। পক্ষান্তরে, ভগবানই হন তখন তাঁদের ধ্যান, জ্ঞান, আরাধনা, পারস্পরিক আলোচনা ও চর্চ্চার বিষয়-বস্তু। বস্তুতঃ এরূপ ভক্তেরা সত্য সত্যই ধন্য ও কৃতকৃতার্থ। এঁদের জীবন হয় নিত্যানন্দময়।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০

অন্বয়—সততযুক্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তৎ বুদ্ধিযোগং দদামি, যেন তে মাম্ উপযান্তি॥ ১০

অনুবাদ—যাঁরা সতত আমাতে যুক্ত হয়ে প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, সেই সব ভক্তগণকে আমি এরূপ বুদ্ধিযোগ দান করি—যার দ্বারা তাঁরা আমাকে লাভ করে থাকেন॥ ১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১

অন্বয়—তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ এব অহম্ আত্মভাবস্থঃ ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি॥ ১১

অনুবাদ—তাঁদের অনুগ্রহ করার নিমিত্ত তাঁদের অন্তরে অবস্থিত হয়ে আমি উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা তাঁদের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করি॥ ১১

ভগবানই আশ্রিত ভক্তের শুভবুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রদাতা

সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল বুদ্ধি ব্যতীত মানুষের অন্তঃকরণে কদাপি ধার্ম্মিক সংস্কার ও ভগবন্নিষ্ঠা জাগ্রত হয় না। তবে প্রশ্ন আসে—এরূপ শুভবুদ্ধি লাভের উপায় কি? উত্তরে জ্ঞানী সাধক বলেন—নিত্যানিত্য বিবেক-বিচারের দ্বারা মানুষ যখন ক্রমশঃ বুঝতে পারে—অসদ্বুদ্ধি ও অশুভ সংস্কার তার যাবতীয় দুঃখ-ক্লেশ ও অধোগতির মূল কারণ, তখন তার মন ধীরে ধীরে সংযত ও সংহত হয়ে সৎপথে প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং, পুরুষকারই জ্ঞানবাদী সাধকের এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়।

পক্ষান্তরে, প্রভুচরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী ভক্ত মনে করেন—উন্মার্গগামী মনোবুদ্ধিকে সংযত করে সুপথে পরিচালিত করার শক্তি-সামর্থ্য তাঁর নেই। সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভুই এ বিষয়ে তাঁর একমাত্র সহায় ও সম্বল। তিনি কৃপা না করলে তাঁর ন্যায় দীন-হীন অসহায়ের আর কোন উপায় নাই। এরূপ চিন্তা ক'রে তিনি ভগবৎ করুণার উপর একান্ত নির্ভরশীল হন এবং তাঁর আশ্রয়দাতা প্রেমময় ভগবান্ তাঁর এই শরণাগতির ভাব উপলব্ধি ক'রে তাঁকে প্রয়োজনানুরূপ শুভ মতি ও

নির্ম্মল জ্ঞান দান করেন। শুধু তাই নয়—তখন তিনি তাঁর হৃদয়ে শুভবুদ্ধি রূপে নিত্য-প্রতিভাত হয়ে জন্মজন্মান্তরের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে দেন। এরূপ ভক্তের আর কোন ভয়-ভাবনা, অভাব-অসন্তোষ থাকে না। কারণ, ভগবানই তখন তাঁর হয়ে সব কিছু করে দেন। বস্তুতঃ, অনন্যভক্তের জীবন হয় তখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্ন।

অর্জ্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ—ভবান্ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমং পবিত্রং ; সর্ব্বে ঋষয়ঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ, ত্বাং শাশ্বতং পুরুষং, দিব্যম্ আদিদেবম্ অজং বিভুম্ আহুঃ, স্বয়ং চ এব মে ব্রবীষি॥ ১২-১৩

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন—হে কেশব, তুমি পরব্রহ্ম, পরম পবিত্র। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে শাশ্বত, সনাতন, স্বয়ংপ্রকাশ, জন্মরহিত, আদিদেব ও সর্ব্বব্যাপী বলেন। তুমি স্বয়ংও আজ আমাকে তাই বললে॥ ১২-১৩

সখার ভগবৎ স্বরূপে অর্জ্জুনের সুদৃঢ় প্রতীতি

শ্রীভগবানের আশ্বাস-বাক্যে প্রবুদ্ধ হয়ে অর্জ্জুন বললেন—হে ভগবন্! তোমার অপার গুণ, জ্ঞান ও মহিমা বিষয়ে ঋষি, মহর্ষি ও দেবর্ষিবৃন্দ এতকাল যা অনুভব ও প্রচার করে এসেছেন, আজ তুমি স্বমুখে তা-ই আমাকে কৃপা করে বলছ। এতে আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে তুমি সেই আদিদেব ও শাশ্বত সনাতন পুরুষ। বিভুরূপে তোমার সত্তা এই অখিল বিশ্বের সর্ব্বত্র ও সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত।

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ।। ১৪

অন্বয়—কেশব, মাং যৎ বদসি এতৎ সর্ব্বং ঋতং মন্যে, ভগবন্, তে ব্যক্তিং দেবাঃ দানবাঃ চ ন বিদুঃ।। ১৪

অনুবাদ—কেশব! তুমি যা বলছ সে সব সত্য মনে করি। হে ভগবন্! কি দেব, কি দানব কেহই তোমার প্রভাব বা উৎপত্তির রহস্য অবগত নয়।। ১৪

ভগবানই স্বীয় মহিমার সর্ব্বোত্তম জ্ঞাতা ও প্রচারক

দেব, দানব, মানব প্রভৃতি সকলেই ভগবানেরই সৃষ্টি। তাদের সীমিত শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে তারা কীরূপে তাদের স্রষ্টা সেই আদি পুরুষের মহিমা ও বিভূতি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করবে? এই কারণে স্বীয় স্বরূপ বিষয়ে শ্রীভগবান্ নিজে যা বর্ণনা করেছেন—তা-ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। ভগবন্মুখে স্বীয় বিভূতির বর্ণনা শুনে অর্জ্জুনের মন তাই এতখানি নিঃসংশয়।

বস্তুতঃ, গুরুকৃপা ব্যতীত ভগবৎশক্তির অপার মহিমা সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায় না। অর্জ্জুন আজ ধন্য। কেন না, তাঁর এতকালের সখা তাঁর সমক্ষে এক্ষণে পরম কৃপালু গুরুরূপে প্রকট হয়ে নিজেই নিজের গুণ ও শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।। ১৫

অন্বয়—পুরুষোত্তম, ভূতভাবন, দেবদেব, জগৎপতে, ত্বং স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ।। ১৫

অনুবাদ—হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে দেবদেব, হে জগৎপতে! তুমি স্বয়ং আপন জ্ঞানে আপন স্বরূপ জান।। ১৫

গীতামৃত—উপরোক্ত শ্লোকে অর্জ্জুন স্বীয় সখাকে কী ভাবে ও কী বিশেষণে পুনঃ পুনঃ সম্বোধন করছেন তা লক্ষ্য করলে স্বতঃই মনে হয়

—তাঁর হৃদয়-মনে এক্ষণে এক অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত। সখা শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের প্রতি যতই তাঁর প্রাণে শ্রদ্ধার ভাব বর্দ্ধিত হচ্ছে ততই তিনি ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে তাঁর প্রাণারাম সুহৃদকে ভগবদ্ভাবে দর্শন ক'রে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁর মহিমাকীর্ত্তনে বিভোর হচ্ছেন। অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলে মনে হয়—ভক্তি সত্যসত্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্পর্শমণি—যার স্পর্শে মানুষের হৃদয়-মন মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।। ১৬

অন্বয়—ত্বং যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ অশেষেণ হি বক্তুম্ অর্হসি।। ১৬

অনুবাদ—তুমি যে যে বিভূতি দ্বারা সর্ব্বলোক ব্যাপক হয়ে আছ, সেই নিজ দিব্য বিভূতিসকল তুমিই নিঃশেষে বলতে সক্ষম।। ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া।। ১৭

অন্বয়—যোগিন্, অহং কথং ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ বিদ্যাম্? ভগবন্ কেষু কেষু ভাবেষু চ ময়া চিন্ত্যঃ অসি।। ১৭

অনুবাদ—হে যোগিন্! কীরূপে সতত চিন্তা করলে আমি তোমাকে জানতে পারি? হে ভগবন্! আমি তোমাকে কোন্ কোন্ পদার্থে কীভাবে চিন্তা করব—তা বল।। ১৭

অনন্ত শক্তি ও গুণের আধার ভগবানকে জানতে হলে প্রথম প্রয়োজন—তাঁর অপার বিভূতির জ্ঞান ও পরিচয়

অর্জ্জুন এক্ষণে বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে বলছেন—হে ভগবন্, তুমি কোন্ কোন্ বস্তুতে কী ভাবে অবস্থিত—তা কৃপা করে বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে বল। আমি তোমার এই সমস্ত বিভূতির মাধ্যমে তোমার ধ্যান করতে একান্ত

আগ্রহশীল। তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে একথাও বুঝিয়ে দাও—কোন্ কোন্ পদার্থে কি ভাবে চিন্তা করলে তোমার স্মৃতি আমার হৃদয়-মনে নিরন্তর জাগ্রত থাকবে।

বস্তুতঃ, শক্তিমান্ ও গুণবান্ ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁর শক্তি ও গুণের বাহ্য অভিব্যক্তিতে। অনন্ত শক্তিমান্ ভগবানের অখিল অপার জ্ঞানেরও উপলব্ধি হয়—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিভাত ও অভিব্যক্ত তাঁর অশেষ বিভূতির মাধ্যমে। এদের মধ্যে কোন্ কোন্ বিভূতির ধ্যান কী ভাবে করলে ভগবানের মহত্ত্ব-গৌরব ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায় অর্জ্জুন এক্ষণে তা-ই জানতে ইচ্ছুক।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃন্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

অন্বয়—জনার্দ্দন! আত্মনঃ যোগং বিভূতিঞ্চ ভূয়ঃ কথয় বিস্তরেণ; তৃপ্তির্হি শৃন্বতঃ নাস্তি মে অমৃতম্॥ ১৮

অনুবাদ—হে জনার্দ্দন! তুমি পুনরায় তোমার যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি সমূহ আমাকে বিস্তৃতরূপে বল। কেন না, তোমার অমৃতোপম বচন শ্রবণ ক'রে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না॥ ১৮

গীতামৃত—অপার অনন্ত ভগবৎ মহিমা শ্রবণে অর্জ্জুনের ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই। এতে যেন তাঁর শ্রবণেচ্ছা ক্রমশঃ আরও বেড়েই চলেছে। প্রকৃত ভক্তের ইহাই মহত্তম লক্ষণ। বস্তুতঃ, সামান্য একটু জপ-তপ, সৎসঙ্গ এবং সাধন-ভজনে যে ব্যক্তি ক্লান্ত বা পরিতৃপ্ত হয়ে যায় তার সাধনাকে উন্নত পর্য্যায়ের বলা চলে না এবং তৎ সহায়ে সাধন-মার্গে বেশী দূর অগ্রসর হওয়াও সম্ভবপর নয়।

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ, দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ প্রাধান্যতঃ হি তে কথয়িষ্যামি বিস্তরস্য মে অন্তঃ নাস্তি॥ ১৯

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমার প্রধান প্রধান দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত নাই। তাই তা তোমাকে সংক্ষেপে বলছি॥ ১৯

গীতামৃত—ভগবানের বিভূতি অনাদি, অনন্ত অপার! তিনি তাঁর কতটুকু বর্ণনা করবেন? তাই এখানে বিশেষ বিশেষ বিভূতিসকল বর্ণিত হচ্ছে। গীতার দশম অধ্যায়ের অনুকরণে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধেও বর্ণিত হয়েছে বিভূতিযোগ। বিভূতিযোগের অনিবার্য্যতা এতেই সুস্পষ্ট।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০

অন্বয়—গুড়াকেশ, সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা অহম্, অহমেব ভূতানাং আদিঃ মধ্যং অন্তঃ চ॥ ২০

অনুবাদ—হে গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা আমি, আমিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারস্বরূপ॥ ২০

গীতামৃত—হে জিতনিদ্র অর্জ্জুন, সকল জীবের অন্তঃকরণে যিনি আত্মারূপে অবস্থিত এবং যিনি সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের আদিকারণ, আমি ব্যতীত তিনি অপর কেহ নন। অর্থাৎ, তুমি আমাকে নন্দের বা বসুদেবের নন্দন মনে করে ভ্রান্ত হয়ো না, আমার যে প্রকৃত স্বরূপ তা হচ্ছে সর্ব্বময় ও সর্ব্বনিয়ন্তা। এইরূপে আমাকে অবগত হলে তোমার সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানতা ও মোহ বিদূরিত হবে।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১

অন্বয়—অহম্ আদিত্যানাং বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাম্ অংশুমান্ রবিঃ মরুতাং মরীচিঃ, নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী অস্মি॥ ২১

অনুবাদ—আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমি কিরণময় সূর্য্য। মরুৎগণের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র॥ ২১

গীতামৃত—সংখ্যায় আদিত্য হচ্ছেন বারজন—ধাতা, মিত্র, অর্যমা, সূর্য্য, রুদ্র, বরুণ, ভগ, বিবস্বান্, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু। মরুৎ বা বায়ুর ...

হচ্ছে উনপঞ্চাশ। ইন্দ্র তাঁর বিমাতা দিতির গর্ভস্থ সন্তানকে উনপঞ্চাশ ভাগ করে বিনষ্ট করেন। এঁরাই উনপঞ্চাশ বায়ু। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মরীচি।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২

অন্বয়—বেদানাং সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং বাসবঃ অস্মি, ইন্দ্রিয়াণাং মনঃ চ অস্মি, ভূতানাং চেতনা অস্মি॥ ২২

অনুবাদ—বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা॥ ২২

সামবেদ সঙ্গীত ও স্তুতিমূলক বলেই তার সর্ব্বোচ্চ মহত্ত্ব

বেদসকলের মধ্যে ঋগ্বেদের মহত্ত্ব প্রথম। কিন্তু, এখানে সামবেদকে সর্ব্বপ্রধান বলে কেন বর্ণনা করা হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, দেবতাদের স্তবস্তুতি ও প্রার্থনার আবৃত্তিতেই ঋগ্বেদের মহত্ত্ব-গৌরব। পক্ষান্তরে, সামবেদ সঙ্গীতপ্রধান হওয়ায় তার সমাদর সর্ব্বাধিক। ভগবান্ এখানে ভক্তিযোগের মহত্ত্ব-কীর্ত্তনে ব্রতী, তাই তিনি সামবেদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছেন।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩

অন্বয়—অহং রুদ্রাণাং শঙ্করঃ অস্মি, যক্ষরক্ষসাং চ বিত্তেশঃ, বসূনাং পাবকঃ অস্মি, শিখরিণাং চ মেরুঃ॥ ২৩

অনুবাদ—রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ-রক্ষগণের মধ্যে আমি কুবের, বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু॥ ২৩

রুদ্র ও বসুগণের পরিচয়

রুদ্র হচ্ছেন এগার জন—অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বিবস্বান, হর। বসু হচ্ছেন আট জন—আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪

অন্বয়—পার্থ, মাং পুরোধসাং চ মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি; অহং সেনানীনাং স্কন্দঃ, সরসাং সাগরঃ অস্মি॥ ২৪

অনুবাদ—হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি জেনো; আমি সেনানায়কগণের মধ্যে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় এবং জলাশয়-সমূহের মধ্যে আমি সাগর॥ ২৪

গীতামৃত—যিনি নিরন্তর পুরের হিত কামনা করেন তিনি হচ্ছেন আদর্শ পুরোহিত। দেবগুরু বৃহস্পতি ছিলেন এরূপ উদারচেতা পুরোধা। পক্ষান্তরে, শুক্রাচার্য্য ছিলেন অসুরগণের হিতৈষী গুরু বা পুরোহিত। শ্রীভগবান্ দৈবী সম্পদের সমর্থক, তাই তিনি বলেন—পুরোহিতগণের মধ্যে আমি দেবগুরু বৃহস্পতি। আদর্শ সেনানী হবেন—সত্ত্বাভিমুখী রজোগুণের প্রতীক্। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের মধ্যেই সেই আদর্শ ও গুণ সর্ব্বাধিক বিদ্যমান। ভগবান্ তাই বললেন—সেনানীগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয়—যিনি ছিলেন ধর্ম্মরাষ্ট্রের স্থাপক ও রক্ষক।

সমস্ত নদনদী ও জলাশয়ের জল সমুদ্রে গিয়ে স্থিতিলাভ করে; তা ছাড়া, বিশেষ কারণ ব্যতীত সমুদ্র কদাপি তার সীমা লঙ্ঘন করে না—ভগবান্ তাই বললেন, জলাধার সমূহের মধ্যে আমি সমুদ্র।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫

অন্বয়—অহং মহর্ষীণাং ভৃগুঃ অস্মি, গিরাম্ একম্ অক্ষরম্ (অস্মি), যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ, স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ অস্মি॥ ২৫

অনুবাদ—মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দসকলের মধ্যে আমি একাক্ষর 'ওঁ'কার ও যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয়॥ ২৫

গীতামৃত—মহর্ষিগণের মধ্যে তপোপ্রভাবে ভৃগুই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান—এজন্য মহর্ষিগণের মধ্যে তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতি ব'লে আখ্যাত। শব্দসকলের মধ্যে একাক্ষর 'ওঁ'কার হচ্ছেন ব্রহ্মবাচক—সুতরাং, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'ওঁ'কার তাই ভগবানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম বিভূতি।

জপযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ কেন?

পুরাকালে যজ্ঞে ছিল পশুবলির ব্যবস্থা। তা ছাড়া, অন্য যাগ যজ্ঞ হচ্ছে আড়ম্বরবহুল ও আয়াসসাধ্য। জপযজ্ঞে এসব হিংসা বা জটিলতার স্থান নাই। সর্ব্ব ধর্ম্মে প্রভুপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম সাধন রূপে এজন্য জপের মহিমা সর্ব্বাধিক। জপ-সাধনার জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না, এতে অর্থব্যয়ের প্রশ্নও ওঠে না। তাই গীতার মাধ্যমে শ্রীভগবান্ জপের মহত্ত্ব ঘোষণা করে বললেন—আমিই জপ।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে নাম ও নামীকে অভিন্ন ব'লে প্রচার করা হয়। তন্ত্র বলেন—"জপাৎ সিদ্ধিঃ।" কেবলমাত্র ইষ্টমন্ত্রের জপ বা নামস্মরণেই ভক্তি ও মুক্তি সহজলভ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একমাত্র নামধর্ম্মের প্রচারের দ্বারাই ব্যক্তি ও জাতির রূপান্তর সাধন করেন। নামের গৌরব-মহিমার প্রচার-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে॥"

স্থবর বা অচল পদার্থ সমূহের মধ্যে হিমালয় যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তা কে অস্বীকার করবে? তবে এখানে জানা আবশ্যক—পর্ব্বতগণের মধ্যে শ্রীভগবান্ সুমেরুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন—হিমালয়কে নয়। এর কারণ, সুমেরু পৃথিবীর উত্তর শীর্ষে সবার উপরে এবং হিমালয়ের শিখর অপেক্ষাও অতি দুর্গম।

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬

অন্বয়—সর্ব্ববৃক্ষাণাম্ অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাং চ নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ॥ ২৬

অনুবাদ—আমি বৃক্ষ সকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে কপিল মুনি॥ ২৬

গীতামৃত—প্রাচীনকাল হতে অশ্বত্থবৃক্ষ ধর্ম্মবৃক্ষরূপে পূজিত। গীতায় অন্যত্র অশ্বত্থকে সংসার-বৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং, কেবল বৃহত্ত্বের দিক দিয়েই নয়, মহত্ত্বের দিক দিয়েও অশ্বত্থ সনাতনী হিন্দুগণের নিকট পরম পূজ্য।

দেবর্ষি হয়েও নারদ ছিলেন পরম ভগবদ্ভক্ত। তাই দেবর্ষিগণের মধ্যে তাঁকে শ্রীভগবান্ নিজের সর্ব্বোত্তম বিভূতি বলে চিহ্নিত করলেন। চিত্ররথ ছিলেন দেব-গায়কগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কপিলমুনি ছিলেন জন্মসিদ্ধ। তাই সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে তাঁর অতুল মহত্ত্ব-গৌরব।

উচ্চৈঃ শ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭

অন্বয়—অশ্বানাং মাম্ অমৃতোদ্ভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসম্ বিদ্ধি ; গজেন্দ্রাণাম্ ঐরাবতং, নরাণাং চ নরাধিপম্॥ ২৭

অনুবাদ—অশ্বগণের মধ্যে আমাকে অমৃতার্থে সমুদ্রমন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা বলে জেনো এবং হস্তিগণের মধ্যে আমাকে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলে জেনো॥ ২৭

গীতামৃত—অমৃত লাভের আশায় দেবতা ও অসুরগণ যখন ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করেন তখন সমুদ্রগর্ভ হতে প্রথমতঃ উত্থিত হতে থাকে বহু মূল্যবান বস্তুসমূহ। উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব ও ঐরাবত নামক হস্তী ঐসব বস্তুর অন্তর্গত। দৈবপ্রাপ্ত ও মহৎ গুণসম্পন্ন ব'লে এরা শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতিরূপে পরিগণিত। ভারতীয় দৃষ্টিতে এককালে রাজার স্থান ছিল অতি উচ্চে। রাজা তখন ছিলেন প্রজারঞ্জক ও অশেষ গুণে গুণী। পরবর্ত্তীকালে রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ায় তৎস্থলে অধুনা প্রবর্ত্তিত হয়েছে গণতন্ত্র। তবে রাজতন্ত্রই হোক আর প্রজাতন্ত্রই হোক রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও আদর্শ যদি উন্নত ও কল্যাণমূলক হয় তাহলে তা ভগবৎ শক্তিরই প্রতীকরূপে পরিগণিত হয়। গীতাকার শ্রীভগবানের

ন্যায় ভগবতী চণ্ডিকাও এজন্য বলেছেন—"অহং রাষ্ট্রী"—আমিই রাষ্ট্রস্বরূপিণী।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮

অন্বয়—আয়ুধানাম্ অহং বজ্রং, ধেনূনাং কামধুক্ অস্মি, প্রজনঃ কন্দর্পঃ অস্মি, সর্পাণাং চ বাসুকিঃ অস্মি॥ ২৮

অনুবাদ—আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু; আমি প্রাণিগণের উৎপত্তির কারণস্বরূপ কন্দর্প এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি॥ ২৮

গীতামৃত—ক্ষেপণাস্ত্র সমূহের মধ্যে বজ্রই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব'লে তা ভগবানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিভূতিরূপে গণ্য, কামধেনু গাভী সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় দুগ্ধদান করে ব'লে তার এত প্রসিদ্ধি ও মর্য্যাদা। কামদেবের প্রেরণা বা প্ররোচনাতেই প্রাণিগণ বংশবৃদ্ধিতে আগ্রহশীল হয়—এই দিক দিয়েই কন্দর্প বা কামদেব প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্যের পরম সহায়ক। বাসুকি সর্পগণের রাজারূপে প্রখ্যাত। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনি ভগবানের অন্যতম বিভূতি।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯

অন্বয়—নাগানাম্ অনন্তঃ অস্মি, যাদসাং চ বরুণঃ, অহং পিতৄণাং চ অর্য্যমা অস্মি, সংযমতাম্ অহং যমঃ॥ ২৯

অনুবাদ—নাগসমূহের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা, নিয়ন্তৃগণের মধ্যে আমি যম॥ ২৯

গীতামৃত—নাগ ও সর্প এখানে দুটি ভিন্ন জাতিরূপে বর্ণিত হয়েছে। সর্পগণের রাজা হচ্ছেন বাসুকি। পক্ষান্তরে, নাগগণের রাজা অনন্ত। জলজন্তুগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হলেন জলদেবতা বরুণ। পিতৃপুরুষগণের অধিপতি হচ্ছেন অর্য্যমা, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামক হচ্ছেন যমরাজ। এজন্য এঁরা ভগবৎ বিভূতি।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০

অন্বয়—অহং দৈত্যানাং প্রহ্লাদঃ অস্মি, কলয়তাং চ কালঃ অহম্ অস্মি, অহং মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রঃ, পক্ষিণাং চ বৈনতেয়ঃ॥ ৩০

অনুবাদ—দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গ্রাসকারীদিগের মধ্যে আমি কাল, পশুগণের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়॥ ৩০

গীতামৃত—দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করলেও প্রহ্লাদ ছিলেন আদর্শ ভক্ত ও প্রজারঞ্জক রাজা। তাই তিনি ভগবানের অন্যতম বিভূতি। কালের ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী আর কে আছেন? সিংহই বলবীর্য্য ও সাহসে পশুজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রথম প্রচেষ্টায় সিংহ যে শিকারকে করায়ত্ত করতে অক্ষম হয় সে সেই শিকারের পশ্চাতে আর ধাবিত হয় না। এতাদৃশ সংযম আত্মমর্য্যাদা গুণের জন্যও সিংহের বিশেষ প্রসিদ্ধি। গরুড়ই হচ্ছে ভগবান্ বিষ্ণুর বাহন।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১

অন্বয়—পবতাং পবনঃ অস্মি, শস্ত্রভৃতাম্ অহং রামঃ, ঝষাণাং মকরঃ অস্মি, স্রোতসাং চ জাহ্নবী অস্মি॥ ৩১

অনুবাদ—বেগবানদের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি রামচন্দ্র, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর এবং নদী সকলের মধ্যে আমি গঙ্গা॥ ৩১

গীতামৃত—এই জগতে বায়ুর ন্যায় গতিশীল আর কিছুই নাই, তাই বায়ু ভগবানের বিভূতি। দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রই ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শস্ত্রবিদ্, মৎস্যজাতীয় জলজন্তুর মধ্যে মকরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত নদ-নদীর মধ্যে গঙ্গার মহত্ত্বই সর্ব্বাধিক। এই সমস্ত গুণের জন্য এরা শ্রেষ্ঠ ভগবৎ বিভূতি রূপে পরিগণিত।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২

অন্বয়—অর্জ্জুন! সর্গণাম্ আদিঃ অন্তঃ মধ্যঞ্চ অহম্ এব ; অহং বিদ্যানাম্ অধ্যাত্ম-বিদ্যা, (অহং) প্রবদতাম্ বাদঃ॥ ৩২

অনুবাদ—আমি সৃষ্ট পদার্থসমূহের আদি, মধ্য ও অন্ত, বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি মোক্ষপ্রদ অধ্যাত্মবিদ্যা, তর্ক মধ্যে আমি বাদ॥ ৩২

গীতামৃত—ন্যায় শাস্ত্রে জল্প, বিতণ্ডা ও বাদ এই তিন প্রকার তর্কের বিষয় বর্ণিত আছে। কোন ব্যক্তি বিজিগীষাপরায়ণ হয়ে স্বীয় মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে তর্ক করে তাকে বলা হয়—জল্প। ইহা আদৌ প্রশংসনীয় নয়। অপর কেহ কেহ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করার জন্য তর্কচ্ছলে তার নিন্দাসূচক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়—এরূপ তর্ককে বলা হয় বিতণ্ডা। ইহাও অত্যন্ত দোষাবহ। পক্ষান্তরে, উভয় পক্ষ যখন ধীর স্থিরভাবে বিচার বিবেচনাপূর্ব্বক তর্কের মাধ্যমে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়—তখন সেই তর্ককে বলা হয় 'বাদ'। সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য এরূপ তর্কের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য্য। তাই 'বাদ' হচ্ছে—অন্যতম ভগবৎ বিভূতি।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অবহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩

অন্বয়—অক্ষরাণাম্ অকারঃ অস্মি, সামাসিকস্য চ দ্বন্দ্বঃ, অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ, অহম্ বিশ্বতোমুখঃ ধাতা॥ ৩৩

অনুবাদ—অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, আমিই অক্ষয় কাল এবং আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা বা বিশ্বের সর্ব্বনিয়ন্তা ধারণকর্ত্তা॥ ৩৩

গীতামৃত—বর্ণমালার প্রথম অক্ষর হচ্ছে 'অ'-কার এবং সর্ব্বব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণে তার প্রয়োজনীয়তা ও মহত্ত্ব-গৌরব সর্ব্বাধিক। দ্বন্দ্বসমাস দুটি বিশেষ্য পদকে সংযুক্ত ক'রে তাদের সমান অর্থগৌরব বর্দ্ধন করে, তাই তার এত প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য। আদ্যন্তহীন কালই ভগবানের অন্যতম স্বরূপ। ভগবানই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ধাতা বা নিয়ন্তা।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪

অন্বয়—অহং সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাম্ উদ্ভবঃ চ, নারীণাং কীর্ত্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতিঃ, মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা চ॥ ৩৪

অনুবাদ—সংহর্ত্তাদের মধ্যে আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু। ভবিষ্যভূতগণেরও আমি স্রষ্টা, নারীগণের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা ও ক্ষমা॥ ৩৪

গীতামৃত—সর্ব্বসংহারক যে মৃত্যু—তাও ভগবানের বিভূতি। ভগবান্ কেবলমাত্র বর্ত্তমান প্রাণিকুলের আদি কারণ নন, তিনি ভবিষ্য জীবকুলেরও স্রষ্টা। নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্ প্রভৃতিতে যে সব সদ্‌গুণ পরিদৃষ্ট হয়—তাও তাঁর বিভূতি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫

অন্বয়—অহং সাম্নাং বৃহৎ সাম, অহং ছন্দসাং গায়ত্রী ; তথা মাসানাং মার্গশীর্ষঃ ; ঋতুনাম্ অহং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫

অনুবাদ—আমি সাম বেদোক্ত মন্ত্র সকলের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দ সমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী, মাস সকলের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ঋতু সকলের মধ্যে আমি বসন্ত ঋতু॥ ৩৫

গীতামৃত—বৃহৎ সাম মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বেশ্বর ইন্দ্র বা ব্রহ্মা স্তুত হন। ইহা মোক্ষ-প্রতিপাদক ব'লে প্রসিদ্ধ। গায়ত্র-ছন্দে রচিত সাবিত্রী-মন্ত্রের নিয়মিত জপের দ্বারা সাধকের বুদ্ধি পরিশুদ্ধ ও ভগবন্মুখী হয়—তাই তার এত সমাদর ও মহত্ত্ব। প্রাচীনকালে অগ্রহায়ণ মাস হতে হত বর্ষারম্ভ, এই মাসে পৃথিবী হয় শস্যপূর্ণ, তাই তার এতটা প্রাধান্য। বিশ্বপ্রকৃতিকে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি সর্ব্বগুণে সুসমৃদ্ধ ও রসময় করে ব'লেই বসন্ত ঋতুকে ঋতুরাজ ব'লে অভিনন্দিত করা হয়।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬

অন্বয়—অহং ছলয়তাং দ্যূতম্ ; তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি, অহং জয়ঃ অস্মি, ব্যবসায়ঃ অস্মি, অহং সত্ত্ববতাং সত্ত্বম্॥ ৩৬

অনুবাদ—আমি ছলনাকারীদিগের দ্যুতক্রীড়া, আমি তেজস্বিগণের তেজঃ, বিজয়িগণের জয়। উদ্যোগিগণের উদ্যম এবং সাত্ত্বিক পুরুষগণের সত্ত্বগুণ॥ ৩৬

গীতামৃত—হিন্দুশাস্ত্র মতে ভাল-মন্দ বা সৎ-অসৎরূপী সমস্ত প্রবৃত্তি সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ হতে উদ্ভূত। সুতরাং, কপটী ও বঞ্চকদের যে ছল-চাতুরি তাও তা হতেই উৎপন্ন। বস্তুতঃ, ভাল-মন্দ—এই দ্বন্দ্ব নিয়েই বিশ্বনাট্যের নিত্যকার অভিনয়। আর ইহাই ভাগবত বিধান।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭

অন্বয়—অহং বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ অস্মি, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ, অহং মুনীনাম্ অপি ব্যাসঃ, কবীনাম্ উশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭

অনুবাদ—আমি বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুন, মুনিগণের মধ্যে ব্যাস ও কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য॥ ৩৭

গীতামৃত—এখানে গীতাকার শ্রীভগবান্ স্বয়ং নিজেকে এবং স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে যথাক্রমে বৃষ্ণিবংশের এবং পাণ্ডবকুলের শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন। ব্যাসদেব হচ্ছেন গীতার রচয়িতা এবং সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ। তাই তিনি মুনিগণের মধ্যে অতুলনীয়। 'কবি' বলতে এখানে বোঝান হয়েছে সত্যদ্রষ্টা। এই দিক দিয়ে বিশেষ প্রখ্যাতি ছিল শুক্রাচার্য্যের।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮

অন্বয়—অহং দময়তাং দণ্ডঃ অস্মি, জিগীষতাং নীতিঃ অস্মি, গুহ্যানাং চ মৌনং এব জ্ঞানবতাং চ জ্ঞানম্ অস্মি॥ ৩৮

অনুবাদ—আমি শাসকবর্গের দ্বারা ব্যবহৃত দণ্ডঃ জয়কামী ব্যক্তিদের নীতি, গুহ্যবিষয়ের মৌন এবং জ্ঞানীদের জ্ঞান॥ ৩৮

গীতামৃত—দণ্ডনীতি ব্যতীত রাষ্ট্র ও সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভবপর হয় না। ভগবান্ তাই দণ্ডদানের পক্ষপাতী ; এজন্য তিনি বলছেন—দমনকারীর যে উদ্যত দণ্ড তাতে আমারই প্রকাশ বিদ্যমান। শুধু দণ্ড নয়, দিগ্বিজয়ী

শাসকের পক্ষে প্রয়োজন—সাম, দান, দণ্ড ও ভেদনীতির যথাযথ প্রয়োগ। এইরূপ যে চতুর্বিধ রাষ্ট্রনীতি তার মধ্যেও ভাগবত বিধান বিদ্যমান থাকাই স্বাভাবিক।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাম্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯

অন্বয়—অর্জ্জুন, যৎ চ অপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তৎ অহম্ এব ; ময়া বিনা যৎ স্যাৎ তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি॥ ৩৯

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, সর্ব্বভূতের যা বীজ স্বরূপ তাই আমি। আমা ব্যতীত উদ্ভূত হতে পারে, চরাচর এমন কিছুই নাই॥ ৩৯

গীতামৃত—বস্তুতঃ নিয়ন্তার বিধান ব্যতীত জগতে কোন কিছু সৃষ্ট হয় নি ও হতে পারে না।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০

অন্বয়—পরন্তপ, মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্ অন্তঃ ন অস্তি, এষঃ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ॥ ৪০

অনুবাদ—হে পরন্তপ, আমার দিব্যবিভূতিসমূহের অন্ত নাই ; আমি সংক্ষেপে তা বর্ণনা করলাম॥ ৪০

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১

অন্বয়—বিভূতিমৎ, শ্রীমৎ, ঊর্জ্জিতম্ এব বা যৎ যৎ তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবম্ অবগচ্ছ॥ ৪১

অনুবাদ—যা যা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন অথবা অসামান্য গুণযুক্ত তৎ সমুদয়কে আমার শক্তির অংশসম্ভূত ব'লে জানবে॥ ৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২

অন্বয়—অথবা, অর্জ্জুন, এতেন বহুনা জ্ঞাতেন কিম্, অহম্ ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য স্থিতঃ॥ ৪২

অনুবাদ—অথবা হে অর্জ্জুন, তোমার এত সব বিভূতির বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক জানবার প্রয়োজন কি? এই মাত্র জেনে রাখ—আমিই আমার এক পাদ দ্বারা সমগ্র জগৎ ধারণ করে অবস্থিত আছি॥ ৪২

গীতামৃত—এই বিরাট বিশ্ব ভগবানের অনন্তশক্তির মাত্র একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ দ্বারা বিধৃত। এতেই বোঝা যায়, তিনি কত মহান্ ও শক্তিশালী। এই প্রসঙ্গে ইহাও জানা আবশ্যক যে গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবন্মুখে যে সমস্ত বিভূতির বর্ণনা প্রদত্ত হল, তাদের মধ্যে তাঁর শক্তি ও স্বরূপ আদৌ সীমিত নয়। যে সৌর জগৎ নিয়ে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনা—এরূপ অসংখ্য সৌর জগৎকে কেন্দ্র করে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আমাদের দৃষ্টির অগোচরে বিদ্যমান। সেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে শ্রীভগবান্ মাত্র তাঁর এক পাদ দ্বারা পরিব্যপ্ত করে বিরাজমান, তাই তিনি বলছেন—আমার ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি অন্তহীন, বস্তুতঃ তা বর্ণনার অতীত, তা কেবলমাত্র অনুভবগম্য।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণাবতারে নয়, অন্য সকল অবতারেই নরদেহধারী শ্রীভগবান্ মোহান্ধ জীবের অনুভব-শক্তির অপ্রতুলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজেই নিজের ভাগবত ব্যক্তিত্ব ও মহিমার অল্প বিস্তর ইঙ্গিত বা সূচনা দিয়েছেন। রামাবতারে শ্রীভগবান্ বনবাস-কালে ঋষিবৃন্দের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন—আমি ধর্ম্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ। আপনাদের তপোবিঘ্নকারী ঐ রাক্ষসকুলকে নির্মূল করে আমি আপনাদের জীবন নিরাপদ করব। বুদ্ধাবতারে শ্রীভগবান্ নিজেকে 'তথাগত' বলে প্রচার করলেন। শিবাবতার জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য রূপে তিনি বললেন—আমাকে এ যুগের আচার্য্যরূপে জান। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মুখ্যতঃ ভক্তভাবে লীলা করলেও কখনও কখনও ভাবাবেশে বিষ্ণুখট্টায় আসীন হয়ে বলতেন—আমাকে পূজা কর, আমি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু। যীশুখৃষ্ট রূপে তিনি ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হয়ে ঘোষণা করলেন—"I and my Father are one"। ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ রূপে তিনি নিজেকে খোদার দোস্ত ব'লে প্রচার করেন।

ইদানীং কালে ভগবদবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস স্বীয় শিষ্য ও পার্ষদগণের পুরোভাগে কখনও কখনও ভাবাবিষ্ট হয়ে বলতেন—"যে রাম, যে কৃষ্ণ,—সেই এবার রামকৃষ্ণ।" তাঁর গুণগ্রামে মুগ্ধ হয়ে কেহ তাঁকে 'অবতার' বলে প্রচার করলে তিনি তাতে আপত্তি না জানিয়ে বরং প্রসন্নই হতেন। আচার্য্য প্রণবানন্দও তদীয় পার্ষদবৃন্দের নিকট প্রসঙ্গ ক্রমে বলতেন—"আজ যদি বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের মত কেহ থাকতেন তবে তিনি বুঝতে পারতেন—আমি কে? এবং আমি কি করতে প্রস্তুত।" স্বীয় সঙ্ঘের মহত্ত্বের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলতেন—**"সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং তোমাদের এই সঙ্ঘের দায়িত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন"**। সঙ্ঘের প্রচার-জীবনের প্রারম্ভিক স্তরে আচার্য্যপ্রবরের বিশিষ্ট ত্যাগী সন্তানগণ যখন লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁর ভাগবত ব্যক্তিত্বের সূচনা দিয়ে প্রচার-ব্রত আরম্ভ করেন—তখন তিনি অতীব প্রসন্ন হয়ে বলেন—**"সঙ্ঘের আজ মহা শুভদিন উপস্থিত"**।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহ সাক্ষ্য দান করে—ভগবদবতারগণ যে ভাগবত চরিত্র ও লোকপাবনী বাণী ও কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে জগতে অবতীর্ণ হন—তাঁরা হন তাঁর প্রচার প্রসারের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল এবং যাঁরা তাঁদের সেই প্রচারব্রতের বিশেষ সহায়ক—তাঁরাই হন তাঁদের সর্ব্বাধিক প্রিয়।

বিভূতিযোগের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে সর্ব্বসংশয়মুক্ত করে তাঁর উদ্দিষ্ট ধর্ম্মরাষ্ট্র-স্থাপনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্ররূপে প্রস্তুত করছেন। ভগবন্মুখে এই আত্মমহিমার সুস্পষ্ট বর্ণনা তাই কেবলমাত্র অর্জ্জুনের নয়, যুগ যুগ ধরে লক্ষকোটি নর-নারীর হৃদয়-মনে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের প্রতি অপার ও অপ্রাকৃত অনুরাগ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে ও করবে। বিভূতিযোগের মহত্ত্বগৌরব তাই অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ—বিশ্বরূপ-দর্শনযোগঃ

বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শনের বিষয় সবিশেষ বর্ণিত হয়েছে, এজন্য এই অধ্যায়কে অভিহিত করা হয়েছে—'বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ' নামে। ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে গীতার এই অধ্যায়টি সত্য সত্যই অতি অপূর্ব ও অতুলনীয়।

বিশ্বরূপ-দর্শনকালে বিস্মিত ও ভীতিবিহ্বল চিত্তে অর্জ্জুন গদগদচিত্তে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে যে স্তুতি করেন—তাও কতই না দিব্য, মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী।

দশম অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে যখন শ্রীভগবান্ বললেন—আমার বিভূতির অন্ত নাই। সংক্ষেপে এইটুকু জেনে রাখ—আমি আমার চতুষ্পাদের একপাদ মাত্র দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করে আছি, তখন অর্জ্জুনের প্রাণে তাঁর সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়ায় তিনি বললেন—

অর্জ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ—মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং তেন মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ॥ ১

অনুবাদ—অর্জ্জুন বলিলেন—তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ যে গোপনীয় অধ্যাত্ম তত্ত্ব বর্ণনা করলে তাতে আমার এই মোহ দূরীভূত হয়েছে॥ ১

ভগবন্মুখে অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণে অর্জ্জুনের মোহনাশ

ইতঃপূর্ব্বে সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ নিজের অক্ষর ও অব্যক্ত

রূপ এবং নবম ও দশম অধ্যায়ে তাঁর বহুবিধ ব্যক্ত রূপের বর্ণনা করেছেন। সেই সব গুহ্যাতিগুহ্য অধ্যাত্ম-তত্ত্ব শ্রবণ করে অর্জ্জুন আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করলেন এবং কৃতজ্ঞচিত্তে বললেন—হে সখে, আমার প্রতি তোমার কতই না অনুগ্রহ! তোমার কৃপা ব্যতীত আমার পক্ষে এরূপ গহন বিষয়ের জ্ঞান লাভ সম্ভবপর হত কী রূপে? আমি এখন সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পেরেছি—তুমি বিশ্ব-সংসারের একমাত্র নিয়ন্তা ; তুমি ব্যতীত এ সংসারের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা আর কেহ নাই। এতকাল ভ্রান্তিবশতঃই আমি নিজেকে হর্ত্তা-কর্ত্তা জ্ঞান ক'রে মিথ্যা অভিমান পোষণ করেছি। তোমার কৃপায় আমার সেই অজ্ঞান ও মোহ আজ অপসৃত হয়েছে।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২

অন্বয়—কমলপত্রাক্ষ, ত্বত্তঃ ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ ; অব্যয়ং মাহাত্ম্যম্ অপি চ॥ ২

অনুবাদ—হে পদ্মপলাশলোচন, ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় তোমা হতেই হয় ; তা ছাড়া, তোমার আরও অনেক অক্ষয় মাহাত্ম্য আমি তোমার নিকট সবিস্তারে শুনলাম॥ ২

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥ ৩

অন্বয়—পরমেশ্বর, যথা ত্বম্ আত্মানম্ আত্থ, এতৎ এবম্, পুরুষোত্তম, তব ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি॥ ৩

অনুবাদ—হে পরমেশ্বর! তোমার বিষয়ে যা তুমি বলেছ তা ঐরূপই! হে পুরুষোত্তম! (আমি) তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখতে ইচ্ছা করি॥ ৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥ ৪

অন্বয়—প্রভো! তৎ যদি ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্যসে ততঃ যোগেশ্বর, ত্বং মে অব্যয়ম্ আত্মানং দর্শয়॥ ৪

অনুবাদ—হে প্রভো! সেই রূপ যদি আমা কর্ত্তৃক দেখার যোগ্য মনে কর, তা হলে, হে যোগেশ্বর! তুমি আমাকে তোমার সেই অব্যয় আত্মরূপ দেখাও॥ ৪

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের আগ্রহ

শ্রীভগবানের শক্তি, গুণ ও মহিমা অপার এবং তাঁর সেই অব্যক্ত ও ব্যক্ত—উভয় প্রকার রূপের মাহাত্ম্য বিষয়ে অর্জ্জুনের মনে এখন আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তিনি এখন ভালভাবে উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর রথের সারথিরূপে যে মানুষটি উপবিষ্ট তিনি সামান্য ব্যক্তি নন। তিনি হচ্ছেন নরদেহে নারায়ণ; জীবোদ্ধারের জন্য বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁর আবির্ভাব। কিন্তু এই জ্ঞানেও অর্জ্জুনের তৃপ্তি নাই। তিনি বলছেন—তোমার এই ঐশ্বরিক রূপ ও বিভূতিবিষয়ে তুমি এতক্ষণ যা বললে, তা সবই সত্য বলে আমি বিশ্বাস করি; তবে উহা আমি স্বচক্ষে একবার দর্শন করার জন্য একান্ত উদ্‌গ্রীব। তুমি যদি আমাকে যোগ্য অধিকারী ব'লে মনে কর, তবে তুমি তোমার সেই অব্যয় ঐশ্বরিক রূপ আমাকে দেখাও।

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—পার্থ, মে দিব্যানি নানাবিধানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য॥ ৫

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—হে পার্থ, তুমি আমার নানা বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট এবং সহস্র সহস্র বিভিন্ন দিব্য মূর্ত্তি দর্শন কর॥ ৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥ ৬

অন্বয়—ভারত, আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ, তথা মরুতঃ পশ্য, বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য॥ ৬

অনুবাদ—হে ভারত, আমার দেহে আদিত্য সকল, বসুগণ, রুদ্রগণ,

অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং বায়ুসকলকে দর্শন কর। পূর্ব্বে যাহা কখন দেখ নাই এমন বহু প্রকারের আশ্চর্য্য বস্তু আমাতে দর্শন কর॥ ৬

গীতামৃত—শ্রীভগবান্ বলছেন, "আমার যে ঐশ্বরিক স্বরূপ—তার মধ্যে সমাবিষ্ট রয়েছে নানা বর্ণের ও নানা আকৃতির অগণিত জীবজন্তু—যা একান্তই অদ্ভুত ও বিচিত্র। তা ছাড়া, তাঁর মধ্যে বিদ্যমান দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু। হে অর্জ্জুন, এ সমস্ত তুমি মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য কর এবং অর সঙ্গে আরও অনেক বিস্ময়কর বস্তু দর্শন কর—যা এ পর্য্যন্ত তোমার দেখবার সুযোগ হয় নি।"

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭

অন্বয়—গুড়াকেশ, ইহ মম দেহে একস্থং কৃৎস্নং সচরাচরং জগৎ, অন্যৎ যৎ চ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি অদ্য পশ্য॥ ৭

অনুবাদ—অর্জ্জুন! এই দেখ আমার এই বিরাট শরীরে একত্রে অবস্থিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ এবং অন্য যা কিছু তুমি দেখতে চাও তাও দর্শন কর॥ ৭

গীতামৃত—শ্রীভগবান্ বলছেন, হে সখে অর্জ্জুন, আমার এই সর্ব্বব্যাপী বিরাট দেহে চরাচর বিশ্বের সব কিছুই বিদ্যমান। তোমার যা কিছু দেখতে ইচ্ছা হয় তা প্রাণভরে দর্শন কর। অতীতে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, বর্ত্তমানে যা কিছু ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে—তা যদি তোমার দেখবার ইচ্ছা হয় তবে তাও তুমি আমার এই দেহে দেখ।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮

অন্বয়—অনেন স্বচক্ষুষা এব তু মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে; তে দিব্যং চক্ষু দদামি, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য॥ ৮

অনুবাদ—তুমি তোমার স্থূল চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা আমার বিশ্বরূপ দর্শন করতে সক্ষম হবে না। এজন্য তোমাকে দিব্যচক্ষুঃ দান করছি। তার দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বরিক যোগৈশ্বর্য দর্শন কর॥ ৮

বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য প্রয়োজন—দিব্যদৃষ্টি

অর্জ্জুন তাঁর প্রাকৃত স্থূল চক্ষুর দ্বারা এতকাল নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে এসেছেন। কিন্তু আজ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবৎ স্বরূপে আরূঢ় হয়ে, অলৌকিক যোগশক্তি বলে যে বিশাল ও বিচিত্র বিশ্বরূপ ধারণ করতে উদ্যত, তা দর্শন করতে হলে প্রয়োজন—বিশেষ যোগ্যতা ও অধিকার। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেই বলেছেন—আমার এই ঐশ্বরিক রূপ অদ্যাবধি কেহ এমন কি দেবতারাও দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেন নি। তোমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য আমি আজ সেই রূপ তোমাকে দেখাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। তবে তুমি তোমার চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা তা দেখতে পারবে না, এজন্য আমি তোমাকে জ্ঞানচক্ষুঃ দান করছি।

ভগবানের এই দিব্য চক্ষুঃ দানের ব্যাপারটি রহস্যজনক ব'লে মনে হয়। তবে ইহা একান্ত সত্য যে অধ্যাত্ম জগতে অসামান্য যোগশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ স্বীয় সঙ্কল্প-শক্তিবলে তদীয় শিষ্যের হৃদয়-মনে তাঁর যোগলব্ধ শক্তি সঞ্চার করতে পারেন ; সুতরাং, এর মধ্যে বিস্ময়কর কিছুই নাই। গীতার প্রথম অধ্যায়েও আমরা লক্ষ্য করেছি, মহাযোগী ব্যাসদেব ঠিক এই ভাবে উন্মোচিত করেছিলেন সঞ্জয়ের জ্ঞানদৃষ্টি এবং তার ফলে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে উপবিষ্ট থেকেই দূরবর্ত্তী কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সংঘটিত সমস্ত ঘটনাবলী দর্শনের যোগ্যতা লাভ ক'রে জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তা বিধৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ—রাজন্, মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস॥ ৯

অনুবাদ—সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্! মহান্ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই কথা ব'লে পার্থকে নিজের পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখালেন॥ ৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০

অন্বয়—অনেকবক্ত্রনয়নম্ অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ অনেকদিব্যাভরণং, দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০

অনুবাদ—(সেই রূপ) অনেক মুখ ও অনেক নয়নযুক্ত, অনেক অদ্ভুত আকৃতি ও অনেক দিব্যালঙ্কারশোভিত এবং উদ্যত দিব্য আয়ুধসমূহে সুসজ্জিত॥ ১০

গীতামৃত—ভগবান্ এক হলেও এখানে বহুরূপে প্রতিভাত ; তাই তাঁর সেই বিশাল ও বিচিত্র দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্ত নাই। তা ছাড়া, তাঁর সেই বিশাল ও অদ্ভুত দেহাবয়ব এক্ষণে নানাবিধ দিব্য অলঙ্কার ও বিবিধ ক্ষেপণযোগ্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত।

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১

অন্বয়—দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং, দেবম্, অনন্তং, বিশ্বতোমুখম্॥ ১১

অনুবাদ—(সেই দেহ) দিব্য মাল্য ও দিব্য বসনে ভূষিত, দিব্য গন্ধ-দ্রব্যে অনুলিপ্ত, অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক, জ্যোতির্ম্ময়, অনন্ত ও অগণিত মুখবিশিষ্ট॥ ১১

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২

অন্বয়—দিবি যদি সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ সা তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ॥ ১২

অনুবাদ—আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যদি যুগপৎ সমুদিত হয় তবে তা সেই মহাত্মার প্রভার তুল্য হতে পারে॥ ১২

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩

অন্বয়—তদা পাণ্ডবঃ তত্র দেবদেবস্য শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং কৃৎস্নং জগৎ একস্থম্ অপশ্যৎ॥ ১৩

অনুবাদ—তখন অর্জ্জুন সেই দেবদেবের শরীরে নানা ভাগে বিভক্ত সমগ্র জগৎ একত্র অবস্থিত দেখলেন॥ ১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

অন্বয়—ততঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা সঃ ধনঞ্জয়ঃ দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত॥ ১৪

অনুবাদ—বিস্ময়াবিষ্ট রোমাঞ্চিতদেহ সেই ধনঞ্জয় বিশ্বদেবকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন॥ ১৪

গীতামৃত—শ্রীভগবানের বিশ্বরূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে যা বললেন—তা কতই না অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর! শ্রীভগবানের সেই বিশ্বরূপের মধ্যে একাধারে কত অগণিত ও বিচিত্র বস্তুর সমাবেশ! এরূপ অলৌকিক দর্শনে অর্জ্জুন যে বিহ্বল ও বিস্ময়াবিষ্ট হবেন—তাতে আশ্চর্য্য কি? এ অবস্থায় তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সেই অদ্ভুতদর্শন দেবদেবকে প্রণাম ক'রে বললেন—

অর্জ্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ—দেব, তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ দিব্যান্ ঋষীন্ সর্ব্বান্ উরগান্ চ ঈশং কমলাসনস্থং ব্রহ্মাণং পশ্যামি॥ ১৫

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন, হে দেব! তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চরাচর জগৎ, সমস্ত ঋষি, সমস্ত নাগ ও কমলাসনস্থ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে দেখতে পাচ্ছি॥ ১৫

অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬

অন্বয়—বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ,—অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং, অনন্তরূপং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি, পুনঃ তব ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি॥ ১৬

অনুবাদ—হে বিশ্বেশ্বর, বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র বিশিষ্ট তোমার অনন্তরূপ সর্ব্বত্র লক্ষ্য করছি ; কিন্তু হে বিশ্বরূপ, তোমার আদি, অন্ত, মধ্য কোথাও দেখতে পাচ্ছি না॥ ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭

অন্বয়—কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ অপ্রমেয়ং চ ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি॥ ১৭

অনুবাদ—কিরীট, গদা ও চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জস্বরূপ, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তোমার অপরিমেয় রূপ আমি সর্ব্বত্র দেখছি॥ ১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮

অন্বয়—ত্বম্ অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং, ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা ; ত্বং সনাতনঃ পুরুষঃ, মে মতঃ॥ ১৮

অনুবাদ—তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম ও একমাত্র জ্ঞাতব্য, তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয় ও সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক, তুমি অব্যয় সনাতন পুরুষ, ইহাই আমার অভিমত॥ ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।। ১৯

অন্বয়—অনাদিমধ্যান্তম্ অনন্তবীর্যম্ অনন্ত-বাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং ত্বাং পশ্যামি।। ১৯

অনুবাদ—আমি দেখছি—তুমি অনাদি, অমধ্য, অনন্ত, তুমি অশেষ বীর্য্যসম্পন্ন, অসংখ্য তোমার বাহু, চন্দ্র-সূর্য্য তোমার নেত্রস্বরূপ; তোমার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতিঃ, তুমি স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করছ।। ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়েকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।। ২০

অন্বয়—মহাত্মন্ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ একেন ত্বয়া হি ব্যাপ্তং; সর্ব্বাঃ দিশঃ চ; তব অদ্ভুতম্ ইদম্ উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্।। ২০

অনুবাদ—হে মহাত্মন্, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী এই অন্তরীক্ষ এবং দশদিক ব্যাপিয়া একমাত্র তুমিই বিদ্যমান। তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্ররূপ দর্শন করে ত্রিলোক ভীত ও ব্যথিত হচ্ছে।। ২০

ভগবানের উগ্র রূপ দর্শনে অর্জ্জুন সন্ত্রস্ত

ভগবানের ব্যক্ত রূপের মধ্যে মধুর ও উগ্র—এই দুইটি রূপই বিদ্যমান। এখানে উগ্রভাবের আধিক্য হওয়ায় অর্জ্জুন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন এবং ভাবছেন—তাঁর ন্যায় ত্রিলোকের সকলেই হয়তো এই রূপ দর্শনে ভীতিবিহ্বল, শঙ্কিত ও ব্যথিত হয়ে পড়েছেন। বস্তুতঃ, অর্জ্জুনের মন এখনও রুদ্রভাবের মহত্ত্বগৌরব অবধারণে অক্ষম। তাই তাঁর এরূপ ভয়ার্ত্ত মানসিক অবস্থা।

এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—যিনি সত্যকার একনিষ্ঠ ভক্ত তিনি তাঁর প্রিয়তম প্রভুকে যে ভাবে যেরূপে দেখুন না কেন তার মধ্যেই তিনি তাঁর মাধুর্য্যের ও বরাভয় হস্তের স্পর্শ লাভ ক'রে নিজেকে ধন্য মনে করেন। সিংহীর শাবক যখন তার মাতাকে উগ্রমূর্ত্তিতে শিকারের উপর লম্ফোদ্যত দেখে, তখন সে কি তার মাতার সেই রূপ দেখে ভীত ত্রস্ত হয়? নিশ্চয়ই না; বরং সে তখন এই ভেবে উৎফুল্ল হয় যে, তার মাতার এই উগ্ররূপ তার আহার্য্য সংগ্রহের জন্য। মহাকাল ও মহাকালীর আদর্শ পূজারীও তদ্রূপ তার উপাস্য দেবতার ভয়ঙ্কর সংহারমূর্ত্তি দর্শন ক'রে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত ও বিচলিত না হয়ে বরং আনন্দিত হয়। মহাকালীর সত্যকার বীর ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের সেই ভীষণ বিকরাল রূপের মধ্যে অপরূপের সন্ধান পেয়ে মনের আনন্দে উল্লসিত কণ্ঠে গেয়েছিলেন—

"সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী।"

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।। ২১

অন্বয়—অমী সুরসঙ্ঘাঃ ত্বাং হি বিশন্তি; কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণন্তি; মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি।। ২১

অনুবাদ—ঐ দেবতাগণ তোমাতেই প্রবেশ করছেন। কেহ কেহ ভীত হয়ে করজোড়ে 'রক্ষ রক্ষ' বলে তোমার স্তব করছেন এবং মহর্ষি ও সিদ্ধগণ 'স্বস্তি স্বস্তি' বলে উত্তম স্তুতিবাক্যে তোমার স্তুতি করছেন।। ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে।। ২২

অন্বয়—রুদ্রাদিত্যাঃ বসবঃ, যে চ সাধ্যাঃ, বিশ্বে, অশ্বিনৌ মরুতঃ চ উষ্মপাঃ, গন্ধর্ব্ব-যক্ষাসুর সিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ ত্বাং বীক্ষন্তে॥ ২২

অনুবাদ—যত রুদ্র, আদিত্য, বসু এবং সাধ্য, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর এবং সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হয়ে তোমাকে দর্শন করছে॥ ২২

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩

অন্বয়—মহাবাহো, তে বহুবক্ত্রনেত্রং, বহুবাহূরুপাদং, বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং, মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ ; তথা অহম্॥ ২৩

অনুবাদ—হে মহাবাহো! বহু বহু মুখ, নেত্র, বাহু, উরু, পদ ও উদরবিশিষ্ট এবং অসংখ্য বৃহৎ দন্তযুক্ত, ভীষণদর্শন তোমার এই বিরাট মূর্ত্তি দেখে সমস্ত প্রাণী অতীব ভীত হয়েছে এবং আমিও অতিশয় ভীত হয়েছি॥ ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪

অন্বয়—বিষ্ণো, নভঃস্পৃশং দীপ্তম্ অনেকবর্ণং ব্যাত্তানং দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং শমং চ ন বিন্দামি॥ ২৪

অনুবাদ—হে বিষ্ণো! তোমার আকাশব্যাপী তেজোময়, নানাবর্ণযুক্ত ও বিস্ফারিত মুখমণ্ডল ও অত্যুজ্জ্বল বিশাল নেত্র দেখে আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত, আমি ধৈর্য্য ও শান্তি পাচ্ছি না॥ ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫

অন্বয়—দংষ্ট্রাকরালানি কালানলসন্নিভানি তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব দিশঃ ন জানে, শর্ম্ম চ ন লভে, দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসীদ॥ ২৫

অনুবাদ—হে দেবেশ, দীর্ঘ দন্তযুক্ত প্রলয়াগ্নিতুল্য তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করে আমার দিক্‌ভ্রান্তি ঘটছে, আমি শান্তি পাচ্ছি না, হে জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হও॥ ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭

অন্বয়—অবনীপালসঙ্ঘৈঃ সহ অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ অসৌ সূতপুত্রঃ চ, অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বরমাণাঃ তে দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি বিশন্তি ; কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ দশনান্তরেষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে॥ ২৬।২৭

অনুবাদ—রাজন্যবর্গসহ ঐ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃগণ তোমার ঐ দংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখগহ্বরে দ্রুতবেগে প্রবেশ করছে। তাদের কারও কারও মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে এবং তা তোমার দন্তসন্ধিস্থলে সংলগ্ন অবস্থায় দেখা যাচ্ছে॥ ২৬।২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি।। ২৮

অন্বয়—যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ সমুদ্রম্ অভিমুখাঃ এব দ্রবন্তি, তথা অমী নরলোকবীরাঃ অভিবিজ্বলন্তি তব বক্ত্রাণি বিশন্তি।। ২৮

অনুবাদ—যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখী হয়ে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে, সেইরূপ এই নরলোকের বীরবৃন্দ সর্ব্বতোব্যাপ্ত তোমার জ্বলন্ত মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে।। ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।। ২৯

অন্বয়—যথা পতঙ্গাঃ সমৃদ্ধবেগাঃ নাশায় প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি, তথা লোকাঃ অপি সমৃদ্ধবেগাঃ নাশায় এব তব বক্ত্রাণি বিশন্তি।। ২৯

অনুবাদ—যেমন পতঙ্গগণ অতি দ্রুতগতিতে ধাবমান হয়ে মৃত্যুর জন্যই জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোকসকল মরণের নিমিত্ত অতিবেগে তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে।। ২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।। ৩০

অন্বয়—জলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লেলিহ্যসে, বিষ্ণো সমগ্রং জগৎ তেজোভিঃ আপূর্য্য তব উগ্রাঃ ভাসঃ প্রতপন্তি।। ৩০

অনুবাদ—হে ভগবন্, তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখসমূহের দ্বারা চতুর্দ্দিকে লোকসমূহকে গ্রাস করে বারংবার লেহন করছো, তোমার তীব্র তেজঃ সমগ্র জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে সন্তপ্ত করছে।। ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।। ৩১

অন্বয়—উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ, মে আখ্যাহি ; তে নমঃ অস্তু, দেববর, প্রসীদ ; আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ; তব প্রবৃত্তিং হি ন প্রজানামি।। ৩১

অনুবাদ—উগ্রমূর্ত্তি তুমি কে? আমাকে বলো! তোমাকে প্রণাম করি! হে দেববর প্রসন্ন হও। আদিপুরুষ তোমাকে জানতে ইচ্ছা করি ; তোমার কার্য্য বুঝি না।। ৩১

বিশ্বরূপ দর্শনের প্রতিক্রিয়া

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন নি—তাঁর সেই রূপ কীরূপ ভীষণ, ভয়ঙ্কর ও সর্ব্বগ্রাসী। এক্ষণে প্রত্যক্ষ তা দর্শন ক'রে তিনি ভীত ও বিচলিত হয়ে বলছেন—হে প্রভো, তুমি এরূপ ভয়ঙ্কর সংহারমূর্ত্তি ধারণ করলে কেন? শুধু আমি নই—ত্রিলোকের কেহই তোমার এই প্রলয়ঙ্কর রূপ সহ্য করতে পারছে না। এই দেখ—তারা সকলে ভীত, বিহ্বল ও সন্ত্রস্ত হয়ে 'ত্রাহি ত্রাহি' করে তোমার তেজে সন্তপ্ত হচ্ছে।

এখানে জানা আবশ্যক—দিব্যদৃষ্টি পেয়ে অর্জ্জুনই শুধু একাকী এই বিশ্বরূপ দর্শন করছেন। অন্য কেহ নয়। তবে তাঁর এতাদৃশ ভীষণ মানসিক প্রতিক্রিয়ার জন্যই কি তিনি ভাবছেন—তাঁর মত সকলেরই এই অবস্থা—সকলেই তাঁর ন্যায় ভীত ও বিহ্বল হয়ে 'ত্রাহি ত্রাহি' করছে? না, যা ভবিতব্য শ্রীভগবান্ তাঁর অচিন্ত্য শক্তিবলে তা-ই অর্জ্জুনকে দেখাচ্ছেন।

বস্তুতঃ ভগবানের ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপের যে সমন্বিত স্বরূপ—তা অচিন্ত্য ও অকল্পনীয়। সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানবীয় দৃষ্টিতে তা ধারণার অতীত। শ্রীকৃষ্ণের সখা হলেও অর্জ্জুনের ধারণাশক্তি অদ্যাপি মানবীয় স্তরেই নিবদ্ধ। তাই তাঁর মনে বিচিত্র বিশ্বরূপ দর্শনের এরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।। ৩২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ অস্মি, লোকান্ সমাহর্ত্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ, ত্বাম্ ঋতেঽপি প্রত্যনীকেষু যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ, সর্ব্বে অপি ন ভবিষ্যন্তি।। ৩২

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল ; এক্ষণে এই লোক সকলকে সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যদি যুদ্ধ নাও কর, তথাপি বিপক্ষ দলে যে সমস্ত যোদ্ধা অবস্থান করছে তারা কেহই জীবিত থাকবে না।। ৩২

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।। ৩৩

অন্বয়—তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ, যশঃ লভস্ব, শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব, ময়া এতে পূর্ব্বম্ এব নিহতাঃ ; সব্যসাচিন্, নিমিত্তমাত্রং ভব।। ৩৩

অনুবাদ—অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও, শত্রু জয় করে যশ লাভ কর ও নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে অর্জ্জুন, আমার দ্বারা এরা পূর্ব্বেই নিহত হয়েছে। তুমি এক্ষণে নিমিত্তমাত্র হও।। ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠাঃ
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।। ৩৪

অন্বয়—ময়া হতান্ দ্রোণং চ, ভীষ্মং চ, জয়দ্রথং চ, কর্ণং চ, তথা অন্যান্

যোধবীরান্ অপি ত্বং জহি, মা ব্যথিষ্ঠাঃ, রণে সপত্নান্ জেতাসি, যুধ্যস্ব।। ৩৪

অনুবাদ—দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য যোদ্ধৃগণকে আমি পূর্ব্বেই নিহত করে রেখেছি। সেই নিহতগণকে তুমি হত্যা কর। ভীত হয়ো না। তুমি যুদ্ধে শত্রুগণকে নিশ্চয় জয় করবে। অতএব, যুদ্ধ কর।। ৩৪

নিমিত্তমাত্র হয়ে যুদ্ধ বা কর্ত্তব্য করার নির্দ্দেশ

অর্জ্জুনের মনে কৌরবপক্ষীয় যে সমস্ত ধুরন্ধর বীর যোদ্ধৃগণের হত্যার বিষয়ে কিছুটা আশঙ্কা ছিল, শ্রীভগবান্ একে একে তাঁদের নাম উচ্চারণ করে বললেন, হে সখে, চিন্তিত হয়ো না—দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণাদি ঐ সব বীরগণকে আমি পূর্ব্বেই হত্যা করে রেখেছি। তুমি আমা দ্বারা নিহত সেই ব্যক্তিগণকে হত্যা কর। অর্থাৎ, নিয়তিবশে তাঁদের মৃত্যু পূর্ব্বনির্দ্ধারিত। সুতরাং, তোমার চিন্তা, দুঃখ বা ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি শুধু দেখতে চাই, ভবিষ্যৎ ধর্ম্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বিঘ্নস্বরূপ এঁদের সকলকে অপসারিত করে তুমি নিষ্কণ্টক রাজ্যের অধিকারী হয়ে যশোলাভ কর।

বস্তুতঃ, কেবলমাত্র বাহ্যযুদ্ধের ব্যাপারে নয়, অন্তরের জীবনযুদ্ধের ব্যাপারেও ভগবান্ তাঁর আশ্রিত ভক্তকে ঠিক অনুরূপ অভয় ও আশ্বাস দান করে বলেন—হে সাধক, তোমার অন্তরের কামক্রোধাদি ঐ শত্রুগণকেও আমি পূর্ব্বেই পরাভূত ও নির্জ্জিত করে রেখেছি। তুমি নিমিত্তমাত্র হয়ে তাদের দমনে যথাশক্তি প্রযত্নশীল হও।

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটি।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য।। ৩৫

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ—কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কিরীটি কৃতাঞ্জলিঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা ভীতভীতঃ সগদ্গদং ভূয়ঃ এব প্রণম্য আহ।। ৩৫

অনুবাদ—সঞ্জয় বললেন—কেশবের এই বাক্য শ্রবণে অতীব ভীত হয়ে কম্পিত কলেবরে প্রণামপূর্ব্বক করজোড়ে গদ্‌গদভাবে অর্জ্জুন বললেন॥ ৩৫

অর্জ্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ—হৃষীকেশ, তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি, অনুরজ্যতে চ ; রক্ষাংসি ভীতানি দিশঃ দ্রবন্তি ; সর্ব্বে সিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ নমস্যন্তি, স্থানে॥ ৩৬

অনুবাদ—হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে সমস্ত জগৎ যে বিশেষ হৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়—তা একান্ত যুক্তিযুক্ত ; রাক্ষসেরা যে ভীত হয়ে নানাদিকে পলায়নপর এবং সিদ্ধগণ যে তোমার প্রতি নমস্কারপরায়ণ ; এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক॥ ৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥ ৩৭

অন্বয়—মহাত্মন্, অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস, ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে চ আদিকর্ত্রে চ তে কস্মাৎ ন নমেরন্ ; সৎ অসৎ পরং যৎ অক্ষরং তৎ চ ত্বম্॥ ৩৭

অনুবাদ—হে মহাত্মন্! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মারও গুরু এবং আদি কারণ ; সকলে তোমাকে কেন নমস্কার না করবেন? সৎ বা ব্যক্ত জগৎ এবং অসৎ বা অব্যক্ত প্রকৃতি এবং সদসতের অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম—তাও তুমি॥ ৩৭

গীতামৃত—এখানে লক্ষ্য করার বিষয়—ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের দ্রষ্টা একমাত্র অর্জ্জুন হলেও তিনি এই বিশাল বিচিত্র ও করাল মূর্ত্তির মধ্যে লক্ষ্য করছেন দুটি বিপরীত চিত্র। তিনি দেখছেন ঐ মূর্ত্তির পুরোভাগে দণ্ডায়মান দু'শ্রেণীর দর্শক—দিব্যগুণসম্পন্ন দেবতা ঋষি, মহর্ষি ও সিদ্ধগণ এবং তমোগুণসম্পন্ন যক্ষরক্ষাদি দুর্ব্বৃত্তগণ। প্রথমশ্রেণীর দর্শকবৃন্দ সেই ভীষণ ও অলৌকিক মূর্ত্তি দর্শন করে বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে স্বস্তিবচন উচ্চারণ পূর্ব্বক করজোড়ে স্তবস্তুতি করছেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শকগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে 'ত্রাহি ত্রাহি' করে পলায়নপর হচ্ছে। এর কারণ—যাঁদের প্রকৃতি সাত্ত্বিক তাঁরা তাঁদের উপাস্য ভগবানের অলৌকিক গুণ ও মহিমা দর্শন ক'রে বিস্মিত হলেও কদাপি ভয়ভীত হন না। আর যাদের প্রকৃতি তামসিক ও কলুষিত তারা যে ভগবানের দুষ্কৃতিদমনকারী—বিকরাল রুদ্ররূপ দর্শন ক'রে ভীত ও কম্পিত হয়ে উঠবে—তা একান্ত স্বাভাবিক। অর্জ্জুনের মনোবুদ্ধি এখনো গুণাতীত ভূমিতে প্রতিষ্ঠ হ'তে পারে নি, তাই তিনি বিশ্বরূপ দর্শনে কখনও হৃষ্ট, আবার কখনও ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়ছেন। আর এই কারণে তিনি কখনও আত্মহারা হয়ে স্তবস্তুতি করছেন, আবার কখনও ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে 'ত্রাহি ত্রাহি' করে আর্ত্তনাদ করছেন।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ ৩৮

অন্বয়—অনন্তরূপ, ত্বম্ আদিদেবঃ, পুরাণঃ পুরুষঃ, ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং ; বেত্তা বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম অসি ; ত্বয়া বিশ্বং ততম্॥ ৩৮

অনুবাদ—হে অনন্তরূপ, তুমি আদিদেব, তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি বিশ্বের অন্তিম লয়স্থান, তুমি জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য, তুমি পরম ধাম। তুমি বিশ্বজগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছ॥ ৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯

অন্বয়—ত্বং বায়ু, যমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ, প্রজাপতিঃ, প্রপিতামহঃ চ, তে সহস্রকৃত্বঃ নমঃ অস্তু পুনশ্চ নমঃ, ভূয়ঃ অপি তে নমঃ নমঃ।। ৩৯

অনুবাদ—তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ; পিতামহ ব্রহ্মাও তুমিই, আবার ব্রহ্মার জনকও (প্রপিতামহ) তুমি। তোমাকে সহস্রবার প্রণাম করি, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।। ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।। ৪০

অন্বয়— তে পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ নমঃ, সর্ব্ব, তে সর্ব্বতঃ এব নমঃ অস্তু ; অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রমঃ ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ; ততঃ সর্ব্বঃ অসি।। ৪০

অনুবাদ—তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করি, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার করি ; হে সর্ব্বাত্মা তুমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তোমাকে সকল দিকেই নমস্কার করি। অনন্ত তোমার বীর্য্য (শারীরিক বল), অসীম তোমার পরাক্রম (শস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য) ; তুমি সমস্ত ব্যাপিয়া বিদ্যমান—তুমি সব কিছু।। ৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।। ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুতে তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্।। ৪২

অন্বয়—তব মহিমানং ইদং চ অজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি সখা ইতি মত্বা হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা ইতি প্রসভং যদুক্তম্ অচ্যুত!

বিহারশয্যাসনভোজনেষু একঃ বা তৎসমক্ষং অপি অবহাসার্থং যৎ অসৎকৃতঃ অসি, অহম্ অপ্রমেয়ং ত্বাং তৎ ক্ষাময়ে।। ৪১-৪২

অনুবাদ—তোমার এই (বিশ্বরূপ) মহিমা না জেনে আমি তোমাকে সখাজ্ঞানে অজ্ঞতা ও প্রণয়বশতঃ হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা ব'লে এতকাল সম্বোধন করেছি। হে অচ্যুত, আহার, বিহার, শয়ন ও উপবেশনকালে একাকী বা বন্ধুগণ সমক্ষে হাস্য-পরিহাস ছলে তোমার কত অমর্য্যাদা করেছি ; হে অপ্রমেয় (অশেষ প্রভাবশালী), তোমার নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।। ৪১-৪২

মহতের কৃপা ব্যতীত মহান্ পুরুষের সম্যক্ পরিচয় লাভ দুঃসাধ্য

ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানকে নিজের বিচার-বুদ্ধিমত অতি সামান্যই অবগত হওয়া যায়। তিনি যখন কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় ভাগবত স্বরূপের পরিচয় দেন তখনই কেবল উপলব্ধি করা যায়—তিনি কত মহান্ ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

বর্ত্তমান যুগের আচার্য্য প্রণবানন্দের ভাগবত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁদের পরিকরবৃন্দের প্রাথমিক ধারণা ও কল্পনাও ছিল কতকটা অনুরূপ। প্রথম সাক্ষাৎকারের পরবর্ত্তী কয়েকটি বৎসর অজ্ঞতাবশতঃ তাঁদের ভবিষ্যৎ ত্রাতা-পাতারূপী সদ্গুরুর গুণ, শক্তি ও মহিমা যাচাই করার জন্য তাঁর উপর কত পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রহসনই না করেছিলেন তাঁরা এবং সেই অপরাধের জন্য তাঁরা পরে কতই বা অনুতপ্ত হয়েছিলেন!

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।। ৪৩

অন্বয়—অপ্রতিমপ্রভাব, ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা, পূজ্যঃ, গুরুঃ, গরীয়ান্ চ অসি, লোকত্রয়ে অপি ত্বৎসমঃ ন অস্তি, অভ্যধিকঃ অন্যঃ কুতঃ? ৪৩

অনুবাদ—হে অপ্রতিমপ্রভাব! তুমি এই চরাচর সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা, পূজ্য গুরু এবং গুরুরও গুরু ; ত্রিভুবনে তোমার সমান কেহই নাই, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেই বা হতে পারে? ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেবঃ সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্॥ ৪৪

অন্বয়—দেব! তস্মাৎ অহং কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য ঈড্যম্ ঈশং ত্বাং প্রসাদয়ে, পুত্রস্য পিতা ইব, সখ্যুঃ সখা ইব, প্রিয়ায়াঃ প্রিয়ঃ ইব, সোঢুম্ অর্হসি॥ ৪৪

অনুবাদ—হে দেব, সেই হেতু আমি শরীরকে অবনত করে প্রণামপূর্ব্বক বন্দনীয় ঈশ্বর তোমাকে প্রসন্ন করছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমিও তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৪৪

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫

অন্বয়—দেব, অদৃষ্টপূর্ব্বং দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ অস্মি ভয়ে চ মে মনঃ প্রব্যথিতং, তৎ এব রূপং মে দর্শয়, দেবেশ, জগন্নিবাস, প্রসীদ॥ ৪৫

অনুবাদ—হে দেব! পূর্ব্বে যাহা দেখি নাই তা দর্শন করে আমি হৃষ্ট হচ্ছি ; আবার ভয়ে আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত ; অতএব তুমি তোমার সেই পূর্ব্ব রূপটি আমাকে দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও॥ ৪৫

ভগবানের রুদ্ররূপ সাধারণ ভক্তের অসহ্য

পূর্ব্বেই আমরা বলেছি, হিন্দুদর্শন মতে ভগবানের দুটি রূপ—অতি সৌম্য ও অতি রৌদ্র। সাধারণ ভক্তেরা ভগবানের সৌম্য বা মধুর রূপের উপাসক। অর্থাৎ, তাঁরা দর্শন ও ধ্যান করতে চান—তাঁদের উপাস্যের সুন্দর, প্রেমময় ও বরাভয়মূর্ত্তি ; পক্ষান্তরে তাঁর যে ভয়াল, বিকরাল, সংহারমূর্ত্তি —তা তাদের নিকট ভয় ও আতঙ্কের বস্তু। অর্জ্জুনের এখন উভয় অবস্থা। তাই তিনি সাধ করে তাঁর সখার বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়ে এখন যা প্রত্যক্ষ করছেন তাতে তিনি কখনও প্রীত ও প্রসন্ন আবার কখনও ভীত, সন্ত্রস্ত ও কাতর হয়ে পড়ছেন এবং সেই অবস্থায় আর্ত্তকণ্ঠে তিনি নিবেদন করছেন —হে দেব, তোমার এই বিশ্বরূপ অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত হলেও আমি তার তেজঃ আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি প্রসন্ন হয়ে কৃপাপূর্ব্বক তোমার ঐ ভীষণ রূপ এখন সম্বরণ কর।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ৪৬

অন্বয়—অহং ত্বাং তথা এব কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং, দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি ; সহস্রবাহো, বিশ্বমূর্ত্তে, তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ এব ভব॥ ৪৬

অনুবাদ—আমি তোমার সেই কিরীটধারী, গদা ও চক্রধারী পূর্ব্ব রূপটি দেখতে ইচ্ছা করি ; হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর॥ ৪৬

গীতামৃত—অর্জ্জুন তো শ্রীকৃষ্ণকে এতকাল দ্বিভুজ রূপেই দর্শন করে এসেছেন। এখন তিনি তাঁকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন করতে চান কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলেন—চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিই ছিল অর্জ্জুনের উপাস্য ইষ্টমূর্ত্তি। সখার বিশ্বরূপ দর্শনকালে যখন অর্জ্জুন সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণই তাঁর সেই উপাস্য বিষ্ণুর অবতার তখন তিনি তাঁকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা জানা আবশ্যক—শ্রীভগবানের অসীম, অনন্ত, বিচিত্র, তেজোময় যে রূপ—তা দর্শকের হৃদয়মনে অদ্ভুত রসের

সঞ্চার করে এবং এই অদ্ভুত রসের উপলব্ধির মধ্যে আনন্দ যে একেবারে নাই তা নয়, তবে সে রূপ সকল দর্শককে শান্তি ও স্বস্তি দিতে পারে না। কেন না, মানুষের সসীম মনোবুদ্ধির পক্ষে অসীম অনন্তের ধারণা এক প্রকার দুঃসাধ্য ; পক্ষান্তরে, সান্ত সসীমের মধ্যেই তার যে উপলব্ধি তাই সহজসাধ্য। এজন্যই সাধারণতঃ দেখা যায়, ভক্তগণ ভগবানের অসীম ভূমা স্বরূপকে তাঁদের নিজের কল্পনা ও ভাবে রূপায়িত ক'রে দেখবার জন্য চিরদিন এতখানি আকুল ব্যাকুল। বিশ্বরূপ দর্শনের পরে অর্জ্জুনের প্রাণে ভগবানের সাকার ও সুপ্রসন্ন বিষ্ণুরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষার মূল কারণও ইহাই।

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥ ৪৭

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—অর্জ্জুন, প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ তব ইদং তেজোময়ং, অনন্তং, আদ্যং, পরং বিশ্বং রূপং দর্শিতং ; যৎ মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥ ৪৭

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন, হে অর্জ্জুন, তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে স্বকীয় যোগপ্রভাবেই আমি তোমাকে আমার এই তেজোময়, অনন্ত, আদ্য, পরম বিশ্বরূপ দেখালাম ; আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই॥ ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ
ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্যঃ অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮

অন্বয়—কুরুপ্রবীর, ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ, ন দানৈঃ, ন চ ক্রিয়াভিঃ, ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ এবং রূপঃ অহং নৃলোকে ত্বদন্যেন দ্রষ্টুং শক্যঃ॥ ৪৮

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বেদাধ্যয়ন দ্বারা, যজ্ঞ-বিধান দ্বারা, দানাদি ক্রিয়ার দ্বারা ও উগ্র তপস্যা দ্বারা মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন অন্য কেহ আমার এই রূপ দেখতে সমর্থ হয় নি॥ ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯

অন্বয়—ঈদৃক্ ইদং মম ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মা, বিমূঢ়ভাবঃ চ মা ; ব্যপেতভীঃ, প্রীতমনাঃ পুনঃ ত্বং মে ইদং তৎ রূপম্ এব প্রপশ্য॥ ৪৯

অনুবাদ—তুমি আমার এই ঘোর রূপ দেখে ব্যথিত ও বিমূঢ় হয়ো না। ভয় ত্যাগ করে প্রীত মনে পুনরায় তুমি আমার পূর্ব্ব রূপ দর্শন কর॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ—বাসুদেবঃ অর্জ্জুনম্ ইতি উক্ত্বা ভূয়ঃ তথা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ; মহাত্মা পুনঃ সৌম্যবপুঃ ভূত্বা ভীতম্ এনম্ অর্জ্জুনম্ আশ্বাসয়ামাস চ॥ ৫০

অনুবাদ—সঞ্জয় বললেন—বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই বলে পুনরায় সেই স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করালেন ; মহাত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) পুনরায় প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করলেন॥ ৫০

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ—জনার্দ্দন, তব ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ অস্মি ; প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন—হে জনার্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মনুষ্যরূপ দর্শন করে আমি এখন প্রসন্নচিত্ত, প্রকৃতিস্থ হলাম॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—মম ইদং সুদুর্দ্দর্শং যৎ রূপং দৃষ্টবান্ অসি দেবাঃ অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫২

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—তুমি আমার যে রূপ দেখলে, তার দর্শন একান্ত দুর্লভ ; দেবগণও সর্ব্বদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী॥ ৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩

অন্বয়—মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি, এবং বিধঃ অহং ন বেদৈঃ, ন তপসা, ন দানেন, ন চ ইজ্যয়া দ্রষ্টুং শক্যঃ॥ ৫৩

অনুবাদ—আমাকে যেরূপ দেখলে—এই প্রকারে বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা আমি দৃষ্ট হতে পারি না (আমাকে কেহ দেখতে সমর্থ নয়)॥ ৫৩

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ৫৪

অন্বয়—পরন্তপ, অর্জ্জুন, অনন্যয়া ভক্ত্যা তু এবংবিধঃ অহং তত্ত্বেন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুঞ্চ শক্যঃ॥ ৫৪

অনুবাদ—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! কেবলমাত্র অনন্য ভক্তির দ্বারাই ঈদৃশ আমাকে স্বরূপতঃ জানতে পারা যায়, সাক্ষাৎ আমার দর্শন পাওয়া যায় এবং আমাতে প্রবেশ করতে পারা যায়॥ ৫৪

গীতামৃত—জ্ঞানবাদী বৈদান্তিকগণ বলেন—ব্রহ্মানুভূতি কেবলমাত্র জ্ঞানের

দ্বারাই সম্ভবপর ; যাগ-যজ্ঞ, দান, বেদপাঠ বা অন্যবিধ তপস্যার দ্বারা তা সম্ভবপর নয়। আর এখানে শ্রীভগবান্ বললেন—ঈশ্বরদর্শন একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫

অন্বয়—পাণ্ডব, যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমঃ, মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ, সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ, সঃ মাম্ এতি॥ ৫৫

অনুবাদ—হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমার জন্যই সমুদয় কর্ম্ম করেন, আমার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত ও আমার অনন্যভক্ত যিনি সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য, কাহারও প্রতি যাঁর শত্রুভাব নাই, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন॥ ৫৫

গীতামৃত—এক শ্রেণীর পণ্ডিতের মতে এই শ্লোকটির মধ্যে সমগ্র গীতার সার শিক্ষা নিহিত। অর্থাৎ, যে ভক্ত সাধক ভগবানে একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত—ভগবান্ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি যাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ, অনুরাগ নাই, ভগবানই যাঁর জীবনের যথাসর্ব্বস্ব, যিনি তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম্ম ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করেন, যিনি রূপ-রসাদি কোন বিষয়বস্তুতে এতটুকু আসক্ত নন, যিনি কারো প্রতি শত্রুভাব পোষণ করেন না—তিনিই ভগবানকে প্রাপ্ত হন।

উপরে বলা হয়েছে—আদর্শ ভগবদ্ভক্ত হবেন নির্ব্বৈর। পরন্তু, প্রশ্ন আসে—গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ তো শৈশব হতেই পুতনাদি অগণিত শত্রুবধে নিরত। নিজের একান্ত আত্মীয় কংস, শিশুপাল প্রভৃতির প্রতি তাঁর যে আচরণ তাও হিংসামূলক। স্বীয় সখা অর্জ্জুনকেও তিনি পুনঃ পুনঃ গাণ্ডীব ধারণ ক'রে শত্রুবধে প্রোৎসাহিত করছেন—এতৎসত্ত্বেও তিনি এখানে তাঁর আদর্শ ভক্তকে নির্ব্বৈর হতে উপদেশ করছেন—এর রহস্য কি? উত্তরে বলা যায়—মনে হিংসা বা শত্রুভাব না রেখেও প্রয়োজনবশে দুষ্টের দমন বা সংহার করা অন্যায় ও অশাস্ত্রীয় নয়।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ—ভক্তিযোগঃ

এক্ষণে আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের মর্ম্মার্থের অনুধ্যানে ব্রতী হ'ব। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—ভক্তিযোগ। শরণাগতি ও অনন্য প্রেমনিষ্ঠাই হচ্ছে ভগবানের সব চেয়ে প্রিয় বস্তু। এই দিক দিয়ে বিচার করলে এই অধ্যায়ের মহত্ত্ব-গৌরব সর্ব্বাধিক। কারো কারো মতে এই অধ্যায়টি হচ্ছে গীতাধর্ম্মের কৌস্তুভমণি। অবশ্য ভক্তিমার্গী আচার্য্যগণেরই ইত্যাকার অভিমত।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে বলা হয়েছে—যিনি ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে তদীয় শ্রীহস্তের যন্ত্রবুদ্ধিতে ভাগবত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, যিনি একান্ত ভগবন্নিষ্ঠ, আসক্তিবর্জ্জিত ও সর্ব্বভূতে বৈরভাবশূন্য—তিনি নিশ্চিতই আমাকে প্রাপ্ত হন। উক্ত আশ্বাসবাণী শুনে অর্জ্জুন এক্ষণে প্রশ্ন করলেন—

অর্জ্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।। ১

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ—এবং সততযুক্তাঃ যে ভক্তাঃ ত্বাং পর্য্যুপাসতে, যে চ অপি অব্যক্তম্ অক্ষরং, তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।। ১

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন—এইরূপে সর্ব্বদা ত্বদ্‌গতপ্রাণ হয়ে যে সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁরা তোমার অব্যক্ত অক্ষর রূপের সাধনা করেন—তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবিদ্ বা সাধক কে? ১

সাকার সগুণ উপাসনা শ্রেয়ঃ, না নিরাকার নির্গুণ?

গীতাপাঠকগণের নিশ্চিতই স্মরণ আছে যে প্রাথমিক স্তরে অর্জ্জুনের হৃদয়-মনে ছিল নিদারুণ কর্ম্মবিতৃষ্ণা। ক্ষত্রিয়নন্দন হয়েও যুদ্ধকর্ম্ম পরিহার

করে কর্ম্মসন্ন্যাস বা জ্ঞানের পথ বরণ করার জন্য তিনি হয়েছিলেন কৃতসঙ্কল্প এবং এজন্য তিনি স্বীয় সখার নিকট পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করেছিলেন—কর্ম্মের পথ শ্রেয়ঃ, না, কর্ম্মসন্ন্যাসের পথ? সখা শ্রীকৃষ্ণের সদুত্তরে তাঁর সে সংশয়ের নিরসন হয়েছে।

অতঃপর, এক্ষণে ভক্তি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় অর্জ্জুনের মনে উদিত হয়েছে আর একটি অভিনব সংশয়—ভক্তির পথ শ্রেয়ঃ, না, জ্ঞানের পথ? অর্থাৎ, তাঁর প্রাণে এক্ষণে প্রশ্ন জেগেছে—সাকার সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা অধিকতর হিতপ্রদ, না, নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা?

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটি বিষয় স্মরণযোগ্য। অর্জ্জুন স্বীয় সখার মুখে ভগবানের ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেক তত্ত্বকথা শ্রবণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করেছেন শ্রীভগবান্ এবং সেই ভীষণ ও বিচিত্র রূপের দর্শনকালে যখন তিনি ভীতিবিহ্বল হয়ে শান্তিলাভের আশায় সখার নিকট তাঁর চতুর্ভুজধারী শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন, তখন তদীয় কৃপায় তাঁর সে ইচ্ছাও পূর্ণ হয়েছে—তথাপি অর্জ্জুনের প্রাণে এই সংশয়-সন্দেহ অমূলক নয় কি?

উত্তরে বলা যায়—কেবলমাত্র তত্ত্বকথা শ্রবণ করে বা অপরের অনুগ্রহে স্বীয় ইষ্টমূর্ত্তির সাময়িক দর্শন লাভ করে সত্যকার শান্তি সান্ত্বনা লাভ করা যায় না এবং তার দ্বারা মনের জিজ্ঞাসারও পরিসমাপ্তি হয় না। কেন না, সত্যকার ধর্ম্মানুভূতি—শুধু শোনা ও বলা নয়—হওয়া বা আচরণ করা। 'Religion is being and becoming It is self-realisation' সাধকের সাধনাজনিত চিত্তশুদ্ধির ফলে যে প্রত্যক্ষ আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন হয় —তাকেই প্রকৃত দর্শন বা অনুভূতি বলা চলে। অর্জ্জুনের প্রাণে এখনও সে অবস্থা অধিগত বা উপলব্ধ হয় নি। তাই তাঁর প্রাণে ইত্যাকার জিজ্ঞাসাই স্বাভাবিক।

যাঁরা গীতার শ্রোতা ও পাঠক, তাঁদেরও প্রয়োজন—এই বিষয়টি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা। শুধু শুনে, পড়ে এবং আলোচনা করেই তাঁরা যেন কর্ত্তব্য সমাপ্ত না করেন। অর্জ্জুনের ন্যায় তাঁদের হৃদয়-মনে যেন অনুরূপ জিজ্ঞাসা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বানুভূতির আশাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়।

সখার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।। ২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—ময়ি মনঃ আবেশ্য নিত্যযুক্তাঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ যে মাম্ উপাসতে, তে যুক্ততমাঃ, মে মতাঃ।। ২

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—যাঁরা আমাতে মন নিবিষ্ট করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত হয়ে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ।। ২

সাকার সগুণ উপাসনাই ভগবানের মতে শ্রেষ্ঠতর

গীতাধর্ম্মে মুখ্যস্থান পরিগ্রহ করেছে ঈশ্বরবাদ। পুরুষোত্তমতত্ত্বই এজন্য গীতায় সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বরূপে স্বীকৃত। ঔপনিষদিক ধর্ম্মে নিরাকার নির্গুণ এবং কোথাও কোথাও নিরাকার সগুণ ভাবের গৌরব-মহিমা প্রকটিত। সাকার স্বরূপে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীভগবান্ কিন্তু স্বমুখনিঃসৃত গীতোপনিষদে তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকগণকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করে বলছেন—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'—আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হও, আমার অনন্য ভক্ত হও, আমার উদ্দেশ্যে পূজা যজ্ঞ কর, আমাকেই প্রণাম কর।

গীতায় শ্রীভগবান্ যেন পুনঃ পুনঃ ভক্তগণকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—ভূভার হরণের জন্য, তোমাদের ন্যায় পাপী, তাপী, অনাথ, আতুরের উদ্ধার বা পরিত্রাণের নিমিত্ত আমি নরতনু পরিগ্রহ করে অবতীর্ণ; আর তোমরা আমাকে উপেক্ষা করে আমার নিরাকার, নির্গুণ, অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য স্বরূপের পশ্চাতে ধাবিত হচ্ছ! তোমাদের জানা উচিত—এটাই আমার সরল সহজ ভাব; তোমাদের ন্যায় দেহাভিমানীর পক্ষে আমার এই সাকার সগুণ স্বরূপটি অপেক্ষাকৃত সহজে অধিগম্য।

নবযুগের অবতার আচার্য্য প্রণবানন্দও তাঁর অন্যতম নিরাকার

নির্গুণবাদী অজ্ঞান সন্তানের মিথ্যা মোহাভিমান বিদূরিত করার জন্য একদা অনুরূপ নির্দ্দেশ দিয়ে বলেছিলেন—"বেদান্তের অদ্বৈতভাবটি কেবলমাত্র উচ্চতম সাধনার স্তরে উপলব্ধির বস্তু। জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহারিক জগতে দ্বৈত আছে এবং থাকিবে।" অর্থাৎ, তাঁরও অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় ছিল—বিশ্বকল্যাণমূলক তাঁর যে ভাবগত কর্ম্মলীলা—তার প্রচার-প্রতিষ্ঠাতেই তাঁর সর্ব্বাধিক আনন্দ ও প্রসন্নতা—তাঁর নির্গুণ ভাবের সেবাতে নয়।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।। ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।। ৪

অন্বয়—যে তু সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য, অব্যক্তম্ অনির্দ্দেশ্যং সর্ব্বত্রগম্ অচিন্ত্যং কূটস্থম্ অচলং ধ্রুবম্ অক্ষরং পর্য্যুপাসতে, তে মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি।। ৩-৪

অনুবাদ—তবে যাঁরা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন, সকল প্রাণীর কল্যাণসাধনে নিরত এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে প্রযত্নশীল হয়ে যাঁরা আমার অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচল, ধ্রুব, অক্ষর স্বরূপের উপাসনা করেন—তাঁরাও আমাকে প্রাপ্ত হন।। ৩-৪

নিরাকার নির্গুণোপাসকের আন্তরিক প্রয়াসও নিষ্ফল হয় না

অক্ষর ব্রহ্মের যাঁরা উপাসক, তাঁরা ভগবানের নিরাকার নির্গুণ বিভাবের যে পরতত্ত্ব তা উপলব্ধির জন্য প্রযত্নশীল। তাঁদের সে সাধনা যদি আন্তরিক হয় এবং তাঁরা যদি সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধিযুক্ত হয়ে সকলের কল্যাণসাধনে ব্যাপৃত হ'ন তবে তাঁদের সে সাধনাও নিশ্চিতই সফল হয়। এখানে কিন্তু একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। এরূপ জ্ঞানবাদী সাধকগণকে উদ্দেশ্য ক'রে শ্রীভগবান্ বললেন—তাঁরা যেন বৈরাগ্য-বিচারের সাধনার অজুহাতে হৃদয়হীন নির্ম্মম না হ'ন। অর্থাৎ, তাঁরা ব্রহ্মের অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য, নিরাকার,

নির্গুণ তত্ত্বোপলব্ধির সাধনায় নিরত থাকার সময়ে যেন নিষ্কামভাবে দুর্গত জনগণের সেবায় উদ্যোগী হন এবং তাঁরা যেন তাঁদের ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করতে প্রযত্নশীল হন।

অধুনা যত্র তত্র একশ্রেণীর শুষ্ক বেদান্তী পণ্ডিত পরিদৃষ্ট হন—যাঁরা জীবসেবাকে অজ্ঞানতা ও বন্ধনের কারণ ব'লে মনে করেন। তাছাড়া, তাঁরা ইহাও মনে করেন যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার কোন সম্বন্ধ-সম্পর্ক নাই। কেন না, ইন্দ্রিয়ের স্বভাব ও আত্মার স্বভাব সম্পূর্ণ পৃথক্। আত্মা হচ্ছে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত—নিরন্তর অসঙ্গ ও অলিপ্ত। সুতরাং, ইন্দ্রিয়গণ যদি স্বভাববশে বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার ভোগসুখে নিরত হয়, তাতে আত্মার কোন ক্ষয়, ক্ষতি, পতন বা অধোগতির সম্ভাবনা হয় না। বলা বাহুল্য, এরূপ মতবাদীরা বেদান্তের নামে হৃদয়হীনতা ও উন্মার্গগামিতার সমর্থন দিয়ে থাকেন। বস্তুতঃ, এঁদের উপলক্ষ্য করেই গীতাকার শ্রীভগবানের উপরোক্ত সতর্কবাণী উচ্চারিত। গীতা এখানে স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন—নির্গুণ বাদীদের বিচারমূলক সাধনা ও জীব-সেবার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। কারণ বেদান্তের মতে—'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। সুতরাং, আত্মনিষ্ঠের জীবসেবা ও ব্রহ্মসেবা এক ও অভিন্ন।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।। ৫

অন্বয়—তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ অধিকতরঃ ক্লেশঃ, হি অব্যক্তা গতিঃ, দেহবদ্ভিঃ দুঃখম্ অবাপ্যতে।। ৫

অনুবাদ—অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত সেই সাধকগণের সিদ্ধিলাভে অধিকতর ক্লেশ হয়। কারণ, দেহধারিগণ অতি কষ্টে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করে থাকে।। ৫

দেহধারীর পক্ষে নিরাকার নির্গুণে নিষ্ঠা দুঃসাধ্য

ইংরাজী প্রবাদবাক্যে বলা হয়—'Like attracts like'. সমানে সমানে আকর্ষণ হয়। এই দিক দিয়ে বিচার করলে দেহধারী মানুষের পক্ষে সাকার সগুণ ভগবানের ধ্যান ধারণা সহজ ও সুখসাধ্য হওয়াই স্বাভাবিক। তবে

উচ্চ অধিকারী সাধকগণের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা তাঁদের দুশ্চর সাধনার দ্বারা নামরূপের অতীত যে ভূমা চৈতন্যসত্তা তার ধারণা করতে সমর্থ; তাই তাঁরা নিরাকার নির্গুণের প্রতি অনুরক্ত হন। তবে যাঁরা সাধারণ দেহাভিমানী সাধক তাঁদের লক্ষ্য করে এখানে শ্রীভগবান্ বলছেন—নিরাকার নির্গুণে নিষ্ঠা অত্যন্ত ক্লেশসাধ্য।

এই প্রসঙ্গে আরও জানা আবশ্যক—সাকার সগুণ এবং নিরাকার নির্গুণ এই দুই স্বরূপের মধ্যে আর একটি স্তর বিদ্যমান—যাকে নিরাকার সগুণ বলা হয়। অর্থাৎ, পরমাত্মা নিরাকার হলেও তিনি দয়া, প্রেম প্রভৃতি গুণের আধার। নিরাকারবাদী ব্রাহ্মসমাজী ও আর্য্যসমাজীরা ভগবানের এই স্বরূপে বিশ্বাসী। ব্রাহ্মসমাজীরা তাঁদের উপাস্যের উদ্দেশ্যে তাঁদের অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করে থাকেন। আর্য্যসমাজিগণ তাঁদের ইষ্টের উদ্দেশ্যে করেন—যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান। বলা বাহুল্য, নিরাকার নির্গুণের উপাসনা অপেক্ষা এঁদের ইত্যাকার উপাসনা অনেকখানি সরল ও সহজ।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।। ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।। ৭

অন্বয়—পার্থ, যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ অনন্যেন এব যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে, ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ন চিরাৎ অহং সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি।। ৬।৭

অনুবাদ—হে পার্থ, কিন্তু যারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক একমাত্র আমাতে চিত্ত স্থির করে ধ্যানযুক্ত চিত্তে আমার উপাসনা করেন, আমাতে সমর্পিতচিত্ত সেই ভক্তগণকে আমি সংসারসমুদ্র হতে অচিরে উদ্ধার করে থাকি।। ৬।৭

সমর্পিতচিত্ত ভক্তের উদ্ধারকর্ত্তা—ভগবান্ স্বয়ং

অনন্য ভক্তের কর্ম্ম-বন্ধনের কোন ভয় নাই। কেন না, ভগবদ্ভক্তের

যে কর্ম্ম তা ভগবানেরই কর্ম্ম। বস্তুতঃ ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে সমর্পণবুদ্ধিতেই অনুষ্ঠিত হয় সে কর্ম্ম। এরূপ কর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষাও থাকে না। কারণ, কর্ম্ম যখন নিজের নয়—ভগবানের, তখন সেই কর্ম্মের ফলও যে তাঁতে বর্ত্তিবে—তাতে সন্দেহ কোথায়?

এই আত্মসমর্পণের ভাবটি আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্য শ্রীভগবান্ পুনরায় বলছেন—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮

অন্বয়—ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়, অতঃ উর্দ্ধং ময়ি নিবসিষ্যসি, সংশয়ঃ ন॥ ৮

অনুবাদ—আমাতেই মন রাখ, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহলে দেহান্তে তুমি আমাকে লাভ করবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই॥ ৮

ভগবানে মনোবুদ্ধি নিবিষ্ট হলেই উর্দ্ধগতি

মনোবুদ্ধিই মানুষের ভাবী উত্থান-পতনের নিয়ন্তা। অর্থাৎ, মানুষের মনোবুদ্ধি যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের অনুগামী হয় তখন তার বন্ধন বৃদ্ধি পায়, আর যখন তা শ্রীভগবানে বা সদ্‌গুরুতে অর্পিত হয় তখন তার গতি হয় উর্দ্ধমুখী। তাই শ্রীভগবান্ স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে পুরোভাগে রেখে সমস্ত সাধকগণকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বলছেন—তোমরা তোমাদের মনোবুদ্ধি আমাতে অভিনিবিষ্ট করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। এরূপ করতে পারলে তোমাদের আর পতন বা অধোগতির সম্ভাবনা নাই—তার ফলে তোমাদের অভ্যুত্থান বা উর্দ্ধগতি অবশ্যম্ভাবী।

মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ এই রহস্যটি অবগত হয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের আকুতি নিয়ে তদীয় অনুপম ছন্দে গাইলেন—

'সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি—
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।'

মনোবুদ্ধি এই ভাবে ভগবানে সমর্পণ করতে পারলে তিনি তখন নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বীয় ভক্তের ভবপারের কাণ্ডারী হন। তখন তাঁর

আর ভয়-ভীতি থাকে না। এ অবস্থায় কি জীবদ্দশায়, কি মৃত্যুর পরে ভক্ত ভগবানের চিরসান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হন।

অনন্য ভক্তের প্রতি ভগবানের কতই না অভয়-আশ্বাস ও সান্ত্বনা! কিন্তু হায়! তথাপি আমাদের প্রাণে আত্মসমর্পণ বা শরণাগতির ভাব জাগ্রত হয় কোথায়? অহঙ্কার অভিমানের পুঁটুলি নিয়ে আর কতকাল আমরা সংসার-সাগরে হাবুডুবু খাব। আজন্ম এত দুঃখ-যন্ত্রণা ও জ্বালামালায় জর্জ্জরিত হয়েও আমাদের মনোবুদ্ধির প্রভুমুখী হল কোথায়?

বস্তুতঃ, ভক্তের প্রতি ভগবানের আশ্বাসের অবধি নাই। ঐ শুনুন, তিনি পুনরায় বলছেন—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯

অন্বয়—ধনঞ্জয়, অথ ময়ি চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং ন শক্নোষি, ততঃ অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুম্ ইচ্ছ॥ ৯

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করতে না পার, তবে অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে লাভ করতে চেষ্টা কর॥ ৯

অভ্যাস-যোগের সাধনা

আত্মসমর্পণকারী সাধকের মনোবুদ্ধি যদি সহজে ভগবন্মুখী না হয় তবে উপায় কি—তার নির্দ্দেশ দিয়ে শ্রীভগবান্ এক্ষণে বলছেন—এরূপ অবস্থায় সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে—অভ্যাসযোগের আশ্রয় গ্রহণ করা। আমাদের স্মরণ রাখা চাই—মনোবুদ্ধির সহজ ও স্বাভাবিক অনুরাগ ও প্রবণতা রূপরসাদি বিষয়ের প্রতি হলেও পুনঃ পুনঃ উদ্যম ও চেষ্টার দ্বারা তাদিগকে ভোগ্য বিষয় হতে প্রত্যাহৃত করে ভগবানে অভিনিবিষ্ট করা আদৌ অসম্ভব নয়। কারণ, যে যে বিষয়ের প্রতি মনোবুদ্ধি প্রতিধাবিত, তা যেমন তুচ্ছ ও নশ্বর, সেই বিষয়ভোগের পরিণামও তেমনি ভীষণ দুঃখপ্রদ। এরূপ অবস্থায় তাদের প্রতি মনোবুদ্ধির অনুরাগ আকর্ষণ কদাপি চিরস্থায়ী হতে পারে না। যাঁরা ধীর ও বিবেকী তাঁরা যদি নিত্য নিয়মিত কিছুদিন বিষয়-ভোগের বিষময় পরিণতির বিষয় চিন্তা করেন, তবে তাঁদের সেই

বিষয়ভোগের মোহ ধীরে ধীরে তিরোহিত হয়ে যায়। এজন্য গীতার অনুশাসন হচ্ছে—অভ্যাসযোগের সাহায্যে মনোবুদ্ধিকে ক্রমশঃ প্রভুমুখী করার প্রচেষ্টা করা।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০

অন্বয়—(যদি) অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি মৎকর্ম্মপরমঃ ভব, মদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি॥ ১০

অনুবাদ—যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তবে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও। আমার প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত কর্ম্ম করলেও তুমি সিদ্ধি লাভ করবে॥ ১০

ভগবৎ প্রীতিমূলক কর্ম্মও সিদ্ধিপ্রদ

যদি বল—এরূপ অভ্যাসযোগের আশ্রয় গ্রহণও তোমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তবে শুন—তোমাকে এ বিষয়ে আরও একটি উপায়ে সূচনা দিচ্ছি। নাম-সঙ্কীর্ত্তন, ভগবৎলীলা-কথা শ্রবণ, পূজা-বন্দনা, জপ প্রভৃতি ভক্তিমূলক আচার অনুষ্ঠানগুলি আমার বড় প্রিয়। তুমি আমার প্রীতির উদ্দেশ্যে এইসব ব্রতাদির অনুষ্ঠান কর। এরূপ করলেও তুমি আমাকে লাভ করে ধন্য হবে।

ভক্তিবাদী সম্প্রদায়গুলি প্রেমলক্ষণা ভক্তির সহায়তায় এরূপ নাম-সঙ্কীর্ত্তণ, পূজা-বন্দনা, ভাগবত, রামায়ণাদি ভক্তিমূলক গ্রন্থগুলির পারায়ণ প্রভৃতি অনুষ্ঠাগুলির বিশেষ সমর্থন ও প্রচার করেন। শুধু অজামিল, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ প্রভৃতি ভক্তগণ নন—রত্নাকর, জগাই-মাধাই-এর ন্যায় পাপী পাষণ্ডগণও একমাত্র নামের গুণেই উদ্ধার পান নি কি? সুতরাং, ভগবৎ প্রাপ্তির পক্ষে এই সরল উপায়টি যে বিশেষ উপযোগী—তাতে সন্দেহ কোথায়? একশ্রেণীর আচার্য্যের মতে কলিকালে ভগবানকে লাভ করার ইহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট সাধন-পথ। তাঁরা বলেন—'কলৌ কেশবকীর্ত্তনম্'।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১

অন্বয়—অথ এতৎ অপি কর্ত্তুম্ অশক্তঃ অসি, ততঃ মৎযোগম্ আশ্রিতঃ যতাত্মবান্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু॥ ১১

অনুবাদ—যদি এতেও অশক্ত হও, তাহ'লে আমাতে কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগের আশ্রয় ক'রে সংযতচিত্ত হয়ে সমস্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর॥ ১১

কর্ম্মযোগের মাধ্যমে ভগবৎপ্রাপ্তি

যদি উপরোক্ত পথগুলিও তোমার পক্ষে অনুকূল ব'লে বিবেচিত না হয়, তবে তোমাকে আরও একটি উপায়ের সূচনা দিচ্ছি আর সেটি হচ্ছে —ভক্তিযুক্তচিত্ত হয়ে কর্ম্মযোগের সাধনা। জ্ঞানী হও, ধ্যানী হও, আর ভক্ত হও, কিছু-না-কিছু কর্ম্ম তো তোমাকে করতেই হবে। বিনা চেষ্টায় তো কোন সাধনা চলতে পারে না—সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্যও তো কর্ম্মের প্রয়োজন। এজন্যই পূর্ব্বে বলা হয়েছে—'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ'—কাজ না করে ক্ষণকালও কেহ এ সংসারে টিকতে পারে না। ইহাই যখন বাস্তব অবস্থা, তখন শ্রীভগবানের সূচনা হচ্ছে—ঐ সকল কর্ম্মগুলি আমাতে অর্পণ করে ফলাকাঙ্ক্ষা পরিহার পূর্ব্বক করে যাও। কর্ম্ম করার সময়ে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখবার চেষ্টা কর। কেন না, মানসিক চাঞ্চল্য নিয়ে কোন কাজই সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা যায় না। এই ভাবে সমর্পণবুদ্ধি নিয়ে অনাসক্ত ভাবে কাজ করলেও তুমি আমাকে লাভ করতে পারবে।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২

অন্বয়—অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ; জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে, ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ; অনন্তরং ত্যাগাৎ শান্তিঃ॥ ১২

অনুবাদ—অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ; ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। অতঃপর ত্যাগের দ্বারা শান্তিলাভ হয়ে থাকে॥ ১২

গীতাধর্ম্মের মতে শান্তি-লাভের ক্রমিক সাধনা

কিছু কাজকর্ম্ম না করে জড়পিণ্ড হয়ে বসে থাকার চেয়ে

অভ্যাসযোগের আশ্রয়ে কিছু করা ভাল। তমোগুণের চেয়ে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ। কারণ, এর দ্বারা দেহ-মনোবুদ্ধির জড়ত্ব কাটে। পরন্তু, কিছু না বুঝে নিরেট অজ্ঞানের মত দিবারাত্র কাজকর্ম্ম করে গেলেও তার দ্বারা বিশেষ লাভ বা উপকার হয় না। এই উপদেশটি ব্যবহারিক জগতে যেমন সত্য, অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। ধর্ম্মজগতের অধিকাংশ লোক অধুনা ভগবান, পরকাল বা সাধনাসংক্রান্ত বিষয়গুলি না বুঝে কুলাচার, দেশাচারের অনুসরণ করে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, তীর্থ-দর্শন ও দেবসেবাদি কর্ম্মগুলি করে যান। এদের এই ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচারনিষ্ঠা নাস্তিকতার চেয়ে যে ভাল তাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে প্রাথমিক স্তরে এগুলি কিছুটা সমর্থনযোগ্য ; তবে সারাজীবন তাঁরা যদি এরূপ অজ্ঞানের মধ্যে থেকে তাঁদের আচার-বিচারের অনুশীলন করে যান, তা'হলে তাতে তাঁদের আত্মিক উন্নতি অবরুদ্ধ হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে, গীতাকারের নির্দ্দেশ হচ্ছে—অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, অধ্যাত্মরাজ্যে এই জ্ঞান হচ্ছে—ইষ্ট ও সাধনাসম্পর্কিত জ্ঞান। ইষ্টের স্বরূপলক্ষণ কি এবং সেই ইষ্টপ্রাপ্তির পক্ষে যে সাধনার প্রয়োজন তাও বা কি প্রকার? এই সমস্ত জ্ঞান নিয়ে বিধিমত সাধন করতে পারলেই সাধন-পথে ক্রমোন্নতি সম্ভবপর। সাধনমার্গে জপ-তপের অভ্যাস করতে হলে তাই প্রথমতঃ ইষ্ট ও সাধনসংক্রান্ত পরোক্ষ জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

পরন্তু, এই প্রকার পরোক্ষ বা তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভই যথেষ্ট নয়। ইষ্টের স্বরূপ-লক্ষণ মাত্র বুদ্ধির দ্বারা জানার পরে যদি তাঁর ধ্যানই করা না হল, তবে অধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সেই বাহ্য জ্ঞানের দ্বারা বিশেষ উপকার হয় না। বরং এরূপ জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে দম্ভ ও অভিমানেরই পরিপোষক হয়—যা সাধকের আত্মিক কল্যাণের একান্ত পরিপন্থী। এজন্য বলা হয়েছে—জ্ঞানের চেয়ে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। এখানে ধ্যান বলতে শুধু ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যানই বোঝান হয় নি ; এখানে ধ্যান বলতে বোঝান হচ্ছে—মননের সহিত নিদিধ্যাসন।

এ পর্য্যন্ত তো ভগবৎ নির্দ্দেশগুলি সহজে বোধগম্য হল। পরন্তু, এর পরেই বলা হয়েছে—ধ্যান হতে কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়টি যেন বেশ একটু জটিল ও দুরূহ বলে মনে হয়। যদি বলা হত—ধ্যান হতে সমাধি বড়, তবে তা সহজে উপলব্ধি করা যেত। কেন না, ধ্যানের পরবর্ত্তী স্তরে ঘনীভূত যে একাগ্রতা বা তন্ময়তা তা-ই সমাধি। ধ্যানসাধনার ক্রমিক উন্নতির

ইহাই সনাতন ধারা। পাতঞ্জল যোগসূত্রেও এইরূপ ধারাই সমর্থিত হয়েছে। এখানে অন্যরূপ সূচনা দেওয়ার তাৎপর্য্য বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

ফলাসক্তির মধ্য দিয়ে মানুষের মনে জাগ্রত হয় ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং এই কারণে ফলাসক্তিই সাধনজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরায়। অনেক কঠোরতপাঃ সাধকের পতন হয় এই ছিদ্র পথে। ভারতের তীর্থস্থানগুলিতে এখন অনেক তপস্বী পরিদৃষ্ট হয় যারা ঊর্দ্ধবাহু হয়ে অথবা এক পায়ের উপর বহুবর্ষব্যাপী দণ্ডায়মান থেকে, অথবা মস্তকটি মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত রেখে বা সূচের ন্যায় ধারাল লোহার কাঁটার উপর শায়িত অবস্থায় থেকে দর্শকবৃন্দের হৃদয়-মনে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব উদ্রিক্ত করে। পরন্তু, কিঞ্চিৎ পরিচয়ের পরে জানা যায়—এরা সকলেই কোন-না-কোন মতলব সিদ্ধির আশায় উক্ত প্রকার দুশ্চর তপঃসাধনায় নিরত। বলা বাহুল্য, লৌকিক এষণা বা ফলাকাঙ্ক্ষাই এদের ইত্যাকার কৃচ্ছ্র সাধনার মূল উৎস ; ভগবৎ-প্রাপ্তি বা মোক্ষ-মুক্তি এদের সাধনার লক্ষ্য নয়।

এতেই বোঝা যায়—ধ্যানের অপেক্ষা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কেন শ্রেষ্ঠ? আমাদের ভালভাবে জানা আবশ্যক—যতদিন তপোজপাদি সাধন-ভজনের ফলভোগের কিছুমাত্র আশাআকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকবে ততদিন মোক্ষ বা ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভবপর নয়।

গীতাধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার অনেক কাল পরে যখন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠে, তখন নয়টি বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত যে প্রেমধর্ম্মের বিকাশ ঘটে, তার স্বরূপ হচ্ছে—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ভগবান বিষ্ণুর মহিমা বা লীলাকথা শ্রবণ, তাঁর নাম সংকীর্ত্তন, ভাব স্মরণ, পূজা, চরণসেবা, অর্চ্চনা, তাঁর স্তবস্তুতি পাঠ, তাঁর দাস্য, সখ্য ও তাঁর নিকট পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন—ইহাই নবধা ভক্তির লক্ষণ।

তা ছাড়া, অন্যত্র যে পাঁচটি অবস্থা-বিশেষ নিয়ে উক্ত ভাগবত ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা হচ্ছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভক্তিমার্গের সাধকগণ স্বীয় স্বীয় গুণ, সংস্কার ও অধিকার অনুযায়ী উক্ত পাঁচ প্রকার সম্বন্ধের যে কোনও একটির সহায়ে শ্রীভগবানে যুক্ত হন।

ভক্তশিরোমণি শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আদর্শ ভক্তের লক্ষণ ও তার আচরণ কী রূপ—তার সুস্পষ্ট সূচনা দিয়ে বলেছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

তৃণের চেয়েও নীচু, বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু এবং সম্পূর্ণ নিরভিমান হয়ে নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন করবে। আদর্শ ভক্তের করণীয় কি—তার নির্দ্দেশ দিয়ে তিনি আরও বলেছেন—'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন।' অর্থাৎ, যিনি আদর্শ ভক্ত—তিনি করবেন জীবের প্রতি দয়া-প্রদর্শন, হবেন শ্রীভগবানের নাম-জপে রুচিসম্পন্ন এবং তিনি বৈষ্ণব বা সাধুভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সেবায় তৎপর হবেন।

এক্ষণে, আমরা লক্ষ্য করব—গীতাকার শ্রীভগবান স্বয়ং আদর্শ ভক্তের গুণ ও অধিকার বিষয়ে এখানে কীরূপ নির্দ্দেশ দিয়েছেন—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।। ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।। ১৪

অন্বয়—সর্ব্বভূতানাং অদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ, করুণঃ চ এব, নির্ম্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ, সমদুঃখসুখঃ, ক্ষমী, সততং সন্তুষ্টঃ, যোগী, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ, যঃ মদ্ভক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ।। ১৩-১৪

অনুবাদ—যিনি কাহাকেও দ্বেষ করেন না, যিনি সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও দয়ালু, যিনি অনাসক্ত ও নিরহঙ্কার, যিনি সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন, সদা সন্তুষ্ট, জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়সঙ্কল্প, যার মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পিত, এরূপ ভক্ত আমার প্রিয়।। ১৩।১৪

গীতামৃত—অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং—আদর্শ ভক্তের হৃদয়-মন হবে সর্ব্বপ্রকার দ্বেষভাববর্জিত। শুধু মনুষ্যসমাজ নয়, ইতর প্রাণীর প্রতিও তাঁর প্রাণে বিন্দুমাত্র ঘৃণা, উপেক্ষা, অনাদর বা দ্বেষভাব থাকবে না। এরূপ ভক্তের সংখ্যা বিরল সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীভগবান এরূপ পরিপূর্ণ হিংসাদ্বেষবর্জ্জিত ভক্তকেই স্বীয় চিহ্নিত প্রিয় ভক্ত বলে নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক—জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এমন একশ্রেণীর গোঁড়া ভক্ত পরিদৃষ্ট হন, যাঁরা নিজেদের ধর্ম্মমত, ধর্ম্মগ্রন্থ, সাধনপদ্ধতি এবং তাঁদের পরিকল্পিত ঈশ্বরীয় কল্পনার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান্; পরন্তু, তাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত, ধর্ম্মগ্রন্থ, সাধনপদ্ধতি প্রভৃতির প্রতি এত বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন যে তাঁরা ছলে-বলে-কৌশলে তাদিগকে ধর্ম্মান্তরিত করে নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত করাকেই পুণ্য কর্ম্ম বলে মনে করেন। গীতাধর্ম্মের দৃষ্টিতে এঁরা যে আদর্শ ভক্ত নন—তা বলাই বাহুল্য।

মৈত্র :— আদর্শভক্ত যে কেবল দ্বেষভাববর্জ্জিত—তা-ই নয়, তিনি হবেন সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা কারও প্রতি ঈর্ষ্যাদ্বেষের ভাবও পোষণ করে না, আবার তারা কাউকে ভালবাসতেও জানে না। বলা বাহুল্য, এরূপ মনুষ্য ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অনধিকারী।

উপরোক্ত ভাগবত সূচনার অনুরূপ আদর্শ ভক্ত হতে হলে কী রূপ সাধনা প্রয়োজন—নিম্নবর্ণিত সত্য উদাহরণটি তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দান করবে।

উত্তরবঙ্গের স্বনামখ্যাত জমিদার লালাবাবু প্রবীণ বয়সে শান্তিলাভের আশায় বানপ্রস্থী হন বৃন্দাবনধামে। তথায় তিনি একটি সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করে সদ্গুরুর নির্দ্দেশমত ভগবৎ-সেবায় নিমগ্ন হন। কয়েক বৎসরের মধ্যে যখন তিনি তাঁর সাধন-মার্গে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে থাকেন তখন দৈবক্রমে তাঁর সমক্ষে উপস্থিত হয় এক বিষম সংকট। দক্ষিণ ভারত হতে জনৈক ধনী শেঠ এই সময়ে বৃন্দাবনে এসে লালাবাবুর মন্দিরের সম্মুখে এক বিশালতর মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে তাঁর সেবাপূজায় ব্রতী হন। এই ক্ষুদ্র ঘটনাটিকে কেন্দ্র ক'রে লালাবাবুর হৃদয়-মনে প্রজ্জ্বলিত হয় বিশেষ ঈর্ষ্যানল এবং সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে শুরু হয়—ভীষণ মনোমালিন্য ও মামলামোকদ্দমা এবং তার ফলে লালাবাবুর অধ্যাত্ম সাধনায় ঘটে অতিশয় বিঘ্ন। সেই মানসিক অশান্তি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন স্বদেশে এবং মোকদ্দমার ব্যয়-নির্ব্বাহের উপযোগী বিপুল অর্থবিত্ত নিয়ে তিনি পাল্কিযোগে পুনরায় রওনা হলেন বৃন্দাবনের পথে। মনে তাঁর আত্যন্তিক দুঃখ, ক্ষোভ, মনস্তাপ অশান্তি। অন্তিম জীবনে তিনি শান্তির আশায় যাবতীয় সহায়সম্পদ পরিহার করে হলেন বৃন্দাবনবাসী। পরন্তু সামান্য একটি কারণে তাঁর আজ

করই না অধঃপতন ও অধোগতি! পথিমধ্যে একদিন লালাবাবুর কানে ভেসে এল একটি বাণীর প্রতিধ্বনি—'সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, বাসনায় আগুন দিবি না?' বাণীটি উচ্চারিত হয়েছিল পথিপার্শ্বস্থ জনৈক ধোপার কণ্ঠ হতে। সে তার উদাসীন কন্যাকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে কলার বাসনা জ্বালিয়ে খার প্রস্তুত করার জন্য যে নির্দ্দেশ দিচ্ছিল তাই যেন দৈববাণীরূপে প্রবিষ্ট হল লালাবাবুর কর্ণে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় ঘটল তাঁর অপূর্ব্ব মানসিক ভাবান্তর।

পাল্কি, লোক-লস্কর, অর্থ-বিত্ত ছেড়ে তিনি এক্ষণে একাকী পদব্রজে রওনা হলেন বৃন্দাবনের পথে। সেখানে পৌঁছে তিনি গুরুর নির্দ্দেশে কোর্ট হতে মামলা উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় প্রবৃত্ত হলেন গভীর সাধন-ভজনে ; কিন্তু মনের শান্তি তিনি আর কিছুতেই ফিরে পেলেন না। সেই মানসিক দুঃখ-দ্বন্দ্ব নিয়ে তিনি পুনরায় উপনীত হলেন তাঁর আশ্রয়-দাতা গুরুদেবের চরণপ্রান্তে। প্রপন্ন শিষ্যকে লক্ষ্য ক'রে এবার গুরুদেব আদেশ দিলেন—লালা, তুমি এখন হতে বৃন্দাবনবাসীর দ্বারে দ্বারে মাধুকরী ভিক্ষা করে জীবিকা নির্ব্বাহ কর এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তুমি তোমার সাধন-ভজনে ব্রতী হও। এতেই তুমি মানসিক শান্তি লাভ করবে। গুরুভক্ত লালাবাবু গুরুর সে আদেশ শিরোধার্য্য করে আরম্ভ করলেন মাধুকরীব্রত ; কিন্তু শান্তি কোথায়? তাঁর হৃদয়ের শুষ্কতা কিছুতেই নিবারিত হয় না।

এবার তাঁর গুরু তাঁর মনোব্যথা অনুভব করে বললেন—আচ্ছা লালা, তুমি তোমার সম্মুখস্থ শেঠজীর নিকট হতে কোন দিন ভিক্ষা গ্রহণ করেছ কি? এই প্রশ্নে হতবিহ্বল হয়ে লালাবাবু বললেন—শেঠজীর প্রতি আমার তো আর কোন শত্রুভাব নাই—তবে তার নিকট হতে ভিক্ষা নিতে আমার প্রাণে আসে ভীষণ লজ্জা ও সঙ্কোচ। তদুত্তরে গুরুদেব বললেন—শেঠজীর প্রতি কেবল হিংসাভাব ত্যাগ করলেই হবে না, তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ ও বরণ করতে হবে। তবেই তুমি লাভ করবে সত্যকার শান্তি ও সান্ত্বনা। হলও তাই—শেঠজীর নিকট হতে ভিক্ষা গ্রহণ করার পরমুহূর্ত্ত হতে লালাবাবু ফিরে পেলেন তাঁর মানসিক শান্তি।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হতে এই শিক্ষাই লাভ করা যায়- হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করাই যথেষ্ট নয়। আদর্শ ভক্তের পক্ষে প্রয়োজন-সর্ব্বজীবের প্রতি

মৈত্রীভাবাপন্ন হওয়া। অর্থাৎ, যতদিন জগতের একটি লোকের প্রতিও মনে বিন্দুমাত্র বিরূপভাব থাকে ততদিন আদর্শ ভক্ত হওয়া যায় না।

করুণ :— আদর্শ ভক্ত হবেন দয়াবান। মহাত্মা তুলসীদাস তাঁর এক দোঁহায় বলেছেন—"দয়া ধরম কা মূল হ্যায়, পাপমূল অভিমান।" অর্থাৎ, ধর্ম্মের মূলকথা হচ্ছে দয়া বা করুণা, আর অভিমানই হচ্ছে পাপের মূল। জগতে এমন অনেক ভক্ত আছেন যাঁরা তাঁদের ইষ্টদেব বা সদ্‌গুরুর প্রতি বিশেষ ভক্তিভাবাপন্ন এবং তাঁদের সেবাপূজার জন্য তাঁরা একান্ত তৎপর, উৎসাহী ও উদ্যমী। পরন্তু, জীব-জগতের প্রতি তাঁদের প্রাণে নিদারুণ উপেক্ষা ও অনাদরের ভাব। তাঁরা বিস্মৃত হন যে, যে ভগবৎ সেবায় তাঁরা এত অনুরাগী ও উৎসৃষ্টপ্রাণ সেই ভগবানই সর্ব্বজীবে বিরাজমান। তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অনাদরের ভাব পোষণ করলে তাই কখনও ভগবানের প্রসন্নতা অর্জ্জন করা যায় না। পক্ষান্তরে, জগতে এমন লোকের অভাব নাই—যারা অত্যন্ত উদারহৃদয় ও পরোপকারী, কিন্তু তাদের জীবন অত্যন্ত গ্লানিময় ও বাসনাসক্ত। এরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এরূপ দয়ালু ও পরোপকারী ব্যক্তিরা তাদের জীবনের এক শুভ মুহূর্ত্তে কোন মহতের কৃপা লাভ ক'রে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হয়ে যান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন এরূপ ব্যক্তিদের অন্যতম। পরোপকার ও বাসনাসক্তি এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী গুণের একত্র সমাবেশ ছিল—ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের জীবনে। তবে পরিণত বয়সে মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসার পরে তাঁর জীবনে আসে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

পক্ষান্তরে, এই সংসারে এমন অনেক লোক আছে, যারা ধার্ম্মিক রীতি-নীতি, ব্রতোপবাস প্রভৃতি পরিপালনে বিশেষ তৎপর। পরন্তু, তারা দীন-দুঃখীর প্রতি বিন্দুমাত্র কৃপা বা সেবার ভাব পোষণ করে না। এরূপ সঙ্কীর্ণমনা অনুদার ব্যক্তিদের পক্ষে ধর্ম্মজগতে উন্নতি করা অত্যন্ত ক্লেশসাধ্য। কেন না, যে হৃদয় হচ্ছে সর্ব্বপ্রকার প্রেরণা ও ভাবভক্তির উৎস, তার বিকাশসাধনেই তারা বিমুখ ও উদাসীন।

নির্ম্মম :— আদর্শ ভক্ত হবেন নির্ম্মম বা মমত্বহীন। বস্তুতঃ, মমত্ববুদ্ধিই হচ্ছে সংসার-বন্ধনের সর্ব্বপ্রধান হেতু। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মমত্ববুদ্ধিবশতঃ স্বীয় পুত্রগণকে যদি প্রথম হতে প্রশ্রয় না দিতেন তবে কৌরবগণ এতখানি

দুরাচারী ও ভ্রাতৃবিদ্রোহী হয়ে পাণ্ডবদের সর্ব্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর হত না।

মমত্ববুদ্ধি বা "আমি আমার" ভাব যে কীরূপ ভীষণ ও মারাত্মক তা আর একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করব। একজন অলস প্রকৃতির কর্ম্মকুণ্ঠ ব্যক্তি তার স্ত্রী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়ে ক্ষুণ্ণ মনে গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ল ভাগ্যের অন্বেষণে। মনে তার সুদৃঢ় সঙ্কল্প—লক্ষপতি না হওয়া পর্য্যন্ত সে আর গৃহে ফিরবে না। এদিকে সময়মত তার গর্ভবতী স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করল। ছেলেটি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তার মার নিকট প্রশ্ন করল—"মা, আমার বাবা কোথায়?" প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মা ছেলেটির সামনে দুই তিনখানা পত্র রেখে বললেন—"এই তো মাঝে মাঝে তোর বাবার পত্র আসে, কিন্তু তাতে কোনও ঠিকানার বালাই নাই।" ছেলেটি পত্রগুলির উপর অঙ্কিত ডাকঘরের শীলমোহর দেখে কতকটা আন্দাজ করে নিল তার বাবা কোথায় কোন্ দিকে আছেন এবং একদিন মায়ের অনুমতি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল পিতার সন্ধানে। পল্লীর পর পল্লী অতিক্রম করে পরিশেষে সে উপস্থিত হল এক সহরের উপকণ্ঠে। সেখানে রাত্রি-যাপনের জন্য সে আশ্রয় নিল পথিপার্শ্বস্থ একটি ধর্ম্মশালায়। অন্যদিক হতে তার পিতা তার সঙ্কল্পিত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে ঘরে ফেরার উদ্দেশ্যে চলতে চলতে দৈবযোগে সেই ধর্ম্মশালায় এসে উপস্থিত হলেন। কারুর সঙ্গে কারুর পরিচয় নাই। অথচ উভয়ের বিশ্রামের স্থান হল একই কক্ষে। ছেলেটি পথশ্রান্তিতে একান্ত ক্লান্ত —তারপরে আহার্য্য-দোষে সেই রাত্রেই সে আক্রান্ত হয়ে পড়ল দুরারোগ্য কলেরা-রোগে। সারারাত ধরে চলল তার ভেদ-বমি ও করুণ আর্ত্তনাদ। বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়ায় ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বারংবার তিরস্কার করতে থাকলেন বালকটিকে। দ্বারবানটিকে ডেকে এনে বললেন তাকে হঠিয়ে দেবার জন্য। এই অবস্থাচক্রের মধ্যে বিনা চিকিৎসায় অসহায় অবস্থায় সেই রাত্রিতে বালকটির মৃত্যু ঘটল। প্রাতঃকালে সংবাদ পেয়ে পুলিশ এল। তার খোঁজ করতেই তার পকেট হতে বেরিয়ে পড়ল কয়েকখানা চিঠি। পত্রের হস্তাক্ষর সেই ভদ্রলোকটি একান্ত হতবিহ্বল চিত্তে লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতলে এবং ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে প্রাণফাটা আর্ত্তনাদ করতে থাকলেন। সেই দৃশ্য

দেখে সকলে হতবাক্। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে-লোকটি ছিল ঐ বালকটির প্রতি এতখানি বিরক্ত ও বিমুখ, তার প্রতি এখন তাঁর এত অনুরাগ আসক্তি কেন? সংবাদ নিয়ে সকলে জানতে পারল—ঐ ছেলেটি আর কেউ নয়, তাঁরই ঔরসজাত পুত্র। তাঁর পকেটের পত্রগুলি তাঁর স্ত্রীর নামে লেখা তাঁর নিজ হাতের চিঠি।

মমত্ববুদ্ধি যে কীরূপ ভীষণ ও মোহপ্রদ—এই ঘটনাটি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয় কি? এই জগতের অসংখ্য বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে যখনই কাউকে বা কোনও কিছুতে আমিত্বের লেবেল লাগান হয়, তখনই মনে জাগ্রত হয় তার প্রতি আত্যন্তিক মোহাসক্তি। বলা বাহুল্য, এই মমত্ববুদ্ধি বা আসক্তিই বন্ধনের সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ।

নিরহঙ্কার :— মমত্ববুদ্ধির ন্যায় অহঙ্কার-অভিমানও অধ্যাত্মপথের আর একটি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। প্রবাদ-বাক্যে বলা হয়—"অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।" অর্থাৎ, আত্যন্তিক দম্ভ ও দর্পের ফলে দশানন তাঁর স্বর্ণপুরী লঙ্কা সহ সবংশে নিহত হন এবং মাত্রাহীন অভিমানের ফলে অধঃপতন ও সর্ব্বনাশ ঘটে কৌরবকুলের। বস্তুতঃ, মানুষ যতদিন আমিত্বের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া করে নিজেকে আড়াল করে রাখে, ততদিন সে থাকে ভগবান্ হতে শত শত যোজন দূরে। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, অহঙ্কার শুধু কোনও একটি বিশেষ বস্তুকে আশ্রয় করে সাধকের মনে জাগ্রত হয় না। দেহ, গেহ, রূপ, যৌবন, ধন, জন, যশঃ, মান প্রভৃতি জাগতিক সর্ব্বপ্রকার বিষয়-বস্তু নিয়ে যেমন অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়, তেমনই ধর্ম্মজগতে 'আমি বড় ভক্ত', 'আমি বড় জ্ঞানী', 'আমি মহান্ তপস্বী' ইত্যাকার মনোভাব নিয়েও সৃষ্ট হয়—এক প্রকার সাত্ত্বিক অভিমান। তা ছাড়া, তামসিক স্তরেও আর এক প্রকার অভিমান দেখা যায়—যা হতে উৎপন্ন হয়—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যরূপী ভয়ঙ্কর দুর্গুণ ও দুষ্প্রবৃত্তিগুলি। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার অহঙ্কারই ভক্তিপথে অন্তরায় বা কণ্টকস্বরূপ। আদর্শ ভক্তকে তার সাধনার চরম অবস্থায় উন্নীত হবার জন্য তাই এই সব অভিমানগুলিকে নিঃশেষে পরিহার ক'রে সম্পূর্ণ নিরভিমান ও নিরহঙ্কার হতে হয়।

এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণ রাখা আবশ্যক—অন্য সব অভিমান দূরীভূত

হবার পরেও মানুষের মনে থাকে দেহাত্মবুদ্ধি বা দেহে আত্মবুদ্ধির অভিমান। এটিকে ত্যাগ করতে না পারলে সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার বা নিরভিমান হওয়া যায় না। আর এজন্য প্রয়োজন—দীর্ঘকালব্যাপী নিরন্তর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আত্মবিশ্লেষণ ও সদ্‌গুরু বা ভগবচ্চরণে কাতর প্রার্থনা ও প্রাণপাতী প্রচেষ্টা। কবি সত্য সত্যই বলেছে—"আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল"। অর্থাৎ, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য-বোধরূপী যে আমিত্ব-বুদ্ধি তার সম্পূর্ণ নাশ হলে সাধক তাঁর পরম ভাগবত স্বরূপ লাভ ক'রে ধন্য হন।

সমদুঃখসুখ :— যিনি আদর্শ ভক্ত তিনি হবেন সুখে-দুঃখে সমবুদ্ধি। সাধারণতঃ মানুষ হয় সুখে উৎফুল্ল ও দুঃখে অবসন্ন। বলা বাহুল্য, এই উচ্ছ্বাস ও অবসাদ—দুই'ই মানসিক চাঞ্চল্যের বিশেষ হেতু। সত্যকার ভক্তের হৃদয়-মন প্রতিষ্ঠ হবে—এই সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে। কেন না, যতদিন তাঁর মনে বিন্দুমাত্র অধৈর্য্য বা চাঞ্চল্য বর্তমান, ততদিন তাঁর ভক্তিসাধনা অসম্পূর্ণ ও অসফল। গীতায় শ্রীভগবান্ এজন্য পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ দিয়ে বলছেন—সাধক সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থাতে থাকবেন ধীর, স্থির, অবিচলিত ও অবিকম্পিত। এই অবস্থায় উন্নীত হওয়া আদৌ সহজসাধ্য নয়। এজন্য প্রয়োজন—ঐকান্তিক অধ্যবসায় সহকারে অবিরাম প্রাণপাতী প্রচেষ্টা।

আদর্শ ভক্তের দৃষ্টিতে সুখ-দুঃখ উভয়ই—তাঁর পরম প্রিয় প্রভুর দান। পরম তপস্বী মৌনী বাবা তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—"পরম পিতার কৃপায় গত পাঁচদিন অনাহারে ছিলাম; আজ তাঁর আশীর্ব্বাদে আকস্মিক ভাবে আহার্য্যের সংস্থান হল।" অন্যত্র লিখেছেন—"পরম পিতার কৃপায় গত দশ দিন যাবৎ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলাম, আজ তাঁর অপার করুণায় রোগমুক্ত হলাম্" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মহান্ সাধকের দিনচর্য্যা অনুধ্যান করলে উপলব্ধি করা যায়—আদর্শ ভক্ত বা সাধক তাঁর সাধনার পথে উপনীত ভাল-মন্দ দ্বন্দ্বগুলিকে কী রূপে সাদরে বরণ ও গ্রহণ ক'রে তাদিগকে তপস্যায় রূপান্তরিত করেন।

এখানে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"—এই সংসারে সুখ ও দুঃখ নিরন্তর চক্রবৎ আবর্ত্তিত হতে থাকে। অর্থাৎ, সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ আসতে বাধ্য। জ্ঞানী সাধক এই পরম

তত্ত্বটি অবগত হয়ে তাঁর চিত্তের সাম্য বা সমত্বের ভাব রক্ষা করে চলেন। বস্তুতঃ, সিদ্ধির চরম অবস্থা বা উচ্চতম সমাধির স্থিতিতে অবস্থিত থাকা কালেই সাধক কেবল দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় অবিচলিত থাকেন। সেই অবস্থায় উন্নীত হবার পূর্ব্ব বা পরের স্থিতিতে সাধককে অল্প-বিস্তর দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতেই হয়। তবে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ তাঁদের সিদ্ধির পরবর্ত্তী অবস্থায় আগত সুখ-দুঃখকে প্রারব্ধ মনে ক'রে ধৈর্য্য সহকারে উপেক্ষা করে থাকেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস যখন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলেন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য ভক্তগণ অধীর অস্থির হয়ে যখন তাঁকে বারংবার প্রশ্ন করতে থাকলেন, ঠাকুর, আপনার দেবদেহে এরূপ ব্যাধির আক্রমণ কেন? তখন তিনি মধ্যে মধ্যে বলতেন—"তোদের ব্যাধি নিয়েই তো আমার এই দুর্ভোগ।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলতেন—"আমি কি এই ব্যাধিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছি?"

ক্ষমী :— আদর্শ ভক্ত হবেন ক্ষমাশীল। শাস্ত্রকারও বলছেন—"ক্ষমা গুণং তপস্বিনাম্"; অর্থাৎ, তপস্বীদের পরম গুণ হচ্ছে—ক্ষমা। যিনি ভগবানের সত্যকার ভক্ত তিনি তাঁর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই সত্য তত্ত্বটি অনুভব করেন যে, মানুষ মাত্রেই কিছু-না-কিছু ভুল, ভ্রান্তি বা দুর্ব্বলতার দাস। তিনি তাই তাদের এই সাময়িক দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা ও উপেক্ষার চক্ষে দেখতে অভ্যস্ত হন। মহর্ষি বশিষ্ঠের শত পুত্র বিশ্বামিত্রের কোপে নিহত হলেন, তথাপি অভিসম্পাতের পরিবর্ত্তে বশিষ্ঠদেব তাঁকে ক্ষমাই করলেন। আর তাঁর সেই ক্ষমার ফলেই বিশ্বামিত্রের জীবনে এল অপরূপ ভাবান্তর। আদর্শ ব্রাহ্মণ যে কত উদার, মহান্, ক্ষমাশীল তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রে তিনি ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জনের সাধনায় ব্রতী হয়ে পরিশেষে সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ধন্য হলেন! মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট যাদের হস্তে ক্রুশবিদ্ধ হলেন, মৃত্যুর প্রাঙ্‌মুহূর্ত্তে তিনি তাদের সেই মহাপরাধের জন্য পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছিলেন—"Oh Father, please forgive them for they do not know what they are doing."

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর অন্যতম বিশেষ অনুশাসন ছিল—উপেক্ষা ও ক্ষমা। তিনি তাঁর আশ্রিত সন্তানগণকে লক্ষ্য করে বারংবার বলেছেন—"উপেক্ষাই সাধকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

গুণ ও সম্পদ। তোমরা তোমাদের পরস্পরের ভুল ত্রুটিকে উপেক্ষা ও ক্ষমা ক'রে তোমাদের সঙ্ঘের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনকে সুদৃঢ় করে তোল।" নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে তিনি কখনও কখনও বলতেন—"আমি যদি তোমাদের ভুল-ত্রুটিগুলি পদে পদে ক্ষমা ও উপেক্ষা না করতাম তা হলে কি তোমরা এক মুহূর্ত্তও আমার নিকটে থাকতে পারতে?"

বস্তুতঃ, মহাপুরুষগণ লোকসংগ্রহের কার্য্যভার গ্রহণ করে সমগ্র জীবন অগণিত পাপী-তাপীর দোষ-দুর্ব্বলতাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেই তাদের কৃপা করে থাকেন। তাঁরা সত্য সত্যই ক্ষমাসুন্দর।

এক গল্পের জনৈক সাধক অপার কৃচ্ছ্র কঠোর তপঃসাধনার মধ্য দিয়ে ভগবানকে প্রসন্ন ক'রে তাঁর বরাশিস্ লাভ করলেন। আর সেই দীর্ঘকালীন সাধনার ফলে তিনি লাভ করলেন—জগন্নিয়ন্তা বিধাতার পরম পদ। সেই মহান্ পদে উন্নীত হয়ে এক দিনের মধ্যেই তিনি পাপী-তাপীদের যে ভাবে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করতে আরম্ভ করলেন তা লক্ষ্য করে ভগবান্ তাঁকে বললেন—তুমি যাদিগকে তাদের ক্ষণিকের দুর্ব্বলতার জন্য কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করছ, আমি এতকাল যাবৎ তাদের সেই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে উপেক্ষা ও ক্ষমার চক্ষে দেখেই তাদের প্রতিপালনের চেষ্টা করে এসেছি। এতে তুমি নিজেই বুঝতে পার—"তোমার ন্যায় অসহিষ্ণু ব্যক্তির পক্ষে এই মহান্ দায়িত্ব সম্পাদন করা কত দুরূহ।" সাধকটি তখন তাঁর ভ্রান্তি বুঝতে পেরে স্বতঃই বললেন—"ঠাকুর, তুমি তোমার দায়িত্বভার নিজেই গ্রহণ কর, আমি এ কাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী :— ভক্ত যোগী সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্টচিত্ত। নীতিশাস্ত্রে বলা হয়—"সন্তোষং পরমং সুখম্, আশা হি পরমং দুঃখম্।" অর্থাৎ, সন্তোষই পরম সুখ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাই আত্যন্তিক দুঃখের কারণ। ইংরাজী প্রবাদেও বলা হয়—"Contentment is bliss."

এক শ্রেণীর খুঁতখুঁতে প্রকৃতির লোক আছে—যারা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায় বা অতি সামান্য আঘাতে মুষড়ে পড়ে। ভাল-মন্দ প্রত্যেকটি ব্যাপারেই এদের মনে অসুখ ও অসন্তোষ। বলা বাহুল্য, এদের জীবন চির-দুঃখময়।

আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা জন্ম-কুঁড়ে। একটু চেষ্টা যত্ন বা

শ্রম করলে তারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, কিন্তু তাতে তারা নারাজ। যাযাবর রূপে এরা পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে জীবনপাত করে ; উচ্চতর জীবন যাপনের দিকে এদের আদৌ দৃষ্টি নাই। গৃহদ্বার নির্ম্মাণ ক'রে সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করার দিকে এদের রুচি বা আগ্রহের একান্ত অভাব। বাহ্যতঃ মনে হয়—এরা পরম সুখী ও সন্তোষী। পরন্তু, এদের রুচি-প্রবৃত্তি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বোঝা যায়—এদের এই তথাকথিত সন্তোষ ঘোর তামসিকতারই নামান্তর। এদের মধ্যেও ভোগ-বাসনা যে নাই তা নয়, তবে তা বিশেষ প্রসুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন ; এরা তার চরিতার্থতা খোঁজে ভিন্ন ও ভ্রান্ত পথে এবং বিকৃত রূপে। অতি নীচ ও জঘন্য বিষয়বস্তুতেই এদের পরম তৃপ্তি। বলা বাহুল্য, এরূপ তামসিক দারিদ্র্য ও মিথ্যা ও সন্তোষ জাগতিক উন্নতি অভ্যুদয়ের একান্ত পরিপন্থী। এদের জীবনকে উন্নত পর্য্যায়ে তুলতে হলে এদেরকে ক্রমশঃ যোগ্য শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে ভদ্ররুচিসম্পন্ন সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এনে তাদের মধ্যে অভাববোধ জাগিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বস্তুতঃ, অনেক অরণ্যচারী যাযাবর প্রকৃতির মনুষ্যেরা এইরূপেই সর্ব্বত্র উন্নত রুচিসম্পন্ন সভ্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে একটি নীতি-সূত্র হচ্ছে—"Necessity is the mother of invention." অর্থাৎ, প্রয়োজনবোধই আবিষ্কারের জননী। মানুষের চলার পথে পরিস্থিতির চাপে যখন যেরূপ নূতন নূতন প্রয়োজনের তাগিদ এসেছে, তখন তদ্রূপ তত্ত্ব, তথ্য ও দ্রব্য সামগ্রীর আবিষ্কার হয়েছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ও অভ্যুদয়ের ইতিহাস অনুধ্যান করলে এই সত্যই অবগত হওয়া যায় যে, বাহ্য প্রকৃতির ভালমন্দ প্রতিক্রিয়ায় মানুষের মনে জাগ্রত হয়েছে গৃহনির্ম্মাণের আকাঙ্ক্ষা ও বিবিধ ভোগ্যবস্তুর আবিষ্কারের বুদ্ধিকৌশল। এই একই কারণে মানুষের বেশভূষা, ছাতা, জুতা, যানবাহন ও অন্যান্য তৈজসপত্রগুলিও... ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে। আর এই ভাবে শুধু যে তাদের ভৌতিক স্তরে উন্নতি অভ্যুদয় ঘটেছে তা-ই নয়, ইত্যাকার আশা-আকাঙ্ক্ষার তাগিদই মানুষকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নতি ও প্রগতিশীল করে তুলেছে।

বস্তুতঃ, মানব সভ্যতার উৎক্রান্তি বা ক্রমবিকাশের ইহাই সনাতন ধারা। অর্থাৎ, উন্নতি-অভ্যুদয়ের জন্য প্রয়োজন—অভাববোধ। এক্ষণে প্রশ্ন আসে

—এইরূপ অসন্তোষ ও অভাববোধই যখন ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির সত্যকার পরিপোষক তখন মনুষ্যজীবনে সন্তোষের স্থান ও মহত্ত্ব কোথায়? "চাই, আরও চাই"—ঐরূপ উগ্র বাসনা-কামনাই যখন উন্নতি অভ্যুদয়ের মূলসূত্র, তখন সন্তোষ বা স্বল্পে তুষ্টির স্থান আছে কি?

উত্তরে বলা যায়—জীবন-বিকাশের প্রাথমিক স্তরে ইত্যাকার অসন্তোষ ও অভাববোধের প্রয়োজনীয়তা যে অনিবার্য্য তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে, এই অভাববোধের একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। সমগ্র জীবন কেবল "চাই চাই" করে হা-হুতাশ করতে থাকলে জীবনে কোন প্রকার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ও শান্তির অবস্থা লাভ হয় না। এরূপ, 'চাওয়া-পাওয়ার' ইতি না হওয়ায় মানুষের জীবন হয়ে উঠে অন্তহীন দুর্ব্বার সংগ্রামময়—যাতে গতি থাকলেও লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থলের স্থিরতা থাকে না। এতে নিত্য-নূতন আবিষ্কারের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই থাকে ; পরন্তু, এর দ্বারা কোনও দিন চরম শান্তির আশ্বাস ও সান্ত্বনা মিলে না। বস্তুতঃ, এইরূপ অসন্তোষপ্রবণ যে প্রগতি, তা দুর্গতিরই নামান্তর। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদী সভ্যতা আজ এই পথেই ধাবিত। ভৌতিক স্তরে এবম্প্রকার নিত্য নূতন অভাববোধ তাদের জীবনকে আজ করে তুলেছে ঘোর অশান্তিময় ও বিনাশপন্থী।

পক্ষান্তরে, ভারতীয় জীবন-বিকাশের চিন্তাধারা অনেকখানি স্বতন্ত্র। ভারতীয় ঋষি বলেছেন—বাইরের যে ঐহিক জীবন তার বিকাশ, প্রকাশ ও সমৃদ্ধিই চরম কথা নয়। এই বাহ্য ও ব্যবহারিক জীবনের উর্দ্ধে উত্থিত হয়ে মানুষকে অন্তিমে পেতে হবে—সেই অতীন্দ্রিয়, অলৌকিক জীবনের সন্ধান। ভৌতিক স্তরের অভাববোধ তাই ততটুকুই বাড়ান উচিত যতটুকু দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যলাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ, জড় দেহ, মন ও প্রাণের ক্ষুধা মেটাবার জন্য যতখানি বাহ্য প্রয়াস ও উদ্যম অত্যাবশ্যক তা অবশ্যই করণীয়। পরন্তু, এর পরে চাই—অন্তরের যে আত্মিক ক্ষুধা বা অতৃপ্তি—তার পরিপূরণের প্রয়াস-প্রচেষ্টা। বাহ্য জীবনের অভাববোধের পরিবর্ত্তে তখন প্রয়োজন—আত্মিক জীবনের চরম বিকাশের নিমিত্ত ঐকান্তিক উৎকণ্ঠা ও অভাববোধ। আর এই অভাববোধই হয় তখন তার আত্মিক কল্যাণ বা অধ্যাত্মমুখী বিকাশের পরম সহায়ক। যুগ যুগ ধরে জীবনদর্শনের এই সত্য-তত্ত্বটি ভারতীয় সাধককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই দিব্য মর্ম্মবাণী—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—অর্থাৎ, যা আমাকে অমৃতত্ব বা পরম শান্তির সন্ধান দিবে না, তা নিয়ে আমি কি করব?

প্রশ্ন আসে—যাঁরা খুব উন্নত স্তরের মুমুক্ষু বা জিজ্ঞাসু নন, তাদের পক্ষে সন্তোষ-সাধনার উপায় কি? উত্তরে বলা যায়, সাধারণ লোকের মানসিক অসুখ অসন্তোষের অন্যতম কারণ হচ্ছে—লোকভয় বা প্রতিষ্ঠাহানির মিথ্যা কল্পনা। একশ্রেণীর নর-নারী আছে যারা নিরন্তর মনে করে—দীন-হীন মলিন বেশে থাকলে বা ভাল জামা-জুতো, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান না করলে বন্ধু-বান্ধবরা তাদিগকে কতই না হেয় জ্ঞান করে উপেক্ষা ও অবহেলা করবে। তাদের এরূপ কল্পনা বা ধারণা কীরূপ অলীক ও মিথ্যা তার প্রতি ইঙ্গিত করে আচার্য্য প্রণবানন্দ কখনও কখনও তাঁর সন্তানগণকে শিক্ষাদান ছলে বলতেন—"**লোকের তো আর কোন কাজকর্ম্ম নাই যে তারা কেবল দিবারাত্র তোমাদের পোষাক পরিচ্ছদ জামা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এরূপ চিন্তা ধারণা যারা করে তারা একান্তই ভ্রান্ত ও মোহগ্রস্ত। যাদের মনে কোন উচ্চ চিন্তা বা দায়িত্ববোধ নেই তারাই শুধু এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় ও মন খারাপ করে।**"

বস্তুতঃ, দুঃখ-দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্যজনিত ইত্যাকার মানসিক গ্লানি ও অসন্তোষ দূর করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে—উচ্চ স্তরের ধনিগণের দিকে লক্ষ্য না দিয়ে নিম্নস্তরের অপেক্ষাকৃত দীন-দুঃখীদের অবস্থার বিষয় চিন্তা করা। কথিত আছে—জনৈক জুতাহীন ব্যক্তি মানসিক দুঃখ ক্ষোভ নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যখন ভাবছে—সে কেমন করে খালি পায়ে রাস্তায় বের হবে, তখন হঠাৎ তার চোখে পড়ল—একজন খঞ্জ ব্যক্তি রাস্তার মাঝখান দিয়ে তার হাত দুখানি ও বিকৃত পদযুগলের উপর ভর দিয়ে কেমন নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলেছে। এই দৃশ্য দেখেই তার মনের সমস্ত অসন্তোষ ও হীনমন্যতার ভাব দূর হয়ে গেল। দৃষ্টান্তটি কতই না শিক্ষাপ্রদ।

জগতে আর এক শ্রেণীর নর-নারী আছে যারা বাহ্যতঃ বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েও নিজেদের অত্যন্ত দীন-হীন মনে করে। বস্তুতঃ এদের দিকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে—"যে যত পায়, সে তত চায়।" ভর্তৃহরির সেই মহান্ উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—

ভোগাঃ ন ভুক্তাঃ বয়মেব ভুক্তাঃ।
তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥

অর্থাৎ, ভোগ আমরা করি না, ভোগই আমাদের ভোগ করে নিঃশেষ করে ফেলে। তৃষ্ণা বা ভোগবাসনা কখনো জীর্ণ হয় না, তৃষ্ণাই আমাদিগকে জীর্ণশীর্ণ করে।

এই কারণে আর্য্য ঋষিগণ প্রাচীনতম কালে ভারত-ভারতীর সমক্ষে যে আদর্শ উপস্থাপিত করেছিলেন তা হচ্ছে—সরল জীবন ও উন্নত চিন্তা—"Plain living and high thinking." নবদ্বীপের প্রখ্যাত পণ্ডিত বুনো রামনাথ ও তদীয়া সতীসাধ্বী ধর্ম্মপত্নী ছিলেন উক্ত আদর্শের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পণ্ডিতপ্রবরের বিদ্যার খ্যাতি ছিল অসামান্য। তাই অগণিত ছাত্র তাঁর নিকট সমাগত হত বিদ্যালাভের জন্য। শুধু বিদ্যাদান নয়, তাদের ভরণ-পোষণের বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হ'ত পণ্ডিতপ্রবরকে। পরন্তু, তাঁর সাংসারিক অবস্থা ছিল—একান্ত দরিদ্র ও অস্বচ্ছল। মুষ্টিভিক্ষার উপর নির্ভরশীল রামনাথকে তাই মধ্যে মধ্যে নিদারুণ অনটনের মধ্যে কালাতিপাত করতে হ'ত। তাঁর বিদ্যাদানের অসামান্য খ্যাতি শুনে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র একদিন তাঁর নিকট এসে প্রশ্ন করলেন—"পণ্ডিত মহাশয়, আপনার কোন অনুপপত্তি আছে কি?" নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামনাথ উত্তর দান প্রসঙ্গে 'অনুপপত্তি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করে বললেন—"না, এখন আর কোনও অনুপপত্তি নাই; ছাত্রদের কাছে সব পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে দিয়েছি।" বিস্ময়বিমূঢ় মহারাজ তখন প্রশ্নটি পরিষ্কার করে বললেন—"আমি জানতে চাচ্ছি আপনার আর্থিক অভাব অনটনের কথা।" এই প্রশ্নের উত্তরেও পণ্ডিতজী ব'লে উঠলেন—"সে অভাবও তো আছে বলে মনে হয় না। যেদিন একান্ত খাদ্যাভাব হয় সেদিন আমার গৃহিণী তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করে দেন; সশিষ্যে আমরা তারই ঝোল সানন্দে পান করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করি।" মহারাজ শিবচন্দ্র বুনো রামনাথের এই মানসিক প্রশান্তির ভাব লক্ষ্য ক'রে একান্ত বিস্মিত হয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।

বুনো রামনাথের স্ত্রী দীনহীন বেশে যখন স্নানের ঘাটে যেতেন তখন তাঁর সেই দৈন্যদশা দেখে পুরস্ত্রীরা কখনো কখনো বিদ্রূপ ছলে বলতেন—"যেমন লক্ষ্মীছাড়া স্বামী, তেমনি তার অলক্ষ্মী স্ত্রী। একখানা ভাল কাপড়

বা দুখানা গহনাও তার অদৃষ্টে জুটে না।" তাদের এই বিদ্রূপাত্মক সমালোচনার যোগ্য উত্তর দিয়ে ব্রাহ্মণী সগর্ব্বে বলতেন—"আমার সিঁথির সিঁদুর, পায়ের আলতা ও হাতের লালসূতা দুটি যতদিন থাকবে ততদিনই তোমাদের নবদ্বীপের গর্ব্ব-গৌরব, আর তার অভাব যেদিন হবে সেদিন নবদ্বীপ হবে অন্ধকার।" সারল্য ও সন্তোষের এই ভারতীয় সনাতন আদর্শ সত্য সত্যই পরিলক্ষিত হয়—বুনো রামনাথ ও তদীয়া ধর্ম্মপত্নীর জীবনে।

যতাত্মা :— আদর্শ ভক্ত হবেন সংযতচিত্ত বা জিতেন্দ্রিয়। যেখানে দুষ্পূরণীয় কামনা-বাসনা বিদ্যমান, সেখানে ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তির স্থান নাই। দিন ও রাত্রি, আলোক ও অন্ধকার যেমন একত্র থাকতে পারে না, কাম ও রামের একত্র অবস্থিতিও তেমনি অসম্ভব। এই জন্যই বলা হয়—জঁহা রাম তাহাঁ নহী কাম।

মানুষের মন হচ্ছে একটি ; তাকে একই সময়ে বিষয় ও ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত রাখা যায় কেমন করে? এজন্য জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সংযম-সাধনার উপর এতখানি জোর দিয়েছেন। বাইবেল বলেছেন—"Root out the eye that looks upon a woman wilfully." অর্থাৎ, উৎপাটন কর সেই চক্ষুটি যা স্ত্রীলোকের প্রতি লালসার সহিত দৃষ্টিপাত করে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মেও শীল-সাধনার স্থান অতি উচ্চে। সম্রাট যযাতি বলেছেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কাম-বাসনা কদাপি উপভোগের দ্বারা শান্ত হয় না। অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করলে তা যেমন আরও বর্দ্ধিত হয়—এও তদ্রূপ।

মনুষ্যদেহে যে দশটি ইন্দ্রিয় বিদ্যমান তাদের মাধ্যমে শক্তি আহৃত ও নির্গত হয়। চক্ষুঃ দ্বারা যখন আমরা কোন সুন্দর ও পবিত্র বস্তু দর্শন করি, তখন আমরা তদ্দ্বারা লাভ করি নূতন পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও শক্তি। পক্ষান্তরে, আমরা যদি তাদের দ্বারা কোন কুৎসিত এবং অপবিত্র বস্তু দর্শন করি তবে তা আমাদের মনকে করে কলুষিত ও দুর্ব্বল। নাসিকা-কর্ণাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধেও সেই কথা। এজন্য জ্ঞান ও শক্তিকামী নর-নারীর পরম কর্ত্তব্য হচ্ছে—বাক্, পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষুঃ, কর্ণাদি পঞ্চ

জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সর্ব্বদা সংযত ও বশীভূত রেখে তাদিগকে সুপথে পরিচালিত করা।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণীয়। ইন্দ্রিয়সংযমের অর্থ এই নয় যে রূপ-রসাদি বিষয় পঞ্চক হতে চিরকাল দূরে অবস্থান করতে হবে। দেহধারী জীবের পক্ষে ইহা যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনি তার প্রয়োজনও নাই। বিষয়ভোগের পরিণাম যে অত্যন্ত ক্লেশপ্রদ ও বিপজ্জনক তা সম্যক্ উপলব্ধি করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়বিতৃষ্ণ করা আদৌ সম্ভবপর নয়। এই কারণে সংযম-সাধনার জন্য প্রয়োজন—বিষয়ের অনিত্যতা, বিষয়ভোগের পরিণামের বিচার এবং আধি, ব্যাধি ও মৃত্যু-চিন্তার মাধ্যমে মনোবুদ্ধিকে ক্রমশঃ বিষয়বিতৃষ্ণ করে তোলা।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে ইন্দ্রিয়সংযমের ব্যাপারে কি তবে কৃচ্ছ্র তপশ্চর্য্যার কোনও প্রয়োজন নাই? উত্তরে বলা যায়—প্রাথমিক স্তরে সাধকের মনোবুদ্ধি যখন অত্যন্ত নিম্নগামী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত থাকে, ভোগ্য বিষয়ের সংস্পর্শে এলেই যখন তার মন বিবশ হয়ে তার পশ্চাতে ধাবিত হয়, শতবিধ বিবেক-বিচারের দ্বারাও যখন তার ভোগবাসনা শান্ত ও সংযত হয় না, তখন সেই অবস্থায় সাধকের পরম কর্ত্তব্য—প্রবল চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তু হতে কিছুদিন দূরে অবস্থান করা। এই সময়ে প্রয়োজনবোধে নির্জ্জন বাস, লোকসঙ্গ-পরিহার, মৌনব্রত-সাধন, কামিনী-কাঞ্চনকে নরকের দ্বার ও সাধনপথের পরম শত্রু জ্ঞানে তাদের সঙ্গ-বর্জ্জন ও উপবাসাদি কৃচ্ছ্র ব্রতগুলির আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ। তবে ইত্যাকার কৃচ্ছ্র সাধনাকে চিরস্থায়ী করে রাখার প্রচেষ্টা অর্থহীন। কেন না, ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আত্যন্তিক আসক্তি যেমন হানিকর, তেমনই তাদের প্রতি আত্যন্তিক দ্বেষ ও ঘৃণার ভাবও অহিতকর। সংক্ষেপে বলা যায়—ভগবানের যিনি প্রিয় ভক্ত তিনি হবেন মিতাহারী, মিতাচারী, মিতব্যয়ী, মিতবাক্ ও মিতদৃষ্টি। বৌদ্ধধর্ম্ম ইহাকেই নির্দ্দেশ দিয়েছেন—মধ্যম পন্থা বলে। গীতাও সেই পন্থারই সমর্থন করেছেন।

দৃঢ়নিশ্চয় :— জগতে এমন এক শ্রেণীর লোক আছে যারা অত্যন্ত শিথিলচিত্ত বা ঢিলা প্রকৃতির। সচরাচর দেখা যায়—এরূপ প্রকৃতির লোক কোনও কঠোর ব্রত বা সঙ্কল্প গ্রহণে ভীত ও সন্ত্রস্ত। আর যদি বা তারা কখনও স্বেচ্ছায় বা পরেচ্ছায় কোনও সঙ্কল্প গ্রহণ করে তবে তা পালন বা রক্ষা করার দৃঢ়তাও তাদের থাকে না। ব্যবহারিক জীবনেও এরা সর্ব্বকার্য্যে পদে পদে আহত ও ব্যাহত হয়। বলা বাহুল্য, ভক্তিরাজ্যে এরা যে এক পাও অগ্রসর হতে পারে না—তা সুনিশ্চিত।

"মন্ত্রং সাধয়ামি শরীরং বা পাতয়ামি"—সত্যকার সাধকের ইহাই হচ্ছে জীবনের মূলমন্ত্র। অধ্যাত্মপথের যাঁরা সাধক তাঁদের গুণ ও অধিকারের বর্ণনা-প্রসঙ্গে উপনিষদও বলেছেন—আদর্শ সাধক হবেন—আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও মেধাবী। শ্রুতিসূচিত এই চারিটি গুণের পশ্চাতে রয়েছে সঙ্কল্পনিষ্ঠার প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ। সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দজী বলতেন—**"সঙ্কল্পই জীবন, সঙ্কল্পই সাধনার মূলমন্ত্র, সঙ্কল্পই সাধকের যথাসর্ব্বস্ব। সঙ্কল্প ছাড়ব না, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গব না—এই যার জীবনের মূলনীতি—সেই বিশ্ববিজয়ী হতে পারে।"**

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি ঃ— আদর্শ ভক্তের মনোবুদ্ধি ভগবানে অর্পিত। অর্থাৎ, অনন্য ভগবন্নিষ্ঠাই সত্যকার ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। লৌকিক জগতেও দেখা যায়—মানুষ যখন কারুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়, তখন সেই ব্যক্তি সেই শরণাগতকে রক্ষার জন্য পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। অধ্যাত্ম জগতে বিশেষতঃ ভক্তিসাধনার পথেও এই প্রকার শরণাগতি ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাধিক।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে—ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে কি তবে পুরুষকারের স্থান আদৌ নাই? বলা যায়—সাধনার প্রাথমিক স্তরে সাধকের মনে প্রাণে যতদিন অহমিকার ভাব বিদ্যমান থাকে ততদিন তার পক্ষে পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। একটু ধীর-স্থির হয়ে বিচার করলে স্বীকার না করে উপায় নাই যে এ জগতে এমন মানুষ অত্যন্ত বিরল যারা একেবারে শক্তিহীন ও নিঃসম্বল। অর্থাৎ ভগবান্ তাঁর প্রত্যেক সন্তান-সন্ততিকেই কিছু-না-কিছু শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন এবং তিনি চান তাঁর সন্তানগণ তাঁর প্রদত্ত সেই শক্তির যথাযথ সদ্ব্যবহার করুক এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর শক্তিলাভের জন্য তাঁর নিকট কাতর প্রার্থনা নিবেদন করুক।

সাধনার অন্তিম স্তরে সাধক যখন অনুভব করেন যে সমগ্র শক্তি বিনিয়োগ করেও তাঁর পক্ষে এই মায়ার গোলক ধাঁধা হতে উদ্ধার পাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়, তখন তাঁর হৃদয়কন্দর হতে স্বতঃই এই প্রার্থনার ধ্বনি উদ্‌গীত হতে থাকে—

'জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥'

অর্থাৎ, ধর্ম্ম কি তা জানি কিন্তু তার আচরণে আমার প্রবৃত্তি নাই। অধর্ম্ম কি তাও বুঝি, পরন্তু, তা হতে নিবৃত্ত হবার শক্তি আমার নাই। হে হৃষীকেশ, তুমি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে আমাকে যে পথে চালনা করবে আমি তা-ই করব।

গুরুগীতাতেও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—"মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপাঃ।" শ্রুতিও সাধককে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন—সেই পরতত্ত্ব যুক্তি-তর্ক, মেধা, প্রতিভা. বহুবিধ শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা লাভ করা যায় না। আত্মা স্বয়ং যাকে (কৃপাপূর্ব্বক) বরণ করেন সেই তাঁকে লাভ করতে পারে। এতেই সমপ্রমাণ হয়—ভগবৎ শরণাগতি ও ভগবৎ কৃপাই ভগবদুপলব্ধির অন্তিম কথা।

একটি লোকায়ত দৃষ্টান্ত অনুধাবন করলে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যাবে। একটি বৃক্ষতলে দুইজন সাধক দীর্ঘকাল তপস্যায় নিরত। এঁদের একজন ছিলেন কঠোর কৃচ্ছ্রতপাঃ যোগী এবং অন্যজন একান্ত শরণাগত ভক্ত। ভক্তপ্রবর নারদকে সেই পথ দিয়ে বৈকুণ্ঠ ধামে প্রয়াণ করতে দেখে তাঁরা উভয়ে তাঁর চরণে নিজেদের আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন—"আপনি প্রভুর অনন্যভক্ত। তাঁর সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে, কৃপাপূর্ব্বক তাঁকে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন—আমাদের মোক্ষ মুক্তি কবে হবে?" নারদ সম্মতি জানিয়ে বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হলেন এবং প্রসঙ্গমত শ্রীভগবানের নিকট উক্ত সাধকদ্বয়ের প্রার্থনা নিবেদন করলেন। তদুত্তরে ভগবান বললেন—"হে নারদ, যে কৃচ্ছ্রতপাঃ সাধকটির কথা তুমি বললে তার বিষয়ে আমি তেমন অবগত নই। তবে দ্বিতীয় ভক্তটিকে বলো—যে অশ্বত্থ বৃক্ষটির নীচে বসে সে আমার ভজনা করছে, সেই বৃক্ষে যতগুলি পাতা আছে তত বৎসর পরে সে আমার দর্শনের অধিকারী হবে।"

শ্রীভগবানের এই উক্তি শুনে নারদ বিস্মিত হয়ে বললেন—"ঠাকুর!

তোমার লীলা কতই না রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয়! আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম সেই সাধকটি ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কীরূপ কঠোর তপস্যায় নিরত। আর সর্ব্বান্তর্য্যামী হয়ে তুমি তাকে চিনতেই পারলে না, এ তোমার কিরূপ ন্যায় বিচার?" উত্তরে ভগবান্ বললেন—"যে তপস্যার মধ্যে শরণাগতি বা আত্মসমর্পণের ভাব নাই, সে তপস্যা সাত্ত্বিক তপস্যা নয়; তদ্রূপ তপস্যায় আমি প্রসন্ন হই না এবং সেরূপ তপস্বীর প্রতি আমি থাকি উদাসীন। অন্য ভক্তটি আমার একান্ত শরণাগত ও আমার কৃপাপ্রার্থী; আমি তার প্রতি তাই প্রসন্ন।" নারদ বললেন—"ঠাকুর, যদি তার প্রতি তুমি প্রসন্নই হয়ে থাক তবে তার মুক্তির এত বিলম্ব কেন?"

উত্তরে ভগবান্ বললেন—"তুমি তার নিকট আমার এই অভয় আশ্বাসের কথা ব'লো। দেখবে—আমার সান্ত্বনায় তার মনে কীরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।"

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নারদ যখন সেই ভক্তদ্বয়কে ভগবানের নির্দ্দেশ শোনালেন—তখন সেই কঠোরতপাঃ সাধকটি অগ্নিশর্ম্মা হয়ে তার তপস্যা ত্যাগ করে নাস্তিক্য-ব্রতী হল এবং দ্বিতীয় ভক্তটি আনন্দে বাহু তুলে নৃত্য করতে করতে বললেন—"শান্তিরাম তুই বগল বাজা, গোলোকে তোর ভিজলো গাঁজা।" অর্থাৎ, ঠাকুরের কৃপা তো লাভ করেছি; এই কয়টি বছর তো দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

এমন সময়ে বৈকুণ্ঠ হতে বিমান নেমে এল এবং ভক্তটি তখনই সশরীরে বৈকুণ্ঠযাত্রার সুযোগ পেল। অর্থাৎ, যাঁরা ভগবানের অনন্যভক্ত—তাঁরা হচ্ছেন ধৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। ভগবানের সকল বিধাননই তাঁরা মাথা পেতে গ্রহণ করতে চিরোদ্যত। দৃষ্টান্তটি হতে বোঝা যায়—ভাবহীন পুরুষার্থী ও অনন্যশরণাগত ভক্তের মধ্যে পার্থক্য কি ও কোথায়?

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫

অন্বয়—যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্বিজতে, যঃ চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে, যঃ চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৫

অনুবাদ—যে ব্যক্তি অন্যের উদ্বেগের কারণ হন না এবং নিজে অন্যের

ব্যবহারে বিচলিত হন না, যিনি হর্ষে উৎফুল্ল ও দুঃখে কাতর হন না, যিনি ভয় ও উদ্বেগমুক্ত—তদ্রূপ ভক্তই আমার প্রিয়।। ১৫

যস্মান্নোদ্বিজতে লোক ঃ— এক শ্রেণীর লোক আছে যারা বিঘ্নসন্তোষী। অর্থাৎ, যারা অন্যের অহিত বা সর্ব্বনাশ সাধন করেই পরমানন্দ লাভ করে। এরা যে কেবল পরছিদ্রান্বেষী—তা-ই নয়, এদের জীবনব্রত হচ্ছে কারণে অকারণে অপরের প্রাণে আঘাত দেওয়া। পুরুষ সমাজে এরা কৌরবদের মাতুল শকুনির ন্যায় এবং স্ত্রীসমাজে এরা হচ্ছে মন্থরাপন্থী। এরূপ জঘন্য খল প্রকৃতির দু' একজন নর-নারীর অনাচার-অত্যাচারে এক একটি জনপদের সুখ-শান্তি কীরূপ বিঘ্নিত ও বিনষ্ট হয়—তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখযোগ্য।

এক গ্রামে এরূপ একজন বিঘ্নসন্তোষী লোক ছিল যে, সে সারা জীবন তার ছল, কপটতা ও প্রতারণা দ্বারা পল্লীর সমস্ত নর-নারীর জীবন অধীর, অস্থির ও অতিষ্ঠ করে তোলে। এমন একটি দিনও বাদ যেত না যেদিন তার রূঢ়, কর্কশ ও নির্ম্মম ব্যবহারে লোক উত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত হত না। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে যখন রোগশয্যায় শায়িত, তখন সে একদিন গ্রামবাসীকে ডেকে বলল—দেখ ভাই, আমি তো চিরদিন তোমাদের যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট দিয়েছি, এখন আমি সেই পাপেরই ফল ভোগ করছি। আমার মনে এখন নিদারুণ অনুতাপ অনুশোচনা। ভাই, তোমাদের সকলের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ—আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার এ পাপ-দেহের অগ্নিসংকার করো না। এই পচা গলা দেহটাকে তোমরা গ্রামের চৌরাস্তার মোড়ে টাঙ্গিয়ে রেখে দিও—যাতে কাক, চিল, শকুনি টুক্‌রো টুক্‌রো করে তা খেয়ে ফেলে। এতেই হবে আমার পাপের চরম প্রায়শ্চিত্ত।

লোকটির সেই সূচনার ফল হল—ভীষণ ও মারাত্মক। লোকটির মৃতদেহকে এই ভাবে ঝুলতে দেখে নিকটবর্ত্তী থানার পুলিশবাহিনী ছুটে এল ব্যাপারটিকে হত্যাকাণ্ড সন্দেহ করে এবং ঘটনাটি নিয়ে শুরু হয়ে গেল—গ্রামময় খানাতল্লাসী ও ভীষণ মারপিট ও ধরপাকড়। পল্লীবাসীরা এখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করল, লোকটি তার জীবদ্দশাতে যেমন তাদের নানা ভাবে হয়রান করে গেছে, মৃত্যুকালেও সে তাদের রেহাই দেয় নি।

চিন্তা করে দেখুন—এরূপ অত্যাচারী ক্রূর ব্যক্তি কি কখনও ভগবানের ভক্ত হতে পারে?

লোকান্নোদ্বিজতে চ য ঃ— অন্যের প্রাণে যারা ব্যথা দেয় তারা যে কদাপি ভক্ত হতে পারে না—তা আমরা বুঝলাম। এক্ষণে আমরা তাদের বিষয়ে আলোচনা করব—যারা অপরের ব্যবহারে বিচলিত হয়।

একথা সহজেই অনুমেয় যে যারা অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত অথবা যাদের ধৈর্য্য ও সহনশক্তি অতি অল্প তারাই সহজে পরের সামান্য কটু ব্যবহার বা নিন্দা-সমালোচনায় বিচলিত হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ এ বিচিত্র জগতে যেখানে সদসৎ, ভালমন্দরূপী দ্বন্দ্ব নিয়েই নিত্যকার ব্যাপার ব্যবহার, সেখানে সমপ্রকৃতির মনের মানুষ পাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য। আর পাওয়া গেলেও তাদের সংখ্যা যে অতি বিরল—তা কে অস্বীকার করবে? ফলে, প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম্মের মধ্যে ভিন্ন প্রকৃতির—এমন কি বিরুদ্ধ স্বভাবের লোকজনের সঙ্গ এড়িয়ে চলা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। প্রত্যহ স্কুলে, কলেজে, অফিসে আদালতে, রাস্তাঘাটে এদের সকলের নিকট হতে সব সময়ে সাধু, অনুকূল ও মধুর ব্যবহার আশা করাটাই দুরাশা নয় কি? আর পরিস্থিতি যেখানে এরূপ, সেখানে মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখতে হলে পদে পদে উপেক্ষা, ধৈর্য্য ও ক্ষমার আশ্রয় ছাড়া গত্যন্তর কি? এজন্যই সচরাচর বলা হয়—"যে সয়, রে রয়।"

তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে এমন ঘটাও বিচিত্র নয় যে, যে ব্যাপারটি নিয়ে তুমি আকাশ পাতাল চিন্তা করে অধীর অস্থির হচ্ছ তা হয়তো সম্পূর্ণ অমূলক, অহেতুক ও মিথ্যা। এরূপ একটি সত্য ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য।

একদা একজন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা আমার নিকট এসে স্বীয় মনোব্যথা নিবেদন করে বলতে লাগলেন—"স্বামীজি, আমার কপাল ভেঙ্গেছে ; আমি যা কোনদিন কল্পনাতেও ভাবিনি আজ আমার অদৃষ্টে তা-ই ঘটেছে। এখন আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর উপায়ান্তর নাই।" মহিলাটিকে এরূপ চিন্তাতুর ও বেদনাক্লিষ্ট দেখে বললাম—"মা, তুমি একটু খুলেই বল না, ব্যাপারটা কি?" উত্তরে তিনি বললেন—"আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি—আমার স্বামী একজন পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়েছেন। তিনি যে এরূপ বিশ্বাসঘাতক হবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।" মহিলাটির কথা শুনে তাকে

বললাম—আচ্ছা, তোমার স্বামী যখন কর্ম্মস্থল হতে ঘরে আসেন, তখন তোমার প্রতি তাঁর ভাবের কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য কর কি?" আমার প্রশ্নের উত্তরে এবার তিনি বললেন—"তাতো কিছু বুঝতে পারি না। তবে যে ভদ্রলোকের মুখে ব্যাপারটি আমি শুনেছি তাকে অবিশ্বাস করা যায় না।" এতক্ষণে আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে বললাম—"না, মানুষের মন একটা বই দু'টো নয়। তোমার স্বামী তোমাকে এবং সেই মেয়েটিকে সমান ভাবে ভালোবাসতে পারেন না। তুমি একটু ভালভাবে খোঁজ নিয়ে দেখ —ব্যাপারটি নিশ্চয়ই অমূলক। হয়তো তোমার মন পরীক্ষার জন্য ভদ্রলোক তোমাকে ঐরূপ কথা বলে থাকবেন।

এর দু'দিন পরে মহিলাটি এসে প্রসন্নবদনে হাসতে হাসতে বললেন —"স্বামীজি, আপনি ঠিক অন্তর্য্যামী। আপনি যা বলেছেন—তা-ই সত্য। আপনি আত্মহত্যারূপ মহাপাপ থেকে আমাকে রক্ষা করলেন। এরূপ অলীক কথায় আর আমি কখনও কান দেব না।"

বস্তুতঃ যিনি আদর্শ ভক্ত তিনি হবেন শক্ত, সরল ও দৃঢ়চেতা। শ্রীবুদ্ধের ন্যায় তিনি বলবেন—চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র যদি কক্ষচ্যুত হয় তাহলেও আমি কদাপি লক্ষ্যভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত হব না।

হর্ষামর্ষ...—যারা হর্ষে অত্যধিক উৎফুল্ল এবং অমর্ষ বা দুঃখে একান্ত ম্রিয়মাণ হয়—তারাও আদর্শ ভক্ত হতে পারে না। চলতি প্রবাদবাক্যেও বলা হয়—"যত হাসি তত কান্না, ক'য়ে গেছে রাম শর্ম্মা"। অর্থাৎ, যারা কথায় কথায় হেসে গড়াগড়ি দেয় অথবা একটু সুখ, একটু আরাম, একটু আদর কদর, দরদ সহানুভূতির স্পর্শ পেলে যারা হর্ষে আনন্দে একেবারে ঢলে পড়ে, তারাই একটু পরে সামান্য দুঃখ আঘাতে, একটু ক্লেশ কষ্টে বা সামান্য হতাশা নৈরাশ্যে একেবারে মুষড়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদেরই স্বভাব-প্রকৃতি এইরূপ। বস্তুতঃ, এই শ্রেণীর লোকেরা ভক্তিসাধনার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

তবে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—যারা একেবারে ভাবহীন, শুষ্কহৃদয়, যাদের অন্তঃকরণে ভাল মন্দ কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় না, যাদের চিত্ত নিরেট পাথরের ন্যায় কঠোর-কঠিন—তারাও আদর্শ ভক্ত পদবাচ্য নয়। অর্থাৎ, সত্যকার ভক্তের জীবন হবে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় শান্ত, সংযত ও

নিস্তরঙ্গ। বিকারের কারণ থাকলেও তাঁদের হৃদয়-মন থাকবে অবিচলিত। কি সুখ, কি দুঃখ, কি শুভ, কি অশুভ, কি ভাল, কি মন্দ—সর্ব্বাবস্থায় তাঁরা থাকেন অক্ষুব্ধ ও অচঞ্চল। জগতের সকল দেশের আদর্শ ভক্তচরিত্র অনুধ্যান করলে এই সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভয়োদ্বেগৈঃ...—আদর্শ ভক্ত হবেন নির্ভীক ও উদ্বেগমুক্ত। সাধকের জানা আবশ্যক—ভয় ও উদ্বেগ মনুষ্য-হৃদয়ের দুটি ভীষণ অবগুণ। এদের একটি হতে ঘটে অন্যটির উৎপত্তি। অর্থাৎ, ভয় হতে যেমন উদ্বেগ, তেমনি উদ্বেগ হতে ভয়ের সৃষ্টি হয়। আর এরা যে শুধু পরস্পরসম্ভূত তা-ই নয় —এরা অবস্থানও করে একসঙ্গে। অর্থাৎ, যেখানে ভয় সেখানেই উদ্বেগ ; আবার যেখানে উদ্বেগ সেখানেই ভয়। সুতরাং, ভয়কে জয় করতে হলে উদ্বেগকে ত্যাগ করতে হবে এবং উদ্বেগশূন্য হতে হলে ভয়রহিত হতে হবে।

এই প্রসঙ্গে জানা আবশ্যক—উদ্বেগই যে শুধু ভয়ের জনক তাই নয়, শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক দুর্ব্বলতা হতেও উৎপন্ন হয় উপরোক্ত দুটি দুর্গুণ। তাই নির্ভীক ও নিরুদ্বিগ্ন হতে হলে সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্যগুলিকে নিঃশেষে দূর করতে হবে।

শোনা যায়—লোকমান্য তিলক বাল্যবিবাহজনিত অসংযম ও অবহেলার ফলে তরুণ বয়সেই শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য-শ্রী হারিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বলচিত্ত হয়ে পড়েন। এই কালে তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও রূপ ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও সুপটু। এই ব্যাপার নিয়ে তিলক এই সময়ে তাঁর সহপাঠীদের নিকট হয়ে পড়েন একান্ত নিন্দা-সমালোচনা ও হাস্য-বিদ্রূপের পাত্র। বন্ধুদের এই সমালোচনা তাঁর প্রাণে নিদারুণ শেলাঘাত করত। এই সব কারণে তিলক ক্রমশঃ নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হয়ে পড়েন বিশেষ ভীত ও উদ্বিগ্ন। এই সময়ে লুপ্ত স্বাস্থ্য ও মনোবল পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি সংকল্পপূর্ব্বক এক বৎসরের জন্য পড়াশুনা ত্যাগ করে মনোযোগী হন সংযম-পালন ও ব্যায়াম চর্চ্চায়। এতেই তাঁর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অত্যদ্ভুত উন্নতি ঘটে। এর ফলেই তিনি তাঁর অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

কিশোর বয়সে আচার্য্য প্রণবানন্দ যখন পল্লীবাসীর নিকট হতে শুনতেন—অমুক স্থানের অমুক জঙ্গলে ভূত প্রেত আছে, তখন তার

সত্যতার পরীক্ষার জন্য তিনি গভীর রাত্রে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। বাংলার বিপ্লবী নেতারা তাঁদের শিষ্য সাক্‌রেদদের নির্ভীক করে গড়ে তুলবার জন্য নির্দ্দেশ দিতেন—গভীর রাত্রে দূরাঞ্চলের বৃক্ষ হতে কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে আনতে। এই ভাবে ভয়কে জয় করার ব্রত বরণ করার ফলে সেই যুগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল একদল অসমসাহসী বিপ্লবী যুবক।

ভয়কে জয় করার শ্রেষ্ঠ উপায়

ভয় ও উদ্বেগকে জয় করার প্রকৃষ্টতম উপায় হচ্ছে—ঐকান্তিক ও প্রগাঢ় ভগবদ্বিশ্বাস। ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও অপার কৃপা-করুণার প্রতি যাঁদের প্রাণে অটুট শ্রদ্ধা-বিশ্বাস বিদ্যমান, জগতের কোন বিপদাপদ বা প্রতিকূল অবস্থাচক্রের মধ্যেও তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত ও মুহ্যমান হন না। 'রাম' নামে অগাধ বিশ্বাসের বলে বীর হনুমান অক্লেশে সমুদ্র লঙ্ঘন করেন। হরিনামে অটল শ্রদ্ধা বিশ্বাসের শক্তিতে শক্তিমান হওয়ার ফলে যবন হরিদাস ভীষণ ও নির্ম্মম অত্যাচার নির্য্যাতনের মধ্যেও ছিলেন অচল অটল অচঞ্চল।

জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী ও দুটি শিশু সন্তান নিয়ে সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হলেন। পথিমধ্যে অকস্মাৎ জাহাজের ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেল। বিপদের সঙ্কেত-ধ্বনি পেয়ে কাপ্তেনের নির্দ্দেশে যাত্রীরা দলে দলে নৌকাযোগে তীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে থাকল। সর্ব্বশেষের নৌকাখানিও যখন যাত্রীতে ভরে উঠল, তখনও দেখা গেল—সেই ইংরাজ ভদ্রলোক ধীর স্থির নির্ব্বাক হয়ে স্বীয় আসনে উপবিষ্ট। তাঁকে এরূপ শান্ত নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় দেখে তাঁর স্ত্রী মনে করলেন—তাঁর স্বামী নিশ্চয়ই এই আকস্মিক বিপদে একেবারে বিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। তাঁকে সচেতন করবার জন্য তাই তিনি বার বার তাঁর হাত ধরে সজোরে টানতে টানতে বললেন —"তোমার এ কি হলো? সমস্ত যাত্রীরা এখনি নেমে যাচ্ছে, শেষ নৌকাখানি ছাড়বে; নিজেদের জীবন-রক্ষার চিন্তা যদি বা না-ই কর শিশু দুটিকে তো বাঁচাতে হবে।"

সাহেব এতক্ষণে সরোষে নিজের রিভলভারটি খুলে স্ত্রীর বুকের উপর

ধ'রে চীৎকার করে বলে উঠলেন—"যদি আবার বিরক্ত কর তবে এখনি তোমাকে শেষ করে ফেলব।" মেমটি কিন্তু স্বামীর এই ব্যবহারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে উঠলেন—"এসব তামাসা এখন রাখ। এখন কেমন করে বাঁচতে হবে, তার চিন্তা কর।" স্ত্রীর কথায় স্বামী গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন—"কি, তোমার ভয় হচ্ছে না বুঝি?" স্বামীর এই কথায় স্ত্রী তখন হাসতে হাসতে বলে উঠলেন—"তুমি কি আমাকে মারতে পার? তুমি যে আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী। তুমি আমাকে কেমন করে মারবে?" এতক্ষণে সাহেবের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি প্রসন্ন বদনে বললেন—'এই যদি তোমার দৃঢ় ধারণা হয়, তবে তুমি ভাব না কেন—যিনি জগৎস্বামী, যিনি আমাদের সকলের প্রিয়তম প্রভু, তিনি আমাদের কি করে মারতে পারেন?" মেমের হৃদয় এখন ভগবদ্বিশ্বাসে ভরপুর হল, আর দেখতে দেখতে অমনি দুর্য্যোগের ঘন-ঘটা কোথায় মিলিয়ে গেল।

সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দ যৌবনে তাঁর এক প্রিয় উত্তর সাধকের গৃহে গিয়েছিলেন তাকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দেবার জন্য। যুবক সাধকের সহিত কথা বলতে বলতে অনেক রাত্রি হয়ে গেল। সেখান হতে প্রায় দেড় মাইল হেঁটে তাঁকে স্বীয় সাধনকুটীরে ফিরতে হবে। মাঠের মধ্য দিয়ে রাস্তা। কৃষ্ণপক্ষের ঘনঘোর অন্ধকার চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। সঙ্গীটি তাঁর হাতে একটি আলো দেবার চেষ্টা করল। তিনি তার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন —"নির্ভর একজনের (ভগবানের) উপরই করতে হয়।"

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

অন্বয়—অনপেক্ষঃ, শুচিঃ, দক্ষঃ, উদাসীনঃ, গতব্যথঃ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যঃ মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

অনুবাদ—যিনি সর্ব্ববিষয়ে নিঃস্পৃহ, শুচি, সর্ব্বকর্ম্মে দক্ষ, উদাসীন, যিনি কোন কিছুতে ব্যথিত হন না, নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য যিনি কোন কার্য্যের সৃষ্টি করেন না, তিনিই আমার প্রিয়॥ ১৬

অনপেক্ষ :— যিনি নিজের সুখের জন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর অপেক্ষা রাখেন না—তাকেই বলা হয় অনপেক্ষ। সাংসারিক জীবনে যে ব্যক্তি স্বীয়

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়াসের জন্য নিরন্তর পরমুখাপেক্ষী হয়—তদ্রূপ পরাধীন ব্যক্তি কদাপি সুখী হতে পারে কি?

প্রচার-ব্যপদেশে একবার লক্ষ্ণৌ সহরে জনৈক বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ভদ্রলোক কথাপ্রসঙ্গে তাঁর অসহায় অবস্থার উল্লেখ করে কতই না ব্যথাভরা হৃদয়ে বলছিলেন—"জগতে আমার ন্যায় দুঃখী ব্যক্তি আর দ্বিতীয় কেহ নাই। বাহির হতে আমার বিশাল অট্টালিকা ও অতুল ধন-সম্পত্তি ও বিষয়-বৈভব দেখে লোকে হয়তো ভাবে—আমি কতই না সুখী; কিন্তু তারা আমার ভিতরের খবর রাখে না। আমার স্ত্রী, পুত্রকন্যা ও পুত্রবধূরা সকলেই আমার শোষণের চিন্তায় ব্যস্ত ও ব্যগ্র। আমার সম্পত্তি কে কতটুকু কি ভাবে গ্রাস করবে তার চিন্তা-চেষ্টা নিয়েই তারা বিব্রত; আমার প্রতি তাদের কারুর বিন্দুমাত্র দরদ নাই। রামদাস নামক আমার ছোট চাকরটি ও আমার বস্তিখানাই আমার শেষ সম্বল। চাকরটি যদি একদিন অনুপস্থিত থাকে তাহ'লে আমার খাওয়া দাওয়া ও শৌচাদি সব বন্ধ হয়ে যায়। স্বামীজী, আমি বড় অসহায় ও পরাশ্রয়ী। মন খুলে দু'টি কথা বলবার লোকও আমার কেউ নাই।" যারা দূর হতে গাড়ী-বাড়ী, দাস-দাসী ও আত্মীয়-পরিজন দেখে মানুষের সুখের পরিমাপ করে, উক্ত ভদ্রলোকটির বুকফাটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করুক।

প্রশ্ন আসে—অনপেক্ষ হতে হলে কি তবে আশ্রয়দাতা, গুরু ও ভগবানের কৃপা ও অনুগ্রহের অপেক্ষাও ত্যাগ করতে হবে? উত্তরে বলা যায়—বিষয়টি দুই দিক দিয়ে বিচার করা চলে। প্রথমতঃ, 'অনপেক্ষ,' শব্দটির অর্থ করা যায়—বিষয়-নিঃস্পৃহ হওয়া। অর্থাৎ, স্বীয় সুখ-শান্তির জন্য কোন ভোগীর বা ভোগ্য বিষয়ের অপেক্ষা না করা। তবে এই অবস্থায় উন্নীত হওয়া আদৌ সহজসাধ্য নয়। এজন্য প্রয়োজন—নিয়মিত সাধুসঙ্গ এবং মহতের ও ভগবানের কৃপা। কেন না, সৎসঙ্গপ্রীতি, গুরুকৃপা ও ভগবানের অনুগ্রহই বিষয়াসক্তি পরিহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এ জন্য আদর্শ ভক্তের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধার ও অবলম্বনই হচ্ছে ভগবৎপ্রেম। বস্তুতঃ এই অন্তিম লক্ষ্যে সিদ্ধির জন্যই তার যাবতীয় ধ্যান, জ্ঞান ও আচারানুষ্ঠান। এমতাবস্থায় ভক্ত সাধক ভগবৎ শরণাগতি ও ভগবৎ-কৃপাকে কদাপি উপেক্ষা ও পরিহার করতে পারেন না।

কৌরব সভায় লাঞ্ছিতা যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী স্বীয় লজ্জা নিবারণের জন্য যখন অপর সকলের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করে হতাশ ও বিমুখ, তখন তাঁর জীবনের অন্তিম আধার শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেই তিনি আত্মরক্ষার সামর্থ্য অর্জ্জন করলেন। আদর্শ ভক্ত তাই মনে করেন—অপেক্ষা যদি করতেই হয়, তবে গুরু বা ভগবানের কৃপার উপর অপেক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

এক্ষণে এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আসে—সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বগুণাধার ভগবান্ কি তাঁর ভক্তের কাতর প্রার্থনা ও প্রাণফাটা ক্রন্দনের অপেক্ষা করে বসে থাকেন? অর্থাৎ, তাঁর কাছে না চাইলে কি তিনি কখনও তাঁর ভক্তকে কৃপা করেন না? উত্তরে বলা যায়—নিশ্চয়ই করেন এবং তদ্রূপ নিষ্কাম ভক্তই ভগবানের সবচেয়ে অধিক প্রিয়। অর্থাৎ, ভক্ত যদি কোন প্রকার প্রতিদানের অপেক্ষা না রেখে, তাঁর পরম প্রেমাস্পদকে নিষ্কাম ও আন্তরিক ভাবে ভালবাসেন এবং সেই ভাবে তাঁর প্রীতির উদ্দেশ্যে নিরন্তর তাঁর সেবা করে যান, তবে পরম কারুণিক ভগবান্ তাঁর প্রতি সবচেয়ে অধিক প্রসন্ন হন।

একটি বাগিচায় জনৈক শেঠের অধীনে দু'জন ভৃত্য কাজ করত। ভৃত্যদ্বয়ের একজন ছিল অত্যন্ত চতুর ও লোভী। শেঠ যখন প্রত্যহ বাগিচায় প্রাতঃভ্রমণে আসতেন তখন সেই ভৃত্যটি তার কাজকর্ম্ম ফেলে তার মালিককে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরে অবিরত তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, সে কাল ও আজ এই এই কাজ করেছে ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, অন্য ভৃত্যটি শেঠের তেমন খোসামুদির ধার ধারত না। সে তাকে একবার সভক্তি প্রণাম জানিয়েই তার কাজে ডুবে যেত। বৎসরান্তে দেখা গেল যে, শেঠজী তার শেষোক্ত ভৃত্যটির মাসিক বেতন দশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং অন্য ভৃত্যটির বেতন দশ টাকা কমিয়ে দিয়েছেন। এতে প্রথমোক্ত সেই চতুর ভৃত্যটি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়ে মালিককে তার প্রতি এই অবিচারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন—তুমি প্রত্যহ যতক্ষণ আমার পেছনে পেছনে ঘুরে ঘুরে অনর্থক বক্ বক্ করে সময় নষ্ট কর, ততক্ষণ সে নিবিষ্ট মনে তার কাজে লেগে থাকে। এতে তুমিই হিসাব করে দেখ—তোমার চেয়ে সে কত অধিক কাজ করে। আমি আমার

বাগিচায় কে কতটুকু কাজ করল না করল—তা ভালমত বুঝি, খোসামুদি আমি পছন্দ করি না।

বস্তুতঃ ভগবানই এই সংসাররূপ বাগিচার মালিক। তিনি স্বয়ং অন্তর্যামী ; তাঁর নিকট মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোতা পাখীর মত কেবল দীর্ঘ স্তব-স্তুতি আওড়ালেই তিনি অধিক প্রসন্ন হন—এরূপ ধারণা মিথ্যা। আন্তরিক ভাবে তাঁকে স্মরণ ক'রে নিষ্ঠা সহকারে স্বধর্ম্ম পালন করলেই তিনি সহজে প্রসন্ন হন। যাঁরা ভগবানের সর্ব্বোচ্চ ভক্ত তাঁরা সেই পন্থাটি অনুসরণ করেন। ভক্তিরাজ্যে পদে পদে প্রতিদানের প্রত্যাশা দোকানদারীর নামান্তর মাত্র।

শুচি :— শুচিতাই ধর্ম্মের ভিত্তি ; এজন্য ইংরাজীতে বলা হয়—'Cleanliness is next to Godliness.' যেখানে শুচিতার অভাব—সেখানে নীতি নাই, সদাচার নাই, ধর্ম্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা নাই। প্রত্যেক ভক্তকে তাই বাইরে ভিতরে শুদ্ধ হতে হবে। বাহ্য স্নান, শৌচাদি দ্বারা বাহ্যশুচিতা এবং সৎসঙ্গ, মন্ত্র-জপ, স্বাধ্যায়, বৈরাগ্য-বিচার প্রভৃতির সহায়তায় অন্তঃশুচিতা লাভ হয়। অনেকে বাহ্য শুচিতা নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করে যে আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা-সাধনের দিকে তাদের আদৌ দৃষ্টি থাকে না। তারা মনে করে—দিনে দশবার স্নান করলে, অন্যের স্পর্শদোষ এড়িয়ে চললে, স্বপাক ও নিরামিষ ভোজন করলে, নিত্য ধৌত পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করলে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, বাহ্য শুচিতার এইরূপ বাড়াবাড়ির ফলে হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়তারূপী কুসংস্কারগুলি এতখানি প্রশ্রয় পেয়েছে।

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—বাহ্য শুচিতার বিধি-নিষেধগুলি ততক্ষণ সমর্থনযোগ্য, যতক্ষণ তা অন্তঃশুচিতার সহায়ক হয়। কেন না, যাবতীয় ধর্ম্মীয় আচার অনুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে—চিত্তশুদ্ধি। সেই মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হলে বাহ্য শুচিতার সমস্ত প্রচেষ্টা আচার-বাহুল্যের আড়ম্বর সৃষ্টি করে। আর অনেক ক্ষেত্রে এরই অন্তিম পরিণতি ঘটে—'শুচিবায়ু' রোগে।

আর একদল লোক আছে, যারা বাহ্যশুচিতার নীতি-নিয়মের আদৌ ধার ধারে না। প্রাতে উঠেই হাত মুখ না ধুয়েই বিছানায় শুয়ে শুয়ে চা পান করা, জুতা পায়ে আহার করা, ভোজনের শেষে ভাল করে মুখ না ধোয়া,

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা প্রভৃতি অনাচারমূলক কাজগুলির মধ্যে এরা সভ্যতার নিদর্শন দেখে। বলা বাহুল্য, এদের এই জঘন্য আচার-প্রথা অন্তঃশুচিতার ঘোর পরিপন্থী। এজন্য, এরা ভক্তি-সাধনার সম্পূর্ণ অনধিকারী।

যারা শুচিতার সাধক তাদের জানা আবশ্যক—বিচার-শুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না রেখে শুধু দৈহিক শুচিতার প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দিলে ক্রমশঃ দেহবাদী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে পদে পদে। আর, একবার যদি দেহবাদ প্রশ্রয় পায় তবে মানুষের অধোগতির সীমা পরিসীমা থাকে না।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।। ১৭

অন্বয়—যঃ ন হৃষ্যতি, ন দ্বেষ্টি, ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভ-পরিত্যাগী যঃ ভক্তিমান্ সঃ মে প্রিয়ঃ।। ১৭

অনুবাদ—যিনি হৃষ্ট হন না, দ্বেষ করেন না, যিনি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না—সেই শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।। ১৭

গীতামৃত—হর্ষ, দ্বেষ, শোক ও বাসনা—ভক্তিপথের বিশেষ অন্তরায়। আদর্শ ভক্তের কর্ত্তব্য তাই এগুলিকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা। প্রশ্ন আসে—হিংসা, দ্বেষ, দুঃখ-শোক ও কামনা-বাসনা যে ভক্তিপথের কণ্টক তা তো সহজে বোঝা যায়। কিন্তু হর্ষ বা আনন্দ কেন ভক্তিমার্গের পরিপন্থী হবে? ভক্তের হৃদয়-মন কি তবে নিরানন্দময় হবে? শাস্ত্র তো বলেন—পরা ভক্তি সাধককে পরমানন্দের অধিকারী করে।

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—আনন্দ ও হর্ষ এক বস্তু নয়। 'হর্ষ' বলতে বোঝায় লৌকিক অত্যানন্দ বা আনন্দের আতিশয্য—যা সাধকের মনকে করে তোলে চঞ্চল ও অধীর অস্থির এবং তার পরিণামে তার মনের যে সমতা বা সাম্য তা বিনষ্ট হয়ে যায়। এরূপ মানসিক চাঞ্চল্য যে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ হবে তাতে সংশয় কোথায়?

উপরোক্ত শ্লোকে আরও বলা হয়েছে—আদর্শ ভক্ত হবেন শুভাশুভ পরিত্যাগী। বস্তুতঃ, শুভ ও অশুভ—সু ও কু-এর ন্যায় দ্বন্দ্বধর্ম্মী। এদের একটির সঙ্গে অন্যটি অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। অর্থাৎ, এদের একটির পরে

অপরটির আগমন অবশ্যম্ভাবী। শান্তিকামী আদর্শ ভক্তের নিকট তাই তা পরিত্যাজ্য।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯

অন্বয়—শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ সমঃ, শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ, সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ, তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ, মৌনী, যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ, ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয়ঃ॥ ১৮।১৯

অনুবাদ—শত্রুমিত্রে ও মান-অপমানে, শীত-গ্রীষ্মে ও সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী, আসক্তিরহিত, নিন্দা-স্তুতিতে অনবহিত, মৌনী, সকল অবস্থাতে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানহীন, স্থিরমতি, ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়॥ ১৮।১৯

গীতামৃত—আদর্শ ভক্তের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণ হচ্ছে সমচিত্ততা। যার হৃদয়-মন পরস্পরবিরোধী ভাবের সংঘাতে আন্দোলিত ও চঞ্চল, তার পক্ষে ভক্তিসাধনা অসম্ভব। এই কারণে এখানে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে শ্রীভগবান্ বলছেন—সত্যকার ভক্ত হবেন—স্থিরমতি, সমজ্ঞানী এবং ভালমন্দ সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্টচিত্ত। তা ছাড়া, এতাদৃশ ভক্ত হবেন মৌনী। এখানে প্রশ্ন উঠে—আদর্শ ভক্ত কি তবে চিরজীবন মৌনব্রত পালন করেন? প্রহ্লাদ, ধ্রুব, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, তুলসীদাস, নরসিংহ মেহতা প্রভৃতি ভক্তগণের চরিত্রে তো এরূপ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না? তাঁরা তো ভগবৎ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও ভগবৎমহিমার প্রচারে নিরন্তর ব্যস্ত ছিলেন। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে তাই বলা যায়—এখানে 'মৌনী' বলতে বোঝায়—আদর্শ ভক্ত বিনা প্রয়োজনে বা অনাবশ্যক কথাবার্ত্তাতে সময়ক্ষেপ করেন না। ভগবৎপ্রসঙ্গ নিয়েই তিনি কালাতিপাত করেন।

উপরোক্ত একটি শ্লোকে ভক্তের আর একটি লক্ষণ নির্দ্দেশিত হয়েছে—অনিকেতঃ (অর্থাৎ বাসস্থানহীন)। ভগবদ্ভক্ত কি তবে গৃহহীন হয়ে সমগ্র

জীবন যত্র তত্র বিহার করবেন? তাঁর বাসস্থান বা সাধন-ভজনের জন্য কি কোনও আবাসস্থল বা কুটীরের ব্যবস্থা হওয়াও অন্যায়? এখানে বলা আবশ্যক—'বাসস্থান' বলতে বোঝায় নিজস্ব কোন আবাসস্থল। আদর্শ ভক্ত তাঁর উপাস্য দেবতা ভগবানকেই পরমাশ্রয় বলে মনে করেন। তাই তাঁর নিজস্ব বাসস্থান বলে কিছু থাকতে পারে না। তিনি তাঁর আবাসস্থলকে তাঁর প্রিয়তম ঠাকুরেরই মন্দির বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ, আদর্শ ভক্তের পক্ষে মমত্ববুদ্ধি সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। তাঁর জন্ম, জীবন, গৃহদ্বার সমস্ত কিছুই প্রভুপদে উৎসৃষ্ট।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

অন্বয়—যে তু যথোক্তম্ ইদং ধর্ম্মামৃতং শ্রদ্দধানাঃ মৎপরমাঃ পর্য্যুপাসতে তে ভক্তাঃ মে অতীব প্রিয়াঃ॥ ২০

অনুবাদ—যাঁরা শ্রদ্ধাযুক্ত ও মৎপরায়ণ হয়ে উক্ত ধর্ম্মামৃতরূপ ভক্তিযোগের সাধনা করেন, সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়॥ ২০

গীতামৃত—যারা শ্রদ্ধাহীন ও ভক্তিবিশ্বাসবর্জ্জিত তারা যে ভক্তিসাধনার অনধিকারী—তা সহজেই অনুমেয়। পক্ষান্তরে, শ্রদ্ধালু ও ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিরাই ভক্তিপথকে সাদরে বরণ করে উপরোক্ত গুণ ও আদর্শগুলির চর্চ্চানুশীলনে যত্নবান হন। শ্রীভগবানের মতে এরূপ অনন্য ভক্তরাই তাঁর একান্ত প্রিয়।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগঃ

অধুনা, একশ্রেণীর বিদ্যাভিমানী তথাকথিত পণ্ডিত আবির্ভূত হয়েছেন—যাঁদের মতে গীতার অন্তিম ছয়টি অধ্যায় একান্ত অবান্তর। এঁদের ধারণা—এগুলি পরবর্ত্তী যুগে গীতার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে। কেন না, বিশ্বরূপ দর্শনের পরে পার্থের জিজ্ঞাসু মনের যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। ভগবদ্দর্শনই যখন অধ্যাত্ম সাধনার চরম কথা ও পরম প্রাপ্তি এবং অর্জ্জুনের যখন তা হয়ে গেছে, তখন আবার নূতন জিজ্ঞাসার অবতারণা কেন? তাঁরা আরও বলেন—'ভক্তিযোগ' অধ্যায়টি "বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ" অধ্যায়টির পূর্ব্বে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কারণ, ঈশ্বরদর্শনের পূর্ব্বেই সাধকের হৃদয়-মনে ভক্তিবিষয়ক জ্ঞান ও অনুরাগের সঞ্চার হওয়া প্রয়োজন।

এই পণ্ডিতম্মন্যদের আরও অনুযোগ যে গীতার ন্যায় প্রখ্যাত ও প্রাচীন গ্রন্থখানির এই অসঙ্গতির বিষয়টি শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি দিগ্‌গজ পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাতৃগণের দৃষ্টিতে কেন যে ধরা পড়েনি—ইহা বিস্ময়ের ব্যাপার। শেষোক্তদের এই ভ্রান্তিও উপেক্ষণীয় নয়।

উক্ত পণ্ডিতগণের ইত্যাকার ঔদ্ধত্য—এত মাত্রাহীন ও অশালীন যে তা এক হিসাবে উপেক্ষা করাই সমীচীন। তথাপি এই বিচার-স্বতন্ত্রতার যুগে প্রশ্নটি যখন উত্থাপিত হয়েছে এবং তা ইতোমধ্যে একশ্রেণীর নরনারীর মস্তিষ্ককে আলোড়িত করতে শুরু করেছে, তখন তার মীমাংসাসূত্রে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, উক্ত সমালোচকদের জানা উচিত—অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের ব্যাপারটি তাঁর সাধনালব্ধ চরম সিদ্ধি নয়। চিত্তশুদ্ধির যে অন্তিম সোপানে আরূঢ় হলে সাধক সুদুর্লভ ভগবদ্দর্শনের অধিকারী হন, অর্জ্জুন তখনও সে অবস্থায় উন্নীত হন নি। সখার মুখে তাঁর অনন্ত ও অত্যদ্ভুত বিভূতির বিচিত্র ও বিস্ময়কর বর্ণনা শুনে তিনি তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য নিজের মনোবাসনা নিবেদন করে বলেছিলেন—

"দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥" ১১।৩

হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করতে ইচ্ছুক। আমাকে যদি যোগ্য অধিকারী মনে কর তবে তা দেখিয়ে কৃতার্থ কর। প্রাণপ্রিয় সখার সেই আন্তরিক আবেদন শ্রবণ করে শ্রীভগবান্ তখন বলেছিলেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ১১।৮

হে সখে! তুমি তোমার এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা আমার এই রূপদর্শনে সক্ষম হবে না। তোমাকে এজন্য আমি দিব্যদৃষ্টি দান করছি—তার সহায়ে তুমি আমার এই যোগৈশ্বর্য্য দর্শন কর।

উপরোক্ত এই বিবৃতি হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—ভগবদ্দত্ত দিব্য দৃষ্টির বলেই অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন—নিজের সাধনোচিত ও যোগ্যতার শক্তিতে নয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় স্মরণযোগ্য। ইত্যাকার ভগবদনুগ্রহজনিত দিব্যদৃষ্টির সহায়ে বিশ্বরূপ দর্শন করেও অর্জ্জুন পরিপূর্ণ আশ্বাস ও শান্তি লাভ করতে পারেন নি। উপরন্তু, তিনি এতে ভীতিবিহ্বল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—হে বিশ্বরূপ! তোমার এই সর্ব্বগ্রাসী মহাকাল রূপ আমাকে একান্ত সন্ত্রস্ত ও পীড়িত করে তুলেছে। অচিরে তুমি তা সম্বরণ ক'রে তোমার পূর্ব্বেকার মানুষী রূপ ধারণ কর।

এতে ভালভাবে সপ্রমাণ হয় যে, অর্জ্জুনের অধ্যাত্ম সাধনা তখনও অসম্পূর্ণ এবং পরপ্রভাবজনিত তাঁর সেই ভগবদ্দর্শন সত্যকার ভগবৎ সাক্ষাৎকারে সুউচ্চ দিব্য অনুভূতি নয়—যা তাঁকে চিরশান্তির অধিকারী করতে পারে।

উপরোক্ত বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে বেশ বোঝা যায়—ঐ সকল জ্ঞানাভিমানীদের যুক্তিগুলি একান্ত অসার ও অলীক।

আসুন, এক্ষণে আমরা এই অধ্যায়ের যা মুখ্য আলোচ্য বিষয়—তার মধ্যে প্রবেশ করি। প্রথমে জানা আবশ্যক—"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগরূপ"—গীতার এই ত্রয়োদশ অধ্যায়টিতে কিঞ্চিৎ জটিল দার্শনিক বিচারের অবতারণা করা হয়েছে। মনোজগতে এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য

যে মানুষের মন যতদিন ভৌতিক জীবনের অধস্তন স্তরে ভোগপ্রমত্ত থাকে —ততদিন তার মধ্যে উচ্চতর বিবেক-বিচারের প্রকাশ-বিকাশ ঘটে না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে জীবের এই অবস্থা ঘোর অবিদ্যা ও অজ্ঞানের দশা। এই স্তরের আত্ম-বিস্মৃতির সময়ে ঘটনাস্রোতের ঘাত প্রতিঘাতে ও বিবিধ ভালমন্দ অভিজ্ঞতার কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে মানুষের মনে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন উপস্থিত হয়—যে সমস্ত আত্মীয়-পরিজনের সাহচর্য্য ও বিষয়বস্তুর ভোগসুখে আমি বিভোর ও প্রমত্ত—তারা কি নশ্বর ও অস্থায়ী নয়? যে দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নিচয়ের মাধ্যমে আমি বিষয়ভোগে তন্ময় ও মশগুল, তাদের শক্তি-সামর্থ্য মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হতে পারে না কি? এই রূপ-রসাদি বিষয়পঞ্চকের ন্যায় ঐ ইন্দ্রিয়গণও তো বিনাশশীল ও ক্ষণবিধ্বংসী। বিষয়-ভোগজনিত সুখসম্ভোগও আপাতমধুর এবং তাদের পরিণাম বিষোপম নিদারুণ দুঃখপ্রদ। এই কালে মধ্যে মধ্যে মনে চিন্তা আসে—যে সংসারে আমি লীলারত তার প্রকৃত স্বরূপ কি? এর সহিত আমার সম্বন্ধ-সম্পর্ক কী রূপ ও কত কালের? মৃত্যুশেষে এই স্থূল দেহ যখন ধূলায় ধূসরিত হবে তখন আমার দশা কি হবে? তখন আমি কোথায় যাব? ইত্যাদি ইত্যাদি।

বস্তুতঃ, মানুষের ভোগকাতর মনে যখন ক্ষণে ক্ষণে এরূপ চিন্তাতরঙ্গ উত্থিত হতে থাকে—তখন তার আর নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনাতে ভোগসুখ করার প্রবৃত্তি থাকে না। তখন তার বহির্মুখী ও উচ্ছৃঙ্খল মনোবুদ্ধি ক্রমশঃ ধীর, গম্ভীর ও অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে। সংসারযাত্রার গতিপথে তখন তার মনে আসে এক বিপুল পরিবর্ত্তন। আর এ বিষয়টি সর্ব্ববাদিসম্মত যে আজ হোক কাল হোক, আর দুচার বৎসর অথবা দু'চার জন্ম পরে হোক, প্রত্যেক জীবের জীবনে একদিন এরূপ পরিবর্ত্তন আসতে বাধ্য। হিন্দুশাস্ত্রমতে জীবের এই সুদীর্ঘ জীবনযাত্রাকে বলা হয়—সংসারচক্র। যেখান হতে এই চক্রের গতির আরম্ভ সেখানেই পুনরায় পরিসমাপ্তি। অর্থাৎ, জীবের উৎপত্তি ঘটেছে যে পরমাত্মা হতে, সুদীর্ঘকালের গতাগতির শেষে সেই পরমাত্মাতেই তাকে হতে হবে প্রত্যাবৃত্ত। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে এই বিষয়টি। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগের বিবৃতি-প্রসঙ্গে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছিল এখানে তা-ই সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে অর্জ্জুনের নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দানের উপলক্ষ্যে।

অর্জ্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব॥ ১

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে কেশব, প্রকৃতিং পুরুষং চ এব, ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ, এতৎ বেদিতুম্ ইচ্ছামি॥ ১

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন—হে কেশব! প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় কি, তা আমি জানতে ইচ্ছুক॥ ১

গীতামৃত—কোন কোন টীকাকারের মতে গীতার এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত ; তাই তাঁরা এটিকে বাদ দিয়ে তাঁদের ব্যাখ্যা শুরু করেছেন। তবে অর্জ্জুনের মুখে এরূপ প্রশ্ন উত্থিত হলে পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে বিবৃত আলোচনাসমূহ অধিকতর সুস্পষ্ট হয়। তাই আমরা এর উপেক্ষা প্রয়োজন মনে করি না।

পার্থের উক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ॥ ২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে কৌন্তেয়, ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে ; যঃ এতৎ বেত্তি, তদ্বিদঃ তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ॥ ২

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—হে কৌন্তেয়! এই দেহকে ক্ষেত্র বলা হয় এবং যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন (বা 'আমি' 'আমার' এরূপ মনে করেন)—তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবেত্তা পণ্ডিতগণ এরূপ বলে থাকেন॥ ২

ক্ষেত্রের সহিত দেহের তুলনা

ক্ষেত্র হচ্ছে—শস্যাদির উৎপত্তিস্থল। এই দেহও তদ্রূপ সুখ-দুঃখের উৎপত্তিভূমি। এই জীবদেহকে তাই ক্ষেত্র বলা হয়। ক্ষেত্রস্বামী যিনি তিনি স্বীয় ক্ষেত্রকে নিজের ক্ষেত্র বলে অভিমান করেন এবং সেই

ক্ষেত্র নিজের অভিপ্রায় মত কর্ষণ ক'রে তাতে উৎপন্ন শস্যাদি ভোগ করেন। এই দেহস্বামী জীবাত্মাও তেমনি স্বীয় দেহকে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করেন এবং তার রূপ, গুণ, শক্তি ও অধিকার ভোগ করেন।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥ ৩

অন্বয়—হে ভারত, সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি ; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানং, মম মতম্॥ ৩

অনুবাদ—হে ভারত! সমুদয় ক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জেনো। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাই প্রকৃত জ্ঞান—ইহাই আমার অভিমত॥ ৩

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান

ক্ষেত্র হচ্ছে দেহ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছেন জীবাত্মা। এই দু'য়ের মধ্যে যে পার্থক্য-জ্ঞান, অথবা দেহ এবং আত্মার যে ভেদবুদ্ধি তা-ই সত্যকার জ্ঞান। অর্থাৎ, জীব দেহ নহে, আত্মা—এরূপ যে বোধ তাই অধ্যাত্ম জ্ঞানের মূল কথা। আর এক দিক দিয়ে বিচার করলে জানা যায়—শ্রীভগবান্ এখানে বলছেন—আমি শুধু ক্ষেত্রজ্ঞ নই, ক্ষেত্রও আমি। কারণ, যে প্রকৃতির পরিণামে এই দেহ উৎপন্ন হয়, সেই প্রকৃতি আমারই শক্তি। সুতরাং, দেহ ও দেহী দুই-ই আমি—এই রূপ যে জ্ঞান তা-ই হচ্ছে সম্যক্ জ্ঞান।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪

অন্বয়—তৎ ক্ষেত্রম্, যৎ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি, যতঃ চ যৎ, সঃ চ, যঃ, যৎপ্রভাবঃ চ তৎ মে, সমাসেন শৃণু॥ ৪

অনুবাদ—সেই ক্ষেত্র কি, উহা কি প্রকার, কীরূপ বিকারবিশিষ্ট এবং ইহার মধ্যে কি হচ্ছে, কি হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কে এবং তার প্রভাব কীরূপ—এই সকল তত্ত্ব সংক্ষেপে আমার নিকট শুন॥ ৪

গীতামৃত—সেই দেহরূপী ক্ষেত্র জড়ধর্ম্মী হওয়ায় তা বিকারশীল ; জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় প্রভৃতি ছয় প্রকার বিকার নিয়েই এই জীবদেহ। দেহের ধর্ম্ম হচ্ছে বিবিধ ভোগবাসনা এবং তাদের পরিণাম বিচিত্র ও বহুমুখী ; তা হতে উৎপন্ন হ[illegible] বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—সেই সব তত্ত্ব এবং দেহিরূপী ক্ষেত্রজ্ঞের স্বভাব এবং জৈব জীবনের উপর তার প্রভাব কীরূপ হতে পারে—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট এই সব তত্ত্ব এক্ষণে বর্ণনা করছেন—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৫

অন্বয়—ঋষিভিঃ, বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ, পৃথক্ বহুধা, গীতম্ ; বিনিশ্চিতৈঃ, হেতুমদ্ভিঃ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ এব চ॥ ৫

অনুবাদ—ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিবিধ ছন্দে নানা প্রকারে এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রের পদসমূহেও যুক্তিযুক্ত বিচারসহ সন্দেহাতীত ভাবে এই বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে॥ ৫

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্বটি অতি প্রাচীন

প্রাচীন কালে ঋষি-মহর্ষিগণ নানা ভাবে গীতাবর্ণিত এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং, আর্য্যহিন্দুর দৃষ্টিতে এই বিষয়টি আদৌ নূতন নয়। কেহ কেহ মনে করেন—ব্রহ্মসূত্র রচিত হয়েছে গীতার বহু পূর্ব্বে ; অপর একদল পণ্ডিতের মত—ব্রহ্মসূত্র ও গীতা-গ্রন্থ দু'খানি সমকালীন এবং উভয়ের রচয়িতা ছিলেন একই ব্যাসদেব। যা হোক—দেহ ও দেহীর সম্বন্ধ-বিচার নিয়ে হিন্দুদর্শনের অনুশীলন ও বিশ্লেষণ যে অতি প্রাচীন এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৬
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ৭

অন্বয়—মহাভূতানি, অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ, অব্যক্তম্ এব চ, দশ ইন্দ্রিয়াণি, একং চ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ, ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং, সংঘাতঃ, চেতনা ধৃতিঃ, এতৎ সবিকারং, ক্ষেত্রং সমাসেন উদাহৃতম্॥ ৬।৭

অনুবাদ—পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি এই সমুদয়কে সবিকার ক্ষেত্র বলে॥ ৬।৭

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের উপাদান

সাংখ্যমতে চব্বিশটি তত্ত্ব নিয়ে এই শরীর গঠিত এবং সেই চব্বিশটি তত্ত্ব হচ্ছে—মূল প্রকৃতি, অহঙ্কার, দশ ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত। গীতাতেও এখানে এই চব্বিশটি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। পরন্তু, এখানে এদের সঙ্গে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, ধৃতি—এই তত্ত্বগুলিরও উল্লেখ করা হয়েছে।

কেহ কেহ মনকে আত্মা বলে ভুল করেন। তাঁদের মতে মন যখন জড়, তখন তাতে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, সংঘাত চেতনা, ধৃতিরূপী গুণগুলি থাকতে পারে না। এগুলি চেতন আত্মার গুণ ; কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। কেন না, ত্রিগুণাতীত নির্ব্বিকার আত্মার মধ্যে এই সমস্ত বিকারশীল গুণগুলির অবস্থিতি কীরূপে সম্ভবপর? এগুলি সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বিচারপ্রবণ মনেরই গুণ। এই ভ্রান্তির নিরসনের নিমিত্ত এখানে উক্ত গুণগুলি পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা'ছাড়া, জানা আবশ্যক—চেতনাও দেহের ধর্ম্ম ; কারণ দেহের মধ্যে যতক্ষণ প্রাণশক্তির ক্রিয়া বর্ত্তমান, ততক্ষণ তার মধ্যে চেতনার খেলাও বিদ্যমান থাকা স্বাভাবিক। তবে সময় ও প্রয়োজন বিশেষে এই জৈবিক চেতনার ক্ষয়-বৃদ্ধিও পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—যখন দেহ-মনের উপর আত্যন্তিক আঘাত আপতিত হয়, তখন তার প্রতিক্রিয়ায় তাদের প্রাণশক্তি অবরুদ্ধপ্রায় হয়ে যায়। নির্ব্বিকার আত্মা কদাপি এরূপ বিকারশীল হতে পারে না। তবে জানা প্রয়োজন—এখানে যে চেতনার বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে—প্রাণচৈতন্য (vital power) ; আত্মচৈতন্য (soul consciousness) নয়। এই কারণে চেতনাকে এখানে দৈহিক উপাদানের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

উপরে যে শারীরিক, মানসিক ও প্রাণিক তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে—সেগুলিকে একত্রে সংশ্লিষ্ট রাখবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন—তাকেই এখানে 'ধৃতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহাও দৈহিক ধর্ম্মের অন্তর্গত। এই শ্লোকে 'সংঘাত' নামক যে শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ কিন্তু আঘাত নয়—মিলন। অর্থাৎ, উপরোক্ত যাবতীয় উপাদানগুলিকে নিয়ে যে সমবায় বা সংগঠন—তাই সংঘাত। বস্তুতঃ, এদের সমাবেশেই জীবদেহ গঠিত।

এক্ষণে প্রশ্ন আসবে,—দেহ, মন, প্রাণ—এই তিনটি যখন জড়, তখন তাদের মধ্যে এরূপ চেতনক্রিয়ার অবির্ভাব ঘটে কেমন করে? এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য বলেন—চেতন পুরুষ বা আত্মার সংস্পর্শে আসার ফলেই দেহ, মন, প্রাণ স্বতঃই এরূপ চেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠে। নীল, পীতাদি বর্ণের সম্মুখে এলেই যেমন শুভ্র স্ফটিকের বর্ণের রূপান্তর ঘটে, ইহাও অনেকটা তদ্রূপ। বস্তুতঃ, আত্মা চেতন হলেও স্বয়ং নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার। পরন্তু, আত্মার সান্নিধ্যে আসার ফলেই জড় প্রকৃতির উপাদানস্বরূপ এই দেহ-মন-প্রাণের মধ্যে চৈতন্য ও ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন হয়।

এ বিষয়ে বেদান্তের অভিমত কিন্তু ভিন্নরূপ। সে মতে পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নয়। এদের উপর পরমাত্মার বিধান বিদ্যমান। তিনিই তাঁর অচিন্ত্য মায়াশক্তির সহায়ে তাঁর পরা প্রকৃতিরূপী পুরুষ এবং অপরা প্রকৃতিরূপী প্রকৃতির মাধ্যমে সব কিছু করাচ্ছেন। সুতরাং, মানুষের মন, বুদ্ধি ও প্রাণের যাবতীয় ক্রিয়ার মধ্যে পরমাত্মার শক্তি ও প্রেরণা বিদ্যমান। ভক্তিশাস্ত্রের মতেও শ্রীভগবানই সব। তিনি দেহ, দেহী, মন, বুদ্ধি, প্রাণ —সব কিছু।

এর পরে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্বের উপলব্ধির জন্য যে যে গুণ বা অধিকারের প্রয়োজন তার সূচনা দিয়ে শ্রীভগবান্ বললেন—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ৮
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্॥ ৯

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ১০
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত-দেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥ ১১
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১২

অন্বয়—অমানিত্বম্, অদম্ভিত্বম্, অহিংসা, ক্ষান্তিঃ, আর্জবম্, আচার্য্যোপাসনং, শৌচং, স্থৈর্যম্, আত্মবিনিগ্রহঃ, ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কারঃ এব চ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্, অসক্তিঃ, পুত্রদারগৃহাদিষু অনভিষ্বঙ্গঃ, ইষ্টানিষ্ট-উপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তত্বং, ময়ি অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশ-সেবিত্বং, জনসংসদি অরতিঃ, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্,—এতৎজ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তং, যৎ অতঃ অন্যথা, তৎ অজ্ঞানম্॥ ৮-১২

অনুবাদ—অমানিত্ব, দম্ভরাহিত্য, অহিংসা, ক্ষান্তি, গুরুসেবা, শৌচ, সংকার্য্যে নিষ্ঠা, আত্মসংযম, বিষয়বৈরাগ্য, নিরভিমানিতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিতে দুঃখ-দোষদর্শন, বিষয়ে অনাসক্তি, স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে মমত্ব বোধের অভাব, ইষ্টানিষ্ট লাভে সমচিত্ততা, আমাতে (ভগবান্) অনন্যভক্তি, নির্জন ও পবিত্রস্থলে বাস, জনসঙ্গে বিরক্তি, নিরন্তর অধ্যাত্মভাবে অনুশীলন, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন বিষয়ে আলোচনা—এই সকলকে জ্ঞান বলা হয়, আর ইহার যা বিপরীত তা-ই অজ্ঞান॥ ৮-১২

জ্ঞানীর পক্ষে প্রয়োজনীয় গুণাবলী

এক শ্রেণীর মানুষ আছেন—যাঁর গ্রন্থকীট বা বিচারবাগীশ। অর্থাৎ, যাঁরা ধর্ম্মজ্ঞান লাভের জন্য শুষ্ক শাস্ত্রচর্চ্চা ও বাক্‌সর্ব্বস্ব আত্মানাত্ম বিচারকেই একমাত্র উপায় মনে করেন। গীতা যে উপরোক্ত মত ও আদর্শ সমর্থন করেন না—তা সহজে অনুমেয়। এ বিষয়ে গীতাকার শ্রীভগবান্ সুস্পষ্ট ভাবে উপদেশ দিলেন—সত্যকার অধ্যাত্মজ্ঞান অনুশীলনসাপেক্ষ। আচার্য্য প্রণবানন্দের উক্তিও গীতার এই নির্দ্দেশকে পূর্ণরূপে সমর্থন করে। এবিষয়ে তিনি তদীয়

ভক্ত শিষ্যগণকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন যে, শাস্ত্র পড়ে, লোকমুখে শাস্ত্রকথা শুনে যারা ধর্ম্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে চায় তারা একান্ত ভ্রান্ত। ধর্ম্মের প্রাণ হচ্ছে অনুষ্ঠান ও অনুভূতি। উপরোক্ত গুণগুলিকে আচার্য্যপ্রবর সংক্ষেপে উল্লেখ করে বলেছেন—"**প্রকৃত ধর্ম্ম হচ্ছে—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য**'। উপনিষদ্‌ও অভ্রান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্॥"

এ বিষয়ে স্মরণযোগ্য—উক্ত গুণগুলির অধিকাংশ পূর্ব্বাধ্যায়ের ভক্তিযোগে বর্ণিত আদর্শ ভক্তের লক্ষণের সমতুল্য। আমরা তাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সেই প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই করেছি। কেবল মাত্র যে যে গুণগুলি পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবৃত হয় নি এখানে তৎসম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্—অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের নিমিত্ত জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি যে সমস্ত কারণগুলির জন্য মানুষ সচরাচর দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করে তাদের দোষ-দর্শনের ফলেই সংসারের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। সাধারণ নর-নারীর নিজেদের অজ্ঞতা ও বিচারশক্তির অভাবের জন্য এগুলির গুরুত্ব বিষয়ে উদাসীন থাকে। জন্মে উল্লসিত, মৃত্যুতে শোকাকুল ও জরা-ব্যাধিতে ক্লিষ্ট হয়ে তারা মনে করে—ইহাই নিয়তি বা অদৃষ্টের খেলা। এর হাত হতে উদ্ধার বা মুক্তির উপায় নাই। পরন্তু, নিয়মিত আত্মবিচার ও মহতের কৃপায় যখন তাদের মনে সুবিমল বিবেক-বৈরাগ্যের শুভ সূত্রপাত হয়, তখন তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে চিরতরে বিমুক্ত হবার জন্য আকুল, ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ-পাঠে জানা যায়—শ্রীরামচন্দ্রের কিশোর হৃদয়ে যে সুতীব্র বিবেক-বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল, তার মূলেও ছিল জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিযুক্ত এই জৈব জীবনের অন্তিম পরিণামের বিষয় চিন্তা ও বিচার। প্রত্যেক নর-নারীর কর্ত্তব্য—প্রত্যহ অবসর সময়ে কিছুক্ষণ দেহের ও সংসারের নশ্বরতা এবং বিষয়ের অবাস্তবতার বিষয় চিন্তা করে মনে বিবেক-বৈরাগ্যের ভাব আনয়ন করা। বস্তুতঃ, এরূপ বিচারে অভ্যস্ত হলে বিষয়মোহ আর তাকে বিভ্রান্ত ও মোহগ্রস্ত করতে পারে না।

বিবিক্ত-দেশ-সেবিত্বম্—আত্মজ্ঞানকারী সাধকের পক্ষে প্রবর্ত্তক

অবস্থায় কিছুকাল নির্জ্জন বাসের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য্য। এ বিষয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সূচনা বিশেষ স্মরণযোগ্য।—"নির্জ্জন নিরালা স্থানে যেমন দধি জমাতে হয়, সাধককেও তেমনি প্রথম অবস্থায় নির্জ্জনে সাধন-ভজন করে মনকে স্থির ও ইষ্টনিষ্ঠ করতে হয়।" এই কারণে প্রাচীনকাল হতে গিরিকন্দর, নির্জ্জন নদীতট বা পবিত্র তীর্থস্থানসমূহ নির্ব্বাচিত হয়েছে সাধনার অনুকূল স্থান রূপে। অক্ষম গৃহীর পক্ষে স্বীয় গৃহকোণে স্থাপিত মন্দির বা উপাসনাস্থলই এ বিষয়ে বহুলাংশে অনুকূল।

অরতিঃ জনসংসদি—বহু জনসমাগমে অপরিপক্ক সাধকের মন চঞ্চল হতে বাধ্য। কারণ, যেখানে বহু জনসমাগম সেখানে ভিন্ন ও বিরুদ্ধ প্রকৃতির লোকের সমাবেশ হওয়া একান্ত স্বাভাবিক এবং তাদের চর্চ্চালোচনা যে চিত্ত-বিক্ষেপকর হবে—তাতে সন্দেহ কোথায়? এজন্য জ্ঞান ও শান্তিকামী সাধক এরূপ অহেতুক লোকসঙ্গকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। তবে এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—এই নির্জ্জন বাস ও জনসমাগম এড়িয়ে চলার মনোভাব ততদিন প্রয়োজন—যতদিন মন শক্ত, শান্ত ও সংযত না হয়। চারা গাছটির পক্ষে বেড়া ততদিন আবশ্যক—যতদিন না সেটি বড় হয়ে তার অনিষ্টকারী শত্রুদের নাগালের বাইরে উত্থিত হয়। বলা বাহুল্য, প্রবর্ত্তক অবস্থা অতিক্রান্ত হবার পরে ইত্যাকার রক্ষা-কবচের আর তেমন প্রয়োজন থাকে না।

গীতোক্ত এই জ্ঞান এবং অধুনা প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের ভিতরে পার্থক্য ও ব্যবধান যে কি ও কতখানি—তাও এই প্রসঙ্গে আমাদের বিচার করা প্রয়োজন। অধ্যয়ন-চর্চ্চা ও গবেষণার মাধ্যমে কতকগুলি পাঠ্য বিষয়ের তথ্য সংগ্রহকে আজকাল জ্ঞান বা শিক্ষা বলে অভিহিত করা হয়। এর সঙ্গে জীবনচর্য্যার বা চরিত্রানুশীলনের সম্বন্ধ-সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং, এর দ্বারা বিদ্যার্থীর বুদ্ধিবৃত্তি কতকটা শাণিত হয় মাত্র। পরন্তু, তা তার হৃদয়কে স্পর্শ করে না। বর্ত্তমান শিক্ষার এই ত্রুটিগুলি বিদূরিত করতে হলে গীতোক্ত ঐ গুণগুলির অনুধ্যান ও অনুশীলন যে অত্যাবশ্যক—তা কে অস্বীকার করবে?

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১৩

অন্বয়—যৎ জ্ঞেয়ং, যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে, তৎ প্রবক্ষ্যামি, তৎ অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম; ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে॥ ১৩

অনুবাদ—যাহা জ্ঞেয় বা জ্ঞাতব্য বস্তু—যা জ্ঞাত হলে অমৃত বা মোক্ষ লাভ করা যায়, তা-ই তোমাকে বলছি। তা আমার অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিশেষ স্বরূপ। তিনি সৎও নন, অসৎও নন॥ ১৩

গীতামৃত—শ্রীভগবান্ উপরোক্ত শ্লোকে নিজের অব্যক্ত ও নির্ব্বিশেষ রূপের বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলছেন—তিনি সৎও নন, অসৎও নন। কেন না, যা আছে তার নাশ অবশ্যম্ভাবী; ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ কদাপি তদ্রূপ হতে পারে না। পক্ষান্তরে, যা অসৎ বা অস্তিত্বহীন তার অস্তিত্বও অসম্ভব। সুতরাং, তাও ব্রহ্ম হতে পারে না। বস্তুতঃ, তিনি অনির্ব্বচনীয় ও অনির্দ্দেশ্য।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৪

অন্বয়—তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং। সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৪

অনুবাদ—সর্ব্বদিকে তাঁর হস্তপদ, সর্ব্বদিকে তাঁর চক্ষুঃ, মস্তক ও মুখ, সর্ব্বদিকে তাঁর কর্ণ। এইরূপে এই লোকে সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত আছেন॥ ১৪

ভগবানের সর্ব্বব্যাপী রূপ

শ্রীভগবান্ সগুণ স্বরূপে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই তাঁর হস্তপদ, চক্ষুকর্ণ, নাসিকা-জিহ্বা-মস্তকাদি বিদ্যমান—এখানে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বেদের পুরুষসূক্তের—"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ"—শ্লোকটিতেও এই ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এখানে 'সর্ব্বতঃ' ও 'সহস্র' শব্দ দু'টি অনাদি অনন্তেরই সূচক ও পরিজ্ঞাপক।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৫

অন্বয়—সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং, সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্, অসক্তম্, সর্ব্বভৃৎ এব চ নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৫

অনুবাদ—তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে প্রকাশমান্ অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বর্জ্জিত। নিঃসঙ্গ, অথচ সকলের আধারস্বরূপ ; নির্গুণ, অথচ সকল গুণের ভোক্তা॥ ১৫

গীতামৃত—আর্য্যহিন্দুর ঐশী কল্পনা কতই না অদ্ভুত ও বিচিত্র! বলা বাহুল্য, ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণের সমাহার হওয়ায় এরূপ বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। সগুণ ঈশ্বররূপে জীবের সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে বিদ্যমান থেকে তিনি সব কিছু দেখেন, শুনেন ও ভোগ করেন ; আবার নির্গুণ ব্রহ্মরূপে তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—কোন কিছু তাঁতে নাই। তিনি সে অবস্থায় একান্ত নিরাধার, নিরুপাধি ও নির্ব্বিশেষ।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৬

অন্বয়—তৎ ভূতানাং বহিঃ চ অন্তঃ চ ; অচরং চরম্ এব চ, সূক্ষ্মত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ং ; দূরস্থং চ অন্তিকে চ॥ ১৬

অনুবাদ—সর্ব্বভূতের অন্তরে এবং বাহিরে তিনি, চল ও অচলও তিনি। সূক্ষ্মত্বশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয় এবং তিনি দূরস্থ হয়েও নিকটে অবস্থিত॥ ১৬

ভগবৎস্বরূপ দুর্ব্বোধ্য হলেও বোধের অতীত নয়

শ্রীভগবান্ বিশ্বচরাচরের ভিতরে ও বাহিরে বিদ্যমান ; তাঁর সেই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্রানুস্যূত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ মনোবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের ধারণার অতীত। তবে তিনি যে একেবারে অনুভূতিগম্য নন—একথাও বলা চলে না। বস্তুতঃ, স্থূলদৃষ্টি অজ্ঞের নিকট তিনি দূর হতেও বহুদূর, আবার শ্রদ্ধালু দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধকের নিকট তিনি নিকট হতে নিকটতম। তিনি তাঁর নিত্যকার সাথী, প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তরতম।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৭

অন্বয়—তৎ অবিভক্তং ভূতেষু চ বিভক্তমিব স্থিতং, ভূতভর্ত্তৃ, গ্রসিষ্ণু, প্রভবিষ্ণু চ জ্ঞেয়ম্॥ ১৭

অনুবাদ—ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন হয়েও সর্ব্বভূতে বিভক্তরূপে প্রতীত হন। তিনি সর্ব্বভূতের পালক, সংহারক ও স্রষ্টা॥ ১৭

গীতামৃত—শ্রীভগবান্ তাঁর সর্ব্বব্যাপী চিন্ময় সত্তায় অপরিচ্ছিন্ন রূপে বিদ্যমান। পুনরায় ব্যষ্টিচৈতন্য রূপে তিনি প্রত্যেকের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবস্থিত। আকাশ যেমন সর্ব্বত্র অপরিচ্ছিন্ন রূপে বিদ্যমান থেকেও ঘটে ঘটে খণ্ডিত রূপে পরিদৃষ্ট হয়—ইহাও তদ্রূপ। সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা সগুণ ঈশ্বররূপে সর্ব্বভূতের পালনকর্ত্তা, সংহর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৮

অন্বয়—তৎ জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ, তমসঃ পরম্ উচ্যতে ; জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, জ্ঞানগম্যং, সর্ব্বস্য হৃদি বিষ্ঠিতম্॥ ১৮

অনুবাদ—তিনি জ্যোতিঃ-সকলের জ্যোতিঃ, তিনি অন্ধকারের অতীত। তিনিই জ্ঞান, জ্ঞেয় বা জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, তিনি জ্ঞানের দ্বারা লভ্য, তিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত॥ ১৮

গীতামৃত—ব্রহ্ম স্বয়ং স্বপ্রকাশ। আদিত্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তাঁর প্রভায় প্রভাসম্পন্ন। যতদিন অবিদ্যারূপী অন্ধকার দূরীভূত না হয়, ততদিন তাঁকে অনুভব করা যায় না। তিনি জ্ঞান ও জ্ঞেয়—দুই-ই। অর্থাৎ, যে জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে অবগত হওয়া যায়, তাও তিনি। আর এরূপ জ্ঞান ব্যতীত তিনি কদাপি উপলব্ধিগম্য হন না। তবে এই জ্ঞান কেবল শাস্ত্রজ্ঞান নয়। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের বর্ণনা পূর্ব্ব শ্লোকে করা হয়েছে, জ্ঞান বলতে এখানে তারই নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।। ১৯

অন্বয়—ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ সমাসতঃ উক্তং, মদ্ভক্তঃ এতদ্ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় উপপদ্যতে।। ১৯

অনুবাদ—এই প্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় কাকে বলে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো ; আমার ভক্ত ইহা জেনে আমার স্বরূপ অবগত হন বা প্রাপ্ত হন।। ১৯

গীতামৃত—মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ একদা খেদ করে গেয়েছিলেন—

"এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

বস্তুতঃ, আমাদেরও অনেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—ইত্যাকার খেদোক্তি। আর এক পশ্চাতে যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের অভাবই কারণরূপে বিদ্যমান তাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ক্ষেত্র বা দেহ কি? ক্ষেত্রজ্ঞ বা দেহস্বামীর সহিত তাঁর সম্বন্ধ-সম্পর্কই বা কি এবং কতখানি, দেহের পতনের পরে দেহধারী জীবাত্মার কি অবস্থা হয়—ইত্যাদি তত্ত্বগুলি জানতে পারলেই মানুষ প্রকৃত তত্ত্ববিদ্ বা আত্মবিদ্ হতে পারে। অন্যথা নয়। উপরোক্ত শ্লোকে শ্রীভগবান্ তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।। ২০

অন্বয়—প্রকৃতিং পুরুষম্ এব চ উভৌ অপি অনাদী বিদ্ধি, বিকারান্ চ গুণান্ এব চ প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি।। ২০

অনুবাদ—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলে জেনো ; দেহেন্দ্রিয়াদি বিকারসমূহ এবং সুখদুঃখাদি গুণসমূহ প্রকৃতি হতেই উৎপন্ন।। ২০

গীতামৃত—সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপী দুটি মূলতত্ত্ব অনাদি এবং প্রকৃতিই জগৎপ্রসবিনী এবং সব কিছুর কর্ত্রী। প্রকৃতি হতেই বিকারশীল দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ এবং সুখ-দুঃখাদি গুণসমূহ উৎপন্ন হয়। বেদান্ত মতে কিন্তু ভগবানই কর্তা এবং প্রকৃতি তাঁরই শক্তি। তিনিই প্রকৃতির মাধ্যমে সব কিছু করাচ্ছেন।

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।। ২১

অন্বয়—কার্য্যকারণকর্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে পুরুষঃ, সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে।। ২১

অনুবাদ—প্রকৃতি কার্য্য এবং কারণের উৎপত্তির কারণ এবং পুরুষ সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলে কথিত হন।। ২১

কার্য্যকারণের কর্ত্রী—প্রকৃতি এবং সুখ-দুঃখের ভোক্তা হচ্ছেন পুরুষ

প্রকৃতি হতে যে কেবল দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হয়—তা-ই নয়, তাদের দ্বারা যে সব শুভাশুভ বা ভাল-মন্দ কার্য্য সংঘটিত হয়—তাদেরও কর্ত্রী হচ্ছেন প্রকৃতি। পক্ষান্তরে, প্রকৃতির দ্বারা অনুষ্ঠিত ঐ সমস্ত কর্ম্মের যে ফল, তা ভোগ করেন পুরুষ। কোন স্ত্রৈণ নিষ্কর্মা পতি যেমন তার স্ত্রীর অর্জিত সম্পত্তির ফলভোগ করে, ইহা যেন কতকটা তদ্রূপ। সাংখ্যমতে সৃষ্টিরাদি কর্তৃত্বে চেতন ও নির্ব্বিকার পুরুষ গৌণ এবং বিকারশীলা জড়স্বভাবা প্রকৃতিই মুখ্যা।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু।। ২২

অন্বয়—পুরুষঃ হি প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে, অস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু গুণসঙ্গঃ কারণম্।। ২২

অনুবাদ—পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন এবং ঐ ভাল-মন্দ গুণসমূহের সঙ্গই পুরুষের সদসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয়।। ২২

পুরুষের সদসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ

পুরুষ প্রকৃতিতে আসক্ত হবার ফলে প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং ইহাই তাঁর সদসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্যকর্ম্মের ফলে পুরুষের দেবজন্ম,

ভালমন্দ মিশ্রিত কর্ম্মের ফলে মনুষ্যজন্ম এবং অসৎ কর্ম্মের ফলে তাঁর পশুজন্ম লাভ হয়ে থাকে।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২৩

অন্বয়—অস্মিন্ দেহে পরঃ পুরুষঃ উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বরঃ, পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ॥ ২৩

অনুবাদ—এই দেহে যে পরম পুরুষ আছেন—তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলে কথিত হন॥ ২৩

সাংখ্যের পুরুষই বেদান্তের ঈশ্বর

উপরোক্ত শ্লোকে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে সাংখ্যদর্শনে যিনি মূল পুরুষরূপে বর্ণিত, তিনিই গীতার (বেদান্তের) মতে সর্ব্বলোকমহেশ্বর, তিনি দ্রষ্টা, অনুমোদনকর্ত্তা, প্রতিপালক তিনিই গুণসমূহের ভোক্তা। এখানেই সাধিত হয়েছে সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয়। বস্তুতঃ, সাংখ্য ও বেদান্তের এই সমন্বয় সাধনই—গীতাধর্ম্মের অনুপম বৈশিষ্ট্য।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ ২৪

অন্বয়—যঃ এবং পুরুষং গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ বেত্তি সঃ সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি ভূয়ঃ ন অভিজায়তে॥ ২৪

অনুবাদ—যিনি এই প্রকার পুরুষতত্ত্ব এবং গুণের সহিত প্রকৃতিতত্ত্ব অবগত হন, তিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ২৪

সাংখ্য মতে মুক্তির উপায়

সাংখ্য মতে পুরুষ-প্রকৃতির বিভেদ বা পার্থক্যজ্ঞানই মুক্তির উপায়। পুরুষকে নির্ব্বিকার চেতনস্বরূপ এবং প্রকৃতিকে বিকারধর্ম্মী ও জড় বলে যিনি জানেন এবং প্রকৃতির সংস্রব বা প্রভাব এড়িয়ে চলবার কৌশল যিনি সম্যকরূপে অবগত হন, তিনি জন্মমৃত্যুর গোলক-ধাঁধা হতে পরিমুক্ত হয়ে

পরম শান্তির অধিকারী হন। সাংখ্যমতে ইত্যাকার মুক্তিকে কৈবল্যমুক্তি বলা হয়।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ ২৫

অন্বয়—কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনা আত্মনি আত্মানং পশ্যন্তি ; অন্যে সাংখ্যেন যোগেন, অপরে চ কর্ম্মযোগেন॥ ২৫

অনুবাদ—কেহ কেহ ধ্যানের দ্বারা আত্মাতে আত্মদর্শন করেন, কেহ কেহ সাংখ্যযোগের দ্বারা, আবার কেহ কেহ কর্ম্মযোগের দ্বারা আত্মদর্শন করেন॥ ২৫

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৬

অন্বয়—অন্যে তু এবং অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা উপাসতে ; তে অপি শ্রুতিপরায়ণাঃ, মৃত্যুম্ অতিতরন্তি এব॥ ২৬

অনুবাদ—কেহ কেহ আবার আত্মাকে জানতে না পেরে অপরের নিকট হতে শুনে উপাসনা করেন ; এরূপ শ্রদ্ধালু শ্রোতারাও গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে সাধনা ক'রে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন॥ ২৬

আত্মদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন পথ

রুচি ও প্রকৃতি ভেদে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপদ্ধতি সূচিত হয়েছে। যাঁদের স্বভাব-সংস্কার ধ্যানশীল তাঁদের পক্ষে উপযোগী হচ্ছে—ধ্যানযোগ। সেই পথে তাঁরা একাগ্রতা অভ্যাস পূর্ব্বক মনকে আত্মতত্ত্বে নিবদ্ধ ক'রে স্বীয় আত্মার মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপে আত্মদর্শন করেন। যাঁদের সংস্কার বিচার প্রবণ তাঁরা 'নেতি নেতি' বিচারের সহায়তায় অথবা সাংখ্য মতানুযায়ী পুরুষ-প্রকৃতির ভেদ-রহস্য অবগত হয়ে জ্ঞানবাদের মাধ্যমে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন। আবার কর্ম্মপ্রধান প্রকৃতির সাধকগণ ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম ক'রে শুদ্ধচিত্ত হয়ে ভগবদ্দর্শন করেন। পক্ষান্তরে, যাঁদের মনোভাব ভাবপ্রধান তাঁরা

গুরুর নির্দ্দিষ্ট পথে সাধন-ভজন-উপাসনাদি ক'রে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মে অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে এরূপ অধিকারবাদ স্বীকৃত হয় নি। এমন কি হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, আর্য্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিতেও এতখানি সাধনস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় নি।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ২৭

অন্বয়—ভরতর্ষভ, যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং সংজায়তে, তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ বিদ্ধি॥ ২৭

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ, স্থাবর জঙ্গম যত কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয় তা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হতে হয়ে থাকে—জানবে॥ ২৭

জগৎসৃষ্টি কীরূপ সম্পন্ন হয়?

পূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে যে ক্ষেত্র (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞ (পুরুষ)—এই উভয়ের সংযোগে এই জগতের যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন। এখানে সেই মতই পুনরায় সমর্থিত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক—সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি হচ্ছে—গীতার পরা ও অপরা প্রকৃতি। সাংখ্যমতে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ আপনা হইতেই সংঘটিত হয়। সুতরাং, জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের উপরেও সাংখ্যের এই নিরীশ্বরবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সাংখ্যদর্শন পুরুষকে ঈশ্বর বলে মান্য করে। তবে সাংখ্যের পুরুষ এক নহে—বহু। সুতরাং, সাংখ্যের ঈশ্বরও একাধিক। বৌদ্ধ এবং জৈনগণও বুদ্ধ ও তীর্থঙ্করগণকে ঈশ্বররূপে পূজা করেন। তবে তাঁরা তাঁদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তার সম্মান দান করেন না।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৮

অন্বয়—সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তং বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি, সঃ পশ্যতি॥ ২৮

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং সমস্ত কিছু বিনষ্ট হলেও যিনি নাশ প্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বরকে যিনি যথার্থরূপে জানেন তিনি সমদর্শী॥ ২৮

সমদর্শীর লক্ষণ

এই বিচিত্র বিশ্বের যেখানে বাহ্যতঃ দুটি বস্তু এক প্রকারের নয়, সেখানে সমদর্শী হওয়া সত্যই জটিল ব্যাপার। তবে তার একটিমাত্র উপায় আছে এবং তা হচ্ছে—ভগবান যে সর্ব্বত্র এবং সব কিছুর অন্তরালে সমভাবে বিদ্যমান আছেন সেই পরতত্ত্বের আবিষ্কার করা। বস্তুতঃ, বহুত্বের অন্তরালে এই ঐক্য বা সাম্যের দর্শনই—ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ব্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। গীতা বলছেন—এই যে অভেদ-দর্শন তা-ই সত্যকার দর্শন বা দিব্যানুভূতি।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২৯

অন্বয়—সর্ব্বত্র হি সমং সমবস্থিতম্ ঈশ্বরং পশ্যন্, আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি, ততঃ পরাং গতিং যাতি॥ ২৯

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তিনি আত্মার দ্বারা আত্মাকে হনন করেন না এবং তিনি পরম গতি লাভ করেন॥ ২৯

সমদর্শী ব্যক্তি আত্মঘাতী হন না

সাধনার দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হওয়ায় যাঁরা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন করেন, তাঁদের দৃষ্টি কদাপি হীন, সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থান্ধ হয় না এবং তাঁদের পক্ষে নিজেকে বা অপরকে ঘৃণা বা হিংসা করা কদাপি সম্ভবপর হতে পারে না। কেন না, তাঁদের মনোবুদ্ধি তখন নিরন্তর সুউচ্চ ভাগবত চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত থাকে—এরূপ অবস্থায় তাঁরা যে পরমগতি লাভ করবেন তাতে সন্দেহ-সংশয় কোথায়?

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ ৩০

অন্বয়—[illegible] কর্ম্মাণি প্রকৃত্যা এব সর্ব্বশঃ ক্রিয়মাণানি তথা আত্মানম্ অকর্ত্তারং পশ্[illegible] সঃ পশ্যতি॥ ৩০

অনুবাদ—প্রকৃতিই সর্ব্বতোভাবে সমস্ত কর্ম্ম করেন এবং আত্মা কিছু করেন না—ইহা যিনি জানেন তিনি সম্যক্‌দর্শী॥ ৩০

গীতামৃত—কর্ত্তৃত্বাভিমানই যাবতীয় বন্ধন ও পাপের মূল। মানুষ যখন সাধনার দৃষ্টিতে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করে যে, এই সংসারে সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্রী হচ্ছেন—প্রকৃতি, আত্মা নন, তখন তার সেই কর্ত্তৃত্বাভিমান স্বতঃই সমূলে বিনষ্ট হয়। বস্তুতঃ, ইত্যাকার জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩১

অন্বয়—যদা ভূতপৃথক্‌ভাবম্ একস্থম্, ততঃ এব চ বিস্তারম্ অনুপশ্যতি, তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে॥ ৩১

অনুবাদ—যখন সাধক ভূতসকলের পৃথক্ পৃথক্ ভাব এক ব্রহ্মবস্তুতে অবস্থিত এবং তা হতেই বহুত্বের বিস্তৃতি অবগত হন, তখন তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন॥ ৩১

সকলের মধ্যে এক এবং এক হতে বহু

যিনি বহুত্বের মধ্যে একত্ব এবং সেই একত্ব হতে বহুত্বের বিস্তার লক্ষ্য করেন—তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী বা তত্ত্ববেত্তা। অর্থাৎ, এই বিচিত্র বিশ্ব এক ভগবানের মধ্যেই নিহিত এবং তা হতেই পুনরায় সব কিছুর উৎপত্তি ও বিস্তার হচ্ছে, এরূপ যে অনুভূতি তার মধ্যেই চরম জ্ঞান নিহিত।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩২

অন্বয়—কৌন্তেয়, অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ অয়ম্ অব্যয়ঃ পরমাত্মা শরীরস্থঃ অপি ন করোতি, ন লিপ্যতে॥ ৩২

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ ব'লে এই পরমাত্মা অবিকারী। দেহে অবস্থিত থাকলেও তিনি কিছু করেন না বা কোন কিছুতে লিপ্ত হন না॥ ৩২

গীতামৃত—যা সাদি, যা সান্ত ও গুণযুক্ত বা ত্রিগুণাত্মক তা-ই বিকারশীল। পরমাত্মা তা নন; তাই তিনি নির্ব্বিকার। তিনি জীবদেহে অবস্থিত থাকলেও সর্ব্বদা অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত থাকেন। সুতরাং, তিনি কিছু করেন না।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩৩

অন্বয়—যথা সর্ব্বগতম্ আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ ন উপলিপ্যতে তথা সর্ব্বত্র দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে॥ ৩৩

অনুবাদ—যেমন আকাশ সর্ব্ববস্তুতে স্থিত থাকলেও সূক্ষ্মতাবশতঃ কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না, তেমনি আত্মা দেহে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও দেহের কোন গুণধর্ম্মে লিপ্ত হয় না॥ ৩৩

আত্মা আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত

এখানে আকাশের সহিত আত্মার তুলনা করা হচ্ছে। আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী, আত্মাও তেমনি সর্ব্বব্যাপী। আকাশ যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হওয়ায় কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না,—'অণোরণীয়ান্' আত্মাও তদ্রূপ কোন কিছুতে লিপ্ত হন না। আকাশে সুগন্ধ, দুর্গন্ধ কত ধূম, ধূলিকণা প্রভৃতি ভেসে বেড়ায়; কিন্তু তাদের সেই ভাল-মন্দ দোষগুণের দ্বারা আকাশ কদাপি লিপ্ত হয় কি? আত্মাও তেমনি দেহের মধ্যে অবস্থিত থাকলেও সেই বিকারশীল দেহের ভাল-মন্দ দোষগুণের দ্বারা কদাপি লিপ্ত হন না।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৪

অন্বয়—ভারত! যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি, তথা ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি॥ ৩৪

অনুবাদ—হে ভারত! যেমন এক সূর্য্য সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করেন, তেমনি এক ক্ষেত্রীরূপী আত্মা সমস্ত ক্ষেত্র বা দেহকে প্রকাশিত করেন॥ ৩৪

আত্মা সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্ব প্রকাশক

এক সূর্য্য যেমন সমগ্র চরাচর বিশ্বকে প্রভাময় করেন, অর্থাৎ এক সূর্য্যের প্রভাব দ্বারা যেমন সব কিছু জ্যোতির্ম্ময় হয়, তেমনি আত্মা দ্বারা দেহের সমস্ত অংশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রদীপ্ত ও প্রাণবন্ত হয়। এতৎ সত্ত্বেও সূর্য্য যেমন সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় নির্লিপ্ত, আত্মাও তেমনি দেহমধ্যে সর্ব্বাবস্থায় অস্পৃষ্ট ও অলিপ্ত থাকেন।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ৩৫

অন্বয়—যে এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং ভূত-প্রকৃতিমোক্ষঞ্চ জ্ঞানচক্ষুষা বিদুঃ তে পরং যান্তি॥ ৩৫

অনুবাদ—যাঁরা জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং প্রকৃতির প্রভাব হতে ভূত সকলের মুক্তিলাভের উপায় বা পন্থা অবগত হন, তাঁরা পরম পদ প্রাপ্ত হন॥ ৩৫

উপসংহার

দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলেছিলেন—অব্যক্তের উপাসনা অতি দুরূহ, জটিল ও ক্লেশসাধ্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সেই অব্যক্তের স্বরূপ কি? তার উপাসনার পদ্ধতি কি?—তাই আলোচিত হয়েছে। সাধারণতঃ আমরা যাকে দেহ ও দেহী বা দেহধারী আত্মা বলি এই অধ্যায়ে তাকে বলা হয়েছে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ; সাংখ্যমতে তাকে বলা হয়—প্রকৃতি ও পুরুষ। বেদান্তের মতে সাংখ্যের পুরুষ হচ্ছে ঈশ্বর এবং প্রকৃতি হচ্ছে তার কার্য্যকারণ-শক্তি ও উপাদান।

সাংখ্যমতে মুক্তির উপায় হচ্ছে বিবেক-বিচারের দ্বারা পুরুষ-প্রকৃতির বিয়োগের ব্যবস্থা করা; অর্থাৎ পুরুষকে প্রকৃতির গুণধর্ম্মের প্রভাব হতে পরিমুক্ত করা। গীতার মতে মুক্তির উপায় হচ্ছে ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। তবে দেহাত্মবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই সুদিব্য পরমগতি লাভ করা অসম্ভব। এই জন্য এই অধ্যায়ে জ্ঞানমার্গের উপযোগী সাধনার উপর সর্ব্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। তৎসঙ্গে আরও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই জ্ঞান লাভ করতে হলে অমানিত্ব, অনহঙ্কার প্রভৃতি কতকগুলি গুণের অনুশীলন ও অর্জন একান্ত প্রয়োজন।

সর্ব্বশেষে জ্ঞানীর লক্ষ্মণের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁরা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বা আত্মদর্শন করেন। এই অবস্থায় তাঁরা উপলব্ধি করেন—আত্মার মধ্যে সব কিছু নিহিত এবং তা হতে এই বিচিত্র বিশ্বের প্রসার ও বিস্তৃতি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ—গুণত্রয়বিভাগযোগঃ

এখন আমরা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের আলোচনায় ব্রতী হব। এই অধ্যায় 'গুণত্রয়বিভাগযোগ' নামে আখ্যাত। সংসারসৃষ্টি ও জীবের কর্ম্মবন্ধনের মূলে "সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ" রূপ যে ত্রিগুণের প্রভাব বিদ্যমান—তাদের স্বরূপ কি? তাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ বিশিষ্ট স্বভাব কি? তাদের দ্বারা এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এবং জীবের কর্ম্মবন্ধন কীরূপে সাধিত হয়? ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ কি এবং সেই গুণাতীত অবস্থা লাভের উপায় কি—? এই বিষয়গুলির এই অধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেছেন—

এই সংসারে সমস্ত কিছুই ত্রিগুণের অধীন, এমন কি বেদসমূহ বা বৈদিক জ্ঞানও ত্রিগুণের অতীত নয়। সুতরাং তুমি গুণাতীত ও নিষ্কাম হও এবং সাত্ত্বিকভাবে চিরপ্রতিষ্ঠ হও।

তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরও সূচনা দেওয়া হয়েছে—প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা সদসৎ কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হয়। পরন্তু, অহঙ্কারী ব্যক্তিরা মনে করে—আমিই কর্ত্তা।

এইরূপে গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে বিশেষতঃ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরুষ-প্রকৃতির স্বরূপ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা করা হয়েছে। পরন্তু, সেই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই দুরূহ বিষয়টি সুস্পষ্ট না হওয়ায় বর্ত্তমান অধ্যায়টির অবতারণা। শ্রীভগবান্ এক্ষণে তারই সূচনা দিয়ে বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—জ্ঞানানাম্ উত্তমং পরং জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ ইতঃ পরাং সিদ্ধিং গতাঃ॥ ১

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—আজ আমি পুনরায় জ্ঞানের মধ্যে যে সর্ব্বোত্তম জ্ঞান—তা-ই তোমাকে বলব—যা অবগত হয়ে ঋষিমুনিগণ মোক্ষ লাভ করেছেন।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২

অন্বয়—ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ সর্গে চ অপি ন উপজায়ন্তে, প্রলয়ে চ ন ব্যথন্তি॥ ২

অনুবাদ—যাঁরা আমার সাধর্ম্ম্য বা ত্রিগুণাতীত ভাগবত স্বরূপ লাভ করেন, তাঁরা সৃষ্টিকালেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয় কালেও ব্যথিত হন না॥ ২

চিরমুক্তি লাভের উপায়—ত্রিগুণাতীত হওয়া

মুক্তিকামী ব্যক্তিরা সংসারের অনিত্যতা, জন্ম-মৃত্যুর গোলকধাঁধায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হওয়া, জরা-ব্যাধি ও রিপু-ইন্দ্রিয়ের উপদ্রব-উৎপীড়ন প্রভৃতি দুঃখ-যন্ত্রণার বিষয়গুলি চিন্তা করে বিশেষ ব্যথিত ও চিন্তিত হন এবং এই দুঃসহ ভববন্ধন ও গতাগতির হস্ত হতে কী রূপে চির অব্যাহতি লাভ করা যায় তার চিন্তা ও চেষ্টায় আকুল-ব্যাকুল হয়ে উঠেন। অর্জ্জুনের মানসিক অবস্থা এখন সেই স্তরে উন্নীত। শ্রীভগবান্ তাই তাঁকে পুরোভাগে রেখে আগত-অনাগত যুগের সমস্ত সাধককুলকে প্রকৃতির গুণবন্ধন হতে চিরমুক্তির উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন।

বস্তুতঃ, বিষয়টি বড়ই জটিল অথচ মহত্বপূর্ণ—শ্রীভগবান্ তাই সর্ব্বপ্রথম সান্ত্বনা দিয়ে অর্জ্জুনকে বলেছেন,—হে সখে, ইতঃপূর্ব্বে অনেক ঋষি-মুনি এই সাধনা আয়ত্ত করে মোক্ষগতি প্রাপ্ত হয়ে ধন্য হয়েছেন। তুমিও মোক্ষার্থী। বিষয়টির জ্ঞান সম্যক্‌রূপে অধিগত করতে পারলে কল্পান্তেও তোমাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করতে হবে না। মৃত্যুকালেও তোমার কোন ভয়-ভীতি থাকবে না।

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য। এক শ্রেণীর পণ্ডিতের ধারণা—চিরমুক্তি ব'লে কোন অবস্থা নাই। তপস্যা দ্বারা পরমগতি লাভ করলেও প্রলয়ান্তে যখন পুনরায় নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত হয়, তখন সেই জীবকুলকেও আবার ধরাধামে অবতীর্ণ হতে হয়। অবতারবাদী হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেও এ বিষয়ে আরও একটি মতবাদ প্রচলিত। এই মতানুসারে শ্রীভগবান্ যুগাবতার রূপে জীবোদ্ধারের জন্য যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি প্রকট হন স্বগণ বা স্বীয় পরিকরবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়টির ঈঙ্গিত দিয়ে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেছেন—হে অর্জ্জুন, তোমার ও আমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সে সকল কথা জানি। হে পরন্তপ, তুমি জান না।

তবে এ বিষয় আমাদের জানা প্রয়োজন—সামগ্রিক ভাবে জগতের সমস্ত জনসাধারণ ভগবানের ইত্যাকার পার্ষদ বা পরিকরভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন না। তা ছাড়া, যাঁদের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবাসনার বীজ নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যায়, তাঁদের পক্ষে কল্পান্তে জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং, মুক্ত জীবকেও কল্পান্তে পুনরাগমন করতে হবে এরূপ মতবাদ যাঁরা প্রচার করেন, তাঁরা ভ্রান্ত। বস্তুতঃ, সাধনার দ্বারা ত্রিগুণাতীত স্থিতিতে উন্নীত হতে পারলে আর পুনর্জ্জন্মের ভয় বা সম্ভাবনা থাকে না। গীতা এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় সেই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন দিলেন।

বিশ্বপ্রপঞ্চ কীভাবে রচিত হয় শ্রীভগবান্ তার সূচনা দিয়ে এক্ষণে বলেছেন—

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩

অন্বয়—ভারত, মহদ্ব্রহ্ম মম যোনিঃ, তস্মিন্ অহং গর্ভং দধামি, ততঃ সর্ব্বভূতানাং সম্ভবঃ ভবতি॥ ৩

অনুবাদ—হে ভারত, প্রকৃতিই আমার গর্ভাধান-স্থান। আমি তাতে গর্ভাধান করি এবং তা হতে সর্ব্ব জীবের উৎপত্তি হয়॥ ৩

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪

অন্বয়—কৌন্তেয়, সর্ব্বযোনিষু যাঃ মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি, মহদ্ব্রহ্ম তাসাং যোনিঃ, অহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়, সমস্ত যোনিতে যারা জন্মগ্রহণ করে, মহদ্ব্রহ্ম বা প্রকৃতি তাদের জননী এবং তাদের বীজপ্রদ পিতা॥ ৪

জগৎসৃষ্টির প্রণালী

মহাপ্রলয়ের শেষে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে পুনরায় সিসৃক্ষা বা সৃষ্টির সংকল্প জাগ্রত হয়—প্রজাপতি ব্রহ্মার এই যে আত্মবিকাশের সংকল্প, তাই হচ্ছে বিশ্বসৃষ্টির বীজ। এই বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত হয় প্রকৃতিতে। তাই এখানে বলা হয়েছে,—শ্রীভগবান্ বীজপ্রদ পিতা এবং প্রকৃতিই গর্ভধারিণী জননী। 'আমিই স্বীয় প্রকৃতিতে গর্ভাধান করি'—এই যে ভগবদুক্তি তার তাৎপর্য্য হচ্ছে—শ্রীভগবান্ জগৎসৃষ্টির আদি কারণ। অর্থাৎ, তাঁর সঙ্কল্পেই প্রকৃতির মাধ্যমে সব কিছু সৃষ্ট হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হয়েছে—

সাংখ্যমতে জড়াপ্রকৃতি হচ্ছে প্রসবধর্মিণী। চেতন পুরুষের সান্নিধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে জাগ্রত হয় সৃষ্টির সঙ্কল্প। তাই তিনি হচ্ছেন এই জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। এই মতে পুরুষের সৃজন-ক্ষমতা নাই। পক্ষান্তরে, এখানে গীতা বলছেন—পুরুষ বা ভগবানই বিশ্বপ্রপঞ্চের স্রষ্টা, প্রকৃতির নিজের কোন সৃষ্টিশক্তি নাই। ভগবানের সঙ্কল্পবীজ যতক্ষণ না তাতে অর্পিত হয় ততক্ষণ প্রকৃতি কিছুই করতে পারেন না; অর্থাৎ ভগবানই কর্ত্তা, প্রকৃতি তার করণ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫

অন্বয়—মহাবাহো, সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ দেহে অব্যয়ং দেহিনং নিবধ্নন্তি॥ ৫

অনুবাদ—হে মহাবাহো, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রকৃতিজাত এই গুণত্রয় দেহমধ্যস্থ আত্মাকে বন্ধন করে রাখে॥ ৫

গীতামৃত—সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতি হতে উৎপন্ন এবং তারাই আত্মার বন্ধনের কারণ। তবে গুণভেদে সেই বন্ধন কী রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হয়

—নীচের কয়েকটি শ্লোকে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এই আলোচনার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে একটি বিষয় পুনরায় স্মরণ রাখা প্রয়োজন—সত্ত্বাদি এই তিনটি গুণ পরস্পর একেবারে স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করে না। এদের প্রত্যেকটির সহিত অপর দুটির সম্বন্ধ-সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। অর্থাৎ, যেখানে এদের একটি বিদ্যমান সেখানে অন্য দুটিও অল্পাধিক বর্ত্তমান থাকে। তবে এদের একটি যখন বিশেষ প্রবল হয়, তখন তার মধ্যে অপর দুটি ক্ষীণ ভাবে অবস্থান করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—যেখানে সত্ত্বগুণের আধিক্য বা বিশেষ প্রাবল্য, সেখানে, রজঃ ও তমোগুণ স্তিমিত হয়ে থাকে।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।। ৬

অন্বয়—অনঘ, তত্র নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকম্ অনাময়ং, সত্ত্বং সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্নাতি।। ৬

অনুবাদ—হে অনঘ, এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল বলে নির্দ্দোষ ও প্রকাশশীল; এই গুণ সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা আত্মাকে আবদ্ধ করে রাখে।। ৬

সত্ত্বগুণের বন্ধন

সত্ত্বগুণের স্বরূপ-লক্ষণ হচ্ছে দুটি—সুখ ও জ্ঞান। সত্ত্বগুণসঞ্জাত এই সুখ ও জ্ঞান বিষয়ানন্দ ও ভৌতিক জ্ঞান অপেক্ষা উন্নততর ও নির্ম্মলতর হলেও তা ব্রহ্মানন্দ ও অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান নয়। কেন না, এই সত্ত্বের মধ্যেও রজঃ ও তমোগুণের কিঞ্চিৎ সংমিশ্রণ বিদ্যমান। তাই এই সত্ত্বগুণের মধ্যে আমি সুখী, আমি জ্ঞানী, আমি ভক্ত এরূপ একটা অভিমানের ভাব নিহিত থাকে। আর এরূপ আমিত্বের অভিমান যেখানে, সেখানে বন্ধন অনিবার্য্য। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় এটি হচ্ছে 'সোনার শিকল'। অর্থাৎ, এই সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে যে সুখ ও জ্ঞানলাভ হয়, তার মধ্যেও নিহিত থাকে এক প্রকার আসক্তি ও সূক্ষ্ম অহঙ্কার যা বন্ধনের কারণ ঘটায়।

তবে এই সাত্ত্বিক অভিমান ও আসক্তি খুব বেশী হানিকর হয় না, বরং

সাধনার প্রাথমিক স্তরে ইহা সাধকের মুক্তিপথে হয় অনেকখানি সহায়ক। আমি দীন নই, হীন নই, আমি পরমাত্মার অংশ, ভগবানের সন্তান, আমি জ্ঞানী, আমি ভক্ত এরূপ যে অভিমান তা প্রাথমিক অবস্থায় আত্মোন্নতি বা আত্মোৎকর্ষের পক্ষে অনেকখানি সহায়ক। তবে সাধনার উচ্চতম স্থিতিতে সেই সাত্ত্বিক অভিমানও ত্যাগ করা চাই। একেই বলা হয়েছে—'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে নিয়ে দুটি কাঁটাকেই ফেলে দেওয়া।' আবার সিদ্ধির পরবর্ত্তী অবস্থায় যাঁরা গুরুর নির্দ্দেশে লোকসংগ্রহমূলক কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁদের এই সাত্ত্বিক অভিমান নিয়েই কাজ করতে হয়। কারণ, বিশুদ্ধ সত্ত্বের মধ্যে ক্রিয়াশক্তির পরিপূর্ণ অভাব ঘটে।

উপসংহারে তাই বলা যায়—সত্ত্বগুণ যেমন বন্ধনের কারণ, তেমনি তা মুক্তির সহায়ক। গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণের মহত্ত্বগৌরব এখানে। বস্তুতঃ, মানুষের মনোবুদ্ধি যখন উচ্চতর সুখ ও জ্ঞানলাভের জন্য উদগ্রীব হয় তখনই তার মধ্যে ঘটে ইত্যাকার সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব এবং তার ফলে তার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও প্রেরণা হয় ঊর্দ্ধমুখী। তবে বিশেষ সাবধান ও সতর্ক না হলে সাধক তখন সেই সুখ ও জ্ঞানলিপ্সায় আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্।। ৭

অন্বয়—কৌন্তেয়, রজঃ রাগাত্মকং তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং বিদ্ধি, তৎ কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনং নিবধ্নাতি।। ৭

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়, রজোগুণ রাগাত্মক, ইহা হতে তৃষ্ণা ও আসক্তি উৎপন্ন হয়। এই রজোগুণ তৃষ্ণা ও আসক্তি দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে।। ৭

রজোগুণের বন্ধন

তৃষ্ণা ও কর্ম্মাসক্তিই রজোগুণের বিশেষ স্বরূপ-লক্ষণ। রজোগুণের প্রাবল্যে মানুষ অতিশয় চঞ্চল ও ভোগপ্রবণ হয়। এরূপ রজোগুণী লোক কদাপি স্বল্পে সন্তুষ্ট হয় না। এদের কণ্ঠে শুধু 'দেহি দেহি' রব। দুর্দ্দম ভোগপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য এরা ভয়াবহ গর্হিত আচরণেও তৎপর হয়ে উঠে। এই শ্রেণীর মানুষরাই সমাজ-সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অহিত ও

সর্ব্বনাশকারী ; সর্ব্বপ্রকার কলহ, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ-বিগ্রহের পশ্চাতে এদের দুরভিসন্ধি ও সক্রিয় প্রচেষ্টা বিদ্যমান। এরাই কংস, রাবণ, শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্যোধনাদির গোষ্ঠীভুক্ত।

তবে যে সকল রজোগুণী ব্যক্তির মধ্যে সত্ত্বগুণের কিছুটা প্রভাব বর্ত্তমান, তাঁদের কামনা, বসনা ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি হয় অনেকখানি লোকহিতকর। এজন্য দেখা যায়, তাঁরা শুধু নিজেদের ভোগসুখের জন্য ব্যগ্র না হয়ে অন্যান্য আত্মীয়-পরিজন, স্বগ্রাম স্বদেশের সেবায় উদ্যত ও তৎপর হয়ে উঠেন। বিভিন্ন দেশের শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নেতা বা নায়কগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। উচ্চতম মোক্ষ-মুক্তির জন্য আগ্রহশীল না হলেও এঁরা নিজেদের বুদ্ধি-বিচারমত দেশ-জাতি ও সমাজের কল্যাণ-প্রচেষ্টায় ভীমকর্ম্মা হয়ে উঠেন।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।। ৮

অন্বয়—ভারত, তমঃ তু অজ্ঞানজং, সর্ব্বদেহিনাং মোহনং বিদ্ধি ; তৎ প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রাভিঃ নিবধ্নাতি।। ৮

অনুবাদ—হে ভারত, তমোগুণ অজ্ঞানজাত এবং দেহিগণের ভ্রান্তিজনক ; ইহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাতন্দ্রা দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে।। ৮

তমোগুণের বন্ধন

ত্রিগুণের মধ্যে তমোগুণের স্থান সর্ব্বনিম্নে। এই গুণের বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে—প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রারূপী জড়ভাব। এজন্যই তমোগুণী মানুষের স্বভাব নিরুদ্যম ও জড়প্রকৃতির। প্রয়োজনীয় সুখ-সমৃদ্ধি অর্জ্জনের প্রতিও এদের উৎসাহ উদ্যমের ঐকান্তিক অভাব। বস্তুতঃ, এরা নরদেহে পশুভাবাপন্ন। এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন অবস্থা হতে উদ্ধার পেতে হলে প্রয়োজন —রজোগুণের আশ্রয়। কেবল মাত্র রাজসিক কামনা বাসনাই এদের মধ্যে জাগৃতি ও কর্ম্মোদ্যম সৃষ্টি করতে পারে।

এখানে স্মরণযোগ্য—বাহ্যতঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের চেহারা কতকটা এক প্রকার। সত্ত্বগুণী লোকেরা যেমন শান্ত-দান্ত, ধীর-স্থির প্রকৃতির, তমোগুণী লোকেরাও তদ্রূপ। পরন্তু, এদের উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান

বিদ্যমান। সাত্ত্বিক ব্যক্তির শান্ত ভাবের মূলে রয়েছে—বাসনা ও আসক্তির অভাব, আর তমোগুণীর শান্ততা হচ্ছে নিরুদ্যম, নিরুৎসাহের চরম পরিণতি। সত্ত্বগুণের শান্ততা আনে প্রশান্তি ও নিষ্কলুষ আনন্দ ; পক্ষান্তরে, তমোগুণের শান্তভাব আনয়ন করে—নিষ্ক্রিয়তা ও জড়তা। এই অবস্থা মানব মনের চরম আধোগতির নামান্তর। বস্তুতঃ, এতে ঘটে নৈতিক মৃত্যু। সুতরাং, এর চেয়ে বড় বন্ধন আর কি হতে পারে?

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।। ৯

অন্বয়—ভারত, সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি, রজঃ কর্ম্মণি উত তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়তি।। ৯

অনুবাদ—হে ভারত, সত্ত্বগুণ সুখে এবং রজোগুণ কর্ম্মে জীবকে আসক্ত করে। কিন্তু, তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করে প্রমাদ বা বিভ্রম উৎপন্ন করে।। ৯

গীতামৃত— মনুষ্যকে সত্ত্বগুণ সুখাসক্ত, রজোগুণ কর্ম্মাসক্ত এবং তমোগুণ প্রমাদী করে তোলে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।। ১০

অন্বয়—ভারত, সত্ত্বং রজঃ তমঃ চ অভিভূয় ভবতি, রজঃ সত্ত্বং তমঃ চ, তথা তমঃ সত্ত্বং রজঃ এব চ।। ১০

অনুবাদ—হে ভারত, সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়। রজোগুণ তমঃ ও সত্ত্বগুণকে এবং তম রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করে প্রবল হয়।। ১০

ত্রিগুণের পরস্পরিক প্রভাবের ফল

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি—উক্ত তিনটি গুণ কদাপি স্বতন্ত্র ও অবিমিশ্রিত ভাবে অবস্থান করে না। উপরোক্ত শ্লোকটিতে তাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে —কখনও সত্ত্ব, কখনও রজঃ, কখনও তমোগুণ অপর দুটিকে অভিভূত

করে প্রবল হয়ে থাকে এবং তা হবার কারণ মানুষের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট। তবে মানুষের জীবনে যখন বা যতদিন যে গুণটি প্রবল হয়, তখন বা ততদিন সেই গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তদনুপাতে কাজ ক'রে সে সুখী বা দুঃখী হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন—ইহাই প্রচলিত নীতি বা নিয়ম হলেও গীতাশাস্ত্রে স্থান বিশেষ শুদ্ধসত্ত্ব বা অবিমিশ্রিত সত্ত্বগুণের উল্লেখ যে নাই, তা নয়। তবে সেই শুদ্ধসত্ত্বের অবস্থাকে গুণাতীত অবস্থা বলাই সমীচীন। অধ্যাত্মসাধনার উচ্চতম স্থিতিতে আরূঢ় হলেই সাধক এরূপ নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থা লাভ করে ধন্য হন।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১১

অন্বয়—যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু জ্ঞানং প্রকাশঃ উপজায়তে তদা উত সত্ত্বং বিবৃদ্ধং ইতি বিদ্যাৎ॥ ১১

অনুবাদ—যখনই এই দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ উৎপন্ন হয় তখন জানবে যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে॥ ১১

গীতামৃত—পবিত্র আহার, নির্ম্মল পরিবেশ, অনুকূল প্রারব্ধ প্রভৃতির ফলে কখন কখন মানুষের দেহেন্দ্রিয়ে পরিপূর্ণ স্বচ্ছ, শুভ ও পরিচ্ছন্ন ভাবের উন্মেষ হয়; তখন তার মেধা, প্রতিভা, বুদ্ধি প্রখর ও প্রদীপ্ত হয়ে উঠে। আর এই সময় নিরন্তর তার মনে প্রবাহিত হতে থাকে উন্নত প্রকারের চিন্তাতরঙ্গ—যার ফলে তার হৃদয়ের কুৎসিত, কদর্য্য ও মলিন ভাবগুলি একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে যায় এবং কামক্রোধাদি রিপুগণ স্বতঃই শান্ত ও সংযত হয়। এই অবস্থা নিঃসংশয়ে সত্ত্ববৃদ্ধির লক্ষণ।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১২

অন্বয়—ভরতর্ষভ, লোভঃ, প্রবৃত্তিঃ, কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ, অশমঃ, স্পৃহা, এতানি রজসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে॥ ১২

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ, লোভ, নিরন্তর কর্ম্মে প্রবৃত্তি, কর্ম্মে অত্যুৎসাহ, শান্তি ও তৃপ্তির ভাব, বিষয়-বাসনা—এই সব লক্ষণ রজোগুণ বৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন হয়॥ ১২

গীতামৃত—যখন মনে অত্যধিক লোভের ভাব প্রকাশ পায়, যখন মনে সদাসর্ব্বদা নূতন নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও প্রমত্ত হবার ইচ্ছা বিশেষ প্রবল হয়, যখন মন নিরন্তর অশান্ত ও অতৃপ্ত থাকে এবং বিষয়ভোগের স্পৃহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন বুঝতে হবে—দেহ-মনে রাজসিক ভাব অতিমাত্র বর্দ্ধিত হয়েছে।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৩

অন্বয়—কুরুনন্দন, অপ্রকাশঃ, অপ্রবৃত্তিঃ চ প্রমাদঃ, মোহঃ এব চ —এতানি তমসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে॥ ১৩

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন (অর্জ্জুন), তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে অজ্ঞানতা, প্রবৃত্তিহীনতা বা নিরুদ্যমতা, প্রমাদ, মোহ বা বুদ্ধিভ্রম—এই সব লক্ষণ উৎপন্ন হয়॥ ১৩

গীতামৃত—মানুষের দেহ মন যখন আলস্য, ঔদাস্য, নিরুদ্যম, বুদ্ধিভ্রম ও অজ্ঞানতা বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং যার ফলে পদে পদে তার বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটতে থাকে, তখন নিশ্চিত বুঝতে হবে যে, তার মধ্যে তমোগুণ বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেছে। এরূপ অবস্থায় মানুষের দেহেন্দ্রিয়ের সমস্ত শক্তি ও বৃত্তি আচ্ছন্ন ও অবিকশিত হয়ে থাকাই স্বাভাবিক।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪

অন্বয়—যদা তু সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে দেহভৃৎ প্রলয়ং যাতি, তদা উত্তমবিদাম্ অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪

অনুবাদ—সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকালে জীবের যদি মৃত্যু হয়, তবে তিনি উত্তম দিব্যলোক প্রাপ্ত হন॥ ১৪

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫

অন্বয়—রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে, তথা তমসি প্রলীনঃ, মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫

অনুবাদ—রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে জীবের কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য লোকে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে দেহত্যাগ হলে পশ্বাদি মূঢ়যোনিতে জন্ম হয়॥ ১৫

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অবস্থায় মৃত্যুফল

মৃত্যুকালে জীবের যেরূপ মানসিক অবস্থা তা-ই তার পরবর্ত্তী জন্ম ও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই বিধান একান্ত বৈজ্ঞানিক। বস্তুতঃ, কার্য্যকারণের অলঙ্ঘ্য নীতি ঠিক অনুরূপ ভাবে জীবের জন্ম-মৃত্যুর ফলাফলকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ, সমগ্র জীবন মানুষ যে প্রকার চিন্তা ও চেষ্টা করে, মৃত্যুকাল তার মনে সেইরূপ সংস্কার প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক এবং সেই মৃত্যুকালীন ভালমন্দ সংস্কারই যে কারণরূপে তার পরবর্ত্তী জন্মকে নিয়ন্ত্রিত করবে—তাতে সংশয়ের অবকাশ কোথায়? উপরের শ্লোকগুলিতে তাই সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে।—মৃত্যুকালে সাত্ত্বিক সংস্কার প্রবল থাকলে দেবজন্ম, রাজসিক সংস্কার প্রবল থাকলে মনুষ্যজন্ম এবং তামসিক সংস্কার প্রবল হলে মূঢ় পশুজন্ম লাভ হয়ে থাকে।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৬

অন্বয়—সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্ আহুঃ; রজসঃ তু ফলং দুঃখং; তমসঃ ফলম্ অজ্ঞানম্॥ ১৬

অনুবাদ—সাত্ত্বিক পুণ্য কর্ম্মের ফল নির্ম্মল, রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান, জ্ঞানিগণ এইরূপ বলেন॥ ১৬

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৭

অন্বয়—সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে; রজসঃ লোভঃ এব চ; তমসঃ অজ্ঞানং প্রমাদমোহৌ এব চ ভবতঃ॥ ১৭

অনুবাদ—সত্ত্বগুণ হতে জ্ঞান, রজোগুণ হতে লোভ এবং তমোগুণ হতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হতে থাকে॥ ১৭

ঊর্দ্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮

অন্বয়—সত্ত্বস্থাঃ ঊর্দ্ধ্বং গচ্ছন্তি, রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি; জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি॥ ১৮

অনুবাদ—সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্যক্তিরা স্বর্গাদি ঊর্দ্ধ্বলোকে গমন করেন, রাজসিক ব্যক্তিরা মধ্যলোকে অর্থাৎ ভূলোকে অবস্থান করেন এবং তামসিক ব্যক্তিরা অধোমুখী নরকগামী বা পশ্বাদি যোনি প্রাপ্ত হয়॥ ১৮

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯

অন্বয়—যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি, গুণেভ্যঃ চ পরং বেত্তি, সঃ মদ্ভাবম্ অধিগচ্ছতি॥ ১৯

অনুবাদ—যখন দ্রষ্টা গুণব্যতীত অন্য কাহাকে কর্ত্তা দেখেন না এবং গুণের অতীত সেই পরম বস্তুকে অবগত হন, তখন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হয়॥ ১৯

গীতামৃত—জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন সাধক যখন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই কর্ত্তা মনে করেন এবং তিনি ঠিক ঠিক অনুভব করেন যে, প্রকৃতি ছাড়া অন্য কোন কর্ত্তা নাই, তখনই তিনি পরমতত্ত্ব অবগত হয়ে আমার স্বরূপ বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ২০

অন্বয়—দেহী দেহসমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য জন্মমৃত্যু-জরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ অমৃতম্ অশ্নুতে॥ ২০

অনুবাদ—জীব দেহোৎপত্তির কারণ স্বরূপ এই তিন গুণকে অতিক্রম করে জন্ম-মৃত্যু, জরা-দুঃখ হতে বিমুক্ত হয়ে অমৃতত্ব লাভ করে॥ ২০

গীতামৃত—ত্রিগুণের প্রভাবে অভিভূত হয়ে জীব যখন প্রকৃতির

কার্য্যকে নিজের কার্য্য বলে মনে করে, তখনই তার সংসারবন্ধন দৃঢ় হয় এবং তা-ই তার পুনঃ পুনঃ দেহধারণ ও জরা, ব্যাধি, দুঃখ শোক-ভোগের কারণ হয়। পক্ষান্তরে, সদ্‌গুরুর কৃপায় বিবেকোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে যখন বুঝতে পারে, কাজ সে নিজে করে না, কাজ করে প্রকৃতি—তখনই তার মুক্তিলাভ হয়।

এতক্ষণে—অর্জ্জুন পুনরায় প্রশ্ন করলেন—

অর্জ্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে।। ২১

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ—প্রভো, কৈঃ লিঙ্গৈঃ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি? কিমাচারঃ, কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে?।। ২১

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন—হে প্রভো! কোন্ লক্ষণের দ্বারা জানা যায় যে জীব ত্রিগুণ অতিক্রম করেছেন? তাঁর (গুণাতীত ব্যক্তির) আচার কীরূপ এবং কি প্রকারে তিনি এই ত্রিগুণ অতিক্রম করেন?।। ২১

গীতামৃত—দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি, তার আচরণ কীরূপ?—ইত্যাদি বিষয় জানবার জন্য অর্জ্জুন ঠিক অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলেন। বস্তুতঃ, প্রত্যেক মোক্ষার্থী সাধকের অন্তরের প্রশ্ন ইহাই। যাঁরা সৎসঙ্গপ্রেমী, তাঁরাও নিশ্চয়ই জানতে চান—মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি? তাঁদের আচার-ব্যবহার কী রূপ এবং কেমন করে বা কি রূপ সাধনার সহায়তায় মুক্তির অবস্থা লাভ করা যায়?

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।। ২২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—পাণ্ডব! প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং মোহম্ এব চ সংপ্রবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি; নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি।। ২২

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—হে পাণ্ডব! যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও

তমোগুণের কার্য্য যথাক্রমে প্রকাশ, কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও মোহ প্রভৃতিকে দ্বেষ করেন না, ঐ সকল কর্য্যে নিবৃত্ত হলেও যিনি উহাদিগকে পেতে চান না, তিনিই ত্রিগুণাতীত।। ২২

গীতামৃত—দেহ যতদিন আছে ও থাকবে ততদিন তাতে ত্রিগুণের ভাল-মন্দ খেলা কমবেশী চলতে থাকবেই। কেন না, দেহ ত্রিগুণজাত। এই তত্ত্ব অবগত হয়ে যিনি আসক্ত বা বিদ্বিষ্ট হন না—তিনি গুণাতীত। অর্থাৎ, ভাল-মন্দ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যাঁর মন সম্পূর্ণ অবিচলিত, তিনি জ্ঞানী।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।। ২৩

অন্বয়—যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে, গুণাঃ বর্ত্তন্তে ইতি এবং যঃ অবতিষ্ঠতি, ন ইঙ্গতে।। ২৩

অনুবাদ—যিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করেন, ত্রিগুণের খেলায় তিনি বিচলিত হন না। গুণের কাজ চলছে ও চলতে থাকবে ইহা জেনে যিনি স্থিরভাবে অবস্থান করেন এবং কোন কিছুতে যিনি চঞ্চল হন না—তিনিই গুণাতীত বলে আখ্যাত।। ২৩

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।। ২৪

অন্বয়—সমুদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ধীর। তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।। ২৪

অনুবাদ—যাঁর নিকট সুখ-দুঃখ সমান, যিনি আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, মৃত্তিকা, প্রস্তর, সুবর্ণ যাঁর নিকট সমান, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয়, নিন্দা ও প্রশংসাকে সমান জ্ঞান করেন, যিনি ধৈর্য্যযুক্ত, তিনিই গুণাতীত বলে অভিহিত হন।। ২৪

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।। ২৫

অন্বয়—যঃ মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে॥ ২৫

অনুবাদ—মান ও অপমানে, শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষে যাঁর তুল্যজ্ঞান এবং ফল লাভের আশায় যিনি কর্ম্মোদ্যম করেন না—এরূপ ব্যক্তি গুণাতীত বলে আখ্যাত॥ ২৫

সাধনোচিত গুণের উৎকর্ষ ব্যতীত গুণাতীত হওয়া অসম্ভব

উপরোক্ত গুণগুলির বিষয় গীতার বহু স্থানে বহু ভাবে বিবৃত হয়েছে। মোক্ষার্থী সাধকের পক্ষে (তিনি কর্ম্মযোগী হ'ন, জ্ঞানযোগী হ'ন, ধ্যানযোগী বা ভক্তিযোগী হ'ন)—এই গুণগুলির অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। কেন না, এই গুণগুলির অর্জ্জন ব্যতীত সাধকের চিত্ত কদাপি শুদ্ধ, সংস্কারমুক্ত ও মোক্ষমুখী হয় না। একদল তথাকথিত ধর্ম্মপ্রেমী আছেন যাঁরা ফাঁকি দিয়ে স্বর্গ বা মুক্তি লাভের স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের জানা উচিত—চাতুরীর দ্বারা ব্যবহারিক জগতে সাময়িক ভাবে উন্নতি অভ্যুদয় লাভ করা যেতে পারে, পরন্তু, অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে এরূপ ফাঁকি বাজীর স্থান আদৌ নাই।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬

অন্বয়—যঃ চ মাং অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে স এতান্ গুণান্ সমতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬

অনুবাদ—যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি এই গুণসমূহ অতিক্রম করে ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন॥ ২৬

গীতার মতে গুণাতীত হবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্ছে ভক্তিযোগ

সাংখ্যমতে গুণাতীত হওয়ার উপায় কি—তা এতক্ষণ আলোচিত হয়েছে। বিচারমূলক জ্ঞানের দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অভাব হতে

পুরুষকে পৃথক্ করতে পারলে সাংখ্যোক্ত কৈবল্যমুক্তির অধিকারী হওয়া যায়। বেদান্ত মতে প্রকৃতি হচ্ছে মায়া। সদসৎ বিচারের সহায়তায় অবিদ্যারূপিণী এই মায়াকে বিদূরিত করতে পারলে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতাতে এই সমস্ত সাধনার বিষয়ও স্থানে স্থানে উপদিষ্ট হয়েছে। পরন্তু, গীতা মুখ্যতঃ ভক্তিমূলক শাস্ত্র। তাই এখানে শ্রীভগবান্ বলছেন—যে সাধক ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিযোগের মাধ্যমে আমার সেবা, পূজা ও প্রার্থনা করেন, আমার কৃপায় তিনি অতি সহজে ত্রিগুণের প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে আমাকে লাভ করে ধন্য হন।

পরবর্ত্তী শ্লোকে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব হতে ভগবত্তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে শ্রীভগবান্ বলছেন—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭

অন্বয়—অহং হি ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা, অব্যয়স্য অমৃতস্য ধর্ম্মস্য চ শাশ্বতস্য ; ঐকান্তিকস্য চ সুখস্য চ॥ ২৭

অনুবাদ—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ; আমি অমৃতের, সনাতন ধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা॥ ২৭

ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নির্গুণ ও সগুণবাদীদের মতবৈষম্য

নির্গুণ উপাসকগণ মনে করেন—অক্ষর, অব্যয়, নির্গুণ ব্রহ্মই সাকার সগুণ ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা বা মূল। কেন না, নির্গুণ হতেই সগুণের আবির্ভাব। পক্ষান্তরে, ভক্তিবাদী আচার্য্যগণ বলেন—সাকার সগুণ পুরুষোত্তম ভগবানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; যেহেতু তাতেই নির্গুণ ও সগুণের সমাবেশ। গীতা হচ্ছে—ভাগবত শাস্ত্র ; ঈশ্বরবাদ তাই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। ভক্তিযোগের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের প্রশ্নের মীমাংসা-সূত্রে শ্রীভগবান্ এই বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছেন—নিরাকার-নির্গুণ ও সাকার-সগুণ—এ দুটিই আমার বিভাব। তবে নিরাকার-নির্গুণের উপাসনা দুষ্কর—দেহধারী মানুষের পক্ষে এর ধারণা অত্যন্ত ক্লেশসাধ্য। ভক্তিপথেই তার তুলনায় অধিকতর সুগম ও উপযোগী

হওয়ায় তাই আমার (ভগবানের) মতে 'যুক্ততম'।

উপরোক্ত ভগবদুক্তি হতে সহজে অনুমান করা যায়—গীতায় সাকার সগুণ পুরুষোত্তম ভাবই সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব ব'লে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে। বস্তুতঃ, শ্রীভগবান্ যখন নরদেহ ধারণ ক'রে জগতে অবতরণ করেন, তখন তাঁকে সরল বিশ্বাসে স্বীকার করে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলে মুক্তিপথ অতি সরল, সহজ ও সুখসাধ্য হয়। গীতাতে তাই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বলেছেন—হে সখে, তুমি আমার ধ্যান কর, আমার পূজা কর, আমার প্রীতির উদ্দেশ্যে যাবতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান কর—তাতেই তুমি আমাকে অতি সহজে লাভ করে ধন্য হবে। ত্রিগুণের বন্ধন ও ত্রিতাপ-জ্বালা হতে পরিমুক্ত হবার ইহাই সুগমতম পথ।

নবযুগের পুরুষোত্তম আচার্য্য প্রণবানন্দেও সেই বাণীর প্রতিধ্বনি। সঙ্ঘগীতা গ্রন্থের সম্পাদক লিখেছেন—"যোগ-ধ্যান-তপস্যা, পূজার্চ্চনা, দান, যজ্ঞ-ব্রত-নিয়ম-উপবাস-তীর্থভ্রমণ—কোন কিছুই মানবকে তার ঈপ্সিত পরম পদ দিতে পারে না—যতক্ষণ সে সর্ব্বতেভাবে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর দয়ার উপর একান্ত নির্ভরশীল না হয়।"

তদীয় ভাগবত ব্যক্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে সঙ্ঘগীতায় অন্যত্র বলা হয়েছে—"সর্ব্বনিয়ন্তা স্বয়ং সঙ্ঘনেতারূপে অবতীর্ণ।" বিশ্বজীবের প্রতি অপার অহৈতুকী কৃপায় বিগলিতচিত্ত ভগবান্ মানবদেহ ধারণ করে জগদাচার্য্যরূপে—ভারতকে তথা সমগ্র জগৎকে মহামুক্তির পথে পরিচালনের জন্য আবির্ভূত হয়ে বিশ্বমানবকে বলেছেন—"আমি আবার আচার্য্যরূপে এসেছি। ওরে তৃষিত তাপিত আর্ত্ত মানব! তোমরা আমাকে আশ্রয় কর। ভীত, বিচলিত ও শোকগ্রস্ত হয়ো না—আমি তোমাকে সমগ্র মালিন্য গ্লানি হতে উদ্ধার করবো। আমার নিকট এস।"

"যারা একান্ত মনে আমাকে আশ্রয় করে আমার চরণে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক ও সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়, আমি স্বয়ং তাদের জীবনতরণীর কাণ্ডারী হই। সুখ-দুঃখ, শুভাশুভ, সম্পদ-বিপদময় নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া দ্রুতবেগে আমি তাদিগকে আমার শ্রীচরণে টানিয়া লই।"

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ—পুরুষোত্তম-যোগঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়ে গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে স্বীয় ভাগবত ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—তিনি স্বয়ং ভগবান্ পুরুষোত্তম। এই অধ্যায়টি এই কারণে আখ্যাত হয়েছে—পুরুষোত্তম-যোগ নামে। অধ্যায়টি আকারে অতি সংক্ষিপ্ত। মাত্র বিশটি শ্লোকে ইহা সম্পূর্ণ। পরন্তু, ভাবসম্পদে, ভাষার লালিত্যে ও গাম্ভীর্য্যে এই অধ্যায়টি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

সাধু ও ভক্ত সমাজের নিকটও এই অধ্যায়টি অত্যন্ত প্রিয়। সমষ্টিভোজন সমারম্ভে ও বহু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তাঁরা এই অধ্যায়টি প্লুত স্বরে সমবেত ভাবে পাঠ করেন। গীতাপ্রেমীদের নিকটও এই অধ্যায়টি কণ্ঠের ভূষণ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে গুণত্রয়ের বন্ধন হতে পরিমুক্ত হবার উপায় কি—তারই আভাস দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে এক্ষণে ত্রিগুণময় সংসারের স্বরূপ কি, তার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় কী রূপে সাধিত হয়, জীবের চরম লক্ষ্য সেই পরম পুরুষোত্তমের মহত্ত্ব-গৌরব কি—প্রভৃতি বিষয়গুলি সংক্ষেপে অথচ বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে।

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্দ্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—ঊর্দ্ধ্বমূলমধঃশাখম্ অশ্বত্থম্ অব্যয়ং প্রাহুঃ; যস্য পর্ণানি ছন্দাংসি তং যঃ বেদ সঃ বেদবিৎ॥ ১

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—(সংসাররূপ) অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধ্বে এবং তার শাখা সকল অধোমুখী। এই বৃক্ষ অবিনাশী, বেদসমূহ ইহার পত্রস্বরূপ—যিনি এই বৃক্ষকে জানেন—তিনি বেদবিদ্॥ ১

সংসারের স্বরূপ অশ্বত্থের ন্যায়

সংসারকে এখানে অশ্বত্থবৃক্ষের সহিত তুলনা করা হয়েছে। এই বৃক্ষটি কিছু বিচিত্র। এই সংসার-বৃক্ষের মূল উর্দ্ধে অবস্থিত। অর্থাৎ, সংসারের মূল কারণ হচ্ছেন ভগবান্ বা পরমাত্মা—যাঁর সংকল্পবীজ হতে এই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি বা উৎপত্তি। এই সংসারবৃক্ষের শাখাসমূহ নিম্নগামিনী। অর্থাৎ, পরমাত্মা হতে যে সব পদার্থ সৃষ্ট হয়েছে তাদের ক্রমিক গতি ও পরিণতি নিম্নমুখী। বেদসমূহ হচ্ছে—এই সংসার-বৃক্ষের পত্র। অর্থাৎ, পত্রসকল যেমন বৃক্ষের আচ্ছাদক ও রক্ষক, বেদোক্ত জ্ঞানও তেমনই সংসারী জীবের উদ্ধার ও মুক্তির পরম উপায়। এহেন যে সংসারবৃক্ষ তার প্রকৃত স্বরূপ যিনি উপলব্ধি করেন, তিনিই সত্যকার জ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞ।

বস্তুতঃ, সংসারের উৎপত্তি ও স্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত হলে তা হতে স্বতঃই লাভ হয়—ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ—এই তিনের জ্ঞান। আর উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের জ্ঞানের মধ্যে নিহিত থাকে যাবতীয় ধর্ম্ম, দর্শন ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব। এই কারণে তাদের রহস্য ভালমত অবগত হতে পারলে সাধকের পক্ষে জানার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না; অর্থাৎ সেই চরম ও পরম আত্মতত্ত্বের মধ্যেই জীব, জগৎ ও ব্রহ্মবিষয়ক সমুদয় জ্ঞান বীজাকারে নিহিত। হিন্দুদর্শনের মতে ইত্যাকার জ্ঞানলাভই মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্যশাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥ ২

অন্বয়—তস্য গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়-প্রবালাঃ শাখাঃ অধঃ উর্দ্ধং চ প্রসৃতাঃ, মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি মূলানি অধঃ চ অনুসন্ততানি॥ ২

অনুবাদ—এই সংসাররূপ অশ্বত্থের শাখাসকল গুণত্রয় দ্বারা বর্দ্ধিত ও বিষয়রূপ প্রবালবিশিষ্ট, উহার শাখাসমূহ অধোদেশে ও উর্দ্ধদেশে বিস্তৃত, ইহার মূলসকল অধোদিকে মনুষ্যলোকে প্রসারিত; ঐ মূলসকল ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের কারণ বা জনক॥ ২

সাংখ্যমতে সংসার-বৃক্ষের ব্যাখ্যা

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বেদান্তমতের সৃষ্টিক্রম সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে এই শ্লোকে সাংখ্যমতে তার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। বেদান্তমতে বিশ্বসৃষ্টির আদিকারণ হচ্ছেন ভগবান্ বা সগুণ ব্রহ্ম। তিনি স্বীয় সংকল্পবলে প্রকৃতির মাধ্যমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কাজ করেন। পক্ষান্তরে, সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের দ্বারা প্রকৃতিই সৃষ্টিকার্য্য সংসিদ্ধ করেন। তাই এখানে বলা হয়েছে—সংসার-বৃক্ষ গুণসমূহের দ্বারা বর্দ্ধিত হয় এবং তার প্রবাল বা পল্লবসমূহ হচ্ছে—রূপ, রসাদি পঞ্চ বিষয়। বস্তুতঃ, পত্র ও পল্লবের সহায়তায় বৃক্ষ বহুলাংশে তার শোষণোপযোগী রস ও সূর্য্যকিরণাদি আকর্ষণ করে এবং তাই-ই তার বৃদ্ধি ও বিকাশের কারণ হয়।

প্রসঙ্গত, এই শ্লোকে আরও বলা হয়েছে—সংসারবৃক্ষের শাখাসমূহ শুধু নিম্নদিকে নয়, ঊর্দ্ধদিকেও বিস্তৃত। এর তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্ব-সংসারের মূলে যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি বিদ্যমান, তা ভাল-মন্দ, উচ্চ-নীচ, উভয় প্রকারের। উন্নত কার্য্যের ফল বা গতি উচ্চ পর্য্যায়ের এবং নিম্ন কর্ম্মের পরিণাম ও গতি নিম্ন বা অধম শ্রেণীর। অর্থাৎ, সৎ ও পুণ্য কর্ম্মের ফলে মানুষ ইহলোকে বা পরলোকে ক্রমোন্নতির স্তরে আরোহণ করে এবং অসৎ বা পাপকর্ম্মের ফলে তার লাভ হয়—সম্পূর্ণ বিপরীত গতি। এই জন্যই এখানে বলা হয়েছে—সংসার-বৃক্ষের কতকগুলি শাখা ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মলোকে এবং অপর কতকগুলি শাখা অধোদেশে মনুষ্যপশ্বাদি যোনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বস্তুতঃ "অশ্বত্থ" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের অনুধ্যান করলেও সংসারের বাস্তব স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।

'অ'=নাই, শ্ব=আগামী কল্য, ত্থ=অবস্থিত। যা আগামী কল্য পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে না অর্থাৎ যা নশ্বর বা বিনাশশীল—তা-ই সংসার। পরন্তু, এখানে ভগবান্ বলছেন—এই যে সংসার-বৃক্ষ তা হচ্ছে অবিনাশী ও শাশ্বত। সুতরাং, এক্ষেত্রে সংসারকে নশ্বর বলা চলে কেমন করে?

উত্তরে বলা যায়—নশ্বর হলেও এই সংসার অনাদি ও অনন্ত। হিন্দুশাস্ত্রের মতে ত্রিগুণের দ্বারা নির্ম্মিত এই সংসারে বৃদ্ধি ও ক্ষয় নিরন্তর হতে থাকলেও তা চক্রাকারে নিত্য বা অনন্তকাল প্রবাহিত। সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গরাশি যেরূপ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া চিরপ্রবাহিত, সংসাররূপ সৃষ্টিপ্রবাহও তদ্রূপ। "It is changeably eternal"—অর্থাৎ, ইহা নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল হয়েও নিত্য ও অবিনাশী। পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে এই দুরূহ বিষয়টি আরও স্পষ্টীকৃত হয়েছে।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ ৪

অন্বয়—ইহ অস্য রূপং ন উপলভ্যতে, তথা ন অন্তঃ, ন চ আদিঃ, ন চ সংপ্রতিষ্ঠা; এনং সুবিরূঢ়মূলম্ অশ্বত্থং দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্ত্বা ততঃ যস্মিন্ গতাঃ ভূয়ঃ ন নিবর্ত্তন্তি, যতঃ এষা পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা তম্ এব চ আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে তৎপদং পরিমার্গিতব্যম্॥ ৩।৪

অনুবাদ—জীবগণ সংসার-বৃক্ষের পূর্ব্বোক্ত রূপ উপলব্ধি করতে পারে না। তারা এর আদি, অন্ত, স্থিতিও উপলব্ধি করতে অক্ষম। এই দৃঢ়মূল সংসার বৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ শাণিত অস্ত্রদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক তদনন্তর যে স্থানে গিয়ে (ব্যক্তিগণ) পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে না, যা হতে চিরন্তনী সংসারগতি বিস্তৃত হয়েছে, সেই আদিপুরুষের আশ্রয় ক'রে সেই পদকে অন্বেষণ করতে হয়॥ ৩।৪

সংসারাসক্তি ছিন্ন করার উপায়

সাধারণ অজ্ঞান জীবের পক্ষে এই সংসারবৃক্ষের স্বরূপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই সংসার-বৃক্ষের আদি কোথায়, এর স্থিতি বা কোথায় এবং কার মধ্যে—এ সব গূঢ় বিষয় তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তা ছাড়া, এই বৃক্ষের মূল এত গভীর ও সুদৃঢ় যে তা সহজে উৎপাটিত বা বিনষ্ট হবারও নয়। তবে এর উৎপাটন বা বিনাশের উপায় যে একেবারে নাই, তা নয়। এজন্য আবশ্যক অনাসক্তি বা বৈরাগ্যরূপ শাণিত কুঠার। অর্থাৎ, একমাত্র কঠোর বিবেক-বৈরাগ্যের দ্বারাই তার মূলোচ্ছেদ সম্ভবপর। জগদ্‌গুরু আচার্য্য প্রণবানন্দজীও তদীয় সাধক সন্তানগণকে লক্ষ্য ক'রে অনুরূপ নির্দ্দেশ দিয়ে বলেছেন—**"ধর সুতীক্ষ্ণ বিবেক-বৈরাগ্যের অসি; ছিন্ন করিয়া ফেল যাবতীয় ভ্রম-ভ্রান্তির কুসংস্কারজাল।"**

যদি বল—যারা ক্ষীণশক্তি দুর্ব্বলচিত্ত সাধক, তাদের সামান্য বিবেক ও বৈরাগ্যের সাহায্যে তারা যদি এই সংসারাসক্তির মূলোচ্ছেদ করতে না পারে তবে উপায় কি? এ সম্বন্ধে গীতাকার বলছেন—এই সংসারবৃক্ষের যিনি স্রষ্টা—যা হ'তে এই মায়াময় বিশ্বের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি তাঁর শরণাপন্ন হও। তিনি শুধু যে সর্ব্বশক্তিমান্ তা-ই নয়, তিনি পরম করুণাময়। তিনি স্বীয় অহৈতুকী কৃপাবলে দুর্ব্বল জীবকুলকে মায়া-মোহ হতে মুক্ত করে পরমা শান্তির সন্ধান দেবেন।

প্রসঙ্গক্রমে জানা প্রয়োজন—উপরোক্ত শ্লোক কয়টিতে সংসারবৃক্ষকে অবিনাশী বা অবিনশ্বর বলার পরে পুনরায় তার মূলোচ্ছেদ সম্ভবপর—একথাও বলা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি উক্তি পরস্পরবিরোধী ব'লে মনে হলেও এদের মধ্যে যে সামঞ্জস্য নাই তা নয়। এক দৃষ্টিতে এই বিশ্বসংসার তার ক্ষয়, বৃদ্ধি (অর্থাৎ কল্পক্ষয়ে তার লয় এবং কল্পারম্ভে তার নব সৃষ্টি) এই গতিপ্রবাহ নিয়ে চিরবিদ্যমান। সুতরাং, তা অনাদি ও অনন্ত। পরন্তু, ব্যক্তিগত ভাবে জীবের এই সংসারবন্ধন একদিন ছিন্ন হয়ে যায় এবং সে চিরমুক্তির অধিকারী হতে পারে। সংক্ষেপে তাই বলা যায়—সামগ্রিক দৃষ্টিতে এই সংসারবৃক্ষ অবিনাশী; অর্থাৎ তার স্রষ্টা ভগবান বা পরমাত্মা

যেমন অনাদি অনন্ত, তাঁর সৃষ্টিও তেমনি অনাদি অনন্ত! পক্ষান্তরে, ব্যক্তিগত ভাবে জীবের যে সংসারলীলা তা আদ্যন্তবন্ত। অর্থাৎ, জীবের পক্ষে চরম মুক্তি সম্ভবপর।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।। ৫

অন্বয়—নির্ম্মানমোহাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ অধ্যাত্মনিত্যাঃ বিনিবৃত্তকামাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ অমূঢ়াঃ তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি।। ৫

অনুবাদ—যারা অভিমান ও মোহশূন্য, যারা সঙ্গ বা আসক্তিজয়ী ও আত্মতত্ত্বে নিষ্ঠাবান্, কামনাহীন এবং সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ববিমুক্ত তারা শ্রেষ্ঠ পরমপদ প্রাপ্ত হয়।। ৫

সেই পরমপদের অধিকারীর লক্ষ্মণ

যারা নিরভিমান, নির্মোহ, জিতেন্দ্রিয় বা জিতকাম, দ্বন্দ্বাতীত, যারা আত্মতত্ত্বে নিষ্ঠাবান্, তদ্রূপ বিবেকিগণ সংসারবন্ধন হ'তে চির-অব্যাহতি লাভ করেন। এখানে একটি প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক—ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকটি নর-নারী যখন ঐরূপ গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী হয়ে মুক্তিলাভ করবে তখন কি এই সংসার জনমানবশূন্য হয়ে যাবে না? কারণ, যতগুলি ব্যষ্টি-আত্মা জীবরূপে জগতে সৃষ্ট হয়েছে—তারা সকলেই যখন একে একে মুক্ত হয়ে যাবে, তখন এই সংসারপ্রবাহ কীরূপে অব্যাহত থাকবে? এই গহন প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে—এই সংসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জীবই যে এক সময়ে সৃষ্ট হয়েছে—তা নয়। ঝর্ণা হতে যেমন অবিরাম, অবিশ্রাম অনন্ত জলকণা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তেমনি অনাদিকাল ধরে হিরণ্যগর্ভ হতে অনন্ত জীবকুল সৃষ্ট হয়ে ক্রমবিকাশের পথে মুক্তিলাভের আশায় ছুটে চলেছে। এই প্রবাহের আদি নাই, অন্ত নাই। মহাপ্রলয়কালে এই

বিশ্বসংসার ও অমুক্ত জীবকুল মহাকরণ বা প্রকৃতির বুকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজরূপে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত বিরাজ ক'রে পুনরায় কল্পান্তে আবির্ভূত হয়ে তাদের গতিপ্রবাহ আরম্ভ করে। বস্তুতঃ, এই সৃষ্টিতত্ত্ব অতি গহন ও রহস্যময়।

শ্রীভগবান্ এখানে স্বধামের বর্ণনা দিয়ে বললেন—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।। ৬

অন্বয়—যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তৎ সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে, ন শশাঙ্কঃ, ন পাবকঃ, তৎ মম পরমং ধাম।। ৬

অনুবাদ—আমার যে পরম ধাম—যা প্রাপ্ত হলে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, সেই ধামকে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রকাশিত করতে পারে না।। ৬

ঈশ্বর স্বপ্রকাশ

আত্মা বা ভগবান্ হচ্ছেন—স্বয়ংজ্যোতিঃ বা চিন্ময়। তাঁর জ্যোতিতেই সব কিছু জ্যোতির্ম্ময়। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নির যে প্রকাশশক্তি তাও প্রসৃত হচ্ছে তা হতে। সুতরাং, তারা তাঁকে প্রকাশিত করবে কেমন করে? সাধনা দ্বারা ও ভগবৎকৃপায় একবার সেই জ্যোতির্ম্ময় ধামে পৌঁছাতে পারলে জীবের আর গতাগতির ভয় থাকে না, তথায় তখন সে চিরপ্রতিষ্ঠ হয়ে যায়। ভগবদ্ধাম তাই জীবের পরম আশ্রয় ও অন্তিম নিলয়। উপরোক্ত শ্লোকটি প্রায় অক্ষরশঃ পরিদৃষ্ট হয়—শ্বেতাশ্বেতর ও কঠোপনিষদে।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।। ৭

অন্বয়—মম এব সনাতনঃ অংশঃ জীবভূতঃ প্রকৃতিস্থানি মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি জীবলোকে কর্ষতি।। ৭

অনুবাদ—আমার সনাতন অংশ জীব হয়ে প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংসারে আকর্ষণ করে থাকে॥ ৭

জীব-ব্রহ্মের সম্পর্ক বিষয়ে বিবিধ মত

জীবব্রহ্মের স্বরূপ ও সম্বন্ধ বিচার নিয়ে হিন্দুধর্ম্মে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রভৃতি বহু মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে গীতাকার শ্রীভগবান্ এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন—জীব ব্রহ্মের অংশস্বরূপ, অর্থাৎ অগ্নির সহিত স্ফুলিঙ্গ, জলের সহিত জলকণার যেরূপ সম্পর্ক—ইহাও তদ্রূপ। গীতা অন্যত্র বলেছেন—আত্মা সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত। পূর্ব্বাপর আলোচনা করলে মনে হয়, গীতা বেদান্তের জীব-ব্রহ্মৈকবাদই স্বীকার করেন। তবে অদ্বৈতবাদী বেদান্তীরা বলেন—যেহেতু ব্রহ্ম এক অখণ্ড অদ্বয় সত্তা, সেহেতু তার অংশ কল্পনা করা অযৌক্তিক। তবে ঘটাকাশ ও মহাকাশের উদাহরণের দ্বারা তাঁরা বলেন—ঘটের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন যে আকাশ তা যেমন ঘটের বিনাশ বা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশে মিলে যায়, তেমনি দেহবদ্ধ জীবের দেহাধ্যাস বা দেহাত্মবুদ্ধি বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। তাঁরা "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"—বাক্যটির ব্যাখ্যা উপরোক্ত ভাবে করে থাকেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলেন—জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হলেও প্রকাশ ও গুণের পরিমাণের দিক দিয়ে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ, সূর্য্যে যতখানি প্রকাশ ও উত্তাপ বিদ্যমান তার রশ্মিতে ততখানি নাই ও থাকতে পারে না। ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে তেমনি অভেদ ও ভেদ—দুই-ই বিদ্যমান। এই মতবাদকে তাই বলা হয়—"অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ"।

দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ আবার এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন—জীব ও ব্রহ্ম চিরকাল পৃথক্। এরা কোন দিন এক ছিল না এবং এক হতে পারে না। জীব সাধনা দ্বারা ও ভগবৎকৃপায় ভগবানের সান্নিধ্য

লাভ ক'রে তাঁর সেবায় পরমানন্দের অধিকারী হয়; অর্থাৎ জীব নিত্য কৃষ্ণের দাস।

বস্তুতঃ জীবব্রহ্মের সম্পর্ক বিষয়ে এই যে মতভেদ তা অনুভূতিগত তারতম্যের পরিণামমাত্র। অর্থাৎ সাধকের রুচি, ভাব, সংস্কার পৃথক্ পৃথক্ হওয়ায় তা'দের অনুভূতি ও উপলব্ধিও পৃথক্ পৃথক্ হওয়াই স্বাভাবিক।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮

অন্বয়—ঈশ্বরঃ যৎ শরীরম্ উৎক্রামতি যৎ চ অপি অবাপ্নোতি (তদা), বায়ুঃ আশয়াৎ গন্ধান্ ইব, এতানি গৃহীত্বা সংযাতি॥ ৮

অনুবাদ—যেমন বায়ু পুষ্পাদি হতে সুগন্ধকণা নিয়ে যায়, তেমনি জীব যখন এক দেহ পরিহার ক'রে অন্য দেহে প্রবেশ করে, তখন এই সকলকে (মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে) সঙ্গে নিয়ে যায়॥ ৮

সূক্ষ্মদেহের উৎক্রান্তি কীরূপে হয়

জীবের শরীর তিনটি। বাহ্যতঃ, তার যে শরীর দেখা যায় তা স্থূল শরীর। এই স্থূল শরীর ছাড়া তার আছে—সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর। স্থূল শরীর ক্ষিত্যাদি পঞ্চ স্থূল ভূত দ্বারা গঠিত। সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান বিষয়ে বেদান্ত ও সাংখ্যমতের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বেদান্তমতে জীবের সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মিত হয়—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সতেরটি উপাদানে। সাংখ্যমতে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও মন এই আঠারটি উপাদানে এই সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয়।

উপরোক্ত সপ্তম শ্লোকে সংক্ষেপে মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে সূক্ষ্ম শরীররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পরন্তু, এই মতের মধ্যে সমাবিষ্ট রয়েছে—কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এখানে আরও একটি বিষয় জানা আবশ্যক। চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় বলতে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে

বোঝান হয়, সেগুলি অন্তরিন্দ্রিয়সমূহের বাহ্যদ্বার মাত্র। বস্তুতঃ, প্রকৃত ইন্দ্রিয় থাকে অভ্যন্তরে। অর্থাৎ, যে শক্তিদ্বারা চক্ষুঃ দর্শন করে, কর্ণ শ্রবণ করে, জিহ্বা স্বাদ গ্রহণ করে, নাসিকা গন্ধ অনুভব করে এবং ত্বক্ স্পর্শ করে, সেই আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলিই হচ্ছে প্রকৃত ইন্দ্রিয়। এজন্য দেখা যায়—নিদ্রাবস্থায় যখন স্থূল দেহ তার বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ বিশ্রাম করে তখনও মন স্বপ্নযোগে কত কি দর্শন, শ্রবণ ও স্পর্শ ইত্যাদি করে। এতেই স্পষ্টতঃ সপ্রমাণ হয়—যেগুলিকে আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় বলি সেগুলি ইন্দ্রিয়ের বাহ্যযন্ত্র। এগুলির সহায়তা ব্যতীতও ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া সম্ভবপর। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—জীব যখন স্থূল শরীর ত্যাগ করে, তখন তার ইন্দ্রিয়গণের নাশ হয়না। সেগুলি সূক্ষ্মরূপে মনোবুদ্ধির সহিত বিদ্যমান থাকে এবং জীব যখন কর্ম্মবশে পুনরায় দেহান্তর পরিগ্রহ করে তখন সেগুলি সূক্ষ্ম শরীরের অংশরূপে সেই দেহে প্রবিষ্ট হয়। মুক্তিলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবের উৎক্রান্তির এই ধারা অব্যাহত থাকে। বাহ্যতঃ, দৃষ্টিগোচর ও অনুভবগম্য হয় না ব'লে অজ্ঞ জনসাধারণ তা ধারণা করতে পারে না; তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরাই শুধু তার গুহ্য রহস্য অবগত হন।

সঙ্ঘগুরু আচার্য্য প্রণবানন্দ তাঁর কোনও আশ্রিত সন্তানের মৃত্যুশয্যায় উপবিষ্ট হয়ে তার অন্তিম শ্বাস ত্যাগের মুহূর্ত্তে হাতে তুড়ি দিয়ে তার জীবাত্মার ঊর্দ্ধগতির সহায়তা করেছেন।* এ দৃশ্য আমরা স্বচক্ষে লক্ষ্য করেছি। এই কালে মনে হয়েছে এই মহান্ আশ্রয়দাতা সদ্‌গুরু শুধু তাঁর আশ্রিত সন্তানগণের জীবৎকালের সাথীই নন, মৃত্যুকালেও তিনি তাদের পরম গতি ও আশ্রয়।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯

অন্বয়—অয়ং শ্রোত্রং, চক্ষুঃ স্পর্শনং চ, রসনং, ঘ্রাণম্ এব চ মনঃ চ অধিষ্ঠায় বিষয়ান্ উপসেবতে॥ ৯

* "সঙ্ঘ-সাধক-চরিতমালা গ্রন্থে স্বামী বোধরূপানন্দের জীবনী দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ—জীবাত্মা চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং মনকে আশ্রয় করে শব্দাদি বিষয়সকল ভোগ করে থাকে॥ ৯

জীবের বিষয়ভোগ কীরূপে সাধিত হয়

ইন্দ্রিয়গণের সহায়তা ব্যতীত জীবাত্মা বিষয়ভোগে অসমর্থ। জীবের এই বিষয়ভোগ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দু-প্রকার। স্থূলদেহে অবস্থিতিকালে জীব যে বিষয়-পঞ্চকের ভোগ করে তা স্থূলভাগ এবং নিদ্রাবস্থায় বা মৃত্যুর পরে সূক্ষ্মদেহে তার যে ভোগ হয়—তা সূক্ষ্মভোগ। চরম মোক্ষ লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবাত্মার এই ঐহিক ও পারলৌকিক ভালমন্দ বিষয়ভোগ বন্ধ হবার নয়। ঐহিক জীবের ভোগাবরণ পাঁচটি কোষে বিভক্ত—অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। জীবের পঞ্চভূতাত্মক যে স্থূলশরীর তাকেই বলা হয় অন্নময় কোষ। তা ছাড়া, মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে নিয়ে মনোময় কোষ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ নিয়ে প্রাণময় কোষ, বুদ্ধি ও পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় নিয়ে বিজ্ঞানময় কোষ গঠিত এবং জীবের যে কারণ-শরীর তাকেই বলা হয় আনন্দময় কোষ।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০

অন্বয়—গুণান্বিতং স্থিতং বা অপি ভুঞ্জানং বা উৎক্রামন্তং বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি, জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি॥ ১০

অনুবাদ—জীব কীরূপে সত্ত্বাদিগুণযুক্ত হয়ে দেহে অবস্থিত থেকে বিষয়সমূহ ভোগ করে, অথবা কীরূপে দেহ হতে উৎক্রান্ত হয়, তা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখতে পায় না, কিন্তু জ্ঞাননেত্রবিশিষ্ট জ্ঞানিগণ তা দেখতে পারেন॥ ১০

জীবের উৎক্রান্তির বিষয় শুধু জ্ঞানীরাই অবগত

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন। তাদের পক্ষে তাই জীবাত্মার সূক্ষ্ম

বিষয়ভোগ ও উৎক্রান্তি বা দেহান্তর প্রাপ্তির বিষয় অবগত হওয়া সম্ভবপর নয়। যাঁরা সত্যকার তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীপুরুষ—সাধনার দ্বারা যাঁরা দিব্যদৃষ্টি লাভে সক্ষম হয়েছেন তাঁরাই কেবল এই গহন তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ।

শোনা যায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর অন্যতম গৃহী শিষ্য মথুরবাবুর দেহত্যাগের পরে তাঁর সূক্ষ্ম শরীরের উৎক্রান্তি লক্ষ্য ক'রে যখন তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট ভক্তগণকে সে বিষয়ে বলেন, তখন তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করেন। স্মরণ রাখা উচিত, ঐ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে এবং মথুরবাবু দেহত্যাগ করেন কলিকাতায়।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১

অন্বয়—যতন্তঃ যোগিনঃ আত্মনি অবস্থিতম্ এবং পশ্যন্তি ; যতন্তঃ অপি অকৃতাত্মানঃ অচেতসঃ এনং ন পশ্যন্তি॥ ১১

অনুবাদ—সমাহিতচিত্ত যোগিগণ আপনাতে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করে থাকেন, কিন্তু যারা অজিতেন্দ্রিয় ও অবিবেকী তারা যত্ন সত্ত্বেও তাঁকে দেখতে পায় না॥ ১১

আত্মদর্শনের জন্য প্রয়োজন—জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও নির্ম্মল বিবেক

অনেকে শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য বিশেষ প্রযত্নশীল হন। পরন্তু, তাঁরা জানেন না যে, সংযম-সাধনার দ্বারা জিতেন্দ্রিয় ও পরিচ্ছন্ন বিবেকের অধিকারী হতে না পারলে কেবল শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা কদাপি সেই দুর্লভ আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। উপনিষদ্‌ও এ বিষয়ে সূচনা দিয়ে বলেছেন —এই আত্মতত্ত্ব সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা লাভ করা যায়, অন্যথা নয়।

নবযুগের সংযমাবতার আচার্য্য প্রণবানন্দজীও এই কারণে

আত্মতত্ত্বোপলব্ধির জন্য রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়সংযমের উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২

অন্বয়—আদিত্যগতং যৎ তেজঃ অখিলং জগৎ ভাসয়তে, চন্দ্রমসি চ যৎ যৎ অগ্নৌ তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি॥ ১২

অনুবাদ—যে তেজঃ সূর্য্যে অবস্থিত থেকে জগৎ উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজঃ চন্দ্র ও অগ্নিতে বিদ্যমান—তা আমারই জানবে॥ ১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩

অন্বয়—অহং চ গামাবিশ্য ওজসা ভূতানি ধারয়ামি, রসাত্মকঃ সোমঃ চ ভূত্বা সর্ব্বাঃ ওষধীঃ পুষ্ণামি॥ ১৩

অনুবাদ—আমি পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নিজের বলের দ্বারা ভূতচরাচরকে ধারণ করে আছি। আমি রসময় চন্দ্ররূপ ধারণ করে ঔষধিগণকে পরিপুষ্ট করে থাকি॥ ১৩

গীতামৃত—উপরোক্ত কয়েকটি শ্লোকে শ্রীভগবান্ স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্বব্যাপিনী শক্তির বর্ণনা করেছেন। তিনি যে সব কিছুর মধ্যে অনুস্যূত ও ওতপ্রোত থেকে সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, তারই বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—পৃথিবীর ধারণশক্তি এবং চন্দ্রমার পোষণশক্তির মধ্যে আমার শক্তি ও প্রেরণাই ক্রিয়াশীল।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥ ১৪

অন্বয়—অহং বৈশ্বানরঃ ভূত্বা প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ প্রাণাপানসমাযুক্তঃ চতুর্ব্বিধম্ অন্নং পচামি॥ ১৪

অনুবাদ—আমি বৈশ্বানর অগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহে অবস্থান করি এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিশ্রিত চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করি।। ১৪

গীতামৃত—মানুষ চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়াদি চার প্রকার অন্ন বা ভোজ্য দ্রব্য আহার করে এবং তা হতে যে রক্ত-রসাদি উৎপন্ন হয়—ভগবানই প্রাণ ও অপানের সহিত মিলিত হয়ে সেই পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

জড়বাদী বৈজ্ঞানিক কিন্তু এই পাচন-ক্রিয়ার মধ্যে কোন ভাগবত বিধান লক্ষ্য করেন না। তাঁরা বলেন—ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রসগ্রন্থি বা পাকস্থলীস্থ পেশীসমূহ হতে যে সকল রসবিশেষ নির্গত হয়, তাদের দ্বারাই পাচন-ক্রিয়া সাধিত হয়। ইহা দেহযন্ত্রেরই ক্রিয়া। এই ব্যাপারে আবার ভগবানকে টেনে আনা কেন? পক্ষান্তরে, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আচার্য্যগণ বলেন—ইহা তো ঠিক। পরন্তু, কোন্ শক্তিবলে এই যান্ত্রিক কার্য্যটি সিদ্ধ হয় জড়বিজ্ঞানীরা তার রহস্য অবগত আছেন কি? এই ক্রিয়াটির মধ্যেও তাই পরোক্ষভাবে ঐশ্বরিক শক্তি বিদ্যমান।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।। ১৫

অন্বয়—অহং সর্ব্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ, মত্তঃ স্মৃতিঃ, জ্ঞানং, অপোহনং চ; অহম্ এব সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ, বেদবিৎ চ অহম্ এব।। ১৫

অনুবাদ—আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, আমা হতে জীবের স্মৃতি, জ্ঞান ও মোহ উৎপন্ন হয়। বেদসমূহের জ্ঞাতব্য আমিই। আমিই বেদার্থপ্রকাশক, আমিই বেদজ্ঞ।। ১৫

ভগবানের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব

জ্ঞান ও স্মৃতি উৎপন্ন হয় চিৎশক্তি হতে। জীবের হৃদয়ে এই যে জ্ঞান ও স্মৃতির আধাররূপিণী চিৎশক্তি, তা ভগবানেরই দান। অর্থাৎ, চিৎশক্তিরূপে ভগবান্ জীবদেহে অধিষ্ঠিত থাকেন ব'লে জীব জানতে পারে এবং সেই জ্ঞাত বিষয় স্মরণ করতে পারে। জীব মধ্যে মধ্যে অজ্ঞানকবলিত বা আত্মবিস্মৃত হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েও শ্রীভগবান্ এখানে বলছেন—জীবের যে অজ্ঞান বা আত্মবিস্মৃতিরূপ মোহ—তার কারণও আমি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে স্তুতিপরায়ণ দেবগণের কণ্ঠেও এই কথারই প্রতিধ্বনি নির্গত হয়েছে—

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।। ৫।৬১
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।' ৫।৭৬

অর্থাৎ, যে দেবী, সকলের হৃদয়ে স্মৃতিরূপে বিরাজিতা, আবার যিনি সকলের অন্তঃকরণে ভ্রান্তিরূপে বিরাজিতা, তাঁকে প্রণাম করি। আর্য্যহিন্দুর এই ঐশী পরিকল্পনা সপ্রমাণ করে যে জগতের শুভ, অশুভ, ভাল, মন্দ—সমস্ত কিছু পরমাত্মা হতে নিঃসৃত।

শ্রীগীতার আলোচ্য শ্লোকটিতে আরও বলা হয়েছে বেদসমূহের বেদ্য বা জ্ঞাতব্য বিষয়—তিনি, বেদার্থের প্রকাশও আবার তিনি—তিনিই বেদজ্ঞ। উপরোক্ত উক্তি সমূহের তাৎপর্য্য হচ্ছে—ভগবানকে সমস্ত কিছু ব'লে জানাই প্রকৃত জ্ঞান। অর্থাৎ, প্রকৃত জ্ঞানী তিনি, যিনি জানেন—এই সংসারের শুভ-অশুভ, সদসদ্ সব কিছুই ভগবান্।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।। ১৬

অন্বয়—ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ লোকে ; সর্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ, কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে।। ১৬

অনুবাদ—এই লোকে ক্ষর ও অক্ষর নামে দুই পুরুষ প্রসিদ্ধ। সর্ব্বভূতই ক্ষর এবং যিনি কূটস্থ ব্রহ্ম তিনি অক্ষর॥ ১৬

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭

অন্বয়—অন্যঃ তু, উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ, ঈশ্বরঃ অব্যয়ঃ যঃ লোকত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্ত্তি॥ ১৭

অনুবাদ—অন্য এক পুরুষ 'পরমাত্মা' বলে কথিত হন। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হয়ে সকলকে পালন করছেন—তিনি অব্যয়, তিনিই ঈশ্বর॥ ১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮

অন্বয়—যস্মাৎ অহং ক্ষরম্ অতীতঃ অক্ষরাৎ অপি উত্তমঃ চ, অতঃ লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ প্রথিতঃ অস্মি॥ ১৮

অনুবাদ—যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তম, সেই হেতু আমি বেদে ও পুরাণে পুরুষোত্তম বলে খ্যাত॥ ১৮

পুরুষোত্তম-তত্ত্ব কি এবং তার মহত্ত্ব কেন

এই সংসারে ক্ষর ও অক্ষর নামে দুটি পুরুষ প্রখ্যাত। ক্ষর পুরুষ হচ্ছেন সর্ব্বভূত, এবং অক্ষর পুরুষ হচ্ছেন কূটস্থ,—নির্গুণ ব্রহ্ম। এখানে শ্রীভগবান্ বলছেন—আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তম—আমি তাই পুরুষোত্তম। অর্থাৎ, ক্ষর ও অক্ষর এ দুটি আমার বিভাব। তাই আমি নির্গুণোগুণী।

উপনিষদে অক্ষর, অব্যয়, নির্গুণ ব্রহ্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বক্তা ঘোষণা করা হয়েছে। পরন্তু, গীতা এখানে সেই নির্গুণ ব্রহ্ম অপেক্ষা সগুণ ঈশ্বরকে বিশেষত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ, জ্ঞানবাদের দৃষ্টিতে নির্গুণ, নিরুপাধি ও অপরিণামী যে ব্রহ্ম—তাহাই পরতত্ত্ব ব'লে স্বীকৃত। পক্ষান্তরে, ভক্তিবাদের

দৃষ্টিতে ভগবানে সগুণ ও নির্গুণের সমাবেশ বিদ্যমান। তবে তাঁর নির্গুণ ভাব অতি গহন। দেহধারী সাধারণ মানুষ তা ধারণা করতে পারে না। তাই জ্ঞানমূলক নেতিবাদের পথ বিশেষ অধিকারী সাধকের উপযোগী। পক্ষান্তরে, ভক্তিপথে তাঁর সগুণ, সোপাধি ভাবটি উপলব্ধি করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে সহজসাধ্য এবং এজন্যই তিনি লীলাদেহ ধারণ পূর্ব্বক ধরাধামে অবতীর্ণ হন। গীতাতে নির্গুণ নির্ব্বিশেষ তত্ত্বটিকে ভগবানের অন্যতম বিভাব ব'লে স্বীকার করা হলেও বাস্তব দৃষ্টিতে তাকে একমাত্র স্থান দেওয়া হয় নি।

জ্ঞানবাদীরা গীতার এই পুরুষোত্তম তত্ত্বটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। পরন্তু, গীতা অন্যতম উপনিষদ্ হলেও তা যে কর্ম্ম-জ্ঞান-ধ্যান-ভক্তিমূলক ভাগবত শাস্ত্র—তা অস্বীকার করা যায় না। পূর্ণাবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে গীতাকার শ্রীকৃষ্ণ যে সগুণ ঈশ্বরতত্ত্বকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেবেন—ইহা একান্ত স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ কেবলমাত্র গীতাগ্রন্থে নয়, গীতার পরবর্ত্তী যুগে রচিত যাবতীয় পুরাণসমূহে এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ ১৯

অন্বয়—ভারত, যঃ এবং অসংমূঢ়ঃ পুরুষোত্তমং মাং জানাতি, সঃ সর্ব্ববিদ্ সর্ব্বভাবেন মাং ভজতি॥ ১৯

অনুবাদ—হে ভারত, যিনি মোহমুক্ত হয়ে এই ভাবে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানতে পারেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন॥ ১৯

পুরুষোত্তম তত্ত্বের জ্ঞান সাধককে নিঃসংশয় করে

ভগবানকে যিনি পরম পুরুষোত্তম ব'লে অবগত হন তাঁর মন সর্ব্বতোভাবে সংশয়রহিত হয়ে যায়। তিনি তখন বুঝতে পারেন—তাঁর

উপাস্য দেবতার মধ্যে সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ, সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ—সব তত্ত্বই পূর্ণরূপে নিহিত। এরূপ অবস্থায় ভগবত্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর আর জানবার কিছু বাকী থাকে না। তিনি তখন পূর্ণমনোরথ হয়ে তাঁর উপাস্যের সেবাপূজায় নিমগ্ন হয়ে পরমানন্দ লাভ করেন।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।। ২০

অন্বয়—অনঘ, ভারত, ইতি ইদং গুহ্যতমং শাস্ত্রং ময়া উক্তম্ ; এতৎ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ।। ২০

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ ভারত, আমি এই গুহ্য কথা তোমাকে বললাম। যে কেহ ইহা জানলে জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয়।। ২০

পুরুষোত্তমতত্ত্ব অতি গূঢ়

শ্রীভগবান্ বলছেন—আমার এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব অতি গুহ্য। যারা অশ্রদ্ধাপরায়ণ ও অবিশ্বাসী তারা সহজে ইহা ধারণা করতে পারে না। তারা শিশুপাল, কংস, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধনাদির ন্যায় আমাকে সামান্য দেহধারী মানব মনে ক'রে অবজ্ঞা করে। এতে তাদের পতন ও দুর্গতিই হয়।

ভগবান্ যখন অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদের ন্যায় নরশরীর ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর সেই পরম গুহ্য পুরুষোত্তম বা অবতার-লীলা যাঁরা উপলব্ধি করেন এবং তাঁকে একান্ত আপনার জ্ঞানে গ্রহণ ও বরণ করেন, তাঁরা সত্যসত্যই ভাগ্যবান ও ধন্য।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ—দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগঃ

সম্পদ বিশ্বজগৎ দ্বন্দ্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই সৃষ্টিচক্রের সর্ব্বস্তরে ও সর্ব্বকর্ম্মে সু-কু এবং শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব চলেছে নিত্য-নিরন্তর। শুধু বাহ্য ব্যাপারেই নয়, মানুষের হৃদয়কন্দরেও চলেছে আশা-নিরাশা, জয়-পরাজয় ও সুখ-দুঃখের এই দ্বন্দ্বপ্রবাহ। আর যেখানে ইত্যাকার সদসদ্‌রূপী পরস্পরবিরোধী ভাব ও তত্ত্বের সমাবেশ, সেখানে সংঘর্ষ-সংগ্রাম অনিবার্য্য ; আর সৃষ্টির সেই প্রথম প্রভাত হতে সু ও কু-এর এই যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ চলেছে তার স্বরূপ বা বাহ্য প্রকাশ কখনও মৃদু, কখনও তীব্র। সকল দেশের সাহিত্যে, কাব্যে, পুরাণে এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দেবাসুরগ্রামসং নামে বর্ণিত। গীতার নবম অধ্যায়ের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে এরই সূচনা দেওয়া হয়েছে সংক্ষিপ্ত ভাবে। এক্ষণে বর্ত্তমান অধ্যায়ে তারই ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে।

সর্ব্বপ্রথম শ্রীভগবান্ দৈবী প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণনা ক'রে বলছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্।। ১

অহিংসাসত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্।। ২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদঃ দৈবীমভিজাতস্য ভারত।। ৩

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—ভারত! অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ দানং, দমঃ চ, যজ্ঞঃ চ, স্বাধ্যায়ঃ, তপঃ আর্জ্জবম্, অহিংসা, সত্যম্, অক্রোধঃ ত্যাগঃ, শান্তিঃ, অপৈশুনং, ভূতেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং, মার্দ্দবং, হ্রীঃ, অচাপলং,

তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্, অদ্রোহঃ, নাতিমানিতা—দৈবীং সম্পদং অভিজাতস্য ভবন্তি॥ ১-৩

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন, হে ভারত! নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা, কর্ম্মযোগে তৎপরতা, দান, ইন্দ্রিয়-সংযম, যজ্ঞ, শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জ্জন, দয়া, অলোভ, বিনয়, (কুকর্ম্মে) লজ্জা, অচাপল্য, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, নিরভিমানিতা—এই সকল গুণগুলিই জাতকের অর্থাৎ মানুষের দৈবী সম্পদ। ১-৩

দৈবী প্রকৃতিই মানুষের আসল স্বরূপ

শ্রুতি বলেন—"জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। বাইবেলও বলেছেন—God made man in His own image—মানুষ ঈশ্বরের প্রকৃতির অনুরূপেই সৃষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ, জীবের যা প্রকৃত স্বরূপ তা হচ্ছে—দিব্য বা ভাগবত। জীবপ্রকৃতির এই যে ঐশ্বরিক গুণ, শক্তি ও বৃত্তিনিচয় তা-ই এখানে দৈবী সম্পদরূপে বর্ণিত। এই দেবভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবহৃদয়ে পুঞ্জীভূত রয়েছে বহু হীন ও জঘন্য পশুভাব। আর সাধারণ অবস্থায় তার চরিত্রে এই পাশব বৃত্তিগুলি অধিকতর পরিস্ফুট ও ক্রিয়াশীল।

জৈব বিজ্ঞানের মতে জীবপ্রকৃতি তাই পশুতুল্য—"Man is primarily an animal" পরন্তু গীতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের দৃষ্টিতে মানব-চরিত্রের এই পশুভাবটি গৌণ এবং দেবভাবই মুখ্য। সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ দৈবী সম্পৎ এবং রজস্তমপ্রধান ব্যক্তিগণ আসুরী সম্পৎ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। শ্রীভগবান্ এখানে প্রথমে দৈবী সম্পদের বর্ণনার পরে আসুরী সম্পদের উল্লেখ করে বলছেন—

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪

অন্বয়—পার্থ! দম্ভঃ দর্পঃ অভিমানঃ ক্রোধঃ পারুষ্যম্ অজ্ঞানং চ এব, আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য॥ ৪

অনুবাদ—হে পার্থ দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞান আসুরী সম্পদজাত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়॥ ৪

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫

অন্বয়—দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়, আসুরী নিবন্ধায় মতা, পাণ্ডব! মা শুচঃ, দৈবীং সম্পদং অভিজাতঃ অসি॥ ৫

অনুবাদ—দৈবী সম্পদ মোক্ষের হেতু এবং আসুরী সম্পদ বন্ধনের কারণ হয়। হে পাণ্ডব, শোক কোরো না, কেন না তুমি দৈবী সম্পদ নিয়ে জাত॥ ৫

গীতামৃত—যাঁরা মহৎ গুণের অধিকারী ও সৎ সংস্কারাপন্ন তাঁরা যে ধীরে ধীরে ধর্ম্মপ্রেমী হয়ে নিজেদের তপঃপ্রভাবে মোক্ষের অধিকারী হবেন এবং যারা অনাচারী ও অসৎ বৃত্তিসম্পন্ন তারা যে সংসারমোহে আচ্ছন্ন হয়ে ক্রমশঃ আরও আসক্ত ও আবদ্ধ হয়ে পড়বে—তাতে সন্দেহ কি? অর্জ্জুন সৎকুলজাত ও বিশেষ গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী। সুতরাং, তাঁর বন্ধনের ভয় থাকতে পারে না।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬

অন্বয়—পার্থ! অস্মিন্ লোকে দৈবঃ চ আসুরঃ চ দ্বৌ ভূতসর্গৌ ; দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ ; আসুরং মে শৃণু॥ ৬

অনুবাদ—হে পার্থ! এ সংসারে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার লোক দৃষ্ট হয়। দৈবী প্রকৃতির বর্ণনা বিস্তৃত ভাবে করা হয়েছে। এক্ষণে আসুরী প্রকৃতির কথা শুন॥ ৬

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭

অন্বয়—আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ ন বিদুঃ ; তেষু ন শৌচং ন আচারঃ ন চ অপি সত্যং বিদ্যতে॥ ৭

অনুবাদ—আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্ম বিষয়ে নিবৃত্তি কি, তা জানে না। তাদের মধ্যে শৌচ, সদাচার, সত্য কিছুই নাই॥ ৭

গীতামৃত—যারা অসুরভাবাপন্ন—তাদের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান থাকে না। সুতরাং, ধর্ম্মমূলক আচার অনুষ্ঠানে তাদের রুচি বা প্রবৃত্তি হয় না এবং পাপমূলক কর্ম্মের প্রতিও তাদের ঘৃণাবোধ জন্মে না। পশুর ন্যায় তারা অজ্ঞান, অশুচি এবং ন্যায়-অন্যায়-বোধহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮

অন্বয়—তে জগৎ অসত্যম্, অপ্রতিষ্ঠম্, অনীশ্বরম্, অপরস্পরসম্ভূতং, কিম্ অন্যৎ কামহৈতুকম্ আহুঃ॥ ৮

অনুবাদ—(আসুরী প্রকৃতির লোকের ধারণা)—এই জগৎ সত্যশূন্য, ন্যায়ান্যায়ের প্রতিষ্ঠাবর্জ্জিত, সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই, স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই জীবকুল সৃষ্ট—তাছাড়া অন্য কোন কারণ নাই॥ ৮

আসুরী প্রকৃতি লোকের ধারণা

আসুরিক ভাবাপন্ন লোকেরা ঘোর বিষয়াসক্ত ও ভোগী। সুতরাং, তারা তাদের মোহ ও অজ্ঞানের দৃষ্টিতে সব কিছু বিচার করে। তাদের সেই বিচারে সত্য, ন্যায়, নীতি ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের স্থান থাকে না। তারা তাই মনে করে —এই জগতের পশ্চাতে সৃষ্টিকর্ত্তা বা কর্ম্মফলদাতা বলে কারও অস্তিত্ব নাই। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হচ্ছে—ভোগক্ষেত্র। মানুষ তার ভোগবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য এখানে তার খেয়াল খুশীমত সব কিছু সৃষ্টি করছে। স্ত্রী-

পুরুষের অন্তঃকরণে যে স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি বিদ্যমান তার পরিপূর্ত্তির ফলেই এ সংসারে প্রজাসৃষ্টি ও প্রজাবৃদ্ধি ঘটে। এই কার্য্যের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তারূপী ঈশ্বরের কল্পনা মিথ্যা ও অহেতুক। বলা বাহুল্য, অধুনা একশ্রেণীর নব্য জড়বিজ্ঞানীও অনুরূপ মতবাদের প্রচার-প্রতিষ্ঠায় কটিবদ্ধ। প্রাচীনকালে চার্ব্বাকপন্থীরাও ছিলেন ইত্যাকার নিরীশ্বর ভোগবাদের সমর্থক। বস্তুতঃ, মনুষ্যপ্রকৃতির মধ্যেই উপরোক্ত দৈবী ও আসুর উভয় প্রকার ভাব বিদ্যমান। সময়, সুযোগ, পরিবেশ ও সংস্কারের অনুপাতে এদের প্রকাশ, বিকাশ, পোষণ ও পরিপুষ্টি ঘটে থাকে।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯

অন্বয়—এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য নষ্টাত্মানঃ অল্পবুদ্ধয়ঃ উগ্রকর্ম্মাণঃ অহিতাঃ জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি॥ ৯

অনুবাদ—ইত্যাকার দৃষ্টি অবলম্বন করে বিকৃতবুদ্ধি, ক্ষুদ্রমতি, ক্রূরকর্ম্মা ব্যক্তিগণ অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয় ; তারা জগতের নাশের জন্যই জন্মগ্রহণ করে থাকে॥ ৯

আসুরী প্রকৃতির লোকের প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা ভীষণ অহিতকর

আসুরী প্রকৃতির লোকদের উচ্ছৃঙ্খল ভোগপ্রবৃত্তির ও ক্রূর কর্ম্ম শুধু যে তাদের চারিত্রিক অধোগতির কারণ হয়, তা-ই নয়, তাদের সেই অপকর্ম্মের প্রতিক্রিয়ায় সমাজের সুখ, শান্তি, কল্যাণও ভীষণভাবে ব্যাহত ও বিঘ্নিত হয়। একজন সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তি নিজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য যদি কিছু অন্যায় অপরাধ করে, তবে তা ততখানি মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে না। পরন্তু, কোন প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি যদি উগ্রস্বরূপ ধারণ ক'রে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় তবে সে যে বহুলোকের সর্ব্বনাশের কারণ হয়ে উঠে—তা কে অস্বীকার করবে? আর এই ক্ষয়-ক্ষতি আরও ব্যাপক রূপ ধারণ করে, যদি

সেই নরাধম ব্যক্তি স্বীয় সংগঠনশক্তির দ্বারা ছলে বলে কৌশলে কোন সমাজ বা রাষ্ট্র বিশেষের নেতৃত্বের আসন অধিকার করতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান যুগের মানব-সমাজ ইত্যাকার একশ্রেণীর উগ্রকর্ম্মা অসুর নেতার অত্যাচার-নির্য্যাতনে প্রপীড়িত।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০

অন্বয়—দুষ্পূরং কামম্ আশ্রিত্য দম্ভমানমদান্বিতাঃ মোহাৎ অশুচিব্রতাঃ, অসদ্ গ্রাহান্ গৃহীত্বা, প্রবর্ত্তন্তে॥ ১০

অনুবাদ—দুষ্পূরণীয় কামনার বশবর্ত্তী হয়ে দম্ভ, মান ও গর্ব্বে স্ফীত হয়ে তারা অপবিত্র ভাবে কতকগুলি মনঃকল্পিত ধর্ম্ম-কর্ম্মের আচরণে ব্রতী বা প্রবৃত্ত হয়॥ ১০

আসুরী ব্রতীদের ধর্ম্মাচরণ

আসুরী প্রকৃতির লোকেরা যে সকলেই নাস্তিক তা নয়। তাদের মধ্যে একদল আস্তিকও আছে। তবে তাদের উপাস্য দেব-দেবী যেমন তাদের মনঃকল্পিত এবং তারা তাদের পূজার্চ্চনাও করে নিজেদের মতলব মত—যার মধ্যে সদাচার, শুচিতা ও বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের বালাই থাকে না। কোন কোন মানুষ যেমন বামাচারের নামে নিজের হীন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তাদের পরিকল্পিত পঞ্চ 'ম'-কারের সহায়তায় অশুচি ভাবে ও আভিচারিক পদ্ধতিতে তাদের সাধনে ব্রতী হয়—এরাও তদ্রূপ ক'রে থাকে। বলা বাহুল্য, তাদের এই পূজার পশ্চাতে থাকে—কেবল তাদের দম্ভাভিমান, যশঃ, মান ও জঘন্য প্রবৃত্তির চরিতার্থতার হীন মনোভাব।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২

অন্বয়—প্রলয়ান্তা অপরিমেয়ান্ চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ কামোপভোগপরমাঃ এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামভোগার্থম্ অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে॥ ১১-১২

অনুবাদ—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অপরিমিত বিষয়চিন্তা ক'রে এই সব বিষয়ী লোকেরা স্থিরনিশ্চয় হয় যে—কামোপভোগই জীবনের পরম পুরুষার্থ। সুতরাং, এরা শতবিধ আশপাশে বদ্ধ এবং কাম-ক্রোধপরায়ণ হয়ে অসদুপায়ে অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়॥ ১১-১২

অপরিমিত বিষয়ভোগের অন্তিম পরিণাম

আসুরী প্রকৃতির লোকদের বিষয়সেবার নেশা অপরিমেয়। সারা জীবন অহরহঃ ভোগ্য বিষয়ের চিন্তায় প্রমত্ত থাকার ফলে তাদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, কামোপভোগই জীবনের চরম কাম্য ও পরম প্রাপ্য। তাছাড়া, আকাঙ্ক্ষিতবস্তু আর কিছুই নাই বা হতে পারে না। আর এরূপ সিদ্ধান্তের ফলে তাদের সেই বিষয়-বাসনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হ'তে হ'তে তাদের মনোবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও অবশ করে ফেলে এবং সেই মোহগ্রস্ত অবস্থায় বিবেকবিচারশূন্য হয়ে তারা তাদের সেই ক্রমবর্দ্ধিত ভোগাকাঙ্ক্ষার চরিতার্থের জন্য দুর্নীতির পথে অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত ও প্রমত্ত হয়ে উঠে। তাদের এই নিরন্তর বিষয়সেবার পরিণাম যে এখানেই পরিসমাপ্ত হয় না, গীতাকার তার সূচনা দিয়ে এক্ষণে বিস্তার পূর্ব্বক বলছেন—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩

অন্বয়—অদ্য ময়া ইদং লব্ধং, ইমং মনোরথং প্রাপ্স্যে, ইদম্ অস্তি, পুনঃ মে ইদং ধনম্ অপি ভবিষ্যতি॥ ১৩

অনুবাদ—আজ আমার ইহা লাভ হল, ভবিষ্যতে আমার এই মনোরথ পূর্ণ হবে, এই ধন আমার আছে, ভবিষ্যতে এই ধন লাভ হবে॥ ১৩

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪

অন্বয়—অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ, অপরান্ অপি চ হনিষ্যে, অহম্ ঈশ্বরঃ, অহং ভোগী, অহং সিদ্ধঃ বলবান্ সুখী॥ ১৪

অনুবাদ—এই শত্রু আমি বধ করেছি, অপর সকলকেও বধ করব; আমি সকলের প্রভু, আমি সকল ভোগ-সুখের অধিকারী, আমিই সিদ্ধ বা কৃতকৃত্য, আমিই বলবান্ আমিই সুখী॥ ১৪

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬

অন্বয়—আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি, ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তিঃ? যক্ষ্যে, দাস্যামি, মোদিষ্যে ইতি অজ্ঞান-বিমোহিতাঃ অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহজাল-সমাবৃতাঃ কামভোগেষু প্রসক্তাঃ, অশুচৌ নরকে পতন্তি॥ ১৫।১৬

অনুবাদ—আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার তুল্য আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আনন্দ করব—এই প্রকার অজ্ঞানে বিমূঢ়, বিবিধ বিষয়চিন্তায় বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে জড়িত ও বিষয়ভোগে আসক্ত এরূপ ব্যক্তিগণ অশুচি নরকে পতিত হয়॥ ১৫।১৬

আসুরী প্রকৃতি বিষয়ীর অন্তিম পরিণাম

তমোমিশ্রিত রজোগুণের প্রভাবেই আসুরী প্রকৃতির উৎপত্তি। এজন্য উক্ত দুটি অবগুণের মধ্যে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি—তা আসুরী প্রকৃতিতে প্রতিভাত হওয়াই স্বাভাবিক। এই কারণে এই শ্রেণীর লোকেরা দাম্ভিক, পরপীড়ক, ভোগী ও পরশ্রীকাতর হয়। এরূপ অজ্ঞান ব্যক্তিরা যে বিভ্রান্ত, বিপথগামী, মোহমত্ত ও ব্যসনাসক্ত হবে—তাতে সন্দেহ কি? জীবদ্দশায় এরা

কদাপি সত্যকার সুখ ও সন্তোষের অধিকারী হয় না। পক্ষান্তরে, জীবৎকালে নিত্য নূতন ভোগবাসনার দ্বারা এদের মনোবুদ্ধি নিরন্তর উদ্ভ্রান্ত ও বিচলিত হতে থাকে এবং মৃত্যুর পরে এরা জঘন্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। বলা বাহুল্য, অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিদের এই অন্তিম পরিণামের বিষয় চিন্তা ক'রে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য —সর্ব্বাগ্রে জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে সাবধান সতর্ক হওয়া।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৭

অন্বয়—আত্মসম্ভাবিতাঃ, স্তব্ধাঃ, ধনমানমদান্বিতাঃ তে দম্ভেন নামযজ্ঞৈঃ অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে॥ ১৭

অনুবাদ—এই সকল আত্মশ্লাঘাযুক্ত, অবিনয়ী, ধনমানগর্ব্বে স্ফীত ব্যক্তিগণ নিজেদের দম্ভ প্রদর্শনের নিমিত্ত অশাস্ত্রীয় যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে॥ ১৭

আসুরিক প্রকৃতির লোকের ধর্ম্ম-কর্ম্ম তাদের দম্ভের পরিপোষক মাত্র

আসুরিক প্রকৃতির লোকেরা যদি বা কখনও যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে তথাপি তাদের অনুষ্ঠিত সেই সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য হয়—নিজেদের ধনৈশ্বর্য্য, নাম, যশঃ, প্রভাব, প্রতিপত্তি জাহির করা। এদের আচরিত সেই সব ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে কোনও উন্নত শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান বা শ্রদ্ধা-ভক্তির স্থান থাকে না। এই কারণে তাদের সেই বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা তাদের চিত্তশুদ্ধি তো হয়ই না বরং এর দ্বারা তাদের দম্ভাভিমান আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হয়ে তাদের পতনের কারণ ঘটায়।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮

অন্বয়—অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ আত্মপরদেহেষু মাং প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮

অনুবাদ—সাধু সজ্জনগণের বিদ্বেষী এই সমস্ত ব্যক্তিগণ অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে স্বদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আমাকে হিংসা করে থাকে॥ ১৮

আসুরিক প্রকৃতির লোকেরা সাধু-বিদ্বেষী ও ভগবদ্বিদ্বেষী

যারা আসুরিক প্রকৃতিসম্পন্ন তারা যে শুধু নিজেদের বল, দর্প, কাম, ক্রোধাদি দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা নিজেদের চারিত্রিক অবনতি ঘটায় তা-ই নয়, তারা তাদের সেই দুষ্ট ও খল স্বভাবের দ্বারা সাধু সজ্জনগণের প্রাণে পীড়ার সঞ্চার করে। তাদের সেই অনাচারমূলক উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার তাদের নিজেদের ও অপর সকলের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত ভগবানও উত্যক্ত ও বিচলিত হন। অর্থাৎ, অনন্ত প্রেম ও ক্ষমার আধার ভগবান্ও এতাদৃশ নরাধমগণের আচারব্যবহারে বিচলিত ও অতিষ্ঠ হয়ে তাদের শাসনে উদ্যোগী হন।

পরবর্ত্তী শ্লোকটিতে শ্রীভগবান্ স্বয়ং এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে বলছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯

অন্বয়—অহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ নরাধমান্ অশুভান্ তান্ সংসারেষু আসুরীষু এব যোনিষু অজস্রং ক্ষিপামি॥ ১৯

অনুবাদ—এইরূপ দ্বেষপরায়ণ, ক্রূর, নরাধম ব্যক্তিগণকে আমি সংসারে আসুরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করে থাকি॥ ১৯

ভগবানের শাসকরূপ

কর্ম্মফলদাতারূপে শ্রীভগবান্ জীবকে তার সদসৎ কর্ম্মের ফল দান করেন। তবে নির্গুণ স্বরূপে তিনি দ্রষ্টা ও সাক্ষীরূপে বিরাজমান থাকেন। পক্ষান্তরে, সগুণ স্বরূপে তিনি পুণ্যাত্মাগণকে স্বর্গাদি উন্নত লোকে প্রেরণ করেন এবং ক্রূরকর্ম্মাগণকে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করেন পশ্বাদি হীন যোনিতে। বস্তুতঃ, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন—ইহাই হিন্দুধর্ম্মোক্ত ভাগবত বিধান।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০

অন্বয়—কৌন্তেয়! জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ মূঢ়াঃ মাম্ অপ্রাপ্য এব ততঃ অধমাং গতিং যান্তি॥ ২০

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! এই সকল মূঢ় ব্যক্তি জন্মে জন্মে আসুরী যোনিপ্রাপ্ত হয় এবং আমাকে না পেয়ে শেষে আরও অধোগতি প্রাপ্ত হয়॥ ২০

আসুরী প্রকৃতির দুর্গতি

আসুরিক প্রকৃতির লোকদের শাস্তির অন্ত নাই। তারা একবার নয়, পুনঃ পুনঃ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। সেই ঘোর অজ্ঞান অবস্থায় থাকাকালে তারা উচ্চতর জ্ঞানালোক লাভ করতে পারে না। আর এই কারণে বহু জন্ম ভাগবত ভাব ও আদর্শের সন্ধান না পেয়ে তারা ক্রমশঃ নীচ গতি লাভ ক'রে নিদারুণ দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য-পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত চার্লস্ ডারুইনের বিবর্ত্ত ও যৌননির্ব্বাচন মতবাদের ভিত্তিতে জীবের যে দৈহিক বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ ঘটে তার গতি ও পরিণতি হয় ক্রমিক ঊর্দ্ধ্বস্তরের দিকে। পক্ষান্তরে, হিন্দু-দর্শনের মতে মানব-যোনিতে উপগত জীবের যে আত্মিক ক্রমবিকাশ—তার ধারা কিন্তু অন্য প্রকার। সেখানে শুভাশুভ কর্ম্মের অনুপাতে মানুষ উচ্চাবচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে করতে ভাল-মন্দ অভিজ্ঞতা লাভ করার পরে অন্তিমে স্বীয় ভাগবত বা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ ক'রে ধন্য হয়।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১

অন্বয়—কামঃ, ক্রোধঃ তথা লোভঃ—ইদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্ আত্মনঃ নাশনং ; তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১

অনুবাদ—কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। এরা মানবাত্মার অধোগতির মূল। সুতরাং, এই তিনটিকে ত্যাগ করবে॥ ২১

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২

অন্বয়—কৌন্তেয়, এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি, ততঃ পরাং গতিং যাতি॥ ২২

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিনটি শত্রুর কবল হতে মুক্ত হলে মানুষ স্বীয় কল্যাণ-সাধনপূর্ব্বক পরমা গতি লাভ করতে পারে॥ ২২

মানবের সর্ব্বপ্রধান শত্রু

রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোকদের পতন ও অধোগতির হেতু অনেক হতে পারে ; পরন্তু, এদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক কারণ হচ্ছে —কাম, ক্রোধ ও লোভ। মুখ্যতঃ, এরাই জীবের যাবতীয় পাপপ্রবৃত্তির মূল উৎস। এজন্য শ্রীভগবান এখানে নির্দ্দেশ করলেন—উপরোক্ত তিনটি ভয়ঙ্কর শত্রুকে সর্ব্বপ্রযত্নে জয় করা কর্ত্তব্য এবং তা কী রূপে সম্ভবপর নিম্নের দুটি শ্লোকে তারই সূচনা দেওয়া হয়েছে—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

অন্বয়—যঃ শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য কামকারতঃ বর্ত্ততে, সঃ সিদ্ধিং ন, সুখং ন, পরাং গতিং ন অবাপ্নোতি॥ ২৩

অনুবাদ—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন ক'রে স্বেচ্ছাচারী ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, শান্তি, মোক্ষ কিছুই লাভ করতে পারে না॥ ২৩

শাস্ত্রবিধিই জীবননীতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামক

"শাস্ত্র" শব্দটির ধাতুগত অর্থ হচ্ছে—যা শাসন করে। সাধারণতঃ মানুষের মনে ভাল-মন্দ নানা প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্পের উদয় হয়। সেই সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্পকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে যদি তাদিগকে সুউচ্চ লক্ষ্য ও আদর্শের অভিমুখী করে না তোলা যায় তবে মানুষের জীবনগতি হয় উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী। এই কারণে জগতের সকল ধর্ম্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, মানুষ স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মের যে অনুশাসন ও বিধি-বিধান, তা-ই অনুসরণ করে চলবে ; এবং অন্যথা করলে কদাপি সে সিদ্ধি, শান্তি ও মুক্তিলাভে সমর্থ হবে না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ ২৪

অন্বয়—তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ শাস্ত্রং তে প্রমাণম্ ; ইহ শাস্ত্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি॥ ২৪

অনুবাদ—এজন্য তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। তুমি তাই শাস্ত্রবিধিমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও॥ ২৪

কোন্ শাস্ত্র গ্রাহ্য

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে শাস্ত্রীয় অনুশাসন একমাত্র নিয়ামক কি না—এই বিষয়টি নিয়ে বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী মানুষের মনে বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

যারা নাস্তিক বা জগতের কোন ধর্ম্মমতে—এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত অবিশ্বাসী, তাদের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। পরন্তু, যারা আস্তিক ও ভগবদ্বিশ্বাসী, তারাও বিভিন্ন মতপথাবলম্বী। এরূপ অবস্থায় তাদের মনে এরূপ সংশয় সন্দেহ উদিত হতে পারে যে জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মগুলির যে

শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান তাও যখন এক নয়, তখন তাদের কোনটিকে সত্য বা গ্রাহ্য বলে স্বীকার করা যাবে?

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—যারা যে ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী, তাদের কর্ত্তব্য—অন্যের প্রতি হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ না রেখে তাদের নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে নিজেদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ করা। অর্থাৎ, যাঁরা খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী তাঁরা অনুসরণ করবেন—তাঁদের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের অনুশাসন; মুসলমানরা মান্য করবেন—তাঁদের ধর্ম্মশাস্ত্র কোরানের বিধি-বিধান এবং পারসীকরা মেনে চলবেন—তাঁদের ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তার উপদেশ-নির্দ্দেশ। তবে এখানেও প্রশ্ন আসবে—বহু শাস্ত্রবাদী আর্য্য হিন্দুগণ এ বিষয়ে কি করবেন? তাঁদের ধর্ম্মে তো বলা হয়েছে—"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্না, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।" অর্থাৎ, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মূল যে বেদ—তাও একাধিক, স্মৃতি-গ্রন্থগুলিও ভিন্ন ভিন্ন; হিন্দুধর্ম্মের যে অগণিত ঋষি-মুনি—তাঁদের মতও পৃথক্ পৃথক্। এক্ষেত্রে সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপায় কি?

এ বিষয়ে প্রাচীন পরম্পরাগত যে নির্দ্দেশ ও সূচনা দেওয়া হয়েছে—তা-ই এখানে স্মরণযোগ্য। পণ্ডিতগণ বলেছেন—স্মৃতি ও পুরাণের অপেক্ষা শ্রুতির প্রমাণ অধিকতর গ্রাহ্য। কেন না, স্মৃতি ও পুরাণের নির্দ্দেশগুলির অধিকাংশ সর্ব্বকালের উপযোগী নয়। যে সময়ে ও যে পরিস্থিতিতে সেগুলি রচিত হয়েছে, তা হচ্ছে সেই কাল ও পরিস্থিতির উপযোগী। পক্ষান্তরে, শ্রুতির নির্দ্দেশ ও অনুশাসন সর্ব্বকাল ও সর্ব্বাবস্থায় উপযোগী ও অনুকূল। এ বিষয়ে আরও বলা হয়েছে—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" অর্থাৎ, মহাজনগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে যে পন্থার অনুবর্ত্তন করেন বা শাস্ত্রসমূহের যে ব্যাখ্যা দান করেন—তাহাই সেকালের যুগধর্ম্ম। আর্য্যহিন্দুর পরম কর্ত্তব্য হচ্ছে—সেই ক্রান্তদর্শী মহাপুরুষগণের আদিষ্ট যুগধর্ম্মের বিধি-বিধান অনুসারে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করা।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ—শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগঃ

পূর্ব্ব অধ্যায়ের অন্তিম ভাগে বলা হয়েছে—যে সকল ব্যক্তি অশ্রদ্ধালু ও শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন ক'রে নিজেদের অভিপ্রায় বা খেয়াল খুশীমত কাজকর্ম্ম করে, তারা কদাপি উচ্চগতি বা শান্তি লাভ করে না। শ্রীভগবানের মুখে এরূপ নির্দ্দেশ শুনে অর্জ্জুনের মনে শ্রদ্ধাবিষয়ে এক নূতন প্রশ্ন উদিত হয়েছে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দানপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ে শ্রদ্ধার প্রকারভেদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই কারণে এই অধ্যায়টি 'শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ' নামে আখ্যাত।

অর্জ্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ—কৃষ্ণ, যে শাস্ত্র-বিধিম্ উৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ যজন্তে, তেষাং নিষ্ঠা কা? সত্ত্বং? রজঃ? আহো তমঃ?॥ ১

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন, হে কৃষ্ণ! যারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করেও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজার্চ্চনা করে, তাদের নিষ্ঠা—সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক?॥ ১

শাস্ত্রবিধিহীন পূজার ফল

অর্জ্জুন বললেন—হে সখে, শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান না মেনে যারা যথেচ্ছভাবে কাজ কর্ম্ম করে তারা ঊর্দ্ধগতি ও শান্তিলাভ করে না—তা তো বুঝলাম। পরন্তু, সংসারে এমনও তো অনেক লোক আছেন—যাঁরা শাস্ত্রবিধান বিষয়ে অজ্ঞান হলেও একেবারে অশ্রদ্ধালু নন এবং যাঁরা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁদের বুদ্ধিবিচারমত পূজার্চ্চনা, দান-ধ্যান, তীর্থযাত্রাদি করে থাকেন, সেই সমস্ত লোকদের ধর্ম্মকর্ম্ম কি তবে নিষ্ফল হয়? আর তা যদি না হয় তবে তাঁদের

ইত্যাকার ধর্ম্মনিষ্ঠা সাত্ত্বিক, রাজসিক, না তামসিক?

জিজ্ঞাসু অর্জ্জুনের মনে এরূপ প্রশ্ন উঠা একান্ত অমূলক নয়। কেন না, এই সংসারে সব দেশে, সব যুগের সব সমাজে এরূপ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত নর-নারীর সংখ্যাই অধিক, যাঁরা শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী না হলেও নাস্তিকও নন এবং তাঁরা সরল বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত তাঁদের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানগুলি বহুলাংশে মেনে চলেন। বস্তুতঃ, প্রত্যেক দেশের ধর্ম্মীয় বহিরঙ্গগুলি যে এই শ্রেণীর লোকদের নিষ্ঠা ও ভক্তি-বিশ্বাসের ফলেই বেঁচে আছে—তা নিঃসন্দেহ।

অর্জ্জুনের উক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।। ২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—দেহিনাং সাত্ত্বিকী, রাজসী চ তামসী চ ইতি ত্রিবিধা এব শ্রদ্ধা ভবতি ; সা স্বভাবজা ; তাং শৃণু।। ২

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বল্লেন—দেহীদের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই তিন প্রকারের শ্রদ্ধা আছে, উহা যে স্বভাবজাত তা তোমাকে বলছি, শোন।। ২

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।। ৩

অন্বয়—হে ভারত, সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি ; অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ, যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।। ৩

অনুবাদ—হে ভারত! সকলেরই শ্রদ্ধা স্বীয় স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময় ; যে যে-রূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেরূপ হয়।। ৩

জীবের স্বভাব ভেদে শ্রদ্ধা তিন প্রকার

দেহধারী জীবের মনে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারের অনুরূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন প্রকারের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। এই সংসারে এমন লোক কেহ নাই যে একেবারে শ্রদ্ধাবর্জ্জিত। অর্থাৎ, মনুষ্যমাত্রই অল্প বিস্তর শ্রদ্ধালু। কারণ, ভাল হোক, মন্দ হোক, শুভ হোক, অশুভ হোক—কোনও না কোনও বিষয়ের প্রতি মানুষের হৃদয়-মনে রুচি বা নিষ্ঠা থাকাই স্বাভাবিক।

বলা বাহুল্য, এস্থলে 'শ্রদ্ধা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে 'শ্রদ্ধা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস। পরন্তু, এখানে শ্রদ্ধার অর্থ—মানুষের স্বাভাবিক রুচি বা নিষ্ঠা। এই দৃষ্টিতে এই জগতের ভাল-মন্দ সকল লোককেই শ্রদ্ধালু বলা চলে। এমন কি যারা পরস্বাপহারী, চৌর, দস্যু, লম্পট—তারাও শ্রদ্ধালু। কারণ, তাদেরও স্বীয় স্বীয় অভ্যাস ও বৃত্তিতে অত্যধিক রুচি বা আগ্রহ বিদ্যমান।

কারো কারো দৃষ্টিতে এই শ্লোকটির অন্তর্গত 'পুরুষ' শব্দটির অর্থ—নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম। পরন্তু, এই অর্থ কষ্টকল্পিত ছাড়া আর কিছু নয়।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।। ৪

অন্বয়—সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে, রাজসাঃ যক্ষ-রক্ষাংসি, অন্যে তামসাঃ জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে।। ৪

অনুবাদ—সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের পূজা করেন। রাজসিক প্রকৃতির লোকেরা যক্ষ-রক্ষদের পূজা করে এবং যারা তামসিক প্রকৃতির তারা ভূতপ্রেতের পূজা করে থাকে।। ৪

রুচিভেদে ইষ্টভেদ

সাধকদের রুচিভেদে ইষ্টভেদ হয়ে থাকে। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোকদের ভগবানের সম্বন্ধে ধারণা অতি অস্পষ্ট ; এমন কি কোন কোনও ক্ষেত্রে অতি বিচিত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কথাই সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা যাক। বহু দেববাদী আর্য্য হিন্দুর ইষ্ট বা আরাধ্য বস্তুর অন্ত নাই। এখানে নিরাকার নির্গুণবাদী সাধকরা যেমন সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষ

পরমাত্মাকে ইষ্ট বলে গ্রহণ করেন—তেমনই নিরাকার সগুণবাদী সাধকরা ভগবানের নিরাকার সগুণ স্বরূপের উপাসনা করেন। তা ছাড়া, অন্য এক শ্রেণীর সাধক আছেন যাঁরা সাকার সগুণবাদী এবং তাঁদের উপাস্য হচ্ছেন —সাকার সগুণ ভগবান্‌। এই সাকার সগুণ ঈশ্বরের উপাসকগণের আবার রুচিভেদে কল্পিত হয়—বহু দেব-দেবী। হিন্দুধর্ম্মে এঁদেরই বলা হয়—তেত্রিশ কোটি দেবতা।

উক্ত দেব-দেবীগণের পূজার্চ্চনা আবার নিষ্কাম ও সকাম—এরূপ দুই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। নিষ্কাম ভাবে যাঁরা পূজা করেন, গীতার মতে তাঁদের শ্রদ্ধাই সাত্ত্বিক। আর এই সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার যাঁরা অধিকারী—তাঁরাই সত্যকার মোক্ষার্থী। পক্ষান্তরে, যাঁরা সকাম ভাবের উপাসক তাঁরা আবার প্রকৃতি ভেদে রাজসিক ও তামসিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত। রাজসিক ভাবাপন্ন সাধকরা নিজেদের অভীষ্ঠ ভোগ্য বস্তু লাভের জন্য যক্ষ-রক্ষাদি অসংখ্য উপদেবতার পূজা করে থাকেন। অবশ্য বর্ত্তমানে যক্ষ-রক্ষাদি নামের পরিচয় পাওয়া যায় না। যক্ষকে ধনের দেবতা ব'লে অভিহিত করা হয়। এজন্য অদ্যাপি প্রবাদে বলা হয়—'যক্ষের ধন'। অর্থ-সম্পদরূপী ভোগ্য বস্তু প্রাপ্তির আশায় বিষয়িগণ বর্ত্তমানে যক্ষের পরিবর্ত্তে লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা করে থাকেন। দক্ষিণ ভারতে এখনও এমন লোকের অভাব নাই যাঁরা শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা রক্ষোরাজ রাবণের অধিক ভক্ত। তামসিক প্রকৃতির উপাসকদের দৃষ্টিতে আবার দেব-দেবীর অপেক্ষা ভূত-প্রেত-পিশাচই পূজা-প্রার্থনার যোগ্য পাত্র। তাদের ধারণা, তাদের অভীষ্ট প্রার্থনা পূর্ণ করতে তারাই সব চেয়ে অধিক সক্ষম।

বস্তুতঃ, শুধু ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম্মের উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধেই যে ইহা সত্য, তা নয়; ভারতের অন্যান্য দেশে এবং অন্যান্য ধর্ম্মগুলিতে এমন নর-নারীর অভাব নাই, যাদের মধ্যে ইত্যাকার নিম্নস্তরের উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত। পার্শী, ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম্মে দেব-দেবীর স্থান না থাকলেও সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে যারা রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির সাধক বা উপাসক, তাঁরাও তাঁদের স্বীয় স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ ভোগ্য বিষয়-বস্তুর প্রাপ্তির জন্য তাঁদের ইষ্ট দেবতার নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রার্থনা করে

থাকেন। তা ছাড়া কোন কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারের সূত্রে অনেক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়—পীড়ন, লুণ্ঠন, হীন ষড়যন্ত্র ও প্রলোভন প্রদর্শন। তবে তাঁদের ধর্ম্মের সাত্ত্বিক উপাসকদের সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য আদৌ প্রযোজ্য নয়। বস্তুতঃ, জগতে এমন কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় নাই, যার মধ্যে উক্ত তিন প্রকারের উপাসক ও উপাসন-পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয় না।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬

অন্বয়—দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ অচেতসঃ জনাঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামম্ অন্তঃশরীরস্থং মাং চ কর্শয়ন্তঃ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপঃ তপ্যন্তে, তান্ অসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি॥ ৫-৬

অনুবাদ—দম্ভ, অহঙ্কার, কামনা ও আসক্তিযুক্ত ও বলদর্পিত হয়ে যে সকল অবিবেকী ব্যক্তি দেহস্থ ভূতগণকে, এবং শরীরস্থ আমাকে কষ্ট দিয়ে শাস্ত্রবিরোধী উগ্র তপঃ করে, তা'দিগকে আসুরী বুদ্ধিসম্পন্ন ব'লে জানবে॥ ৫।৬

আসুরী প্রকৃতির লোকের তপস্যার স্বরূপ

আসুরী প্রকৃতির লোকদের তপস্যাও আসুরী ধরণের। অজ্ঞানতা ও অবিবেকবশতঃ তারা শাস্ত্রবিধির পরোয়া করে না। তারা কেহ কেহ নিজেদের দম্ভাভিমান নিয়ে আপনাপন মতলব সিদ্ধির জন্য ঘোর কৃচ্ছ্র তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হয়। কখনও তাদিগকে হেঁটমুণ্ড, ঊর্দ্ধ্বপদ হয়ে, কখনও এক পায়ে খাড়া হয়ে, কখনও ঊর্দ্ধ্ববাহু হয়ে, আবার কখনও সুদীর্ঘকাল উপবাসপরায়ণ হয়ে উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এদের এই উদ্ভট তপশ্চর্য্যার লক্ষ্য কিন্তু উন্নত বা মহৎ নয়। প্রায়শঃ, কোন জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি বা অপরের সর্ব্বনাশ-সাধনের উদ্দেশ্যে এরা এরূপ তপস্যা করে থাকে। উন্নত আদর্শ ও লক্ষ্যবিহীন ইত্যাকার তপস্যা যে কদাপি শুভ ও হিতপ্রদ

হবার নয়—শ্রীভগবান্ তারই ইঙ্গিত দিয়ে বলছেন, এই সমস্ত অবিবেকী তপস্বিগণ এইরূপ ঘোর তপশ্চর্য্যার দ্বারা যে কেবলমাত্র নিজেদের দেহ-মনকে ক্লিষ্ট করে, তাই নয়, তাদের দেহে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত আমাকেও তারা কষ্ট দিয়ে থাকে।

বস্তুতঃ, সত্যকার তপস্যার লক্ষ্য হচ্ছে—আত্মজ্ঞান বা ভগবদুপলব্ধি এবং সেই তপস্যার রীতি-পদ্ধতি ও আদর্শ—শাস্ত্র ও সদ্গুরুর নির্দ্দেশ মত সম্পন্ন হয়। এরূপ তপস্যায় আত্যন্তিক উগ্রতার বা ঐকান্তিক শিথিলতার স্থান থাকে না। সাধকের সংস্কার ও অধিকার অনুযায়ী এই সাধনার প্রকৃতি ও ক্রম নির্দ্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ, যাঁরা উচ্চ সংস্কারসম্পন্ন, যাঁদের মন স্বভাবতঃই অনেকটা সাত্ত্বিক, তাঁদের সাধনা হয় অপেক্ষাকৃত সরল ও শাস্ত্রসম্মত।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু।। ৭

অন্বয়—সর্ব্বস্য আহারঃ তু অপি ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি ; তথা যজ্ঞ তপঃ দানং চ [ত্রিবিধ], তেষাম্ ইমং ভেদং শৃণু।। ৭

অনুবাদ—সকলের প্রিয় আহার্য্যও তিন প্রকার হয়ে থাকে, সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা, দানও ত্রিবিধ। উহাদের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ তা শ্রবণ কর।। ৭

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।। ৮

অন্বয়—আয়ুঃ সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ, রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ, হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ।। ৮

অনুবাদ—যাহা আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, রুচি ও প্রসন্নতাবর্দ্ধনকারী, সরস, স্নেহযুক্ত, সারবান ও প্রীতিকর, এরূপ আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়।। ৮

সাত্ত্বিক আহার

রুচিভেদে আহার্য্যভেদ স্বাভাবিক। সকল লোকের সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য তৃপ্তিপ্রদ হয় না। এই রুচিভেদের জন্য জন্মগত স্বভাবসংস্কার ও স্থানীয় জলবায়ুও কতকাংশে দায়ী। আমিষাহারী পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা বাল্যকাল হতে মৎস্য, মাংস, ডিম্বাদি খেতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাদের সেই আহার্য্যে প্রীতি জন্মে। তা ছাড়া, সমুদ্রতীরবর্ত্তী ও জলাভূমির অধিবাসীদেরও সাধারণতঃ আমিষাহারী হতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ তথাকার প্রাকৃতিক আবহাওয়ার জন্য ঐরূপ প্রোটিনযুক্ত আহার্য্যই ঐসব অঞ্চলের লোকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক উপযোগী। এজন্যই দেখা যায়, তথাকার ব্রাহ্মণ ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির ভক্তগণও আমিষ আহারে অভ্যস্ত। কালভেদেও আহার্য্যভেদ হয়ে থাকে। বৈদিক আর্য্যগণও আমিষাহারী ছিলেন, যদিও ইঁহারা ছিলেন বহুলাংশে সাত্ত্বিক প্রকৃতির।

এখানে দ্রষ্টব্য যে গীতা আহার্য্য বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আমিষ-নিরামিষের প্রশ্নটি উত্থাপন করেন নি। গীতার মতে যে আহার্য্য আয়ুঃ, আরোগ্য, সুখ, প্রীতি, রুচি ও প্রসন্নতাদি গুণের পরিপোষক তা-ই সাত্ত্বিক।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।। ৯

অন্বয়—কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ, দুঃখশোকাময়প্রদাঃ আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ।। ৯

অনুবাদ—অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিদাহী এবং দুঃখ, শোক ও রোগোৎপাদক আহার রাজসিক প্রকৃতির লোকদের প্রিয়।। ৯

রাজসিক আহার

ঘোর রাজসিক প্রকৃতির লোকদের আহার্য্য সর্ব্ব বিষয়ে উগ্রতাবর্দ্ধক। এই প্রকৃতির লোকেরা স্বভাবতঃ উত্তেজনাপ্রিয় হওয়ায় তারা এমন আহার্য্য পছন্দ করে যা তাদের সেই উত্তেজনাবৃদ্ধির পরিপোষক। আমিষ হোক আর

নিরামিষ হোক, তারা তাদের আহার্য্য বস্তু এমন ভাবে প্রস্তুত করে—যা অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রদ। বলা বাহুল্য, এরা এই সমস্ত উত্তেজক আহার্য্য গ্রহণ করে বলে এরা দুঃখ, শোক ও আধি-ব্যাধিতে অধিকতর আক্রান্ত ও অভিভূত হয়।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতংচ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০

অন্বয়—যাতযামং গতরসং চ, পূতি পর্য্যুষিতুম্ উচ্ছিষ্টং অপিচ অমেধ্যং যৎ ভোজনং [তৎ] তামসপ্রিয়ম্॥ ১০

অনুবাদ—যে আহার্য্য বস্তু বহু পূর্ব্বে পক্ক, যার রস শুষ্ক, যা দুর্গন্ধ, বাসি, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র—তা তামস ব্যক্তিদের প্রিয়॥ ১০

তামসিক আহার

তামসিক প্রকৃতির লোকদের সংস্কার ও রুচি এমন অপবিত্র ও বিকৃত যে তারা বাসি, পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য আহার করতে ভালবাসে। সদ্যঃপক্ব জিনিস পচিয়ে, দুর্গন্ধযুক্ত করে খেতেও তারা অধিক রুচি অনুভব করে। তাই দেখা যায়—ভাত, গুড় ও আঙ্গুরাদি স্বাদিষ্ট বস্তুগুলি পচিয়ে তারা তাড়ি বা মদ প্রস্তুত করে এবং তাই পান করতে তাদের পরম আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি। ব্রহ্মদেশের কিছু অধিবাসিগণের নিকট 'নাপ্পি' হচ্ছে একটি প্রিয় খাদ্য। এই অদ্ভুত খাদ্য বস্তুটি প্রস্তুত করার জন্য তারা মাছ, মাংস মৃৎপাত্রের মধ্যে মাটির নীচে কিছুকাল পচিয়ে রাখে এবং তারপর তাতে যখন অসংখ্য পোকা উৎপন্ন হয় তখন তা-ই তারা পরমানন্দে আহার করে। অথচ, ঘৃতের গন্ধ এদের একান্ত অসহ্য। বিভিন্ন দেশের প্রচলিত আহার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই অনুমান করা যায়, সভ্যতা-সংস্কৃতির গর্ব্বকারী মানুষের রুচি-প্রকৃতি কী রূপ অদ্ভুত ও বিচিত্র! তবে এ কথা সত্য, সর্ব্বদেশেই অল্প বিস্তর সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহার্য্যের পক্ষপাতী নর-নারী বিদ্যমান।

আহারশুদ্ধি

হিন্দুধর্ম্মে বলা হয়েছে—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ"। অর্থাৎ, আহার

শুদ্ধ হ'লে মানুষের প্রকৃতিও শুদ্ধ হয়। কেন না, আহারের দ্বারা কেবল যে মানুষের স্থূল শরীর গঠিত হয়, তা-ই নয়, ইহা দ্বারা গঠিত হয় তার সূক্ষ্ম শরীর বা মনোবুদ্ধি। আর এই মনই হচ্ছে মানুষের সুখ, দুঃখ, বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। তাই দেহ-মনকে শুদ্ধ, সুস্থ ও পবিত্র রাখতে হলে আহার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের দুই জন বিশিষ্ট ধর্ম্মাচার্য্যের মত বা অভিপ্রায় এখানে উল্লেখযোগ্য।

আহার্য্য-বিষয়ে আচার্য্য রামানুজ বলেছেন—আহার্য্যের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন—জাতি, আশ্রয় ও নিমিত্ত। এর কারণ, তাঁর মতে উক্ত তিনটি কারণে আহার্য্য দোষ-গুণযুক্ত হয়। 'জাতিদোষ' বলতে আহার্য্য বস্তুর প্রকৃতিগত গুণাগুণ বোঝায়—যেমন মদ্য, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি। এই জাতীয় আহার্য্য গ্রহণ করলে মানুষের দেহ-মন হয় রাজসিক ও তামসিক ভাবাপন্ন। 'আশ্রয়দোষ' বলতে বোঝায় যে ব্যক্তি আহার্য্যবস্তু রান্না ও পরিবেশন করে তার গুণাগুণ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তির আশ্রয়ে আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত ও পরিবেশিত হয়, সে যদি চরিত্রহীন, অসৎপ্রকৃতি ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তবে তার সে দোষ-দুর্ব্বলতা খাদ্যে সংক্রামিত হয়। 'নিমিত্তদোষ' বলতে বোঝায়—যে স্থানে বসে এবং যে পাত্রে আহার্য বস্তু গ্রহণ করা হয় তার অশুদ্ধি বা অপবিত্রতা। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থায় আহার্য্যে ধূলাবালি বা অন্যান্য মলিন বস্তুর সমাবেশ ঘটার একান্ত সম্ভাবনা। রামানুজ বলেন, যাঁরা শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক জীবনের পক্ষপাতী তাঁরা আহার্য বিষয়ে উক্ত তিন প্রকার দোষ এড়িয়ে চলবেন।

আচার্য্য শঙ্করের আহারশুদ্ধির বিধান আরও ব্যাপক। তাঁর মতে 'আহার' শব্দের অর্থ আহরণ বা সংগ্রহ। অর্থাৎ, মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা কিছু আহরণ করা হচ্ছে—তা-ই আহার এজন্য তিনি নির্দ্দেশ দিয়েছেন, মানুষ যদি শুদ্ধ সাত্ত্বিক বস্তু আহার করেও মনে মনে কুচিন্তা করে, চক্ষুর্দ্বয় দ্বারা কুদৃশ্য দর্শন করে, কর্ণযুগল দ্বারা অশ্লীল সঙ্গীতাদি শ্রবণ করে, ত্বক্ দ্বারা অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করে, চরণযুগল দ্বারা অস্থানে কুস্থানে গমন করে, হস্তদ্বয় দ্বারা কুবস্তু গ্রহণ করে এবং অসৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, অসৎ সঙ্গে মেলামেশা

করে, তবে কেবল আহারশুদ্ধির কোন ফল হয় না। সুতরাং, আহারশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন—মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করা। বস্তুতঃ, শঙ্করের মতে আহারশুদ্ধির অর্থ শুধু খাদ্য বস্তুর শুদ্ধি-বিচার নয়, এজন্য প্রয়োজন—মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ও সুপথগামী করা।

আহারের বিষয়ে সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দ যা বলেছেন, তাও এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তিনি স্বীয় সাধক শিষ্যগণকে এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন—সংযমই সাধকের প্রকৃত আহার। অসংযত ভাবে শুধু রসনা-তৃপ্তির জন্য যারা আহার করে অথবা যারা খাদ্যের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি না রাখে এবং অক্ষুধায় খায়, তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য কদাপি ঠিক থাকে না। সংযত ব্যক্তি সামান্য ডাল-ভাত খেয়েই অটুট স্বাস্থ্য রক্ষা করে থাকে। পক্ষান্তরে, নানাবিধ তৃপ্তিকর আহার্য্য গ্রহণ করেও যারা সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে উদাসীন, তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হতে বাধ্য।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১

অন্বয়—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায় বিধিদিষ্টঃ যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে সঃ সাত্ত্বিকঃ॥ ১১

অনুবাদ—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে অবশ্য-কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে শাস্ত্রবিধিঅনুসারে শান্তচিত্তে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ॥ ১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২

অন্বয়—ফলং অভিসন্ধায় তু অপিচ, দম্ভার্থম্ এব যৎ ইজ্যতে, ভরতশ্রেষ্ঠ, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি॥ ১২

অনুবাদ—কিন্তু ফললাভের উদ্দেশ্যে এবং দম্ভার্থে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাকে রাজস যজ্ঞ ব'লে জানবে॥ ১২

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

অন্বয়—বিধিহীনম্ অসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণং শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

অনুবাদ—শাস্ত্রবিধিশূন্য, অন্নদানহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলে॥ ১৩

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যজ্ঞের স্বরূপ

সাত্ত্বিক যজ্ঞে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না, এই যজ্ঞ শুধু কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ও ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া, এই যজ্ঞ শাস্ত্রের বিধিবিধানসম্মত নিখুঁত ভাবে ও নিষ্ঠাসহকারে অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ, শুদ্ধাচারসম্মত ভাবে ও কেবলমাত্র ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞই —সাত্ত্বিক যজ্ঞ। মোক্ষার্থী সাধকগণই শুধু এরূপ ভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকেন।

রাজসিক প্রকৃতির লোকেরা যজ্ঞ করেন—নিজেদের দম্ভাভিমান ও ভোগবাসনা চরিতার্থ করার জন্য। ইঁহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের মধ্যে কোনও উন্নত সঙ্কল্প বা বিচার-বিবেচনা থাকে না। ভোগ্য বস্তুর প্রাপ্তি এবং যশঃ-মান প্রতিষ্ঠার কামনা নিয়েই এঁরা যজ্ঞের আয়োজন করেন।

পক্ষান্তরে, তামসিক প্রকৃতির লোকেরা যে যজ্ঞ করে তার মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান, মন্ত্র, দান-দক্ষিণা ও শ্রদ্ধাবুদ্ধির স্থান আদৌ থাকে না। নিজেদের অজ্ঞতা, অশ্রদ্ধা ও অনুদারতা নিয়ে এরা কোনক্রমে যাগ-যজ্ঞ-পূজাদি সম্পন্ন করে। এরূপ যজ্ঞ-পূজা সুফলপ্রসূ তো হয়ই না, বরং তার দ্বারা যজ্ঞকারীর অকল্যাণই সাধিত হয়।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪

অন্বয়—দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞপূজনং, শৌচম্, আর্জ্জবং, ব্রহ্মচর্য্যম্, অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে॥ ১৪

অনুবাদ—দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা প্রভৃতিকে শারীরিক তপস্যা বলে॥ ১৪

শারীরিক তপস্যা

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোকদের যজ্ঞ ও পূজার্চ্চনা কী রূপ—তা পূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে। এক্ষণে ত্রিবিধ তপস্যায় বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে।

কৃচ্ছ্র তপশ্চর্য্যার দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করা প্রকৃত তপস্যা নয়। তবে কি শরীরের সহিত তপস্যার কোনও সম্বন্ধ নাই? এই বিষয়টি পরিষ্কৃত করার জন্য এখানে বলা হচ্ছে—সেবা-পরিচর্য্যার দ্বারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণকে প্রসন্ন করা, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের নীতি-নিয়ম পালন করা, কায়মনোবাক্যে কোনও প্রাণীকে দুঃখ না দেওয়া, সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে সরলতার ভাব পোষণ করা—গীতার মতে ইহাই শারীরিক তপস্যা। এই তপস্যার দ্বারা শরীর শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে ভগবৎ প্রাপ্তির সহায়ক হয়।

অনুদ্‌বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫

অন্বয়—অনুদ্‌বেগকরং সত্যং প্রিয়হিতং চ যদ্ বাক্যং স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব বাঙ্‌ময়ং তপঃ উচ্যতে॥ ১৫

অনুবাদ—অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর যে বাক্য এবং নিয়মিত শাস্ত্র-চর্চ্চা—ইহাই বাচিক তপস্যা॥ ১৫

বাচিক তপস্যা

সত্যকার সাধক কথাবার্ত্তায় বিশেষ সাবধান সতর্ক। অর্থাৎ, বিনা প্রয়োজনে তিনি কথা বলেন না। শত প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি সত্যবাদী হন। তাঁর বাক্যে তিক্ততার দোষ থাকে না। পক্ষান্তরে, তাঁর কথায় অন্যের উপকার হয় এবিষয়ে আচার্য্য প্রণবানন্দ বলতেন—"কথা হচ্ছে মন্ত্র। যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত হলে প্রত্যেকটি বাক্য মন্ত্রের মত কাজ করে। বাকশক্তির অপব্যবহারে এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়।" একটি মাত্র কথাতে বহু লোকের জীবনব্যাপী বন্ধুত্ব ঘোর শত্রুতায় পরিণত হতে

পারে, অথবা অসংযত মুহূর্ত্তে উচ্চারিত একটি মাত্র পুরুষ বাক্যে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে—ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আজও বিরল নয়।

প্রশ্ন আসে, সত্য কথা বলা সমীচীন। একথাও না হয় স্বীকার করা গেল। পরন্তু, যেখানে সত্য কথা বললে লোকের প্রাণে ব্যথার সঞ্চার হয় সেখানে কি করা কর্ত্তব্য? সেখানে কি সত্য গোপন করে লোকপ্রিয়তা বজায় রাখা উচিত? উত্তরে বলা যায়—সত্যকথা যথাসম্ভব মধুরভাবে প্রকাশ করা উচিত। তবে লোকপ্রিয়তা নষ্ট হবার ভয়ে সত্যকে গোপন করা বা বিরুদ্ধপক্ষের খোসামুদি করা—একান্তই অন্যায় ও অযৌক্তিক। সত্যবাদী কদাপি স্পষ্টবাদী হতে ভীত হন না, তবে তিনি অবশ্যই লক্ষ্য রাখেন—স্পষ্টবাদিতার নামে তিনি যেন অন্যের হৃদয়ে অনর্থক মনঃপীড়া সৃষ্টি না করেন। কাজটি কঠিন বটে, তবে অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ প্রত্যেক সাধকের পক্ষে এরূপ বাক্-সাধনা অপরিহার্য্য।

সাধারণতঃ বলা হয়—যা শোনা ও ভাবা যায়—তা ঠিক ঠিক প্রকাশ করাই সত্য! পরন্তু, এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে আরো বলা হয়েছে "প্রিয়হিতঞ্চ যৎ" অর্থাৎ যা প্রিয় ও লোকহিতকর, তা-ই সত্য। সত্যাসত্য নির্ণয়ের এর চেয়ে বড় মাপকাঠি আর কিছু হতে পারে কি?

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬

অন্বয়—মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং, মৌনম্, আত্মবিনিগ্রহঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ ইতি এতৎ মানসং তপঃ উচ্যতে॥ ১৬

অনুবাদ—মনের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, বাক্‌সংযম, আত্মসংযম বা মনঃসংযম, ব্যবহারশুদ্ধি—ইহাই মানসিক তপঃ॥ ১৬

মানসিক তপস্যা

নিরন্তর মনের প্রসন্নতা ও সৌম্যভাব রক্ষা করা মানসিক তপস্যার একটি বিশেষ অঙ্গ। এই কাজটি কিন্তু ততটা সহজসাধ্য নয়। পূর্ব্ব জন্মের

সুকৃতির ফলে কোনও কোনও মানুষের প্রকৃতি হয় স্বভাবতঃই ধীর, স্থির ও শান্ত। বিশেষ কারণ ব্যতীত এঁদের মন অশান্ত ও চঞ্চল হয় না। বলা বাহুল্য, এরূপ লোকের পক্ষে মানসিক স্থৈর্য্য ও সৌম্যভাব রক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। পরন্তু, অন্যের পক্ষে এই কার্য্যটি বেশ ক্লেশসাধ্য। এইজন্য প্রয়োজন—ভাবশুদ্ধি ও ব্যবহারশুদ্ধি। অর্থাৎ, দৃঢ়চিত্ত সাধক যখন তাঁর হৃদয়-মনে উত্থিত প্রত্যেকটি চিন্তা বা ভাব এবং কার্য্যক্ষেত্রে নিজের প্রত্যেকটি আচরণ ও ব্যবহারের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে, নিরন্তর তা'দিগকে শুদ্ধ ও সংযত রাখবার চেষ্টা করেন, তখন তাঁর সেই অভ্যাসের ফলেই মনের চাঞ্চল্য ও প্রতিকূল ভাব দূরীভূত হয়ে তা ক্রমশঃ শান্ত, শুদ্ধ ও অন্তর্মুখী হয়ে উঠে। বলা বাহুল্য, এই সাধনা একদিনে সিদ্ধ হয় না; এজন্য আবশ্যক—দীর্ঘকালীন সতর্ক দৃষ্টি ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা। আর এই প্রকার আন্তরিক প্রচেষ্টাই হচ্ছে সত্যকার মানসিক তপঃ।

উপরে শারীরিক, বাচিক ও মানসিক—এই তিন প্রকার তপঃ কী রূপ তা বর্ণিত হয়েছে। এখন উক্ত তিন প্রকার তপস্যা সাত্ত্বিকাদি ভেদে কী রূপ, তাই নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃসাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭

অন্বয়—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং তৎ ত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭

অনুবাদ—পূর্বোক্ত তপস্যা যদি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে॥ ১৭

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮

অন্বয়—সৎকারমানপূজার্থং দম্ভেন চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে ইহ চলম্, অধ্রুবং তৎ তপঃ রাজসং প্রোক্তম্॥ ১৮

অনুবাদ—সৎকার, মান ও পূজালাভের জন্য দম্ভ সহকারে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, ইহলোকে অনিত্য, অনিশ্চিত সেই তপস্যাকে রাজস তপস্যা বলা হয়॥ ১৮

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯

অন্বয়—মূঢ়গ্রাহেণ আত্মনঃ পীড়য়া পরস্য উৎসাদনার্থং বা যৎ তপঃ ক্রিয়তে, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্॥ ১৯

অনুবাদ—মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধিবশে নিজেকে কষ্ট দিয়ে অথবা পরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় তাকে তামস তপস্যা বলে॥ ১৯

সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ তপস্যার ফলাফল

সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারণা—তপস্যামাত্রই শুভফলপ্রদ। তাদের এই ধারণা যে ভ্রান্ত তা শ্রীভগবানের উপরোক্ত উক্তি হতে ভাল মত বোঝা যায়। সাত্ত্বিক তপস্যার লক্ষ্য হয়—ভগবৎপ্রাপ্তি বা আত্মজ্ঞান। এই তপস্যার মধ্যে তাই কোনও সাংসারিক বিষয়বস্তুর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে না। রাজসিক তপস্যার উদ্দেশ্য অনেকখানি ভোগমূলক। দম্ভাভিমান সহকারে মানুষ যখন নাম, যশঃ, সম্মান লাভের আশায় তপস্যা করে, তখন তার ফল কখনও স্থায়ী ও হিতকর হয় না। অধিকাংশ বিষয়ী লোক এরূপ রাজসিক ভাব নিয়ে পূজা-যজ্ঞাদি করে থাকে। রাবণ, হিরণ্যকশিপুর তপস্যা ছিল এই ধরণের। তা ছাড়া, আর একদল মানুষ আছে যারা মোহবুদ্ধিবশতঃ মারণ, উচাটন, বশীকরণ, অভিচারাদি জঘন্য অনুষ্ঠানের দ্বারা একদিকে যেমন নিজেদের আত্মিক অকল্যাণ সাধন করে, তেমনি তাদের আচরিত এই তপস্যার দ্বারা অপরের সর্ব্বনাশও সাধিত হয়। এরূপ তপস্যা যে অত্যন্ত হীন ও অহিতকর তাতে সন্দেহ নাই।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০

অন্বয়—দাতব্যম্ ইতি অনুপকারিণে দেশে কালে চ পাত্রে চ যৎ দানং দীয়তে তৎ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০

অনুবাদ—দান করা কর্ত্তব্য—এই বুদ্ধিতে ও প্রত্যুপকারের আশা না রেখে উপযুক্ত দেশ, কাল এবং পাত্র বিবেচনা করে যে দান করা হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলে॥ ২০

সাত্ত্বিক দান

মানুষ চিত্তশুদ্ধির জন্য যত প্রকার ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তার মধ্যে দানের স্থান অন্যতম। মনু বলেন—'দানমেকং কলৌ যুগে'—কলিকালে দানই একমাত্র ধর্ম্ম। কিন্তু, এই 'দান' সকলে একই প্রকার মনোভাব নিয়ে করে না। আর এজন্য তার ফলাফলও এক প্রকার হয় না। গীতার মতে সাত্ত্বিক দানে স্বর্গাদি প্রাপ্তির কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না, অথবা প্রত্যুপকারের আশাও লক্ষিত হয় না এই দানের মধ্যে—কারণ যেখানে প্রত্যুপকার লাভের মনোভাব থাকে, সেখানে দান হয়—দোকানদারী বা আদান-প্রদানের ব্যাপার। তা ছাড়া, সাত্ত্বিক দানে দেশ, কাল ও পাত্রের যোগ্যতার বিবেচনা করা হয়।

এক শ্রেণীর লোক মনে করেন—কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে গ্রহণ, সংক্রান্তি আদি পুণ্য তিথি উপলক্ষে পাণ্ডা, ব্রাহ্মণ ও সাধুসন্তগণের ন্যায় যোগ্য পাত্রে দান করাই সাত্ত্বিক দান। পক্ষান্তরে, আজকার বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা দানের ব্যাপারে এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থের সমর্থন দেন না। তাঁদের মতে দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি সঙ্কটকালে দীন, দুঃখী, আর্ত্ত নরনারীদের ক্লেশ নিবারণে দান করাই সত্যকার সাত্ত্বিক দান। পক্ষান্তরে, আজকাল একদল ধনী ব্যবসায়ী অসাধু উপায়ে অর্থ সংগ্রহ ক'রে ব্রাহ্মণভোজন ও দরিদ্রভোজন করিয়ে বা তীর্থস্থানে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ ক'রে তাঁদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে থাকেন। বলা বাহুল্য, শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এরূপ দানকে সাত্ত্বিক দান বলা যায় না।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১

অন্বয়—পুনঃ যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং বা ফলং উদ্দিশ্য পরিক্লিষ্টং দীয়তে তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১

অনুবাদ—প্রত্যুপকারের আশায় অথবা ফল কামনায় অতি কষ্টের সহিত যে দান করা হয় তাকে রাজস দান বলে॥ ২১

গীতামৃত—গীতার মতে রাজস দান তাকেই বলা হয়—যে দানের পশ্চাতে থাকে প্রত্যুপকার লাভ ও স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং যে দানের ব্যাপারে দাতা মানসিক ক্লেশ অনুভব করে। এরূপ দান কদাপি চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় না।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

অন্বয়—অদেশকালে অপাত্রেভ্যঃ চ যৎ দানং দীয়তে, অসৎকৃতম্ অবজ্ঞাতং [যদ্দানং দীয়তে] তৎ তামসম্ উদাহৃতম্॥ ২২

অনুবাদ—অনুপযুক্ত দেশ ও কালে, অপাত্রে এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে যে দান করা হয়, তাকে তামস দান বলে॥ ২২

তামসিক দান

এই দয়া-ধর্ম্ম ও দান-দাক্ষিণ্যের দেশে দয়া ও দানের নামে চলছে—অধুনা এক প্রকার অনাচার ও কদাচার। আজকাল দেখা যায়—এক শ্রেণীর দাতা, যারা দেশ, কাল ও পাত্রাপাত্রের বিচার না করে তেলা মাথায় তেল দেওয়ার ন্যায় যেখানে সেখানে যাকে তাকে দান ক'রে নিজেদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রবৃত্ত হয়। তাদের সেই বিচারহীন দানের ফলে দেশে একদল চির ভিক্ষুকের সৃষ্টি হয়ে সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করছে। তা ছাড়া, আজকাল আর এক শ্রেণীর দাতা দেখা যায়, যারা মানুষের চেয়ে ইতর জীব—পশু, পক্ষী, পিপীলিকাদের সেবা করে পুণ্যার্জ্জনে আগ্রহশীল। এরা এই ব্যাপারে যুক্তি দেখিয়ে বলে যে, মানুষ তো নিজের শক্তি-সামর্থ্য-বলে কিছু উপার্জ্জন ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে, পরন্তু অসহায় পশু, পক্ষী, কুকুর, বিড়াল, পিপীলিকাদের সেই শক্তি নাই। সুতরাং, এদের সেবা করাই

অধিকতর পুণ্যের ব্যাপার। আবার অন্য একদল আছে যারা একান্ত বিরক্তিসহকারে অথবা নিতান্ত ঘৃণা ও অবহেলার ভাব নিয়ে ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষুককে দু'পয়সা দিয়ে দায় উদ্ধার করে থাকে। এই সমস্ত দানের দ্বারা যে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের অকল্যাণ হয় তা বলাই বাহুল্য। গীতার মতে এরূপ দান তামস দান বলে অভিহিত।

এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে বর্ত্তমান ভারতে ধর্ম্মপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার, সমাজসেবা প্রভৃতি এমন অনেক অত্যাবশ্যক কাজ রয়েছে যেগুলি অর্থাভাবে যথেষ্ট প্রসার লাভের সুযোগ পাচ্ছে না। আজ দেশের ধনী ব্যক্তিগণের সে দিকে আদৌ দৃষ্টি কই?

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩

অন্বয়—ওঁ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধঃ ব্রহ্মণঃ নির্দ্দেশঃ স্মৃতঃ ; তেন ব্রাহ্মণাঃ চ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ পুরা বিহিতাঃ॥ ২৩

অনুবাদ—শাস্ত্রে ওঁ তৎ সৎ—পরব্রহ্মের এই তিন প্রকার নাম নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। এর নির্দ্দেশক্রমে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হয়েছে॥ ২৩

গীতামৃত—ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি শব্দই ব্রহ্মবাচক এবং ইহা হতেই সৃষ্ট হয়েছে—ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪

অন্বয়—তস্মাৎ ওম্ ইতি উদাহৃত্য ব্রহ্মবাদিনাং বিধানোক্তাঃ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ সততং প্রবর্ত্তন্তে॥ ২৪

অনুবাদ—এই কারণে ব্রহ্মবাদিগণের যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদির কর্ম্ম সর্ব্বদা 'ওঁ' উচ্চারণ করে অনুষ্ঠিত হয়॥ ২৪

গীতামৃত—প্রাচীনতম কাল হতে শাস্ত্রীয় বিধান হচ্ছে যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি যাবতীয় শুভ কর্ম্ম পরমাত্মার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রতীক এই পবিত্র 'ওঁ'

শব্দের উচ্চারণের দ্বারা আরম্ভ করা উচিত। পরবর্ত্তী তান্ত্রিক যুগেও মাতৃভক্ত সাধক প্রার্থনা করেছেন :—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনম্॥"

প্রাতঃকাল হতে সায়ংকাল, সায়ংকাল হতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি যা কিছু করি, হে জগদম্বে, তা তোমারই পূজা।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫

অন্বয়—তৎ ইতি মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলম্ অনভিসন্ধায় বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ ক্রিয়ন্তে॥ ২৫

অনুবাদ—মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ 'তৎ' এই শব্দটি উচ্চারণ দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করে তাঁদের যজ্ঞ, তপস্যা, দানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন॥ ২৫

গীতামৃত—ওঁ শব্দের ন্যায় 'তৎ' শব্দটিও ব্রহ্মবাচক। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ-দানাদি শুভকর্ম্মগুলি যেমন 'ওঁ' শব্দটির উচ্চারণের দ্বারা সম্পন্ন করে থাকেন, তেমনি মোক্ষার্থী অন্য সাধকগণ 'তৎ' শব্দটির উচ্চারণের দ্বারা তাঁদের যজ্ঞ, তপস্যা, দান প্রভৃতি কর্ম্মগুলি নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করেন।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬

অন্বয়—পার্থ, সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সৎ ইতি এতৎ প্রযুজ্যতে, তথা প্রশস্তে কর্ম্মণি সৎ শব্দঃ যুজ্যতে॥ ২৬

অনুবাদ—হে পার্থ! কোনও বস্তুর অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝবার জন্য 'সৎ' শব্দটি প্রযুক্ত হয় এবং যাবতীয় মঙ্গল কর্ম্মে ও ব্যবহৃত হয় 'সৎ' শব্দটি॥ ২৬

গীতামৃত—'ওঁ' ও 'তৎ' শব্দের ন্যায় 'সৎ' শব্দটিও ব্রহ্মবাচক। সুতরাং, বিবাহাদি যাবতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'সৎ'

শব্দটির দুই অর্থ—যাহা চিরকাল বিদ্যমান আছে এবং যাহা শুভ। বলা বাহুল্য, ভগবানও চিরদিন বিদ্যমান আছেন এবং তিনিই মঙ্গলস্বরূপ।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭

অন্বয়—যজ্ঞে, তপসি দান চ ইতি চ স্থিতিঃ সৎ উচ্যতে, তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ সৎ ইতি এব অভিধীয়তে॥ ২৭

অনুবাদ—যজ্ঞ, তপস্যা ও দানরূপ পবিত্র কার্য্যে যে অবস্থিতি তা-ই সৎ নামে অভিহিত। ঐ সকলের উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম্ম 'সৎ' নামে অভিহিত হয়॥ ২৭

গীতামৃত—যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি যাবতীয় শুভ কর্ম্মকে 'সৎ' বলা হয়।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ২৮

অন্বয়—হে পার্থ, অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং, তপ্তং তপঃ, যৎ চ কৃতম্ অসৎ ইতি উচ্যতে। তৎ ন ইহ নো প্রেত্য॥ ২৮

অনুবাদ—হে পার্থ! হোম, দান, তপস্যা বা অন্য যা কিছু অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় তাদিগকে 'অসৎ' বলে অভিহিত করা হয় এবং এই সকল কর্ম্ম ইহলোক ও পরলোকে ফলদায়ক হয় না॥ ২৮

গীতামৃত—অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্ম—তা যোগ, যাগ, তপস্যা, দান বা অন্য যা কিছু হোক না কেন, কদাপি শুভফলপ্রদ হয় না এবং শুধু ইহকালে নয়, পরকালেও তা মানুষকে দুঃখ দান করে। এরূপ অবস্থায় তা অসৎ বলে আখ্যাত হয়।

যজ্ঞ-দান-তপস্যাদি শুদ্ধভাবে করার উপায়

গুণভেদে পূজার্চ্চনা, যাগ-যজ্ঞ, ব্রতোপবাস ও দানাদি কর্ম্মগুলি যে বিবিধ, তার সূচনা দেওয়ার পরে সেগুলি কী ভাবে অনুষ্ঠিত হলে শুভফলপ্রদ

বা মোক্ষপ্রদ হতে পারে, তারই বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বললেন—'ওঁ' 'তৎ' 'সৎ'—এই তিনটি শব্দই ব্রহ্মবাচক। এগুলিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উচ্চারণ করাও চলে, আবার একসাথে প্রয়োগ করা যায়। উপরোক্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলির আরম্ভ কালে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ বা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী এগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বা একসঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন। অর্থাৎ, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে তথা ভগবৎপ্রীতিকে লক্ষ্যপথে রেখে ব্রতাদি যাবতীয় অনুষ্ঠান করা হিতপ্রদ। পক্ষান্তরে, অশ্রদ্ধভাবে যা কিছু করা হয় তা ইহলোক ও পরলোকে দুঃখপ্রদ।

প্রাচীনতম বৈদিক যুগ হতে ভারতীয় আর্য্য হিন্দুর জীবন ছিল প্রভুময়। মোক্ষ ও মুক্তিই ছিল—তাঁদের চিরন্তন জীবনলক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য তাঁরা তাঁদের জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম্ম 'যজ্ঞ'-বুদ্ধিতে সম্পন্ন করতেন। শয্যাত্যাগের সময় তাঁরা উচ্চারণ করতেন ভগবানের নাম এবং সারাদিনের প্রত্যেকটি কর্ম্ম তাঁরা আরম্ভ করতেন ভগবানের নাম উচ্চারণ করে এবং কর্ম্মশেষে তার ফলও তাঁরা ভগবৎচরণে অর্পণ করে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করতেন। উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে গীতাকার শ্রীভগবান্ আমাদিগকে সেই প্রাচীন পরম্পরার কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আর্য্য হিন্দু আজ আত্মবিস্মৃত। অধ্যাত্ম মুক্তির পরিবর্ত্তে আজ তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করেন ; আর তাঁদের অনুসৃত সেই রাজনীতি ও অর্থনীতি যে ভারতের প্রাচীন পরম্পরাগত আদর্শভিত্তিক নয়—তা সহজে অনুমেয়। তারই ফলে ভারতীয় জীবনে আজ চতুর্দ্দিকে এত ভেদ, বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলা।

ভারতীয় জীবন-ধারাকে যদি পুনরায় স্বকীয় ভাবাদর্শের পথে প্রবাহিত করতে হয়, তবে আজ আবার আর্য্য হিন্দুকে তার চিরন্তন ধর্ম্মীয় আদর্শের পথে প্রত্যাবৃত হতে হবে ;—"নান্যঃ পন্থাঃ।"

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ-যোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ—মোক্ষযোগঃ

অষ্টাদশ অধ্যায় গীতার অন্তিম অধ্যায়। গীতার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়গুলিতে মোক্ষপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথ ও উপায় সম্বন্ধে বহু স্থানে বহু সূচনা দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে সেই সূচনা ও নির্দ্দেশগুলি বর্ণিত হয়েছে আরও সুস্পষ্ট রূপে। তাই এই অধ্যায়টি 'মোক্ষযোগ' নামে অভিহিত।

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন।। ১

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ—মহাবাহো, হৃষীকেশ, কেশিনিসূদন, সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বেদিতুম্ ইচ্ছামি।। ১

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললে—হে মহাবাহো, হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিসূদন! সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব আমি পৃথক্ ভাবে জানতে ইচ্ছা করি।। ১

সন্ন্যাস বিষয়ে অর্জ্জুনের ধারণা এখনও অস্পষ্ট

কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের মনে যে সংশয় প্রথম থেকে বিদ্যমান ছিল, তা' এখনও দূরীভূত হয় নি। গীতার বহুস্থানে বিশেষতঃ পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝিয়েছেন—কর্ম্মসন্ন্যাসের অর্থ কর্ম্মত্যাগ নয়—কর্ম্মফল ত্যাগ। তিনি একথাও তাঁকে বলেছেন—কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মফল-ত্যাগই শ্রেয়ঃ। কিন্তু, তথাপি অর্জ্জুনের সংশয়ব্যাধির নিরসন হয় নি। তিনি হয়ত ভাবছেন,—সনাতন বৈদিক ধর্ম্মে যে চতুর্থাশ্রম রূপে সন্ন্যাসের বিধান আছে আমি তো এখন সেই বয়সে উপনীত। শ্রীকৃষ্ণ আমার সখা, তিনিও তো কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিরস্ত্র থাকবেন ব'লে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন। আমিও সেই ব্রত গ্রহণ করি না কেন? তাই তিনি এখানে পুনরায় প্রশ্ন করছেন—সন্ন্যাস এবং ত্যাগের রহস্য কি—তা আমাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বুঝিয়ে বল।

কর্ম্মবিতৃষ্ণ ব্যক্তিগণের যে মনোভাব অর্জ্জুনের এই উক্তির মধ্যে তা-ই প্রতিধ্বনিত হয় নি কি?

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।। ২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ—কবয়ঃ কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং বিদুঃ বিচক্ষণাঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুঃ।। ২

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বললেন—কাম্য কর্ম্মের ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস ব'লে জানেন এবং সকল কর্ম্মের ফলত্যাগকেই বিচক্ষণ বা সূক্ষ্মদর্শিগণ ত্যাগ ব'লে উল্লেখ করেন।। ২

গীতামৃত—যাঁরা তত্ত্ববিদ্ তাঁরা কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তিযুক্ত যে সকাম কর্ম্ম তার ত্যাগকে সন্ন্যাস ব'লে ধারণা করেন। পক্ষান্তরে, 'ত্যাগ' বলতে তাঁরা বোঝেন—সকাম এবং নিষ্কাম উভয় প্রকার কর্ম্মের ফলাসক্তির ত্যাগ।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।। ৩

অন্বয়—একে মনীষিণঃ কর্ম্ম দোষবৎ ইতি ত্যাজ্যং প্রাহুঃ ; অপরে চ যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি।। ৩

অনুবাদ—কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন, কর্ম্মমাত্রই সদোষ বা দোষযুক্ত ; অতএব তা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। অন্য কেহ কেহ বলেন যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কর্ম্ম ত্যাজ্য নয়।। ৩

কর্ম্মবাদ বিষয়ে বেদান্তী ও মীমাংসক পণ্ডিতগণের অভিমত

সাংখ্য বা উগ্রপন্থী বেদান্তবাদীদের মতে কোন কর্ম্মই দোষমুক্ত নয়। সুতরাং, কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব। এঁদের মধ্যে আবার কেহ কেহ বলেন—প্রাথমিক স্তরে নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত গুরুসেবা বা জপ-তপাদি কর্ম্ম

চিত্তশুদ্ধির সহায়ক, কিন্তু জ্ঞানলাভের পর তারও প্রয়োজন থাকে না। পক্ষান্তরে, মীমাংসক পণ্ডিতগণ যজ্ঞ, দান ও তপোমূলক কর্ম্মত্যাগের ঘোর বিরোধী। তাঁদের মতে একমাত্র এরূপ কর্ম্মই সাধককে পরম কল্যাণ দান করতে পারে।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।। ৪

অন্বয়—ভরতসত্তম, তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ং শৃণু ; পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগং হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।। ৪

অনুবাদ—হে ভরতসত্তম, ত্যাগ বিষয়ে আমার অন্তিম অভিপ্রায় শোন। হে পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগ ত্রিবিধ ব'লে বর্ণিত।। ৪

গীতামৃত—পূর্ব্বে অপরাপর পণ্ডিতগণের মতের সূচনা দিয়ে গীতাকার শ্রীভগবান্ এক্ষণে নিজের দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রে বলছেন—ত্যাগ হচ্ছে তিন প্রকার। এখানে লক্ষণীয় এই যে শ্রীভগবান্ এখানে স্বীয় সখাকে 'ভরতসত্তম' ও 'পুরুষব্যাঘ্র' ব'লে বিশেষিত করেছেন। বস্তুতঃ, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে—অর্জ্জুনের মনে আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মচেতনার সঞ্চার করা।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।। ৫

অন্বয়—যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং ; তৎ কার্য্যমেব, যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ মনীষিণাম্ এব পাবনানি।। ৫

অনুবাদ—যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম ত্যাজ্য নয়, উহা করাই কর্ত্তব্য। যজ্ঞ, দান, তপস্যা মনীষিগণের বিচারে চিত্তশুদ্ধিকর।। ৫

[তা কী রূপে আচরণ করতে হবে তার সূচনা দিয়ে শ্রীভগবান্ এক্ষণে বলছেন]

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।। ৬

অন্বয়—পার্থ, তু এতানি কর্ম্মাণি অপি সঙ্গং ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি ইতি মে নিশ্চিতম্ উত্তমং মতম্।। ৬

অনুবাদ—হে পার্থ, তবে এই সকল কর্ম্মও কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি ত্যাগ ক'রে করা কর্ত্তব্য, ইহাই আমার নিশ্চিত ও সর্ব্বোত্তম অভিমত।। ৬

শুভকর্ম্ম ও নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠেয়

মীমাংসক পণ্ডিতগণ যজ্ঞ, দান ও তপোমূলক কর্ম্মগুলিকে মঙ্গল বা স্বর্গফলপ্রদ ব'লে মনে করেন। তাই তাঁদের মতে স্বর্গলাভের কামনা দিয়েই এই কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠেয়। গীতাকার শ্রীভগবান্ কিন্তু এ বিষয়ে স্বীয় সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত ক'রে বলছেন—উক্ত কর্ম্মগুলিও কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তি ত্যাগ ক'রে করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেন না, কর্ম্ম যতই শুভ বা উৎকৃষ্ট হোক না কেন, তার অনুষ্ঠান বা আচরণকালে কর্ম্মীর মন যদি সম্পূর্ণ নিষ্কাম না হয়, তবে তা কখনও মোক্ষপ্রদ হতে পারে না। বস্তুতঃ, শ্রীমদ্ ভগবৎ গীতা যে মোক্ষশাস্ত্র এই শ্লোকের দ্বারা তা-ই সুস্পষ্ট হ'ল।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। ৭

অন্বয়—নিয়তস্য কর্ম্মণঃ তু সন্ন্যাসঃ ন উপপদ্যতে ; মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। ৭

অনুবাদ—স্বভাবের অনুকূল যে কর্ম্ম তাও ত্যাগ করা অনুচিত ; মোহবশতঃ তার ত্যাগকে তামস ত্যাগ বলা হয়।। ৭

তামস ত্যাগ

কেবলমাত্র যজ্ঞ, দান ও তপোমূলক কর্ম্মই নয়, প্রত্যেকের যা স্বভাবনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম, তার ত্যাগ করাও অনুচিত। কেন না, স্বধর্ম্ম-ত্যাগ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণের সামিল এবং তার ফলে কর্ম্মীর ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনের সাম্য, শৃঙ্খলা ও শান্তি বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণাদি

বিভিন্ন বর্ণ যদি নিজেদের স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তবে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক জীবনে বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলা ঘটাই স্বাভাবিক। গীতার মতে তাই এরূপ ত্যাগ—তামস ত্যাগের নামান্তর। অর্জ্জুন এরূপ তামস ত্যাগে ব্রতী না হন, শ্রীভগবান্ এজন্য তাঁকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করে দিচ্ছেন।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮

অন্বয়—(যঃ) দুঃখম্ ইতি এব কায়ক্লেশভয়াৎ যৎ কর্ম্ম ত্যজেৎ সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং ন এব লভেৎ॥ ৮

অনুবাদ—কর্ম্মকে দুঃখকর মনে করে কায়িক ক্লেশের ভয়ে যে কর্ম্মত্যাগ তা রাজস ত্যাগ। যিনি এই ভাবে কর্ম্মত্যাগ করেন, তিনি ত্যাগের ফল লাভ করেন না॥ ৮

রাজস ত্যাগ

পূর্ব্বে মোহবশতঃ যে কর্ম্মত্যাগ তাকে তামস ত্যাগ বলা হয়েছে। এক্ষণে রাজস ত্যাগ কি—তার সূচনা দেওয়া হচ্ছে। কর্ম্মানুষ্ঠান দুঃখপ্রদ ও ক্লেশসাধ্য—এরূপ চিন্তা করে যখন তা ত্যাগ করা হয়, তখন সেই ত্যাগকে বলা হয়—রাজস ত্যাগ। এরূপ ত্যাগ কদাপি ঐচ্ছিক বা আন্তরিক হয় না। উপরন্তু, এরূপ ত্যাগের দ্বারা ঘটে কর্ম্মীর আত্মিক পতন। কারণ, এরূপ ত্যাগাচরণের ফলে তার দেহ-মনে আলস্য, ঔদাস্য, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতা প্রভৃতি দুর্গুণগুলি ক্রমশঃ প্রশ্রয় পায়।

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯

অন্বয়—হে অর্জ্জুন, সঙ্গং ফলং চ এব ত্যক্ত্বা কার্য্যম্ ইতি এব যৎ নিয়তং কর্ম্ম ক্রিয়তে, স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ॥ ৯

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিহার করে

কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করা হয়, তা-ই সাত্ত্বিক ত্যাগ ব'লে অভিহিত॥ ৯

সাত্ত্বিক ত্যাগ

কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে শাস্ত্রসম্মত করণীয় কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠিত হ'তে থাকবে অথচ কর্ম্মকালে 'আমি করছি ও এরূপ ফললাভের আশা করছি'—এই ভাবটি নিঃশেষে পরিত্যক্ত হবে, এরূপ যে ত্যাগ—তা-ই হচ্ছে সাত্ত্বিক ত্যাগ। বস্তুতঃ, কর্ম্মযোগের প্রকৃত আদর্শ ইহাই।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০

অন্বয়—সত্ত্বসমাবিষ্টঃ মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ত্যাগী অকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে কর্ম্মে ন অনুষজ্জতে॥ ১০

অনুবাদ—সত্ত্বগুণসম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়শূন্য, ত্যাগী পুরুষ অকুশল কর্ম্মে দ্বেষ করেন না এবং কুশল কর্ম্মেও আসক্ত হন না॥ ১০

সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ

সাত্ত্বিক ত্যাগী যে উন্নত ও আদর্শ কর্ম্মযোগী একথা পূর্ব্বে বহুপ্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এক্ষণে এরূপ ত্যাগীর স্বভাব-চরিত্র কী রূপ, তারই সূচনা দেওয়া হচ্ছে। বস্তুতঃ, এরূপ সাত্ত্বিক ত্যাগীর অন্তঃকরণ শান্ত, বুদ্ধি স্থির ও সংশয়রহিত। তিনি ভাল মন্দ বা শুভাশুভ কোন কর্ম্মে বিচলিত হন না। কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে আরব্ধ কর্ম্মের উদ্‌যাপনই হয় তাঁর জীবনব্রত।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১

অন্বয়—দেহভৃতা অশেষতঃ কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যং; যঃ তু কর্ম্মফলত্যাগী, সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে॥ ১১

অনুবাদ—দেহধারী ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। অতএব, যিনি কর্ম্মফলত্যাগী তিনিই প্রকৃত ত্যাগী॥ ১১

গীতামৃত—যতদিন দেহ আছে ততদিন কিছু-না-কিছু কর্ম্মপ্রচেষ্টা থাকতে বাধ্য। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি কর্ম্মগুলি পরিহার ক'রে মানুষ কী রূপে জীবিত থাকবে? এই জন্য বলা হচ্ছে—দেহধারীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগী আদৌ সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা করলে কর্ম্মফলের আসক্তি ত্যাগ করা সম্ভবপর এবং তা-ই করণীয়।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২

অন্বয়—অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্ অত্যাগিনাং প্রেত্য ভবতি; তু সন্ন্যাসিনাং ন ক্বচিৎ॥ ১২

অনুবাদ—অত্যাগী ব্যক্তিদের মৃত্যুর পরে ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট মিশ্র—এই তিন প্রকার কর্ম্মফল লাভ হয়। পরন্তু, ত্যাগী ব্যক্তিদের কদাপি এরূপ হয় না॥ ১২

ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ও ফলাসক্ত কর্ম্মীর কর্ম্মফল

যারা কর্ম্ম করে অথচ ত্যাগ করে না, তাদের এখানে অত্যাগী এবং যারা কর্ম্ম করার পরে ফলাসক্তি ত্যাগ করে তাদিগকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে ত্যাগীরূপে। এরূপ অত্যাগী ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরে তাদের কৃত ভাল-মন্দ ও সদসৎমিশ্র কর্ম্মের ফলভোগ করতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে, ত্যাগীদের এরূপ কোন ফল ভোগ করতে হয় না। কারণ, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্মিগণের মন সম্পূর্ণ আসক্তিবর্জিত হয়ে যায়।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥ ১৩

অন্বয়—মহাবাহো, সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি ইমানি পঞ্চকারণানি মে নিবোধ॥ ১৩

অনুবাদ—হে মহাবাহো, সাংখ্যমেত যে কোনও কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত পাঁচটি কারণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তুমি তা আমার নিকট শোন॥ ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪

অন্বয়—অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা পৃথগ্বিধং করণং, বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ চ অত্র পঞ্চমং দৈবম্ এব চ॥ ১৪

অনুবাদ—অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, বিবিধ প্রকারের করণ বা সাধন, বিবিধ চেষ্টা আর পঞ্চম কারণ হচ্ছে দৈব॥ ১৪

কর্মানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান

একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে কোনও কর্ম্ম করার জন্য প্রথম প্রয়োজন—একটি অনুকূল ও উপযোগী স্থান। দ্বিতীয় প্রয়োজন—একজন কর্ত্তা বা কর্ম্মী। কেন না, কর্ত্তা ব্যতীত কোনও কর্ম্ম সম্পন্ন হবে কী রূপে? তৃতীয়তঃ, কর্ত্তার নিকট যদি কাজ করার উপযোগী সাধন বা উপকরণ না থাকে তবে কর্ত্তা যতই বুদ্ধিমান্ শক্তিশালী হোন না কেন, তাঁর দ্বারা কোনও কিছু করা সম্ভবপর হয় না। কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য চতুর্থ প্রয়োজন হচ্ছে—চেষ্টা, যত্ন ও আগ্রহ। এগুলির অভাব থাকলে কোনও কাজ সিদ্ধ বা সফল হবার নয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য আর একটি বস্তুর প্রয়োজন এবং সেটি হচ্ছে—দৈব। সাংখ্যের মতে দৈব বা প্রারব্ধের আনুকূল্য ছাড়া কেবলমাত্র চেষ্টা বা পুরুষকারের দ্বারা কোনও কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—প্রারব্ধবশে জীব দেহধারণ করে এবং তার অধিকাংশ কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূলে প্রেরণা বা প্রযোজক রূপে যে শক্তি নিত্যক্রিয়াশীল, তাও তার প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কার বা প্রারব্ধ। তবে ভক্তের দৃষ্টিতে সব কর্ম্মের পশ্চাতে ভাগবতী ইচ্ছা বা ভাগবত বিধানই কার্য্যকরী। ভক্ত বলেন—সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা ব্যতীত বৃক্ষের একটি পত্রও পতিত হয় না।

বেদান্তের মতে অধিষ্ঠান হচ্ছে—দেহ, কর্ত্তা—জীব, করণ—বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-চেষ্টা ও প্রাণ অপানাদির ক্রিয়া, দৈব—জীবের জন্মার্জিত অদৃষ্ট।

যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন উপরোক্ত পাঁচটি কারণের

সমবায়েই সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। পরবর্ত্তী শ্লোকে এই বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।

ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫

অন্বয়—নরঃ শরীরবাঙ্মনোভিঃ যৎ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা কর্ম্ম প্রারভতে, এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ॥ ১৫

অনুবাদ—মনুষ্য দেহ-মন ও বাক্যের দ্বারা ন্যায্য বা অন্যায্য যে কোনও কর্ম্ম করে, পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি উপাদানই তার কারণ॥ ১৫

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৬

অন্বয়—তত্র এবং সতি, যঃ তু কেবলম্ আত্মানম্ কর্ত্তারং পশ্যতি, অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ, সঃ দুর্ম্মতি ন পশ্যতি॥ ১৬

অনুবাদ—এরূপ যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ আত্মাকে কর্ত্তা ব'লে মনে করে, তার বুদ্ধি সুসংস্কৃত না হওয়ায় সেই হীনমতি ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না॥ ১৬

বিকৃতবুদ্ধি কর্ম্মীর তত্ত্বদর্শন অসম্ভব

উপরে সুস্পষ্টরূপে বোঝান হয়েছে যে ভালমন্দ প্রত্যেকটি কর্ম্মের পশ্চাতে বিদ্যমান রয়েছে—পাঁচটি কারণ। শাস্ত্রজ্ঞান বা সদ্‌গুরুর উপদিষ্ট জ্ঞানের অভাবে এই সত্য তত্ত্বটি অবগত না হয়ে যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ আত্মাকে সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা মনে করে, তাকে অজ্ঞান ছাড়া আর কি বলা যায়? বস্তুতঃ, এরূপ ব্যক্তির দৃষ্টি ভ্রান্ত ও কলুষিত। তার পক্ষে তাই সত্যকার তত্ত্বদর্শন অসম্ভব।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭

অন্বয়—যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ ন, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে, সঃ ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি ন হন্তি, ন নিবধ্যতে॥ ১৭

অনুবাদ—যাঁর 'আমি কর্ত্তা' এই ভাব নাই, যাঁর বুদ্ধি কর্ম্মফলে আসক্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোক হত্যা করলেও কিছু হত্যা করেন না এবং তার ফলে তিনি আবদ্ধ হন না॥ ১৭

হিংসা ও অহিংসা প্রশ্নের চরম সমাধান

আজ যখন সমগ্র পৃথিবীতে হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নটি নিয়ে এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিশেষ ভাবে আন্দোলিত ও আলোড়িত, তখন উপরোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্যের প্রতি বিশেষ মনেযোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক।

হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নটি সর্ব্ব যুগের একটি সার্ব্বজনীন সমস্যা। বস্তুতঃ, এই প্রশ্নটির সমাধানের জন্যই গীতাধর্ম্মের অবতারণা। স্বজনবধরূপ হিংসাত্মক কার্য্য পরিহারের নিমিত্তই অর্জ্জুন স্বীয় প্রাণাদপি প্রিয় গাণ্ডীব ধনু পরিহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং তাঁর সেই বিচার যে ভ্রান্ত, তা প্রতিপন্ন করার জন্যই গীতোপদেশের সূচনা।

শুধু আধুনিক গান্ধীবাদী অহিংসার যুগেই নয়, পূর্ব্বাপর সকল যুগেই বিচারশীল মনুষ্যের মনে এই প্রশ্নটি পুনঃ পুনঃ উদিত হয়—হিংস্র বা হিংসোদ্যত শত্রুপক্ষকে জয় করার সত্যকার উপায় কি? শোনা যায়—শিম্বো নামক জনৈক সেনাপতি অহিংসাবতার ভগবান্ শ্রীবুদ্ধের নিকট অনুরূপ প্রশ্ন করে বলেছিলেন—ভগবন্, আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার করার জন্য আমাকে কি আমার সৈনাপত্যরূপ হিংসাত্মক কর্ম্ম পরিহার করতে হবে? সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবুদ্ধ তাঁকে বলেছিলেন—বৎস, স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য যিনি অস্ত্র ধারণ করেন, তিনি আমার প্রচারিত অহিংসা-ধর্ম্মের পরিপন্থী নন। কেন না, লক্ষ্যের দ্বারাই কর্ম্মের গুণাগুণ বিচার হয়। সেনাপতি হলেও তোমার মন যখন উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত, তখন তুমি আমার সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করতে পার।

বলা বাহুল্য, গীতাকার শ্রীভগবান্ এখানে যে উপদেশ দিয়েছেন, তার

অর্থ তদপেক্ষা আরও গভীরতার দার্শনিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তত্ত্ব ও যুক্তি—এই উভয় দিক দিয়ে এই উপদেশের মহত্ত্ব-গৌরব অপরিসীম ও অতুলনীয়। গীতাকার শ্রীভগবান্ এখানে বলছেন—কাজ করে প্রকৃতি বা দেহ-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার রূপ জৈব প্রকৃতি—নিঃসঙ্গ আত্মা নন। সুতরাং, নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি, ফলাসক্তি যেখানে নাই, সেখানে ভাল-মন্দ বা হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক কর্ম্মের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করা একান্ত অযৌক্তিক। যাঁর হৃদয়-মনে কিছুমাত্র কর্তৃত্ববুদ্ধি বা ফলাসক্তি নাই, তিনি ত্রিলোক হনন করলেও হত্যারূপ কর্ম্মের ফলভাগী হন না।

যদি বলা হয়, এতখানি দার্শনিক জ্ঞানে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত নন, তিনি এক্ষেত্রে কি করবেন? উত্তরে বলা যায়—এরূপ ব্যক্তি যদি সত্যদ্রষ্টা সদ্গুরুর আদেশে যন্ত্রবুদ্ধিতে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হয়ে স্বীয় কর্ত্তব্যে ব্রতী হন, তবে তিনিও পাপলিপ্ত হবেন না। সদ্‌গুরুরূপী শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে অনুরূপ উপদেশ দিয়ে বলেছেন—"নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্"। হে বীর সব্যসাচি, তুমি আমার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে আমার নির্দ্দেশ পালনে ব্রতী হও।

অহিংসা, ক্ষমা ও প্রেমের দ্বারা যেখানে কোনও দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে জয় করা অসম্ভব ব'লে বিবেচিত হয়, সেখানে গীতার উপরোক্ত মহৎ উপদেশ স্মরণ করে উপযুক্ত দণ্ডদানের দ্বারা সেই শত্রুকে বশীভূত করাই সমীচীন। এরূপ না করলে আত্মরক্ষা এবং সমাজস্থিতি রক্ষা করা সম্ভবপর নয়।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮

অন্বয়—জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধাঃ কর্ম্মচোদনা ; করণং, কর্ম্ম, কর্ত্তা, ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮

অনুবাদ—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা (এই) তিনটি কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু। করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা—এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়॥ ১৮

কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু ও কর্ম্মের আশ্রয়

কোনও কর্ম্ম আরম্ভ করতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে চাই প্রেরণা এবং সেই প্রেরণা আসে—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—এই তিনটি বিষয়ের সম্যক্ অনুভূতি হ'তে। অর্থাৎ, কোনও মানুষ যখন কোনও জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তখন সেই বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভের জন্য তার মধ্যে জাগ্রত হয় তীব্র প্রেরণা এবং তার ফলে যখন সেই বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান আয়ত্ত হয়, তখন সেই বস্তুটি লাভের নিমিত্ত তার মনে জাগ্রত হয়ে উঠে—প্রবল কর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং তখন সেই ব্যক্তি কর্ত্তারূপে প্রয়োজনীয় উপায়ের (করণ) সাহায্যে সেই কর্ম্মটি সম্পন্ন করে। অর্থাৎ, জ্ঞানের প্রেরণা হতে কর্ম্ম-সম্পাদনের উপযোগী তাগিদ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় এবং এইরূপে সেই কাজটি নিষ্পন্ন হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় বোঝা গেল—কোনও কর্ম্ম সম্পাদনের পূর্ব্বে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে—কর্ম্মীর মানসিক প্রস্তুতি। গীতার দার্শনিক ভাষায় তাকে বলা হয়েছে 'কর্ম্ম-চোদনা' এবং তার পরে কর্ম্মী সেই কার্য্যটি সম্পাদনের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ ক'রে যখন সেই কার্য্যটি সম্পন্ন করে, তখন কর্ম্মীর সেই বাহ্য উপকরণগুলির সংগ্রহকে বলা হয়—'কর্ম্মসংগ্রহ'।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯

অন্বয়—গুণসংখ্যানে জ্ঞানং, কর্ম্ম চ, কর্ত্তা চ, গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে ; তানি অপি যথাবৎ শৃণু॥ ১৯

অনুবাদ—সাংখ্যদর্শনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তাকে গুণভেদে তিন প্রকার বলা হয়েছে তোমাকে যথাবৎ তা বলছি—শুন॥ ১৯

গীতামৃত—কাপিল সাংখ্যমতে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্বাদি গুণভেদে তাই এদের স্বরূপও হয় তিন প্রকার। শ্রীভগবান্ নীচে যথাক্রমে তারই বর্ণনা করেছেন।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০

অন্বয়—যেন বিভক্তেষু সর্ব্বভূতেষু অবিভক্তম্ একম্ অব্যয়ং ভাবম্ ঈক্ষতে, তৎজ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি॥ ২০

অনুবাদ—যে জ্ঞান দ্বারা পরস্পর বিভক্তভাবে অবস্থিত সর্ব্বভূতে এক নিত্য অদ্বয় বস্তুর দর্শন হয়, তাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান ব'লে জানবে॥ ২০

বহুত্বের মধ্যে একত্বের দর্শনই—সাত্ত্বিক জ্ঞান

এই বাহ্য জগতে বৈচিত্র্য ও ভেদ-বৈষম্যের অন্ত নাই। এখানে কোনও দুটি বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতি, গুণ ও ক্রিয়া এক প্রকার নয় এবং এই ভেদ-বৈষম্য হতেই মানুষের মনে সৃষ্ট হয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ। সংসারের যাবতীয় অসুখ, অশান্তি, অসন্তোষের মৌলিক কারণও এই ভেদদর্শন। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি তাই এই বিচিত্রতা, বিভেদ ও বৈষম্যের অন্তরালে নিরন্তর একটি ঐক্য ও সাম্যের অনুসন্ধান করেন এবং যে জ্ঞানের দ্বারা এই ঐক্যানুভূতি লাভ হয়, তাকেই বলা হয়—সাত্ত্বিক জ্ঞান।

উপনিষদ্‌ও বলেছেন—প্রজাপতি ব্রহ্মা মানুষের মন ও ইন্দ্রিয়কে বহির্মুখী ক'রে সৃষ্টি করেছেন। তাই সে এই জগতে বাহ্য বস্তুর মধ্যে যে ভেদ-বৈষম্য—তা দর্শন ক'রে ব্যথিত ও পীড়িত হয়। পরন্তু, যাঁরা ধীর ও বিবেকী তাঁরা এই বাহ্য ও বিচিত্র দৃশ্যপরম্পরার অন্তরালে যে পরম ঐক্য ও সাম্য বিদ্যমান, তা দর্শন করে ধন্য হন। বলা বাহুল্য, জড়বিজ্ঞানও অধুনা ভৌতিক স্তরে বাহ্য বস্তু-পরম্পরার মধ্যে ঐক্যের সন্ধানে নিত্য তৎপর এবং এই সূত্রে প্রথম আবিষ্কৃত হয়—Matter and Energy ; পরন্তু এখন তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এক Energy হতেই উৎপত্তি ঘটেছে সব কিছুর।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্ বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১

অন্বয়—যৎ তু জ্ঞানং পৃথকত্বেন সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথগ্‌বিধান্ নানা ভাবান্ বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি॥ ২১

অনুবাদ—যে জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে পৃথক্ পৃথক্ ভাবের অনুভব হয়, তা রাজস জ্ঞান॥ ২১

সর্ব্বত্র ভেদদর্শনই রাজস জ্ঞান

রজোগুণের সৃষ্টি হচ্ছে—চঞ্চলতা। আর এরূপ চঞ্চলতা হতেই বৃদ্ধি পায়—ভেদবুদ্ধি এবং তারই ফলে শুধু সর্ব্বভূতের মধ্যে নয়, একের মধ্যেও ঘটে নানাত্বের অনুভূতি। আর এই ভেদদর্শনই ব্যক্তিগত তথা সামূহিক জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশার মুখ্য কারণ। আর এই ভেদদর্শনের ফলেই সৃষ্ট হয় —রাগ ও দ্বেষ এবং জীবের অধোগতি। সংসারবন্ধনের মূল কারণও তাই এই ভেদদর্শন। বস্তুতঃ রাজস জ্ঞান হচ্ছে—সাত্ত্বিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী।

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

অন্বয়—যৎ তু একস্মিন্ কার্য্যে কৃৎস্নবৎ সক্তম্, অহৈতুকম্ অতত্ত্বার্থবৎ অল্পং চ, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্॥ ২২

অনুবাদ—যে জ্ঞান কোনও একটি বিষয়ে সব কিছু বিদ্যমান মনে ক'রে তাতে আসক্ত হয়ে থাকে, সেই অযৌক্তিক ও তুচ্ছ জ্ঞানকে বলা হয় তামস জ্ঞান॥ ২২

যে-জ্ঞান মিথ্যা বস্তুতে আসক্ত করে—তা-ই তামস জ্ঞান

যে জ্ঞান দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি নশ্বর বস্তুর যে কোনও একটিকে একান্ত প্রিয় ও যথাসর্ব্বস্ব মনে করিয়ে জীবকে তাতে মোহাসক্ত করে অথবা ধর্ম্মক্ষেত্রে কোনও একটি দেবমূর্ত্তি অথবা একটি তত্ত্বই একমাত্র সত্য এবং অন্য সব মিথ্যা—এরূপ বোধ উৎপন্ন করিয়ে সাধককে তাতে আসক্ত ও আচ্ছন্ন করে, সেই অযৌক্তিক ও মিথ্যা জ্ঞানকে বলা হয়—তামস জ্ঞান। ধর্ম্মজগতে এরূপ তামস জ্ঞানের পরিণামেই বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে উদ্ভূত হয়—নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও হানাহানি। কেন না, এই সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি হ'তে তারা নিজেদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ধর্ম্মমত, ধর্ম্মীয় শাস্ত্র ও বিধি-বিধানকেই একান্ত সত্য মনে ক'রে অন্য ধর্ম্মমতগুলির বিরুদ্ধাচরণ—এমনকি উৎসাদনে

ব্রতী হয়ে থাকে। ভৌতিক স্তরেও এরূপ মোহাসক্ত সংকীর্ণ জ্ঞান অশেষ দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ সৃষ্টি করে।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩

অন্বয়—অফলপ্রেপ্সুনা নিয়তং সঙ্গরহিতম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতং যৎকর্ম্ম, তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে॥ ২৩

অনুবাদ—ফলাসক্তি ত্যাগ করে, রাগদ্বেষবর্জ্জিত হয়ে, অনাসক্ত ভাবে যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাকে বলা হয় সাত্ত্বিক কর্ম্ম॥ ২৩

সাত্ত্বিক কর্ম্ম

নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। কারণ, ইহাতে ফলাসক্তি ও রাগ-দ্বেষের ভাব বিদ্যমান থাকে না এবং শাস্ত্রবিধি মতেই সেই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। এই কর্ম্মে বন্ধনেরও ভয় থাকে না। বস্তুতঃ এই সাত্ত্বিক কর্ম্মই মোক্ষপথের পরম সহায়ক।

যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪

অন্বয়—পুনঃ তু কামেপ্সুনা সাহঙ্কারেণ বা বহুলায়াসং যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে, তৎ রাজসম্ উদাহৃতম্॥ ২৪

অনুবাদ—ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয়ে অহঙ্কার বশে বহু ক্লেশ সহকারে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকে বলে রাজস কর্ম্ম॥ ২৪

রাজস কর্ম্ম

যেখানে অহমিকা ও ফলাসক্তি বশে কাজ করা হয় এবং যে-কর্ম্মের মধ্যে স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা প্রবল এবং যে-কর্ম্ম সম্পন্ন করতে অত্যধিক শ্রম বা আয়াস স্বীকার করতে হয়—তা রাজস কর্ম্ম। রাজসিক ব্যক্তির অশেষ

আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য তাকে সারা জীবন অপরিমিত ক্লেশ স্বীকার করতে হয় এবং তার ফলে তার জীবন হয় অশান্তি ও অসন্তোষময়। রাজস কর্ম্ম তাই সংসারবন্ধনের সব চেয়ে বড় কারণ।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে॥ ২৫

অন্বয়—অনুবন্ধং, ক্ষয়ং, হিংসাং, পুরুষং চ অনপেক্ষ্য মোহাৎ যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে তৎ তামসম্ উচ্যতে॥ ২৫

অনুবাদ—ভাবী ফলাফল, স্বীয় সামর্থ্য, অর্থনাশ, অপরের ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতি বিষয়গুলির বিচার না করে মোহবশতঃ যে কর্ম্ম করা হয়—তা তামস কর্ম্ম বলে অভিহিত॥ ২৫

তামস কর্ম্ম

তামস কর্ম্মীর মন মোহাচ্ছন্ন, তাই সে তার আরব্ধ কর্ম্মের ফলাফল কি হবে বা হতে পারে, সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করার যোগ্যতা বা শক্তিসামর্থ্য তার আছে কিনা, সেই কর্ম্মের ফলে তার নিজের এবং অপরের কী রূপ ক্ষয়-ক্ষতি হতে পারে, সে বিষয়ে চিন্তা করার শক্তি-সামর্থ্য তার থাকে না। ফলে, তার মনে যখন যেরূপ উদ্ভট কল্পনা বা প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তা পূর্ণ করার জন্য সে বিনা বিচারে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর এর পরিণাম যে কখনও শুভ ও হিতকর হতে পারে না—তা সহজেই অনুমেয়। তামস কর্ম্ম তাই সব চেয়ে অধম এবং তার ফলও অত্যন্ত হানিকর ও মারাত্মক।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মের বিচার

কোনও কর্ম্মের বাহ্যরূপ দেখে সব সময় তার ভাল-মন্দ বিচার করা যায় না। বস্তুতঃ, কর্ম্মী বা কর্ত্তা যেরূপ মনোভাব নিয়ে কর্ম্মটি আরম্ভ ও সম্পন্ন করে, তা-ই হয় তার কর্ম্মফলের নিয়ামক। কোনও লোক যদি চুরির মতলব নিয়ে পূজার্চ্চনার ছলে মন্দিরে প্রবিষ্ট হয়ে দেবদর্শনে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার সেই দেবদর্শন যে তামস ফল দান করবে—তা নিঃসন্দেহ।

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে হিংসাত্মক যুদ্ধকর্ম্মে প্রবৃত্ত হলেন—কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষ। সেই যুদ্ধকর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ লাভ করলেন —চিত্তশুদ্ধিমূলক সাত্ত্বিক ফল; পক্ষান্তরে, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবগণ লাভ করলেন—হীন ষড়যন্ত্রজনিত রাজস ফল এবং সেই কৌরবদের পক্ষে হিতাহিত বিচার না করে মোহবশে যে রাজন্যবর্গ সাহায্যার্থে অগ্রসর হলেন, তাঁরা লাভ করলেন—তামস ফল। এতেই বোঝা যায়, প্রত্যেক কর্ম্ম সম্পর্কে কর্ত্তার মনোভাবই তার কৃত কর্ম্মফলের সত্যকার নিয়ন্তা হয়ে থাকে। গীতার এই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মের লক্ষণগুলি নিরন্তর স্মৃতিপথে রেখে প্রত্যেক কর্ম্মীর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।। ২৬

অন্বয়—মুক্তসঙ্গঃ, অনহংবাদী, ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ, সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা, সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে।। ২৬

অনুবাদ—যিনি আসক্তিবর্জ্জিত, কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত, ধৈর্য্যশীল, উদ্যমী, কৃতকর্ম্মের সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার—তিনি সাত্ত্বিক কর্ত্তা রূপে কথিত হন।। ২৬

সাত্ত্বিক কর্ত্তা

বস্তুতঃ, সাত্ত্বিক কর্ত্তাই গীতার মতে প্রকৃত কর্ম্মযোগী। আদর্শ কর্ম্মীর যাবতীয় গুণ, শক্তি ও প্রেরণাই তাঁর মধ্যে প্রতিভাত। এইরূপ কর্ম্মী প্রবর্ত্তক অবস্থায় চিত্তশুদ্ধির জন্য সদ্গুরুর নির্দ্দেশে কর্ম্মরত হন এবং সেই কর্ম্মের মধ্যে তাঁর নিজস্ব অহং বা মমত্ববুদ্ধি বলতে কিছুই থাকে না। কর্ম্মফলও তিনি শ্রীগুরুর চরণে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হন। সিদ্ধিলাভের পরে লোকসংগ্রহের জন্য তিনি আরও ধৈর্য্য ও উৎসাহ সহকারে উচ্চতর কর্ম্মে ব্রতী হন। সাত্ত্বিক কর্ত্তা তাই নির্ব্বিকার ও নিরন্তর প্রসন্নচিত্ত।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। ২৭

অন্বয়—রাগী, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ, লুব্ধঃ, হিংসাত্মকঃ, অশুচিঃ, হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। ২৭

অনুবাদ—বিষয়াসক্ত, ফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, পরপীড়ক, শৌচাচারহীন, হর্ষশোকে বিচলিতচিত্ত যে কর্ম্মী—তাকে রাজস কর্ত্তা বলা হয়।। ২৭

রাজস কর্ত্তা

রাজস কর্ত্তা রজোগুণের প্রতিমূর্ত্তি। তার মধ্যে তাই দম্ভ, অভিমান, লোভ, আসক্তি, পরপীড়নের প্রবৃত্তি, আচারহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, সুখ-দুঃখে চঞ্চলচিত্ততা প্রভৃতি অবগুণগুলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এরূপ কর্ম্মীর জীবনে তাই ধৈর্য্য ও শান্তির আশা সুদূরপরাহত।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে।। ২৮

অন্বয়—অযুক্তঃ, স্তব্ধঃ, শঠঃ, নৈষ্কৃতিকঃ, অলসঃ, বিষাদী, দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে।। ২৮

অনুবাদ—চঞ্চলচিত্ত, অভদ্র, অনম্র, শঠ, পরবৃত্তিনাশক, অলস, বিষণ্ন ও দীর্ঘসূত্রী কর্ম্মীকে তামস কর্ত্তা বলা হয়।। ২৮

তামস কর্ত্তা

তামস কর্ত্তা মন ও চরিত্র তমোগুণসুলভ দুর্গুণ ও দুষ্প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা যে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হবে—তাতে সন্দেহ কি? বলা বাহুল্য, এরূপ কর্ম্মী একান্ত মূঢ়, অজ্ঞান ও অপদার্থ—এদের হীন কর্ম্মপ্রবৃত্তি একান্তই নৈরাশ্যজনক ও হানিকর।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়।। ২৯

অন্বয়—ধনঞ্জয়, বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ গুণতঃ এব ত্রিবিধং ভেদং পৃথক্ত্বেন অশেষেণ প্রোচ্যমানং শৃণু॥ ২৯

অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়, গুণানুসারে বুদ্ধি এবং ধৃতির তিন প্রকার ভেদ হয়, তাহা তোমাকে পৃথক্ ভাবে ও ভালরূপে বোঝাচ্ছি, শোন॥ ২৯

প্রথমতঃ, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী বুদ্ধির স্বরূপ ও পার্থক্য কি নিম্নশ্লোকত্রয়ে তা-ই বর্ণিত হচ্ছে।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩০

অন্বয়—পার্থ, প্রবৃত্তিং চ, নিবৃত্তিং চ, কার্য্যাকার্য্যে, ভয়াভয়ে, বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী॥ ৩০

অনুবাদ—পার্থ, (ধর্ম্ম ও কর্ম্মে) প্রবৃত্তি এবং (অধর্ম্ম ও অকর্ম্মে) নিবৃত্তি, কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তি যে-বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়, তা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি॥ ৩০

সাত্ত্বিকী বুদ্ধির স্বরূপ লক্ষণ

সাধকের মন যখন ঠিক ঠিক ভগবন্নিষ্ঠ বা আত্মনিষ্ঠ হয় তখন তাঁর বুদ্ধি ক্রমশঃ নির্ম্মল ও স্বচ্ছ স্বরূপ ধারণ করে এবং সেই বুদ্ধি তখন তাঁকে নিরন্তর পরিচালিত করে সৎ ও শুভ পথে। আর তার ফলেই সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সহায়তায় তিনি তখন ভালভাবে বুঝতে পারেন—প্রবৃত্তিমার্গের পরিণাম কি এবং নিবৃত্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? শুধু তাই নয়, সেই সাত্ত্বিকী বুদ্ধিলাভের ফলে তখন তাঁর মনে উদিত হয়—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান। অর্থাৎ, কোন্ পথে চললে পতনের ভয় ও বন্ধনের আশঙ্কা এবং কোন্ পথের আশ্রয় গ্রহণ করলে অভয় ও মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, এসব বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা তখন তাঁর মনে জাগ্রত হয়। বস্তুতঃ, এরূপ অবস্থায় উন্নীত হলে সাধকের আর বিপথগামী হবার সম্ভাবনা থাকে না।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি সা বুদ্ধিঃ পার্থ রাজসী॥ ৩১

অন্বয়—পার্থ, যয়া ধর্ম্মম্ অধর্ম্মং চ কার্য্যম্ অকার্য্যম্ এব চ অযথাবৎ প্রজানাতি, সা রাজসী বুদ্ধিঃ॥ ৩১

অনুবাদ—হে পার্থ, যে বুদ্ধি ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্যের বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞান দান করে—তা রাজসী বুদ্ধি॥ ৩১

গীতামৃত—রাজসী বুদ্ধি মানুষকে সত্যপথের সন্ধান না দিয়ে বিভ্রান্ত ও উন্মার্গগামী করে। বলা বাহুল্য, এরূপ রাজসী বুদ্ধির ফলেই মানুষ ভগবদ্বিমুখ হয়ে বিষয়সেবায় নিরত হয় এবং তারই ফলে সাধিত হয়—তার অধঃপতন ও অধোগতি।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩২

অন্বয়—পার্থ, যা অধর্ম্মং ধর্ম্মম্ ইতি মন্যতে সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ চ, তমসা, আবৃতা সা বুদ্ধিঃ তামসী॥ ৩২

অনুবাদ—হে পার্থ, যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করায় এবং সকল বিষয়ে বিপরীত জ্ঞান জন্মায়, তা-ই তামসী বুদ্ধি॥ ৩২

গীতামৃত—তমোগুণের কাজ মনোবুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করা এবং তার ফলে মানুষ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞান করে নিরয়গামী হয়। শুধু তাই নয়, এই তামস বুদ্ধি মানুষকে যাবতীয় বিষয়ে বিপথগামী ক'রে তার সর্ব্বনাশ সাধন করে। এক্ষণে তিন প্রকার ধৃতি সম্বন্ধে সূচনা দেওয়া হচ্ছে।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩৩

অন্বয়—পার্থ, যোগেন অব্যভিচারিণ্যা যয়া ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়াঃ ধারয়তে সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী॥ ৩৩

অনুবাদ—হে পার্থ, যে অবিচলিত ধৃতি বা ধারণা-শক্তির সাহায্যে মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়, তা-ই সাত্ত্বিকী ধৃতি॥ ৩৩

সাত্ত্বিকী ধৃতি

সাত্ত্বিকী ধৃতি তাকেই বলা হয়—যার অনুশীলনের ফলে সাধকের মনোবুদ্ধি যে শুধু শান্ত ও সংযত হয় তা-ই নয়, তা ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী হয়ে সমাধিনিষ্ঠ হয়। এখানে সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধি ও ধৃতির পার্থক্য ও সঙ্গতি কোথায়-তা বোঝা আবশ্যক।

বুদ্ধির কার্য্য ভাল-মন্দ বিচার ক'রে মনকে যথাযোগ্য নির্দ্দেশ দান করা। পক্ষান্তরে, ধৃতির কার্য্য হচ্ছে বুদ্ধির দ্বারা নির্ণীত লক্ষ্যে স্থিরনিবদ্ধ বা নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া। একাজ আদৌ সহজসাধ্য নয়। এ জন্য আবশ্যক—ঐকান্তিকী একাগ্রতার অভ্যাস। আর এই কারণে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে—"যোগ" শব্দটি।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩৪

অন্বয়—পার্থ, অর্জ্জুন, যয়া ধৃত্যা তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধারয়তে প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী, সা রাজসী ধৃতিঃ॥ ৩৪

অনুবাদ—হে পার্থ, হে অর্জ্জুন, যে ধৃতির দ্বারা মানুষ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামভোগে আসক্ত হয় এবং সেই সব প্রসঙ্গে ফলকামী হয়—তা-ই রাজসী ধৃতি॥ ৩৪

রাজসি ধৃতি

রাজসি ধৃতি মানুষের মনোবুদ্ধিকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবায় আবদ্ধ ক'রে রাখে এবং তার ফলে কর্ম্মীর মনোবুদ্ধি ধর্ম্মের প্রচলিত গতানুগতিক বিধি-বিধান, অর্থার্জ্জন ও ভোগসুখের আশাকাঙ্ক্ষা অতিক্রম ক'রে আর উর্দ্ধমুখী হয় না। অর্থাৎ, রাজসিকী বৃত্তি মানুষকে মোক্ষমুখী না ক'রে বিষয়াসক্ত করে রাখে।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩৫

অন্বয়—পার্থ, দুর্ম্মেধাঃ যয়া স্বপ্নং, ভয়ং, শোকং, বিষাদং, মদং চ এব ন বিমুঞ্চতি, সা ধৃতিঃ তামসী॥ ৩৫

অনুবাদ—হে পার্থ, যে ধৃতির ফলে হতবুদ্ধি মনুষ্য নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ এবং দম্ভাভিমান ত্যাগ করতে পারে না—তা তামসী ধৃতি॥ ৩৫

তামসী ধৃতি

যে ধৃতি মানুষকে তমোভাবজনিত নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, শোক, দুঃখ, বিষাদ, মদ, মাৎসর্য্যাদি দুর্গুণগুলিতে আবদ্ধ ও আচ্ছন্ন ক'রে রাখে এবং তা হতে মুক্ত হতে দেয় না, এরূপ ধৃতিকে তামসী ধৃতি বলা হয়। বলা বাহুল্য, এই তামসী ধৃতির ফলেই মানুষের মন ঘোর বিমূঢ় ও হতোদ্যম অবস্থায় অবনমিত হয়। এই অবস্থায় মানুষ আলস্য ঔদাস্যে আচ্ছন্ন হয়ে পশুবৎ ঘৃণ্য জীবন যাপন করে।

এতক্ষণ কর্ম্ম, জ্ঞান-বুদ্ধি, ধৃতি প্রভৃতির ত্রিবিধ ভেদ বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে তিন প্রকার সুখের বর্ণনা করা হচ্ছে।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাৎ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥ ৩৬
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭

অন্বয়—ভরতর্ষভ, ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে শৃণু, যত্র অভ্যাসাৎ রমতে, দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি, যত্তদ্ অগ্রে বিষম্ ইব, পরিণামে অমৃতোপমম্ আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজং তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্॥ ৩৬-৩৭

অনুবাদ—হে ভরতর্ষভ, এক্ষণে আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিষয় শোন। ক্রমিক অভ্যাসবশতঃ যে সুখে প্রীতি লাভ হয়, যা লাভ হলে দুঃখের অন্ত হয়, যা প্রথমে বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃততুল্য এবং যা আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসন্নতা হতে উৎপন্ন—তা-ই সাত্ত্বিক সুখ॥ ৩৬-৩৭

সাত্ত্বিক সুখ কি ও কীরূপে লব্ধ হয়

সাত্ত্বিক সুখ বিষয়সুখের ন্যায় সহজলভ্য নয়। তার প্রাপ্তি হয়—ক্রমিক অভ্যাস বা সদ্‌গুরুনির্দ্দিষ্ট সাধনপদ্ধতির দীর্ঘকালীন অনুশীলনের দ্বারা। এই সুখ বিষয়ভোগজনিত সুখের ন্যায় দুঃখমিশ্রিত নয়। এই সুখের প্রাপ্তি হলে দুঃখের চিরাবসান ঘটে। তা ছাড়া, এই সাত্ত্বিক সুখ লাভ করতে হলে প্রাথমিক স্তরে যে কঠোর বৈরাগ্য-বিচারের আশ্রয় নিতে হয় এবং তা যে বিশেষ ক্লেশসাধ্য, তাতে সন্দেহ সন্দেহ নাই। তাই এখানে বলা হয়েছে —এই সুখ প্রথমে বিষের ন্যায় জ্বালাপ্রদ। তবে সেই প্রাথমিক সংগ্রামের স্তর যখন অতিক্রান্ত হয় তখন তা হয় অমৃতের ন্যায় অশেষ শান্তিপ্রদ। অর্থাৎ, সাত্ত্বিক সুখ সহজলভ্য না হলেও তার পরিণাম—অত্যন্ত শুভ ও অশেষ আনন্দপ্রদ।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮

অন্বয়—বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যত্তৎ অগ্রে অমৃতোপমং পরিণামে বিষম্ ইব, তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮

অনুবাদ—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃ যে সুখ উৎপন্ন হয় এবং যা প্রথমে অমৃতের ন্যায় এবং পরিণামে বিষতুল্য—সেই সুখকে রাজস সুখ বলা হয়॥ ৩৮

রাজস সুখের উৎপত্তি ও তার পরিণাম

রাজস সুখ উৎপন্ন হয়—রূপ-রসাদি বিষয়-পঞ্চকের সহিত বাক্, পাণি, পাদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ বা সংযোগের ফলে। সুতরাং, ইহার প্রাপ্তি ঘটে অতি সহজে ও অতি সত্বর। কেন না, ইন্দ্রিয়গণ নিরন্তর বিষয়ভোগের জন্য একান্ত উন্মুখ ও উদগ্রীব এবং ইন্দ্রিয়গণের পক্ষে বিষয়ের সংস্পর্শে আসাও খুব একটা ক্লেশসাধ্য ব্যাপার নয়। আর যদি কোনও ক্ষেত্রে ঈপ্সিত বিষয়বস্তুর আহরণ কিছুটা ক্লেশকর হয়, তথাপি তার প্রতি ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুরাগ থাকার ফলে,

তার অর্জ্জনের চেষ্টা খুব বেশী দুঃখপ্রদ হয় না। তাই এখানে বলা হয়েছে —এই রাজস সুখ অগ্রে অমৃততুল্য সুখপ্রদ। তবে যে বিষয়বস্তুর প্রতি ইন্দ্রিয়গণের এতটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ও অনুরাগ, তা একান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং তার উপভোগের পরিণামেও উদ্ভূত হয় বহুবিধ শারীরিক ও মানসিক গ্লানি-গ্লানি ও আধি-ব্যাধি। তাই বলা হচ্ছে—রাজস সুখের পরিণতি বিষের ন্যায় জ্বালাপ্রদ।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯

অন্বয়—যৎ চ সুখং অগ্রে অনুবন্ধে চ আত্মনঃ মোহনং নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্॥ ৩৯

অনুবাদ—যে সুখ প্রথমে ও পরে বুদ্ধিভ্রংশকর এবং যা নিদ্রা, আলস্য ও অসতর্কতা হতে উৎপন্ন, তাকে তামস সুখ বলা হয়॥ ৩৯

তামস সুখের উৎপত্তি ও তার পরিণাম

যে-সুখ নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হতে উৎপন্ন হয়, তা যে মানুষকে প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত মোহগ্রস্ত ক'রে রাখবে তাতে সন্দেহ কি? আর এমতাবস্থায় মানুষ সাবধান সতর্ক হয়ে আত্মসংশোধনের চেষ্টাও করতে পারে না। ফলে, এই ঘোর আত্মবিস্মৃতির অবস্থায় তার মনে বিবেক-বুদ্ধি কী ভাবে জাগ্রত হতে পারে? আর সেই মতিচ্ছন্ন অবস্থায় যে এক প্রকার মিথ্যা সুখের আভাস অনুভূত হয়, তাকে বলে—তামস সুখ। এই সুখ যে অতি ও জঘন্য ধরণের—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০

অন্বয়—পৃথিব্যাং দিবি বা দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং নাস্তি যৎ প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তঃ স্যাৎ॥ ৪০

অনুবাদ—পৃথিবীতে, স্বর্গে এবং দেবগণের মধ্যেও এমন কেহ নাই —যা প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণ হতে পরিমুক্ত॥ ৪০

কেহ বা কোন কিছু ত্রিগুণমুক্ত নয়

গীতার মতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিগুণজাত। সুতরাং, এই ত্রিলোকের সমস্ত দেব-দেবী, নর-নারী, জীব-জন্তু ও ভূতচরাচর যে ত্রিগুণাত্মক হবে তাতে সন্দেহ কোথায়? এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—বর্ত্তমান যুগে এমন দু একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা প্রচার করেন—তাঁদের তপোলব্ধ শক্তিবলে অদূর ভবিষ্যতে এই জগতে অবতরণ করবে 'দেবলোক' এবং সেই সময়ে এই জগতের যাবতীয় পাপ-তাপ, অসুখ-অশান্তি ও ভেদ-বৈষম্যের চিরাবসান ঘটবে। ক্রম-বিকাশবাদী এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণেরও অভিমত এরূপ যে, কালক্রমে মানুষ দ্বেষ-হিংসাবর্জ্জিত হয়ে পরিণত হবে দেব-মানবে। পরন্তু, গীতার উপরোক্ত ভাগবত সিদ্ধান্তের মতে তাঁদের এই ধারণা একান্ত ভ্রান্ত ও স্বকপোলকল্পিত। কেন না, এ জগতে সব কিছু যখন ত্রিগুণাত্মক, তখন এখানে এমন সময় কখনও আসবে না বা আসতে পারে না—যখন এই জগতে তমো ও রজোগুণ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তবে এরূপ ঘটা সম্ভবপর যে, তপঃশক্তিশালী উচ্চকোটি মহাপুরুষগণের আবির্ভাবের ফলে এ সংসারে কখনও কখনও সত্ত্বগুণ অনেকখানি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং তার ফলে তখন রজঃ ও তমোগুণ অনেকখানি সঙ্কুচিত ও স্তিমিত হয়ে থাকবে, আর গীতাতে একেই বলা হয়—ধর্ম্ম-সংস্থাপনা বা ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু স্মরণ রাখা চাই—এই অবস্থা আদৌ শাশ্বত বা চিরন্তন নয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন —"The word is like a dog's tail, you can straighten it but it will again recoil." অর্থাৎ, জগৎটা হচ্ছে কুকুরের কোঁকড়ানো লেজের ন্যায়, একে যতই সোজা কর না কেন—তা আবার কুঁকড়ে যাবেই। ক্রমবিকাশবাদীদেরও স্মরণ রাখা উচিত—ক্রমবিকাশ-নীতি ও ক্রমসঙ্কোচ-নীতি পরস্পর এমন ভাবে সংযোজিত যে, এদের একটি অপরটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে না।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১

অন্বয়—পরন্তপ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানি॥ ৪১

অনুবাদ—হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল তাদের স্বভাবজাত গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভক্ত হয়েছে॥ ৪১

প্রকৃতি ভেদে বর্ণভেদে

প্রত্যেক সমাজে চার প্রকার রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয় এবং উক্ত চতুর্ব্বিধ রুচি ও সংস্কারের অনুপাতে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ অবশ্যম্ভাবী। হিন্দুসমাজে প্রাচীনকাল হতে এরা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপে পরিগণিত ও পরিচিত। তাদের বর্ণোচিত গুণ ও সংস্কার কী রূপ বিভিন্ন—তা পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

জগতের আর্য্যেতর অন্যান্য সমাজ-সম্প্রদায়গুলিতেও ঐ রূপ চার প্রকার রুচিসম্পন্ন লোক পরিদৃষ্ট হয়। তবে তা'রা অভিহিত হয়েছে অন্য নামে। তথায় তা'দিগকে শিক্ষক, রক্ষক, পালক ও সেবকরূপে বর্ণনা করা হয়। গীতার মতে এই চতুর্ব্বর্ণ-বিভাগ ভাগবত বিধানরূপে স্বীকৃত। এই বিধান তাই শাশ্বত ও সনাতন এবং এই কারণে এই বিধান কখনও কোনও দেশ বা জাতিবিশেষের মধ্যে সীমিত বা সীমাবদ্ধ হতে পারে না। বস্তুতঃ, সকল দেশের সমাজস্থিতি রক্ষার জন্য উপরোক্ত চারটি শ্রেণী বা বর্ণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪২

অন্বয়—শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচং, ক্ষান্তিঃ, আর্জ্জবং, জ্ঞানং, বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যম্ এব চ স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম্ম॥ ৪২

অনুবাদ—শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত গুণ॥ ৪২

জন্মমাত্র কেহ ব্রাহ্মণ হয় না

নব্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের স্মরণ রাখা উচিত—হিন্দুশাস্ত্রের মতে 'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে'—অর্থাৎ, জন্মক্ষণে সকলে শূদ্রই থাকে। সংস্কারের দ্বারা পরে দ্বিজত্ব অর্জ্জিত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপনয়ন-সংস্কার ও যোগ্য শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ সন্তান শম-দমাদি উপরোক্ত গুণগুলি অর্জ্জন ক'রে থাকেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আধুনিক ব্রাহ্মণগণ এই শাস্ত্রোক্ত বিধান ও নির্দ্দেশ বিস্মৃত হয়েছেন। তাই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপনয়নাদি সংস্কারের পরেও তাঁরা ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণগুলির অনুশীলন বা অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন না।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩

অন্বয়—শৌর্য্যং, তেজঃ, ধৃতিঃ, দাক্ষ্যং, যুদ্ধে চাপি অপলায়নং, দানম্, ঈশ্বরভাবঃ চ—স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম্ম॥ ৪৩

অনুবাদ—শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, কর্ম্মদক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান বা উদারতা ও শাসন ক্ষমতা—এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্ম॥ ৪৩

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

অন্বয়—কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম ; পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

অনুবাদ—কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য বৈশ্যগণের এবং সেবামূলক কর্ম্ম শূদ্রদের স্বভাবজাত॥ ৪৪

বর্ণভেদ ও জাতিভেদের মধ্যে পার্থক্য

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—বর্ণভেদ গুণগত এবং জাতিভেদ জন্মগত। তবে বর্তমান যুগে এই জন্মগত জাতিভেদ এতখানি মহত্ত্ব ও প্রাধান্য অর্জ্জন করেছে যে, গুণ ও কর্ম্মগত বর্ণবিভাগের প্রথাটি অধুনা হিন্দুসমাজে বিলুপ্ত হতে বসেছে এবং সেই কারণে জাতিভেদের নামে আজ শতবিধ ঘৃণা, বিদ্বেষ, ভেদ-বৈষম্যরূপ পাপ প্রশ্রয় পেয়ে হিন্দু- সমাজের নিদারুণ অধোগতি ও দুর্গতির কারণ হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ, জন্মগত জাতিভেদের মৌলিক আধার হচ্ছে বৃত্তিভেদ আর এই কারণে প্রাচীন চতুর্ব্বর্ণের স্থলে হিন্দুসমাজে অধুনা সৃষ্ট হয়েছে শত শত শাখা জাতি। বলা বাহুল্য, এই বিধান মনুষ্যকৃত—ইহা শাস্ত্রসম্মত নয়।

যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয়—মহাভারতীয় যুগের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় বৈদিক সমাজে গুণগত বর্ণবিভাগ অনেকখানি বিশুদ্ধ স্বরূপে প্রচলিত ছিল। তার পরে বহিরাগত বহু অভারতীয় জাতির অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সেই বৈদিক সমাজে যখন নানা প্রকার আদর্শবিভ্রাট ও রুচিবৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখনই ঐ সমস্ত বহিরাগত বিভিন্ন জাতির সহিত আর্য্য জাতির বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে বর্ণসাঙ্কর্য্য প্রশ্রয় পায় এবং তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণামে সমাজে উদ্ভূত হয়—অগণিত শাখা-জাতি। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের উপজাতি ও শাখাজাতিগুলির বংশ-পরিচয়ের ঐতিহ্যও সেই সত্যের প্রমাণ দেয়।

মহাভারত পাঠে জানা যায়, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কখনও কখনও এই জাতিভেদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর-দান প্রসঙ্গে তিনি যে উক্তি করেছেন তা নিম্নরূপ—আমার মতে সর্ব্ব বর্ণের সঙ্কর হেতু মনুষ্য মাত্রতে জাতি-নিশ্চয় দুঃসাধ্য। বর্ণসকলের সংস্কারাদি ক্রিয়াসম্পন্ন হলেও যদি সচ্চরিত্রতা বা উচ্চ গুণ-শীল বিদ্যমান না থাকে, তবে সে স্থলে সংস্কারকে বলবান মনে করতে হবে।

শূদ্রেতু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজো তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রা ভবেচ্ছুদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

যে শূদ্রে শম-দমাদির লক্ষণ থাকে সে শূদ্র—শূদ্র নয়—ব্রাহ্মণ ; আর যে

ব্রাহ্মণে সেই সমস্ত গুণ-শীলের অভাব সে ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ নয়—শূদ্র। উমা-মহেশ্বর সংবাদে মহাদেবও বলেছেন—

ন যোনিনাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥

দ্বিজকুলে জন্ম, উপনয়নাদি সংস্কার, বেদাধ্যয়নাদি দ্বিজত্বের কারণ হয় না। একমাত্র চরিত্রই—দ্বিজত্বের কারণ।

এখানে 'দ্বিজ' বলতে শুধু ব্রাহ্মণকে বোঝানো হচ্ছে না। কেন না, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণই 'দ্বিজ' রূপে আখ্যাত হতেন এবং তাঁদের সকলের জন্যই বিহিত ছিল—উপনয়ন-সংস্কার ও বেদাধ্যয়ন। দ্বিজলক্ষণ সম্বন্ধে পরবর্তী যুগের ভক্তিশাস্ত্রেও বলা হয়েছে—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ॥"

অর্থাৎ, চণ্ডালও যদি হরিভক্তিপরায়ণ হয়, তবে সেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

এ বিষয়ে আর অধিক শাস্ত্রপ্রমাণের উদ্ধৃতি অনাবশ্যক। প্রাচীন ভারতে তপস্যার দ্বারা কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব রাজা বিশ্বামিত্রই নন—অনেক বৈশ্য এমন কি শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করেছিলেন। রাজর্ষি জনক, পিতামহ ভীষ্ম, নীতিশাস্ত্রকার বিদুর, পুরাণপ্রবক্তা সূত প্রভৃতি অব্রাহ্মণগণও যে জ্ঞান ও চরিত্রগুণে সেই যুগের মুনি-ঋষিগণেরও শ্রদ্ধেয় হয়েছিলেন—তাও ইতিহাস-বিশ্রুত।

আজকাল হিন্দুসমাজে জাতিভেদের সমস্যা এত জটিল স্বরূপ ধারণ করেছে যে, তার সংস্কারসাধন এক প্রকার দুঃসাধ্য ব'লে মনে হয়। বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মরাষ্ট্র-সংস্থাপক হিন্দুরাজা ও সমাজব্যবস্থাপক উদারহৃদয় সমাজপতির অভাব। জীবিকার দায়ে ব্রাহ্মণ-সন্তান আজ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এমনকি শূদ্রের পেশা বরণেও ইতস্ততঃ করেন না। কেবলমাত্র বিবাহকালেই জাতি-গোত্রের অনুসন্ধানের প্রথা অধুনা বিদ্যমান। কালের পরিবর্ত্তনে, বিজাতীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে ও সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে সে প্রথাও আজ বিনষ্টপ্রায়। এমতাবস্থায় পেটের দায়ে যে যে-বৃত্তির আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে তার প্রধান কর্ত্তব্য—নিষ্ঠাসহকারে ও স্বধর্ম্মজ্ঞানে তারই যথাযথ অনুসরণ করা। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি আজ দেশরক্ষার কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকেন,

তবে তাঁর পক্ষে সেই ক্ষাত্রধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম জ্ঞান করে আন্তরিকতা সহকারে তারই প্রতিপালন করা একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া, যে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য এখনও স্বীয় স্বীয় বৃত্তি অবলম্বন ক'রে আছেন, তাঁদের কর্ত্তব্য —তাঁদের সেই স্বধর্ম্ম নিষ্ঠা সহকারে পালন করা। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় স্মরণযোগ্য।

বর্ত্তমান কালে একই বর্ণের মধ্যে যে অসংখ্য শাখা-জাতি বা উপজাতি উদ্ভূত হয়েছে, যুগের প্রয়োজনে তাদের উচ্ছেদ ও সমীকরণের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান ধর্ম্মাচার্য্যগণের কর্ত্তব্য —তাঁদের আশ্রিত শিষ্য-পরিকরগণের মধ্যে উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবের প্রচার-প্রতিষ্ঠার দ্বারা জাতিভেদজনিত বর্ত্তমান অন্ধ গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির সমূল উচ্ছেদ সাধন করা। নবযুগের আচার্য্য মহর্ষি দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য্য প্রণবানন্দ এই কার্য্যে অগ্রণী হয়ে সমাজসংস্কারের যে আদর্শ স্থাপন করেছেন, হিন্দুসমাজের পরম কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব—তাঁদের সেই উপদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসরণ ক'রে সামাজিক বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করা।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটি কথা মননযোগ্য। চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ যখন ভাগবত বিধান ব'লে স্বীকৃত, তখন তা শুধু মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত ও সীমাবদ্ধ হতে পারে না। এই জন্য দেবতা, গ্রহ-নক্ষত্র, প্রাণীকুল, এমন কি উদ্ভিদ্ ও জড়বস্তুসমূহের মধ্যেও সেই বিভাগ অনেকাংশে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, হিন্দুশাস্ত্রে সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে প্রজাপতি ব্রহ্মাকে রজোগুণী; পালন-কর্ত্তারূপে বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণী এবং সংহারকর্ত্তারূপে শঙ্করকে তমোগুণী দেবতা ব'লে বলে মান্য করা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে নক্ষত্রগণের মধ্যেও গুণভেদের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেমন কোনও কোনও নক্ষত্রকে শুভ এবং অন্য কতকগুলিকে অশুভ ব'লে বর্ণনা করা হয়। জীব-জন্তুগণের মধ্যে সত্ত্বগুণী ব'লে গোজাতি পূজ্য এবং মহিষাদিকে রজো ও তমোগুণী ব'লে দেবপূজায় তাদের বলিদানের ব্যবস্থাও দেওয়া হয়েছে। উদ্ভিদ্ জগতেও তুলসী, বিল্ব ও অশ্বত্থ সত্ত্বগুণাত্মক ব'লে পূজ্য। প্রস্তর-স্তরেও কোনও কোনও শিলাখণ্ডকে নারায়ণ ও শিবের প্রতীকরূপে মান্য

করা হয়। নদ-নদীর মধ্যে সপ্তসিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া ব'লে গৃহীত ও পূজিত।

বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্রে শ্বেত, লোহিত, পীত এবং কৃষ্ণ বর্ণানুসারে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ করা হত। অর্থাৎ, শ্বেত বা গৌরবর্ণধারী ব্রাহ্মণকে সত্ত্বগুণী, লোহিত বর্ণ ক্ষত্রিয়কে রজোগুণী, পীতবর্ণ বৈশ্যকে রজস্তমমিশ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রকে তমোগুণী ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ত্তমান যুগে এরূপ গাত্রবর্ণ ভেদে বর্ণভেদের প্রথা যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ণসাঙ্কর্য্যহেতু আজ অনেক ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণবর্ণ এবং বহু শূদ্রকে গৌরবর্ণ দেখা যায় না কি?

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫

অন্বয়—স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে ; স্বকর্ম্মনিরতঃ যথা সিদ্ধিং বিন্দতি তৎ শৃণু॥ ৪৫

অনুবাদ—স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে অভিরত বা নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হলে কী রূপে মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে—তা শুন॥ ৪৫

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬

অন্বয়—যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ যেন ইদং সর্ব্বং ততং, মানবঃ স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি॥ ৪৬

অনুবাদ—যা হতে ভূতসমূহের উৎপত্তি ও জীবের কর্ম্মচেষ্টা, যিনি এই চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, মানব স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা তাঁর অর্চ্চনা বা সেবা ক'রে সিদ্ধি লাভ করে থাকে॥ ৪৬

স্বকর্ম্মই—স্বধর্ম্ম

যিনি বিশ্বস্রষ্টা ও জীবের সর্ব্ববিধ কর্ম্মের নিয়ন্তা, তাঁর সেবার্চ্চনা যে শুধু পুষ্প-চন্দন ও ধ্যান-ধারণার মাধ্যমেই সম্ভবপর তা নয়—প্রত্যেক মানুষ

তার বর্ণনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের সুষ্ঠু উদ্‌যাপনের দ্বারাও তাঁর প্রসন্নতা বিধানপূর্ব্বক মোক্ষ বা অধিকারী হতে পারে।

অনেকের ধারণা—ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কর্ম্মই শুধু মোক্ষের অনুকূল—শূদ্রাদির সেবাপরিচর্য্যামূলক কর্ম্ম নয়। উপরোক্ত শ্লোকে শ্রীভগবান্ সেই ভ্রান্তি নিরসন ক'রে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন—সকল বর্ণের স্বীয় স্বীয় বৃত্তিমূলক কর্ম্মই তাদের স্বধর্ম্ম এবং এই স্বধর্ম্মগুলির মধ্যে উচ্চাবচ কোনও ভেদভাব নাই। স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্ম্মই মহৎ। সেখানে চণ্ডীপাঠ বা জুতা মেরামতের মধ্যে কোনও ব্যবধান বা পার্থক্য নাই। এই বিষয়টি পরবর্ত্তী শ্লোকে আরও ভালভাবে স্পষ্টীকৃত হচ্ছে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭

অন্বয়—বিগুণঃ (অপি) স্বধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্ ; স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং আপ্নোতি॥ ৪৭

অনুবাদ—স্বধর্ম্ম দোষযুক্ত হলেও সম্যক্‌ভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা তা শ্রেষ্ঠ। স্বীয় স্বভাবের অনুকূল কার্য্য ক'রে লোক পাপভোগী হয় না॥ ৪৭

স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের অনুবর্ত্তনের ফলাফল

প্রত্যেকের বর্ণনির্দ্দিষ্ট যে কর্ম্ম তা-ই তার স্বধর্ম্ম এবং সেই স্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তনই তার পক্ষে সুগম ও সহজসাধ্য। এই জন্য প্রত্যেকের কর্ত্তব্য—পরম নিষ্ঠা ও সন্তোষের সহিত স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে অনুরত থাকা। স্বধর্ম্ম পালনের বিশেষ কারণবশতঃ যদি কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি ঘটে অথবা প্রতিকূল অবস্থার দরুণ তার অনুসরণে কিছু বাধা-বিঘ্ন সৃষ্ট হয়, তথাপি তার অনুসরণ করাই একান্ত যুক্তিযুক্ত ও শ্রেয়ঃ। আর এরূপ বিধান অনুসরণ না ক'রে যদি কেহ পরধর্ম্ম ভালভাবে উদ্‌যাপন করতে অগ্রসর হয়, তবে তার উন্নতি বা কল্যাণের পক্ষে তা আদৌ উপযোগী হয় না। পক্ষান্তরে, স্বীয় বর্ণনির্দ্দিষ্ট অনুবর্ত্তনের সময়ে যদি কিছু ভুল ত্রুটিও হয় তবে তার জন্য তার পাপ বা প্রত্যবায় হয় না।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮

অন্বয়—কৌন্তেয়, সহজং কর্ম্ম সদোষম্ অপি ন ত্যজেৎ ; সর্ব্বারম্ভাঃ হি ধূমেন অগ্নিঃ ইব দোষেণ আবৃতাঃ॥ ৪৮

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! স্বভাবানুরূপ কর্ম্ম দোষযুক্ত হলেও তা ত্যাগ করতে নাই। অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মমাত্রই দোষযুক্ত॥ ৪৮

স্বধর্ম্ম ত্যাগ একান্ত অসমীচীন

জগতে এমন কোনও কাজ নাই যা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বা একেবারে দোষমুক্ত। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহরূপ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করতে করতেও কর্ম্মীর মনে গুরুগিরির মোহ বা মিথ্যা আভিজাত্যের গর্ব্ব-গরিমার ভাব আসা অস্বাভাবিক নয়। ক্ষত্রিয় বর্ণকে যুদ্ধ-বিগ্রহে যে হিংসাত্মক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতে হয় তাতেও মনে গ্লানি ও পাপভীতির সঞ্চার হওয়া সম্ভবপর। বৈশ্যগণেরও কৃষিকর্ম্মে জীবহিংসা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কখনও কখনও মিথ্যাচারের ভাগী হবার আশঙ্কা থাকে। শূদ্রগণকেও অপরের সেবা-পরিচর্য্যা করতে গিয়ে কত প্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করতে হতে পারে। সর্ব্ববর্ণের ভিতরেই কর্ত্তব্যবিচ্যুতি প্রভৃতিও ঘটতে পারে। এতেই বোঝা যায়—এ সংসারে সব কাজই দোষযুক্ত। এরূপ অবস্থায় মানুষ কি কর্ম্মত্যাগ ক'রে চুপ চাপ বসে থাকবে এবং এরূপ করলে কি তার নিজের বা সমাজের হিত সাধিত হবে? নিশ্চয়ই নয়। যে অগ্নি পরম পাবক—যার দ্বারা কত লোকের কত উপকার হয়—তাও কৃষ্ণ-মলিন ধূমের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে না কি? অর্থাৎ, ধূমের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে ব'লে অগ্নিকে যেমন ত্যাগ করা যায় না, স্বকর্ম্ম দোষযুক্ত হলেও তেমনই তা ত্যাগ করা অনুচিত।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯

অন্বয়—সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ, জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি॥ ৪৯

অনুবাদ—যিনি সর্ব্ব বিষয়ে অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয়, নিঃস্পৃহ, তিনি কর্ম্মফল ত্যাগের দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ করেন বা কর্ম্মবন্ধন হতে মুক্ত হন॥ ৪৯

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির উপায়

'নৈষ্কর্ম্ম্য' শব্দটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে—কর্ম্মশূন্যতা। এই অর্থে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধির অর্থ হয়—কর্ম্মশূন্যতার অবস্থা লাভ করা। জ্ঞানবাদী সন্ন্যাসিগণ এইরূপ ব্যাখ্যারই সমর্থন করেন। তাঁদের মতে জ্ঞানই হচ্ছে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় এবং কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত সেই জ্ঞান লাভ করা যায় না। এই দৃষ্টিতে তাঁরা সমস্ত কর্ম্মকে দোষযুক্ত ব'লে থাকেন।

এখানে জানা আবশ্যক—গীতাকার শ্রীভগবান্ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির এরূপ ব্যাখ্যা সমর্থন করেন না। উপরোক্ত শ্লোকে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন—স্বধর্ম্ম দোষযুক্ত হলেও তা কদাচ ত্যাজ্য নয়। নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি বলতে তিনি ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগেরই সূচনা দিয়েছেন। বর্ত্তমান শ্লোকে তাই তিনি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে বলছেন—যিনি সর্ব্ব বিষয়ে অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয় ও নির্লোভ, তিনি কর্ম্মফল ত্যাগের দ্বারা মোক্ষ বা মুক্তির অধিকারী হন। এখানে লক্ষ্য করতে হবে—আদর্শ কর্ম্মযোগীকে হতে হবে—জিতেন্দ্রিয়, অনাসক্ত ও কামনা-বাসনামুক্ত। প্রশ্ন আসতে পারে—যিনি বাসনামুক্ত তাঁর পক্ষে কি কার্য্য করা সম্ভবপর? উত্তরে বলা যায়—কর্ম্মযোগী স্বীয় বাসনার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, সদ্গুরুর নির্দ্দেশে ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে যন্ত্রবুদ্ধিতে কাজ করেন। তাঁর সে কর্ম্মের পশ্চাতে থাকে—সদ্গুরুর সঙ্কল্প ও প্রেরণা।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০

অন্বয়—কৌন্তেয়, সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি তথা সমাসেন মে নিবোধ ; যা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা॥ ৫০

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! এইরূপে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধ সাধক কী রূপে ব্রহ্মভাব লাভ করেন তা' আমার নিকট সংক্ষেপে শোন। ইহাই জ্ঞানের চরম স্থিতি॥ ৫০

গীতামৃত—নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিই হচ্ছে জ্ঞানের চরম অবস্থা। এই অবস্থায় উপনীত হলে সাধক কী রূপে ব্রহ্মময় হয়ে যান, নিম্নোক্ত তিনটি শ্লোকে তা বর্ণিত হচ্ছে।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩

অন্বয়—বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ ধৃত্যা আত্মনং নিয়ম্য, শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা, রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য, বিবিক্তসেবী, লঘ্বাশী, যতবাক্‌কায়মানসঃ, নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ, বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ, অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫১-৫৩

অনুবাদ—নির্ম্মলবুদ্ধিযুক্ত সাধক ধৃতির দ্বারা মনোবৃত্তিকে সংযত ক'রে, শব্দাদি বিষয় পঞ্চক ত্যাগ ক'রে নির্জ্জনবাসী, মিতাহারী, কায়মনোবাক্যে সংযত, নিত্য ধ্যানপরায়ণ ও বৈরাগ্যব্রতী হয়ে অহঙ্কার, পাশবিক শক্তি, দর্প, কাম, ক্রোধ ও বাহ্য ভোগসামগ্রী পরিহারপূর্ব্বক প্রশান্তচিত্ত হয়ে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভের উপযুক্ত হন॥ ৫১-৫৩

ব্রাহ্মী স্থিতি লাভের উপায়

ভগবৎ স্বারূপ্য বা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভই অধ্যাত্ম জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। গীতার মতে এই সর্ব্বোচ্চস্থিতি লাভের উপায়—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ। উপরোক্ত সমস্ত প্রকার যোগের সাধনার পূর্ব্বে সাধকগণের পক্ষে যে উপরে বর্ণিত গুণগুলির অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন

—তা গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যিনি অধ্যাত্ম পথের পথিক তিনি কর্ম্মযোগী হোন, জ্ঞানযোগী হোন, ধ্যানযোগী হোন অথবা ভক্তিযোগী হোন, তাঁকে প্রবর্ত্তক অবস্থায় ধৈর্য্যশীল, সম্যক্‌রূপে সংযতাত্মা চিত্ত-বিক্ষেপকর বিষয়বস্তুর পরিত্যাগী বা বিষয়বিরাগী, নির্জ্জনতাপ্রিয়, মিতভোজী, ধ্যানশীল, কাম-ক্রোধ-লোভ-অভিমানাদি দুর্গুণগুলির দমনকারী ও প্রশান্তচিত্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই গুণগুলির অর্জ্জনের প্রতি মনোযোগ না থাকলে কোনও সাধনাই সিদ্ধ বা সফল হতে পারে না। অন্যান্য শাস্ত্রগুলির তুলনায় গীতার মহাবৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দান ক'রে ক্ষান্ত হন নি, সেই জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধনরূপী উক্ত গুণগুলির অর্জ্জনের প্রতিও সাধকের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করেছেন।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪

অন্বয়—ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি, ন কাঙ্ক্ষতি ; সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ পরাং মদ্ভক্তিং লভতে॥ ৫৪

অনুবাদ—ব্রহ্মভূত হলে তিনি প্রসন্নচিত্ত হয়ে শোক করেন না, কোনও কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সকল ভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হন এবং পরা ভক্তির অধিকারী হন॥ ৫৪

ব্রাহ্মী স্থিতির ফল

উপরে বর্ণিত গুণগুলির অনুশীলনের দ্বারা সাধক যখন ব্রহ্মস্বারূপ্য প্রাপ্ত হন, তখন তিনি কোনও কিছুর নাশ বা অভাবের জন্য শোকাভিভূত হন না অথবা কোনও কিছুর প্রাপ্তির আশাও তিনি রাখেন না। তখন তিনি সর্ব্বভূতের প্রতি রাগদ্বেষবর্জ্জিত হয়ে সমদর্শী হন এবং এই অবস্থায় তিনি পরা ভক্তির অধিকারী হন।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ৫৫

অন্বয়—ভক্ত্যা যাবান্ যঃ অস্মি, তত্ত্বতঃ অভিজানাতি ; ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরং বিশতে॥ ৫৫

অনুবাদ—এই পরা ভক্তি লাভ হলে সাধক—আমি স্বরূপতঃ কি বা কে—তা তত্ত্বতঃ অবগত হন এবং এই ভাবে আমাকে জেনে তিনি আমাতে প্রবিষ্ট হন॥ ৫৫

পরা ভক্তির পরিণাম

পরম প্রেম বা পরা ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা যায়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখা যায়—যখন কারুর প্রতি প্রেম বা ভালবাসা উৎপন্ন হয়, তখন সেই প্রেমের সূত্রে ক্রমশঃ তার হৃদয়ে প্রেমাস্পদের স্বভাব ও প্রকৃতির সম্যক্ পরিচয় লাভ করতে আগ্রহ উৎপন্ন হয়। তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রেমাস্পদের সম্পর্কে তার যে জ্ঞান—তা থাকে 'একান্ত অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। বস্তুতঃ, ভগবানের অনন্ত রূপ, অনন্ত গুণ ও অনন্ত বিভূতির সম্যক্ জ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত তাঁকে পূর্ণরূপে অনুভব করা যায় না এবং সেই জ্ঞান যখন লাভ হয়, তখন ভগবদ্ভক্ত প্রেমোন্মত্ত হয়ে তাঁতে ডুবে মজে একাকার হয়ে যান। আর এই অবস্থা লাভ হয়—পরা ভক্তির সহায়তায়।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬

অন্বয়—সদা সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ অপি মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতম্ অব্যয়ং পদম্ অবাপ্নোতি॥ ৫৬

অনুবাদ—আমাকে আশ্রয় ক'রে নিরন্তর সকল প্রকার কর্ম্ম করতে থাকলেও, আমার প্রসাদে বা কৃপায় সাধক সেই শাশ্বত পরম পদ প্রাপ্ত হন॥ ৫৬

কর্ম্মযোগের দ্বারাও পরমপদ প্রাপ্তি সম্ভব

উপরোক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে যে পরা ভক্তিই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভের

সর্ব্বোত্তম উপায়। যাঁদের সংস্কার কর্ম্মপ্রধান এবং যাঁদের মধ্যে ভাব-ভক্তির প্রাবল্য তেমন নাই, তাঁরা কি তাহলে সেই শাশ্বত পরমপদের অধিকারী হতে পারেন না? এই সংশয়ের নিরাকরণের জন্য শ্রীভগবান্ এক্ষণে বলছেন—এরূপ প্রকৃতির সাধক যদি আমার প্রীতির উদ্দেশ্যে নিরন্তর কর্ম্ম ক'রে যান তবে তিনিও আমার প্রসাদে নিশ্চিতই সেই পরম পদের অধিকারী হয়ে ধন্য হতে পারেন।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭

অন্বয়—চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য সততং মচ্চিত্তঃ ভব॥ ৫৭

অনুবাদ—মনে মনে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে ন্যস্ত বা অর্পণ করে—মৎপরায়ণ হয়ে সমত্ব-বদ্ধিরূপ যোগের আশ্রয় পূর্ব্বক আমাতে চিত্ত স্থাপন কর॥ ৫৭

গীতামৃত—কর্ম্মযোগী তাঁর আরব্ধ যাবতীয় কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ ক'রে একান্ত ভাবে তাঁর প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত হবেন এবং তিনি মনে কোনও কিছুর প্রতি রাগ-দ্বেষের ভাবকে প্রশ্রয় না দিয়ে সমত্ববুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে ইষ্টের প্রতি স্থিরচিত্ত হবেন।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ৫৮

অন্বয়—মচ্চিত্তঃ ত্বং মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বদুর্গাণি তরিষ্যসি ; তথ চেৎ অহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি, বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ৫৮

অনুবাদ—আমাতে চিত্ত স্থির রাখলে তুমি আমার প্রসাদে সকল বিপদ অতিক্রম করবে, আর যদি আমার কথা না শুন তবে বিনাশ প্রাপ্ত হবে॥ ৫৮

ভগবৎকৃপায় কর্ম্মযোগী সঙ্কটমুক্ত হন

কর্ম্মযোগীকে বাহ্যতঃ স্বাশ্রয়ী এবং আত্মনির্ভরশীল ব'লে মনে হলেও তিনি মনে প্রাণে একান্ত ভাবে ভগবৎশরণাগত ও তাঁর কৃপার উপর নির্ভরশীল। বস্তুতঃ, কর্ম্মযোগী জানেন—কর্ম্মকালে তাঁকে যে রাগ-দ্বেষ ও শুভাশুভ কর্ম্মজনিত জয়-পরাজয়ে সম্মুখীন হতে হয়, তা অতিক্রম করতে হলে ভগবৎকৃপাই তাঁর একমাত্র সম্বল। তা' ছাড়া, তাঁর পক্ষে সঙ্কটমুক্তির অন্য কোনও উপায় নাই।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি।। ৫৯

অন্বয়—অহঙ্কারং আশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি যৎ মন্যসে তে এষঃ ব্যবসায়ঃ মিথ্যা ; প্রকৃতিঃ ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি।। ৫৯

অনুবাদ—অহঙ্কারবশে তুমি মনে করছ—যুদ্ধ করবে না। তোমার এইরূপ বিচার বা সঙ্কল্প মিথ্যা। তোমার প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবে।। ৫৯

গীতামৃত—স্বধর্ম্ম ত্যাগে ইচ্ছুক অর্জ্জুনকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্রীভগবান্ বলছেন—হে সখে! তুমি যে যুদ্ধ করবে না বলছ, তোমার এই সঙ্কল্প অহঙ্কার বা অভিমানপ্রসূত। ভুলো না, তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তান—দেশরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার স্বভাব-সংস্কার। এই স্বভাব-সুলভ প্রকৃতি ত্যাগ করা তোমার পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হবে না। তথাপি তুমি যদি অভিমান বশে তা করতে উদ্যত হও, তবে তোমার স্বভাবজ ক্ষাত্র প্রবৃত্তি তোমাকে জোরপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাবে।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।। ৬০

অন্বয়—কৌন্তেয়! মোহাৎ যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ, অবশঃ তৎ অপি করিষ্যসি।। ৬০

অনুবাদ—হে কৌন্তেয়! মোহবশতঃ তুমি যা করতে ইচ্ছা করছ না, স্বভাবজ কর্ম্মে আবদ্ধ থাকায় তোমাকে অবশ হয়ে তা করতে হবে।। ৬০

মানুষ স্বীয় স্বভাব-সংস্কারের অধীন

পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের অনুপাতে মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি সৃষ্ট হয় এবং সেই প্রকৃতিই তার বর্ত্তমান কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষ শত চেষ্টা করেও সেই প্রবৃত্তির গতিকে রুদ্ধ করতে পারে না। বস্তুতঃ প্রকৃতিই যাবতীয় কর্ম্মপ্রবৃত্তির একমাত্র নিয়ামক। এখানে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে সেই কথাই বলছেন—তুমি যুদ্ধ করতে না চাইলেও তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করাবেই। অর্থাৎ, অবশভাবে তোমাকে তোমার প্রকৃতির সেই দুর্ব্বার গতির অনুবর্ত্তন করতে হবে।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।। ৬১

অন্বয়—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বরঃ মায়য়া যন্ত্রারূঢ়ানি [ইব] সর্ব্বভূতানি ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি।। ৬১

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবস্থিত থেকে স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় তাদিগকে চালিত করেন।। ৬১

ভগবানের মায়াশক্তিই সর্ব্বজীবের সঞ্চালক

উপরের শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক জীবের যা স্বভাব বা প্রকৃতি তা-ই তার কর্ম্মপ্রবৃত্তির নিয়ামক। এক্ষণে বর্ত্তমান শ্লোকে বলা হচ্ছে—ভগবানের মায়াশক্তিই সকল জীবের জীবনগতির একমাত্র সঞ্চালক। অর্থাৎ, সাংখ্য মতে প্রকৃতি সর্ব্বময়ী কর্ত্রী এবং গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের মতে শ্রীভগবানই জীবের শুভাশুভ কর্ম্মপ্রবৃত্তির বিধায়ক। সূত্রধর যেমন পশ্চাতে অবস্থিত থেকে যন্ত্রের সহায়তায় তার পুতুলগুলিকে চালিত করে, শ্রীভগবানও তেমনি অদৃশ্যভাবে স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সঞ্চালিত ক'রে থাকেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্‌॥ ৬২

অন্বয়—ভারত! সর্ব্বভাবেন তম্‌ এব শরণং গচ্ছ, তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শাশ্বতং স্থানং প্রাপ্স্যসি॥ ৬২

অনুবাদ—হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ কর ; তাঁর কৃপায় পরম শান্তি ও অক্ষয়পদ লাভ করবে॥ ৬২

গীতামৃত—হে কুন্তীপুত্র ভারত, শ্রীভগবানই যখন তোমার জীবনগতির সর্ব্বময় বিধাতা, তখন তোমার কর্ত্তব্য হচ্ছে—সর্ব্বতোভাবে তাঁর একান্ত শরণাগত হওয়া। এরূপ ঐকান্তিক শরণাগতির দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করতে পারলে, তুমি তাঁর অপার অনুগ্রহে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও অক্ষয় ব্রাহ্মী স্থিতির অধিকারী হয়ে ধন্য হবে। নিশ্চিত রূপ জেনে রাখ—ভগবৎকৃপাই সেই পরমপদ লাভের সরলতম উপায়।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩

অন্বয়—ইতি গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং ময়া তে আখ্যাতম্‌। এতদ্‌ অশেষেণ বিমৃশ্য যথা ইচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩

অনুবাদ—আমি তোমার নিকট গুহ্য হতেও গুহ্যতর সেই বিষয় বললাম। তুমি এখন ভালমত বিচার করে যা ইচ্ছা তা-ই কর॥ ৬৩

সদ্‌গুরুরূপী শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণই সিদ্ধির গুহ্যতম রহস্য

শ্রীভগবান্‌ যখন জীবোদ্ধারের জন্য নরশরীরে অবতরণ করেন, তখন তাঁর চরণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পারলে মুক্তি বা মোক্ষ একান্ত সহজসাধ্য হয়। নবযুগের পরিপূর্ণ অবতার ও পরিত্রাতা আচার্য্য প্রণবানন্দও সেই গুহ্যতম রহস্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সঙ্ঘগীতায় লিখিত আছে।—"যারা একান্ত মনে সঙ্ঘনেতাকে আশ্রয় করিয়া তাঁর চরণে

আত্মনিবেদনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়, তিনি স্বয়ং তাদের জীবন-তরণীর কাণ্ডারী হন। যেখানে যে ভাবে যে অবস্থায় থাকিলে তাদের অধিকতর কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা সেইখানে সেই ভাবে সেই অবস্থায় তাহাদিগকে রাখেন। সুখ-দুঃখ, শুভাশুভ, সম্পদ-বিপদময় নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া দ্রুতবেগে আপনার শ্রীচরণে টানিয়া নেন।" সঙ্ঘগীতার এই উক্তি উপরোক্ত ভদবদুক্তিরই অনুরূপ প্রতিধ্বনি নয় কি?

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌॥ ৬৪

অন্বয়—সর্ব্বগুহ্যতমং মে পরমং বচঃ ভূয়ঃ শৃণু ; মে দৃঢ়ম্‌ ইষ্টঃ অসি ; ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি॥ ৬৪

অনুবাদ—পুনরায় সবচেয়ে গুহ্যতম আমার বচন শ্রবণ কর। তুমি আমার প্রিয়, সেজন্য আমি তোমাকে এই কল্যাণকর কথা বলছি॥ ৬৪

গীতামৃত—অর্জ্জুনকে অত্যন্ত প্রিয় বলার তাৎপর্য্য এই যে, অর্জ্জুনই সর্ব্বাধিক প্রেম, অনুরাগ ও আনুগত্যের দ্বারা শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, অর্জ্জুন ছিলেন একান্ত জিজ্ঞাসু এবং ধর্ম্মরাষ্ট্র সংস্থাপনে শ্রীভগবানের অনন্য সেবক। অন্যান্য ভক্তগণের তুলনায় অর্জ্জুনের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তাঁকে শ্রীভগবানের সর্ব্বাধিক প্রিয় ক'রে তুলেছিল। অর্থাৎ, যে প্রেমে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের সাথে সাথে আন্তরিক জিজ্ঞাসা ও সেবার ভাব বিদ্যমান, তা-ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গোপ-গোপীরা তাঁদের প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে মধুর ভাবে ভালবাসতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে বিশাল ধর্ম্মরাষ্ট্র-সংস্থাপনের মহৎ ব্রতভার নিয়ে শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, সেই ব্রতোদ্‌যাপনের কর্ম্মে তাঁরা অনুপস্থিত।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫

অন্বয়—মন্মনাঃ, মদ্ভক্তঃ, মদ্যাজী ভব, মাং নমস্কুরু, তে সত্যং প্রতিজানে মাম্ এব এষ্যসি, মে প্রিয়ঃ অসি॥ ৬৫

অনুবাদ—তুমি মদগতচিত্ত হও, আমাকে ভক্তি কর, আমার পূজা কর, আমাকে প্রণাম কর। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তোমাকে এই সত্য বলছি যে, তুমি আমাকে লাভ করবে, কেন না, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়॥ ৬৫

গীতামৃত—উপরোক্ত শ্লোকে ভক্তিযোগের চরম রহস্য ও ভক্তের প্রতি ভগবানের পরম প্রতিশ্রুতির আশ্বাস ও সান্ত্বনার ভাবটি বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ, শ্রীভগবান্ ভক্তির দাস এবং অনন্য ভক্তের উদ্ধারের জন্য তিনি চিরোদ্যত। যাঁরা ভক্তিপথের পথিক তাঁদের পক্ষে শ্রীভগবানের এই অভয়-বাণী কতই না সান্ত্বনাপ্রদ!

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বাপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

অন্বয়—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য একং মাং শরণং ব্রজ ; অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ॥ ৬৬

অনুবাদ—সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে তুমি একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সর্ব্ব প্রকার পাপ হ'তে পরিমুক্ত করব—শোক করো না॥ ৬৬

সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য্য

ধর্ম্মের তত্ত্ব সত্য সত্যই অতীব গূঢ় ও রহস্যময়। আর এজন্যই বলা হয়েছে—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"। বস্তুতঃ, তত্ত্বদর্শী সদ্গুরুর সাহায্য-সহায়তা ব্যতীত ধর্ম্মাধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় একান্ত দুঃসাধ্য। সুমহান্ অবতার পুরুষগণও এই হেতু সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকেন। আশ্রয়দাতা আচার্য্য আশ্রিত শিষ্যের প্রকৃতি, সংস্কার ও অধিকার অবগত হয়ে তার পক্ষে যে ধর্ম্মমত বা বিধি-বিধান উপযোগী, তা-ই তাকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় আশ্রিত শিষ্য অর্জ্জুনকে সেই বিষয়টি

বোঝাবার নিমিত্ত এখানে বলছেন—হে সখে! ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার পূর্ব্বকল্পিত চিন্তা ও বিচার পরিহার ক'রে তুমি একান্ত ভাবে আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ-তাপ, গ্লানি-ম্লানি হতে উদ্ধার করব। তুমি শোকাকুল বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না

বেদান্তবাদী পণ্ডিতগণ এখানে 'ধর্ম্ম' শব্দটির অর্থ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই-ই বোঝাতে চেয়েছেন এবং সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম বা সত্যাসত্যের দ্বন্দ্ব পরিহার ক'রে নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মে নিবিষ্টচিত্ত হও—এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। পরন্তু, এখানে এরূপ কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, উপরের শ্লোকটিতে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করেই স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে তাঁর প্রতি অর্থাৎ তাঁর সগুণ পুরুষোত্তম স্বরূপের প্রতি শরণাগত হওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষ স্মরণযোগ্য। শ্রীভগবান্ যখন যুগধর্ম্মের নবীন বাণী নিয়ে আবির্ভূত হন তখন তাঁর প্রবর্ত্তিত সেই নবধর্ম্মের ভাববন্যায় প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মীয় মত-পথ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের চুলচেরা বিচার নিঃশেষে ভেসে যায় এবং তখন তাঁর প্রচারিত সেই নবীন ধর্ম্মাদর্শই হয়ে উঠে সর্ব্বজনগ্রাহ্য। এই কালে রক্ষণশীলতার নামে যারা ধর্ম্মাধর্ম্মের পুরাতন আচার-বিচার আঁকড়ে রাখতে চায় তারা প্রকৃত সত্যের সন্ধান পায় না। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিবাদ, পাতঞ্জলের রাজযোগের মতাদর্শ প্রচলিত ছিল, তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাদের রূপান্তরের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে, অথচ অর্জ্জুন তখনও সেই পূর্ব্ব প্রচলিত মতাদর্শগুলিকেই একমাত্র সত্য মনে ক'রে তাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হতে চাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন—হে সখে! ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে তুমি যে বিচার ও ধারণা এতকাল পোষণ ক'রে এসেছ তা নিঃশেষে পরিহার ক'রে আমার শরণাগত হও এবং আমার উপদিষ্ট মত-পথের আশ্রয় কর, তাতেই তোমার কল্যাণ সাধিত হবে, অন্যথা নয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত—নবযুগের আচার্য্য প্রণবানন্দও স্বীয় আশ্রিত সন্তানদের লক্ষ্য করে যা বলেছেন তারও মর্ম্মার্থ এই—ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সত্যাসত্য সম্বন্ধে তোমাদের

স্বকপোলকল্পিত ধারণা ও বিশ্বাস ছাড়িয়া একান্ত ভাবে তোমরা শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হও। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও—গুরুর আশ্রিত সন্তানগণের মুক্তি-মোক্ষ গুরুরই কৃপাসাপেক্ষ।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।। ৬৭

অন্বয়—ইদং তে ন অতপস্কায় ন বাচ্যং, ন অভক্তায়, ন চ অশুশ্রূষবে ন চ মাং যঃ অভ্যসূয়তি।। ৬৭

অনুবাদ—যে তপোহীন, যে অভক্ত, যে শ্রবণ করতে অনিচ্ছুক, যে আমাকে দ্বেষ করে, তাকে তুমি একথা বলবে না।। ৬৭

অনধিকারীর নিকট গীতারহস্যের প্রচার নিষেধ

গীতাকার শ্রীভগবানের মতে অনধিকারীর নিকট গীতাধর্ম্মের উচ্চতম রহস্যের প্রচার অসমীচীন। কেন না, এতে হিতে বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা। রাজসূয়-যজ্ঞকালে পিতামহ ভীষ্ম যখন শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব-গৌরব ও গুণগ্রামের প্রশংসা ক'রে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁকে অর্ঘ্যদানের প্রস্তাব করলেন, তখন অনধিকারী শিশুপালপন্থীদের হৃদয়-মনে তা কী রূপ ঘৃণা-বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি করেছিল—তা মহাভারতের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। শ্রীভগবান্ এই জন্যই এখানে গীতাধর্ম্মের গুহ্য রহস্য অশ্রদ্ধালু, সাধনভজনবিহীন, জ্ঞানলাভে আগ্রহহীন ব্যক্তিগণের নিকট প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। প্রাচীনকালে যখন শাস্ত্রজ্ঞান ছিল গুরুমুখী, তখন এই আদর্শ ও অনুশাসন বহুলাংশে কার্য্যকরী ছিল। পরন্তু, অধুনা মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে শাস্ত্রগ্রন্থগুলি সকলের নিকট উন্মুক্ত হওয়ার ফলে এক শ্রেণীর অশ্রদ্ধালু পাঠক ও প্রচারক যে হিন্দুশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা বা কদর্থের প্রচার ক'রে সমাজে নানাপ্রকার বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে উদ্যত হচ্ছে ও হবে—তাতে আশ্চর্য্য কি?

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।। ৬৮

অন্বয়—যঃ ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা, মাম্ এব এষ্যতি, অসংশয়ঃ।। ৬৮

অনুবাদ—যিনি পরম গুহ্য এই গীতাধর্ম্ম আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করেন—তিনি আমাকে পরা ভক্তি করায় আমাকে প্রাপ্ত হবেন—এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।। ৬৮

গীতামৃত—ভগবদ্ বাণীরূপী এই পরম গীতাধর্ম্ম যিনি ভক্তগণের নিকট প্রচার করেন, তাঁর মধ্যে স্বতঃই ঐকান্তিক ভক্তি-ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কেন না, প্রচার-প্রসঙ্গে আন্তরিক ভাবে ভগবদ্ গুণানুবাদ করতে করতে তিনি যে ক্রমশঃ শুদ্ধচিত্ত ও প্রভুময় হয়ে যাবেন—তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।। ৬৯

অন্বয়—মনুষ্যেষু তস্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমঃ চ ন, তস্মাৎ অন্যঃ মে প্রিয়তরঃ চ ভুবি ন ভবিতা।। ৬৯

অনুবাদ—মনুষ্য মধ্যে তার চেয়ে আমার প্রিয় আর কেহ নাই এবং পৃথিবীর মধ্যে তার অপেক্ষা আমার প্রিয় সাধক আর কেহ হবে না।। ৬৯

গীতাধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা ভগবানের সর্ব্বাধিক প্রিয়

উপরোক্ত দুটি শ্লোকে শ্রীভগবান্ স্বীয় মর্ম্মবাণীরূপিণী গীতার ব্যাখ্যাতৃগণের প্রতি কী রূপ প্রীত ও প্রসন্ন—তারই মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন। বস্তুতঃ, যখন কোনও যুগাবতারের আবির্ভাব ঘটে, তখন তিনি চান—তাঁর জীবোদ্ধারের-লীলার কাহিনী এবং তাঁর তপঃপূত অমৃত বাণীর ব্যাপক প্রচার প্রতিষ্ঠা হোক। কেন না, সেই বাণীই হচ্ছে সেই যুগের যুগবাণী এবং তার মধ্যে নিহিত থাকে সেই যুগের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবন-গঠনের অমোঘ নির্দ্দেশ ও সূচনা। যাঁরা তাঁর সেই লোকপাবনী বাণীর প্রচার প্রতিষ্ঠায় এবং সেই লোকসংগ্রহমূলক ব্রতের

দায়িত্বভার গ্রহণে উদ্যত হন, তাঁরা যে তাঁর সর্ব্বাধিক প্রিয় ও অনুগ্রহভাজন হবেন, তাতে সন্দেহ কি? এ বিষয়ে আচার্য্য প্রণবানন্দ তাঁর শিষ্যগণকে উদ্দেশ্য ক'রে যে উক্তি করেছেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন—"কঠোর তপঃ-সাধনায় এই শরীরে এই জীবনে যে মহাশক্তির স্ফুরণ ঘটিয়াছে, সেই মহাশক্তি সমগ্র জাতির মহামুক্তি আনয়নে সমর্থ। যাও, তোমরা ঘরে ঘরে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলকে এই মহাশক্তির সংস্পর্শে আনয়ন কর।"

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০

অন্বয়—যঃ চ আবয়োঃ ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদম্ অধ্যেষ্যতে তেন অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্, ইতি মে মতিঃ॥ ৭০

অনুবাদ—আর যিনি আমাদের এই ধর্ম্ম-সংলাপ অধ্যয়ন করবেন তিনি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমার পূজা করবেন—ইহাই আমার অভিমত॥ ৭০

গীতাপাঠ-গীতাকারেরই অর্চ্চনা

গীতার ব্যাখ্যাতা শ্রীভগবানের কত প্রিয় তা পূর্ব্বে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে গীতাপাঠের কি ফল, তা-ই বর্ণিত হচ্ছে। গীতাপাঠ হচ্ছে জ্ঞানযজ্ঞের যজন বা অনুশীলন। অর্থাৎ, যিনি নিত্য নিয়মিত ভক্তি-বিশ্বাস সহকারে গীতাপাঠ বা গীতার পারায়ণ করেন, তিনি ভগবানেরই পূজা করেন। পুষ্প, চন্দনের দ্বারা শ্রীভগবানের পূজার্চ্চনার যে ফল, গীতাপাঠের দ্বারাও সেই ফলই লাভ হয়। তবে এখানে স্মরণ রাখতে হবে—অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ সমালোচনার মনোবৃত্তি নিয়ে গীতা অধ্যয়নের ফল হয় সম্পূর্ণ বিপরীত।

আজকাল এক শ্রেণীর নাস্তিক ও বিধর্ম্মী হিন্দুধর্ম্মের দোষত্রুটির অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য নিয়ে গীতাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অনুশীলন ক'রে থাকে। বলা বাহুল্য, তারা যে পুণ্যের বদলে পাপের, সুকৃতির বদলে দুষ্কৃতির ভাগী হয়, তাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণযোগ্য। অধুনা

হিন্দু-সমাজেও এমন এক শ্রেণীর নর-নারী আছে, নিত্য অধ্যয়নের ফলে গীতাগ্রন্থখানি যাদের কণ্ঠস্থ। পরন্তু, তাঁদের জীবন গীতাধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের গীতাপাঠে যে ছলনা, প্রতারণার কৌশল বিশেষ—তাতে সন্দেহ কোথায়?

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্॥ ৭১

অন্বয়—শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ যঃ নরঃ অপি শৃণুয়াৎ সঃ অপিঃ মুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণাং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ॥ ৭১

অনুবাদ—যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও ঘৃণাদ্বেষশূন্য হয়ে গীতা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপ হতে মুক্ত হয়ে পুণ্যাত্মাগণের প্রাপ্য শুভলোক প্রাপ্ত হন॥ ৭১

গীতাশ্রবণের ফল

গীতাব্যাখ্যা বা গীতাপাঠের ফল কী রূপ—তা বর্ণনা করার পরে গীতাশ্রবণের ফল কি, এক্ষণে তা-ই বিবৃত হচ্ছে। গীতাশ্রবণে জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ-তাপ বিনষ্ট হয় এবং পুণ্যাত্মাগণের ঈপ্সিত ও উপযোগী শুভলোক বা উচ্চগতি লাভ হয়। তবে যেমন তেমন ভাবে বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে শ্রবণ করলে সে ফল পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে পাঠকগণের মহারাজ পরীক্ষিতের দৃষ্টান্ত স্মরণযোগ্য। সপ্তাহ কাল ভাগবত শ্রবণেই তিনি মৃত্যুভয় জয় করেন।

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥ ৭২

অন্বয়—পার্থ! ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ? ধনঞ্জয়! যে অজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ?॥ ৭২

অনুবাদ—হে পার্থ! তুমি একাগ্র মনে ইহা শ্রবণ করেছ তো? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ দূরীভূত হয়েছে তো?॥ ৭২

গীতাধর্ম্মের প্রচারের শেষে শ্রীভগবানের প্রশ্ন

সদ্‌গুরুরূপী শ্রীভগবান্ স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ দান করেই যে স্বীয় কর্ত্তব্য সমাপ্ত করলেন—তা-ই নয়। তিনি সখাকে এক্ষণে প্রশ্ন করছেন—আমি যে এতক্ষণ তোমাকে এত উপদেশ-নির্দ্দেশ দিলাম তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছ তো? এবং তার ফলে তোমার মনের সংশয়-মোহ দূরীভূত হয়েছে তো?

অনেক ধর্ম্মাচার্য্য বা গীতাব্যাখ্যাতা মাসের পর মাস শ্রোতৃবৃন্দের নিকট গীতাধর্ম্মের ব্যাখ্যা ক'রে যান, কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করেন না—তাঁদের সেই উপদেশ তাঁদের শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়মনে রেখাপাত করেছে কি না। বলা বাহুল্য, এরূপ উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের ফলেই অধুনা শাস্ত্রব্যাখ্যা ও কথকতা তেমন কার্য্যকরী হচ্ছে না।

সঙ্ঘনেতা আচার্য্য প্রণবানন্দজী ছিলেন এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক। তিনি স্বীয় শিষ্য, পার্ষদবৃন্দকে লক্ষ্য ক'রে বলতেন—"এক শ্রেণীর গুরু নিত্য নূতন নূতন উপদেশ দিয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে বিভ্রান্ত ক'রে থাকেন, আমার রীতি-পদ্ধতি তা নয়। যার যতটুকু প্রয়োজন, তার নিকট তার চেয়ে অধিক কোনও কথা বলা আমার নিয়মবিরুদ্ধ। যে যতটুকু শুনবে ও পড়বে তার প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে—ততটুকু অনুসরণ বা পালন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া।" মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত এ বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেন—দেশে আজ 'বকাউল্লা' ও 'শোনাউল্লার' অভাব নাই। পরন্তু, 'কবিমুল্লার' বা কর্ম্মীর সন্ধান পাওয়া দুষ্কর।

অর্জ্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ—অচ্যুত! ত্বৎপ্রসাদাৎ মোহঃ নষ্টঃ, ময় স্মৃতিঃ লব্ধা, গতসন্দেহঃ স্থিতঃ অস্মি, তব বচনং করিষ্যে॥ ৭৩

অনুবাদ—অর্জ্জুন বললেন—হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার মোহ

বিনষ্ট হয়েছে, আমি আমার আত্মস্মৃতি ফিরে পেয়ে স্থিরসঙ্কল্প হয়েছি, আমার আর কোনও সংশয় নাই। এক্ষণে আমি তোমার বচন বা নির্দ্দেশ পালন করব॥ ৭৩

অর্জ্জুনের গীতাশ্রবণের ফল

শ্রীভগবানের প্রশ্নের উত্তরে অর্জ্জুন বললেন, হে অচ্যুত। তুমি কৃপা ক'রে এতক্ষণ যে উপদেশ দিয়েছ তা ব্যর্থ বা নিষ্ফল হবার নয়। হে সখে! তুমি নিজে ত্রুটিবিচ্যুতিহীন, তাই তো তুমি অচ্যুত। তোমার উপদেশ নির্দ্দেশ কি কখনও ব্যর্থ হতে পারে? আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, তোমার ঐ অমৃতময় উপদেশ শ্রবণের ফলে আমার সুদীর্ঘকালের 'মোহ' অপসৃত হয়েছে। যে আত্মবিস্মৃতির নিমিত্ত আমি আমার স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে পরধর্ম্ম আশ্রয়ের জন্য প্রবৃত্ত হচ্ছিলাম, তোমার উপদেশে আমার সে ভ্রান্তি সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে। আমি এখন স্থিরনিশ্চয় হয়েছি ; তোমার উপদেশ পালনের জন্য এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

বস্তুতঃ, গীতার এই অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করার পরে অর্জ্জুনের ন্যায় আমরাও কি বলতে পারি—আমরা আমাদের অজ্ঞান ও পূর্ব্ব সংস্কার পরিহার ক'রে মোহমুক্ত হয়েছি? আমরাও কি এক্ষণে তাঁর ন্যায় আমাদের স্বধর্ম্ম বা স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছি? যদি হয়ে থাকি তবেই আমাদের গীতা-শ্রবণ সফল ও সার্থক—নচেৎ নয়।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম॥ ৭৪

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ—ইতি অহং মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ ইমং রোমহর্ষণম্ অদ্ভুতং সংবাদম্ অশ্রৌষম্॥ ৭৪

অনুবাদ—সঞ্জয় বললেন, মহাত্মা বাসুদেব ও পার্থের এই অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর কথোপকথন আমি শুনেছি॥ ৭৪

গীতামৃত—কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদকে অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর ব'লে বর্ণনা

করার হেতু এই যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে, তার মহত্ত্ব-গৌরব কতই না অত্যদ্ভুত ও চমকপ্রদ। বস্তুতঃ, গীতাজ্ঞান সত্য সত্যই অভূতপূর্ব্ব।

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫

অন্বয়—অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ এতৎ পরং গুহ্যং যোগং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্॥ ৭৫

অনুবাদ—ব্যাসদেবের প্রসাদে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হ'তে আমি এই পরম গুহ্য যোগশাস্ত্র শ্রবণ করেছি॥ ৭৫

গীতামৃত—সঞ্জয় যে মহামুনি ব্যাসদেবের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ ক'রে কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনের যাবতীয় ঘটনাবলী দর্শন ও শ্রবণ করেছিলেন একথা পূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে; সঞ্জয় এক্ষণে স্বমুখে তা-ই স্বীকার করছেন। এখানে যোগশাস্ত্র বলতে যে জ্ঞান-ধ্যান-ভক্তিমিশ্র কর্ম্মযোগ শাস্ত্র বোঝাচ্ছে—তাতে সন্দেহ নাই।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৭৬

অন্বয়—রাজন্ কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যম্ অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুর্ম্মুহুঃ হৃষ্যামি॥ ৭৬

অনুবাদ—হে রাজন্ (ধৃতরাষ্ট্র), কৃষ্ণার্জ্জুনের সেই অদ্ভুত ও পুণ্য কথোপকথন বারংবার স্মরণ ক'রে আমার মনে মুহুর্ম্মুহুঃ হর্ষভাবের উদয় হচ্ছে॥ ৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭

অন্বয়—হে রাজন্, হরেঃ তৎ অত্যদ্ভুতং রূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মে মহান্ বিস্ময়ঃ চ পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি॥ ৭৭

অনুবাদ—হে রাজন্, হরির (শ্রীকৃষ্ণের) সেই অতি অদ্ভুত রূপ স্মরণ ক'রে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত ও হৃষ্ট হচ্ছি॥ ৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম॥ ৭৮

অন্বয়—যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ, যত্র ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ, তত্র শ্রীঃ, বিজয়ঃ, ভূতিঃ, ধ্রুবা নীতিঃ, ইতি মম মতিঃ॥ ৭৮

অনুবাদ—যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধর পার্থ বিদ্যমান, সেখানেই লক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয়, অভ্রান্ত নীতি—ইহাই আমার অভিমত॥ ৭৮

গীতাজ্ঞানের চরম সাফল্য কি ও কোথায়?

গীতার এটি অন্তিম শ্লোক। এজন্য এই শ্লোকটিতে গীতাধর্ম্মের অনুসরণ বা প্রতিপালনের সর্ব্বোচ্চ ফলের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। গীতাধ্যয়ন ও গীতাশ্রবণের পরে যদি এরূপ ফল না মিলে, তবে বুঝতে হবে—গীতাপাঠ, গীতাশ্রবণ বা গীতার অনুরূপ জীবন-যাপনে কোনও না কোনও ত্রুটি রয়ে গেছে।

এখানে 'যোগেশ্বর' শব্দটি বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। গীতায় 'যোগ' বলতে কোথাও বুদ্ধিযোগ, কোথাও ধ্যানযোগ, কোথাও কর্ম্মকৌশল, কোথাও যোগ অর্থে সাধনা, যুক্তি ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এখানে 'যোগেশ্বর' শব্দটি ব্যাখ্যাত হয়েছে—সর্ব্ববিধ যোগে সুকৌশলী অর্থে। অর্থাৎ, ভৌতিক স্তরে সংগ্রামক্ষেত্রে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সুচতুর পরামর্শদাতা এবং অর্জ্জুনের ন্যায় সশস্ত্রও সুনিপুণ যোদ্ধার সমাবেশ, সেখানে বিজয় এবং তার পরিণামে ঐশ্বর্য্য, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও অভ্রান্ত রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। অধ্যাত্মক্ষেত্রে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বযোগসিদ্ধ আচার্য্য ও অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষার্থী একনিষ্ঠ সাধক-শিষ্যের মিলন সাধিত হয়—সেখানে সেই অধ্যাত্ম সাধনার পথে লাভ হয়—আত্যন্তিকী প্রগতি ও সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধি। নৈতিক স্তরে যেখানে যুক্তি (যোগ) ও নৈতিক শক্তির সমন্বয়, সেখানেই চরম সাফল্য, সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি।

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং অনন্য ভক্ত ও ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনের ন্যায় শিষ্যের মিলন ও সমাবেশ, সেখানে উন্নতি, অভ্যুদয়, ঐশ্বর্য্য ও বিজয়—তা তো বোঝা গেল। কিন্তু, বর্ত্তমান যুগে রাশিয়া ও চীনের ন্যায় এমনও তো কোন কোন সমাজ ও রাষ্ট্র আছে—যারা ধর্ম্ম এবং ভগবানে অবিশ্বাসী, অথচ তারা তো আজ জাগতিক উন্নতি-অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রগতিশীল এবং রাষ্ট্রের অনুকরণ ও অনুসরণের পাত্র।

এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—ধর্ম্ম ও ভগবদ্বিশ্বাসহীন সমাজ ও রাষ্ট্রের এই যে উন্নতি-অভ্যুদয় তা অতি সাময়িক, তা কদাপি স্থায়ী হতে পারে না। ভারতীয় শাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে—"ধর্ম্মঃ ধরা-ধারকঃ"। অর্থাৎ, ধর্ম্মই সংসারকে ধারণ ক'রে রাখে।

এ বিষয়ে সঙ্ঘনেতা আচায্য প্রণবানন্দ কি বলেছেন—তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"জড়বাদকে যে দেশ চরমবাদ বলিয়া ধ্বনিয়াছে, এ দেশ সে দেশ নয়, এ দেশ চায় নীতি, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা।"

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

॥ ওঁ তৎসৎ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

শ্রীশ্রীগীতা-মাহাত্ম্যম্

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

ঋষিরুবাচ

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্॥ ১

সূত উবাচ

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥ ৩

অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সঙ্কীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্ বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্॥ ৪

১। ঋষি বললেন—হে সূত, পূর্ব্বে নারায়ণ-ক্ষেত্রে (বদরিকাশ্রমে) মুনিবর ব্যাসদেব-বর্ণিত গীতা-মাহাত্ম্য আমার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন কর।

২। সূত বললেন—হে ভগবন্, আপনি উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করেছেন; যা পরম গোপনীয় সেই গীতা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে কে সক্ষম?

৩। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ তা সম্যকরূপে জানেন; কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন, ব্যাসদেব, ব্যাসপুত্র (শুকদেব), যাজ্ঞবল্ক্য ও জনক এ বিষয়ে কিছু কিছু অবগত আছেন।

৪। অন্য সকলে অপরের নিকট শ্রবণ করে তার লেশমাত্র কীর্ত্তন করে থাকেন। আমিও ব্যাসদেবের মুখে যেরূপ শ্রবণ করেছি তা-ই যৎকিঞ্চিৎ আপনাকে বলছি।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৫

সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬

সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥ ৭

গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্॥ ৮

যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ॥ ৯

গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নির্গুণম্॥ ১০

৫। উপনিষদ্ নিচয় গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তার দোহন-কর্ত্তা, পার্থ সেই গাভীর বৎসস্বরূপ, গীতারূপ অমৃত তারই দুগ্ধ ; সুধী ব্যক্তিগণ এই গীতামৃতের ভোক্তা।

৬। যিনি লোকত্রয়ের কল্যাণের জন্য অর্জ্জুনের সারথ্যব্রতে ব্রতী হয়ে গীতামৃত দান করেছেন, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

৭। যিনি ঘোর সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক, তিনি গীতারূপ নৌকার সাহায্যে অনায়াসে তা পার হতে পারেন।

৮। যে মূঢ় ব্যক্তি সর্ব্বদা অভ্যাসযোগে গীতাজ্ঞান শ্রবণ করে নি, অথচ মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা রাখে, সে বালকেরও উপহাসাস্পদ হয়।

৯। যাঁরা দিবারাত্রি গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁরা মনুষ্য নন, নিশ্চিতই তাঁরা যে দেবস্বরূপ তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

১০। শ্রীকৃষ্ণ গীতাজ্ঞান আশ্রয় করেই সম্যক্ জ্ঞানের কথা অর্জ্জুনকে জ্ঞান দানের জন্য বলেছিলেন, তাতে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় পরম ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে।

সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশো চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদি কর্ম্মাণি॥ ১১

সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ॥ ১২

গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ॥ ১৩

তস্মাদ্ গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্॥ ১৪

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবং তদ্গৃহাশ্রমম্॥ ১৫

গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমম্॥ ১৬

১১। গীতার ভক্তিমুক্তি-প্রধান অষ্টাদশ (অধ্যায়রূপ) সোপান দ্বারা প্রেমভক্তি আদি কর্ম্মে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয়।

১২। গীতারূপ জলে স্নান সাধুগণের সংসারমল নাশ করে ; শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির পক্ষে (কিন্তু) উহা হস্তিস্নানের তুল্য নিষ্ফল হয়।

১৩। যে ব্যক্তি গীতার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিষয়ে জ্ঞাত নয়, মনুষ্য-লোকে সেরূপ লোকের সকল কর্ম্ম ব্যর্থ হয়ে থাকে।

১৪। যে ব্যক্তি গীতাজ্ঞান অবগত নয়, তদপেক্ষা অধম আর কেহ নাই। সেরূপ ব্যক্তির মনুষ্যদেহ ধারণে ধিক্, তার শাস্ত্রপাঠজনিত যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কুলশীল—তাতেও ধিক্।

১৫। যে ব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নয়, তার ন্যায় অধম আর কেউ নাই। তার দেহে ধিক্, তার চরিত্রে ধিক্, তার ধনসম্পত্তিতে ধিক্ এবং তার গৃহস্থাশ্রমেও ধিক্।

১৬। যে লোক গীতাশাস্ত্র জানে না তার তুল্য অধম আর কেহ নাই। তার প্রারব্ধে ধিক্, প্রতিষ্ঠায় ধিক্, পূজায় ধিক্, দানে ও মহত্ত্বে ধিক্।

গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ॥ ১৭

গীতার্থ-পঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্‌জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্॥ ১৮

তন্মোঘঃ ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞান-প্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে॥ ১৯

যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হ্রীয়তে॥ ২০

শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্ গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্॥ ২১

১৭। গীতাশাস্ত্রে যার মতি নাই তার সব কিছুই নিষ্ফল, তার জ্ঞানদাতা গুরুকে ধিক্, তার ব্রত ও নিষ্ঠায় ধিক্, তার তপস্যায় ধিক্ এবং তার যশেও ধিক্।

১৮। যে ব্যক্তি অর্থসহ গীতাপাঠ জানে না তার চেয়ে অধম আর নাই। যে জ্ঞান গীতায় বর্ণিত হয় নি, তা আসুর জ্ঞান ব'লে জানবে—তা নিষ্ফল, ধর্মহীন ও বেদান্তনিন্দিত।

১৯। সেইজন্য ধর্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানদায়িনী। গীতা—সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূতা ও পরম পবিত্র ব'লে প্রশংসিতা।

২০। যিনি বিষ্ণুপর্ব্বাহে, হরিবাসরে, কি স্বপ্নাবস্থায়, কি জাগ্রতাবস্থায়, কি চলতে চলতে, বসতে বসতে গীতাপাঠ করেন, তিনি শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন না।

২১। শালগ্রাম শিলার নিকট, দেবালয়ে, শিবালয়ে, তীর্থে, নদীতটে যিনি গীতাপাঠ করেন, তিনি নিশ্চিতই সৌভাগ্যের অধিকারী হন।

দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ॥ ২২

গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ॥ ২৩

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ॥ ২৪

গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ॥ ২৫

যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম॥ ২৬

গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ॥ ২৭

২২। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ প্রসন্ন হন, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, তীর্থযাত্রা ও ব্রতাদিতে সেরূপ প্রসন্ন হন না।

২৩। যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত চিত্তে গীতাপাঠ করেন, তিনি সমুদয় বেদ, অখিল শাস্ত্র ও পুরাণ অধ্যয়ন করেন।

২৪। যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রাম শিলার সমক্ষে, সাধুজনের সভায়, যজ্ঞে এবং বিষ্ণুভক্তের সমক্ষে গীতাপাঠ করলে পরম সিদ্ধি লাভ হয়।

২৫। যিনি প্রত্যহ গীতাপাঠ শ্রবণ করেন, তিনি দক্ষিণাসহ অশ্বমেধ প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করেন।

২৬। যিনি গীতা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, কিংবা অন্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করান, তাঁর পরমপদ লাভ হয়।

২৭। যিনি সাদরে ভক্তিসহকারে বিধিপূর্ব্বক গীতাগ্রন্থ দান করেন, তাঁর পত্নী প্রিয়তমা হন।

যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে॥ ২৮

অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে॥ ২৯

তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ॥ ৩০

বিস্ফোটকাদয়ো দেহে না বাধন্তে কদাচনঃ।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্॥ ৩১

জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাহভ্যাসরতস্য চ।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে॥ ৩২

মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা॥ ৩৩

২৮। তিনি যে যশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই এবং তিনি পত্নীর প্রিয়তম হয়ে পরম সুখলাভ করেন।

২৯। যে গৃহে গীতার অর্চ্চন হয় সেখানে অভিচারজাত ও গুরুতর পাপজনিত দুঃখ উপস্থিত হয় না।

৩০। সেখানে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিকরূপী ত্রিতাপজনিত পীড়া বা ব্যাধিভয় থাকে না। পাপ, তাপ, দুর্গতি ও নরকের সম্ভাবনা থাকে না।

৩১। গীতাপাঠকারীর দেহে কখনও বিস্ফোটকাদি রোগ-দুঃখ হয় না। তিনি কৃষ্ণপদে ঐকান্তিকী দাস্যভক্তি লাভ করেন।

৩২। যে ব্যক্তি গীতাভ্যাসে রত, তিনি প্রারব্ধজনিত শোক-দুঃখ ভোগ করলেও সকল জীবের প্রতি তাঁর সখ্য জন্মে। তিনি ইহলোকে সুখী ও মুক্ত হন। তিনি কোন কর্ম্মে লিপ্ত হন না।

৩৩। গীতা অধ্যয়নকারী ব্যক্তি মহাপাপ ও অতিপাপ করলেও সেই পাপ তাকে স্পর্শ করে না; যেরূপ পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না।

অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদি কৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা॥ ৩৪

জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ॥ ৩৫

সর্ব্বত্র প্রতিভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন॥ ৩৬

রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা॥ ৩৭

যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ॥ ৩৮

দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবান্ অপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ॥ ৩৯

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে॥ ৪০

৩৪-৩৫। অনাচারজনিত ও অবাচ্য বাক্যপ্রয়োগজনিত ও অভক্ষ্য ভক্ষণজনিত অস্পৃশ্য স্পর্শজনিত যে দোষ, জ্ঞানাজ্ঞানকৃত ও প্রাত্যহিক ইন্দ্রিজনিত যে দোষ তা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

৩৬। সর্ব্বত্র ভোজনকারী, সকলের নিকট হতে প্রতিগ্রহকারীও গীতাপাঠ করলে কদাপি পাপভাগী হয় না।

৩৭। ধনরত্নপূর্ণ এই পৃথিবী অন্যায়রূপে প্রতিগ্রহ করেও একবার মাত্র গীতাপাঠ করলে বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল হয়।

৩৮। যার হৃদয় সর্ব্বদা গীতাপাঠে অনুরক্ত, তিনি সাগ্নিক, সর্ব্বদা জাপক, তিনি ক্রিয়াশীল কর্ম্মী ও পণ্ডিত।

৩৯। তিনি দর্শনীয়, ধনী, যোগী ও জ্ঞানী, তিনি যাজ্ঞিক তিনি যাজী, তিনি সর্ব্ববেদার্থজ্ঞাতা।

৪০। যেখানে গীতাগ্রন্থ নিত্য অধীত হয়, এ সংসারে সেই স্থানে প্রয়াগাদি সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান থাকে।

নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ॥ ৪১

গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদ-ধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥ ৪২

যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ॥ ৪৩

শ্রীকৃষ্ণো ভগবানুবাচ

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥ ৪৪

গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥ ৪৫

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্॥ ৪৬

৪১। গীতাধ্যায়ীর দেহে এবং দেহশেষেও দেবতাগণ, ঋষিগণ ও যোগিগণ দেহরক্ষকরূপে বাস করেন।

৪২। যেখানে গীতাপাঠ হয়, সেখানে বালকৃষ্ণবেশী গোপাল, নারদ, ধ্রুব প্রভৃতি পার্ষদগণের সহিত সহায়রূপে উপস্থিত হন।

৪৩। যেখানে গীতাবিচার, গীতাপাঠ ও গীতার অধ্যাপনা হয়, সেখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত আনন্দে বিরাজ করেন।

৪৪। শ্রীভগবান্ বললেন—হে পার্থ, গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার উত্তম সারভাগ, গীতা আমার অত্যুগ্র এবং অব্যয় জ্ঞান।

৪৫। গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু।

৪৬। আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি, গীতা আমার পরম গৃহ, গীতাজ্ঞান আশ্রয় ক'রে আমি ত্রিলোক পালন করি।

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাহরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা॥ ৪৭

গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৪৮

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যামুক্তিগেহিনী॥ ৪৯

অর্দ্ধমাত্রা চিতা নন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী॥ ৫০

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্॥ ৫১

পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণ তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫২

৪৭। গীতা যে আমার পরম ব্রহ্মবিদ্যা, তাতে সংশয় নাই, গীতা অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা, নিত্যা ও অনির্ব্বাচ্য পদাত্মিকা।

৪৮। হে পাণ্ডব, গীতার গুহ্য নাম কীর্ত্তন করছি, শ্রবণ কর। গীতানাম কীর্ত্তনে সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

৪৯-৫১। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থ-জ্ঞান-মঞ্জরী—এই সকল নামে যে ব্যক্তি স্থিরচিত্তে প্রত্যহ জপ করেন, তিনি নিত্য জ্ঞান ও সিদ্ধি লাভ করেন এবং অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন।

৫২। যিনি সম্পূর্ণ পাঠে অক্ষম, তিনি অর্দ্ধেক অংশ পাঠ করবেন; তাতে তিনি নিঃসংশয়ে গোদানজনিত পুণ্যলাভ করবেন।

ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥ ৫৩

তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্॥ ৫৪

একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্॥ ৫৫

অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্॥ ৫৬

গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা॥ ৫৭

৫৩। এক তৃতীয়াংশ পাঠকারী ব্যক্তি সোমযাগের ফল লাভ করবেন। ষষ্ঠাংশপাঠকারী ব্যক্তি গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হন।

৫৪। যিনি প্রত্যহ দুটি অধ্যায় নিষ্ঠা সহকারে পাঠ করেন, তিনি নিশ্চিতই ইন্দ্রলোক লাভ করেন এবং তথায় এককল্পকাল বাস করেন।

৫৫। যিনি ভক্তিযুক্ত চিত্তে নিত্য নিয়মিত গীতার এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় রুদ্রস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে দীর্ঘকাল বাস করেন।

৫৬। যিনি প্রতিদিন গীতার অর্দ্ধ অধ্যায় নিয়মিতরূপে পাঠ করেন, তিনি রবিলোক প্রাপ্ত হয়ে তথায় শত মন্বন্তরকাল বাস করেন।

৫৭। যিনি প্রত্যহ গীতার দশটি, সাতটি, পাঁচটি, চারটি, তিনটি, দুটি, একটি বা আধটি শ্লোক একাগ্র চিত্তে পাঠ করেন, তিনি চন্দ্রলোকে অযুতবর্ষকাল বাস করেন।

গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্॥ ৫৮

গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ॥ ৫৯

গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬০

গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্।
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ॥ ৬১

যদ্ যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৬২

৫৮। যিনি গীতার অর্দ্ধ, এক চতুর্থাংশ, একটি শ্লোক বা একটি অধ্যায় স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন।

৫৯। অন্তকালে যিনি গীতার অর্থ বা গীতা শ্রবণ করেন, তিনি মহাপাপী হলেও মুক্তিভাগী হন।

৬০। যিনি গীতাপুস্তক ধারণ ক'রে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোকে বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে বাস করেন।

৬১। গীতার একটি অধ্যায় সংযুক্ত হয়ে দেহত্যাগ করলে তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং পুনরায় গীতাভ্যাসের দ্বারা তিনি পরম মুক্তি লাভ করেন। 'গীতা' এই শব্দ উচ্চারণ করতে করতে দেহত্যাগ করলে দেহীর পরমা গতি লাভ হয়।

৬২। গীতা পাঠ করতে করতে যে যে কর্ম্ম করা হয়, সেই সেই কর্ম্ম নির্দ্দোষ হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্॥ ৬৩

গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ॥ ৬৪

গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ॥ ৬৫

পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্॥ ৬৬

শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৬৭

গীতাদান প্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুণা সহ মোদতে॥ ৬৮

৬৩। যিনি পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধবাসরে গীতা পাঠ করেন, তাঁর পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন এবং তিনি নরক হতে স্বর্গে গমন করেন।

৬৪। গীতাপাঠে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রাদ্ধতৃপ্ত পিতৃগণ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে পিতৃলোকে গমন করেন।

৬৫। ধেনুপুচ্ছ সমন্বিত গীতাগ্রন্থ দান করলে মানুষ তৎক্ষণাৎ সম্যক্‌রূপে কৃতার্থ হন।

৬৬। স্বর্ণ সহিত গীতাগ্রন্থ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দান করলে দাতার পুনর্জ্জন্ম হয় না।

৬৭। যিনি একশত গীতা-গ্রন্থ দান করেন তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তথা হতে আর তাঁর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

৬৮। (তিনি) গীতাদানের ফলে দেহত্যাগের পরে বিষ্ণুলোকে সপ্তকল্পকাল বিষ্ণুর সহিত বাস করে পরমানন্দ লাভ ক'রে থাকেন।

সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্॥ ৬৯

দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে॥ ৭০

জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ॥ ৭১

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্দ্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্॥ ৭২

গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী॥ ৭৩

যোঽভিমানেন গর্ব্বেন গীতানিন্দাং করোতি চ।
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্॥ ৭৪

৬৯। যিনি গীতার্থ সম্যক্‌রূপে শ্রবণ ক'রে ঐ গ্রন্থ দান করেন, শ্রীভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর অভীষ্ট পূর্ণ করেন।

৭০। হে ভারত! চতুর্বর্ণের অন্তর্গত মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে যে ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা পাঠ করে না, সে হস্তস্থিত অমৃত ত্যাগ ক'রে বিষ ভক্ষণ করে।

৭১। সংসারদুঃখে একান্ত কাতর ব্যক্তিও গীতাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে গীতামৃত পান ক'রে জগতে কৃষ্ণভক্তি লাভ ক'রে সুখী হবে।

৭২। জনকাদি বহু নৃপতিগণ গীতা আশ্রয় ক'রে ইহলোকে নিষ্পাপ হয়ে পরমপদ প্রাপ্ত হয়েছেন।

৭৩। গীতাজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ নীচ জনসমূহে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, "গীতা" সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের তুল্যরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপিণী।

৭৪। যে ব্যক্তি অভিমান ও গর্ব্বভরে গীতানিন্দা করে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকপ্রাপ্ত হয়।

অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৭৫

গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি॥ ৭৬

চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ॥ ৭৭

যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ॥ ৭৮

গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ॥ ৭৯

বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ॥ ৮০

৭৫। অহঙ্কার বশে যে মূঢ় ব্যক্তি গীতার্থ জানে না, সে যতদিন কল্পক্ষয় না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচতে থাকে।

৭৬। নিকটে গীতাপাঠ হতে থাকলেও যে ব্যক্তি তা শ্রবণ করে না, সে বহুবার শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়।

৭৭। যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থ চুরি ক'রে আনে তার কিছুই ফল হয় না। তার গীতাপাঠও বৃথা।

৭৮। যে গীতার্থ শ্রবণ ক'রে আনন্দ বোধ করে না, প্রমত্ত ব্যক্তির পরিশ্রমের ন্যায় ইহলোকে তার সমস্তই বিফল হয়।

৭৯। গীতা শ্রবণ করার পরে স্বর্ণ, ভোজ্য দ্রব্য ও পট্টবস্ত্র পরমাত্মার প্রীতির নিমিত্ত নিবেদন করবে।

৮০। ভক্তিসহকারে নানাবিধ দ্রব্য, বস্ত্র ও উপকরণের দ্বারা পাঠকের পূজা করবে। এরূপ বহুপ্রকার প্রীতি প্রদর্শন করলে ভগবান্ শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন।

সূত উবাচ

মাহাত্ম্যমেতদ্‌গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ॥ ৮১

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ॥ ৮২

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৩

শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্॥ ৮৪

সূত বললেন

৮১। যে ব্যক্তি গীতাপাঠের শেষে শ্রীকৃষ্ণবর্ণিত পুরাতন এই গীতামাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি যথার্থ ফল লাভ করেন।

৮২। গীতাপাঠ ক'রে যে গীতামাহাত্ম্য পাঠ করে না, তার পাঠ বৃথাশ্রম মাত্র।

৮৩। যে ব্যক্তি এই মাহাত্ম্যযুক্ত গীতা পাঠ করেন এবং শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেন, তিনি পরমগতি লাভ করেন।

৮৪। অর্থযুক্ত গীতা যিনি ভক্তি সহকারে শ্রবণের পরে এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁর পুণ্যফল সর্ব্বসুখের কারণ হয়।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্॥

শ্লোকসূচী

র

ল

ব

শ

স

হ

৩। সঙ্ঘনেতা-সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বদ্রষ্টা। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, অন্তর-বাহির, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, দূর-অন্তিক, দৃষ্ট-অদৃষ্ট - সমস্তই তাঁর নখদর্পণে 'করামলকবৎ' দেদীপ্যমান্। ঐ তিনি পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও আশ্বাস দিচ্ছেন-

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি নত্বং বেত্থ পরন্তপ।
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন।।"

তিনি সবই জানেন, কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না-জানিতে চেষ্টা করে কে? "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"-সংশয় হইলে অকল্যাণ।

৪। যাহারা একান্ত মনে সঙ্ঘনেতাকে আশ্রয় করিয়া তাঁর চরণে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয় তিনি স্বয়ং তাহাদিগের জীবন-তরণীর কাণ্ডারী হন। যেখানে, যখন, যেভাবে, যে অবস্থায় থাকিলে তাহাদের অধিকতর কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা সেইখানে, সেই ভাবে, সেই অবস্থায় তাহাদিগকে রাখেন। সুখ-দুঃখ, শুভাশুভ, সম্পদ-বিপদময় নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া দ্রুতবেগে আপনার শ্রীচরণে টানিয়া নেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

২১১, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা - ৭০০ ০১৯
ফোন ঃ ২৪৪০-৫১৭৮